'প্রথম কবে এসেছিলেন মনে আছে ?'

'এজ্ঞে হ্যাঁ। যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিন সকালে।'

'যেদিন কাকা মারা গেলেন ?' মণিবাবু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন।

'এজ্ঞে হ্যাঁ।'

অনুকূলের চোখে জল এসে গেছে। সে গামছা দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, 'সে ভদ্দরলোক গেলেন চলে, আর তার কিছু পরেই আমি বাবুর চানের জল গরম করে নিয়ে তেনাকে বলতে গিয়ে দেখি কি তেনার যেন হুঁশ নেই। কয়েকবার "বাবু বাবু" করে ডেকে যখন সাড়া পেলাম না তখন এনার বাড়িতে গেলাম খবর দিতে।' অনুকূল অবনীবাবুর দিকে দেখিয়ে দিল। অবনীবাবু বললেন, 'আমি ব্যাপার দেখেই মণিবাবুকে টেলিফোন করে একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে বলি। অবিশ্যি বিশেষ কিছু করার ছিল না।'

একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। অনুকূল বাইরে চলে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকলেন লম্বা ঝুলপি, ঝাঁকড়া চুল, লম্বা গোঁফ আর পুরু ফ্রেমের চশমা পরা এক ভদ্রলোক। জানা গেল ইনিই সুরজিৎ দাশগুপ্ত। অবনীবাবু মণিমোহনবাবুকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনি এঁর সঙ্গে কথা বলুন। ইনি রাধারমণবাবুর ভাইপো।'

'ও, আই সি। আপনার কাকার সঙ্গে আমার চিঠিতে আলাপ হয়। উনি আমাকে এসে দেখা করতে—'

মণিবাবু তার কথার উপরেই বললেন, 'কাকার চিঠিটা সঙ্গে আছে কি ?'

ভদ্রলোক তাঁর কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড বার করে মণিবাবুর হাতে দিলেন। মণিবাবুর পড়া হলে সে চিঠি ফেলুদার হাতে গেল। আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম তাতে রাধারমণবাবু ভদ্রলোককে রবিবার ১৮ই সেপ্টেম্বর সকালে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন। কারণটাও বলা আছে — 'বাদ্যযন্ত্র আমার যাহা আছে তাহা আমার নিকটেই আছে। আপনি আসিলেই দেখিতে পাইবেন।' উল্টোদিকে ভদ্রলোকের ঠিকানাটাও ফেলুদা দেখে নিল — মিনার্ভা হোটেল,

সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলকাতা-১৩।

ফেলুদা চিঠিটা পড়ে খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা সুলেখা ব্লু-ব্ল্যাক কালিটার দিকে এক ঝলক দেখে নিল। চিঠিটা মনে হয় সেই কালিতেই লেখা।

সুরজিৎবাবু এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই খাটের একটা কোণে গিয়ে বসলেন। পরের প্রশ্নটাও মণিমোহনবাবুই করলেন।

'আঠারো তারিখে আপনার সঙ্গে কী কথা হয়?'

সুরজিৎবাবু বললেন, 'কিছুদিন আগে একটা পুরনো গীতভারতী পত্রিকায় বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে ওঁর একটা লেখা পড়ে আমি রাধারমণবাবু সম্বন্ধে জানতে পারি। এখানে এসে ওঁর কালেকশন দেখে আমি তার থেকে দুটো যন্ত্র কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করি। দাম নিয়ে কথা হয়। আমি দুটোর জন্যে দু'হাজার টাকা অফার করি। উনি রাজি হন। আমি তখনই চেক লিখে দিচ্ছিলাম, উনি দু'দিন পরে ক্যাশ নিয়ে আসতে বললেন। তাই বুধবার আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়। মঙ্গলবার কাগজে দেখি উনি মারা গেছেন। তারপর আমি দেরাদুন চলে যাই। পরশু ফিরেছি।'

মণিবাবু বললেন, 'আপনি যেদিন দেখা করতে আসেন সেদিন ওঁর শরীর কেমন ছিল?'

'ভালই তো। তবে ওঁর বোধহয় একটা ধারণা হয়েছিল উনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। দু-একটা কথায় সেরকম একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।'

'আপনার সঙ্গে কোনও কথা কাটাকাটি হয়নি তো?'

প্রশ্নটা শুনে সুরজিৎবাবুর মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য বেশ কালো হয়ে গেল। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'আপনি কি ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাকের জন্য আমাকে দায়ী করছেন?'

মণিবাবুও যথাসম্ভব ঠাণ্ডাভাবেই বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করে কিছু করেছেন বলছি না। তবে আপনি যাবার কিছুক্ষণ পরেই তো উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই...'

'তা হতে পারে, তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ তিনি সম্পূর্ণ

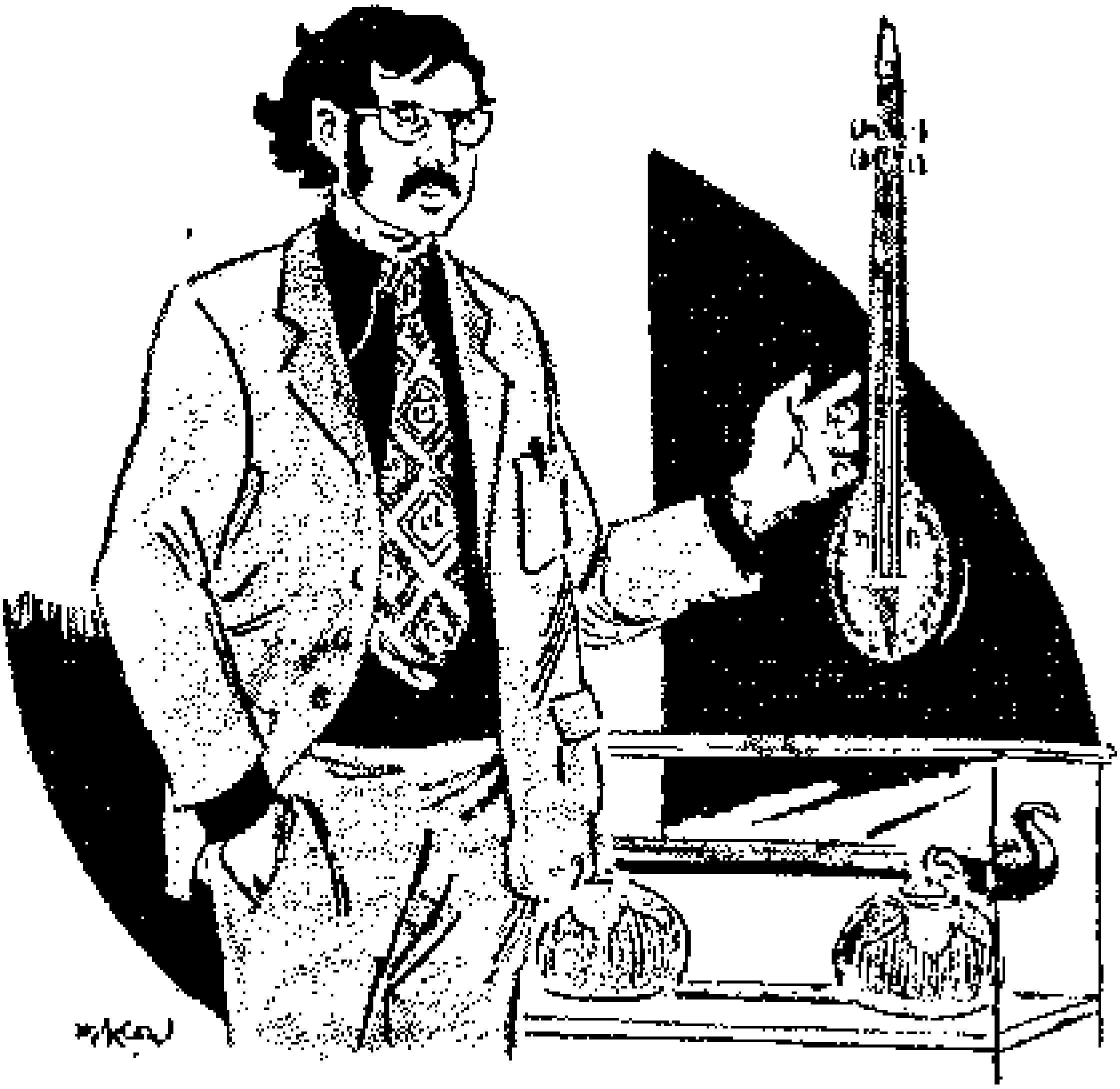

সুস্থ ছিলেন। এনিওয়ে, আপনি আমার ব্যাপারে নিশ্চয় একটা ডিসিশন নিতে পারবেন। আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি — দু'হাজার —' ভদ্রলোক পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলেন — 'যন্ত্র দুটো আজ পেলে ভাল হত। আমি কাল দেরাদুন ফিরে যাচ্ছি। আমি থাকি ওখানেই। ওখানেই মিউজিক নিয়ে রিসার্চ করি।'

'কোন দুটো যন্ত্রের কথা বলছেন আপনি?'

সুরজিৎবাবু খাট থেকে উঠে দেয়ালের দিকে গিয়ে হুকে ঝোলানো একটা বাজনার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'একটা হল এটা। এর নাম খামাঞ্চে — ইরানের যন্ত্র। এটার নাম জানতাম, কিন্তু দেখিনি কখনও। বেশ পুরনো যন্ত্র। আর অন্যটা হল —'

সুরজিৎবাবু ঘরের উল্টো দিকে একটা নিচু টেবিলের উপর রাখা

ছোট্ট হারমোনিয়ামের মতো দেখতে যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এটাই কিছুক্ষণ আগে সাধন বাজাচ্ছিল। ভদ্রলোক সেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এটার নাম মেলোকর্ড। এটা বিলিতি যন্ত্র; আগে দেখিনি কখনও। আমার বিশ্বাস অল্প কয়েকদিনের জন্য ম্যানুফ্যাকচার হয়েছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। খুব সিম্‌প্‌ল যন্ত্র; তবে আর পাওয়া যায় না বলে এক হাজার অফার করেছিলাম। উনি তখন রাজিই হয়েছিলেন —'

'ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না মিস্টার দাশগুপ্ত।'

সুরজিৎবাবু থমকে গেলেন। কথাটা বলেছে ফেলুদা, আর বলেছে বেশ জোরের সঙ্গে। 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হানা'র কথাটা কোন বইয়ে যেন পড়েছি। সুরজিৎবাবু মণিবাবুর দিক থেকে বাঁই করে ঘুরে ফেলুদার দিকে সেই রকম একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবাণ হেনে শুকনো ভারী গলায় বললেন, 'আপনি কে?'

উত্তর দিলেন মণিবাবু।

'উনি আমার বন্ধু। তবে উনি ঠিকই বলেছেন। ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না। তার প্রধান কারণটা আপনার বোঝা উচিত। কাকা যে ওগুলো আপনাকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই।'

সুরজিৎ দাশগুপ্ত কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ কিছু না বলে গট্‌গট্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদাও দেখি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। সুরজিৎবাবুর ঘটনাটা যেন কিছুই না এই রকম একটা ভাব করে সে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে খামাঞ্চে যন্ত্রটাকে মন দিয়ে দেখল। রাস্তায় যে খেলার বেহালা বিক্রি হয়, অনেকটা সেই রকম দেখতে। যদিও তার চেয়ে অনেক বড়, আর গোল অংশটায় খুব সুন্দর কাজ করা।

এবার খামাঞ্চে ছেড়ে ফেলুদা গেল মেলোকর্ড যন্ত্রটার কাছে। সাদা-কালো পর্দায় চাপ দিতেই আবার সেই পিয়ানো আর সেতার মেশানো টুং টাং শব্দ।

'এই বাজনার আওয়াজ শুনেছিলে কি?' ফেলুদা সাধনকে জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে।'

সাধনের মতো এত অল্প বয়সে এত গম্ভীর ছেলে আমি খুব কম দেখেছি।

এবার ফেলুদা আলমারির দেরাজ থেকে এক তাড়া পুরনো কাগজ বার করে মণিবাবুকে বলল, 'এগুলো আমি একটু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি কি?'

মণিবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই! আরও যদি কিছু...'

'না, আর কিছু দরকার নেই।'

আমরা যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তখন সাধন জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত সুর গুন গুন করছে।

সেটা কিন্তু কোনও ফিল্মের গানের সুর নয়।

॥ ৩ ॥

ফেলুদা মণিমোহনবাবুর কাছ থেকে দু'দিন সময় চেয়ে নিয়েছিল। চাইতেই হবে, কারণ রাধারমণবাবুর বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনও চাবি, বা চাবি দিয়ে খোলা যায় এমন কোনও বাক্স বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া যায়নি। তাই ফেলুদা বলল, এক নম্বর, ওকে চুপচাপ বসে চিন্তা করতে হবে; দুই নম্বর, রাধারমণবাবুর কাগজপত্র ঘেঁটে লোকটা সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যায় কি না দেখতে হবে, আর তিন নম্বর, গান বাজনা সম্বন্ধে আরেকটু ওয়াকিবহাল হতে হবে।

বামুনগাছি থেকে ফেরার পথে মণিমোহনবাবু বললেন, 'কী রকম বুঝছেন মিস্টার মিত্তির?'

ফেলুদা তার গম্ভীর ও অন্যমনস্ক ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'আপনাকে কতগুলো সন তারিখের ব্যাপারে একটু হেল্প করতে হবে।'

'বলুন।'

'আপনার খুড়তুতো দাদা — অর্থাৎ রাধারমণবাবুর ছেলে মুরলীধর — কবে মারা গেছেন ?'

'ফর্টি ফাইভে। আটাশ বছর আগে।'

'তখন তাঁর ছেলের বয়স কত ছিল ?'

'ধরণীর ? ধরণীর বয়স ছিল সাত কিংবা আট।'

'ওরা কলকাতাতেই থাকত ?'

'না। দাদা ভাগলপুরে ডাক্তারি করতেন। উনি মারা যাবার পর বউদি ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় এসে শ্বশুরবাড়িতে ওঠেন। তখন বাবা ছিলেন অ্যামহার্স্ট স্ট্রিটে। অ্যামহার্স্ট স্ট্রিটেই বউদি মারা যান। ধরণী তখন সিটি কলেজে পড়ছে। মা মারা যাবার পর থেকেই তার মতিগতি বদলে যায়। সে পড়াশুনো ছেড়ে থিয়েটারে ঢোকে। আর তার বছরখানেক পরে বাবাও চলে গেলেন বামুনগাছি। ওঁর বাড়িটা তৈরি হয়েছিল —'

'ফিফটি-নাইনে। গেটের প্লাকে ডেট লেখা রয়েছে।'

রাধারমণবাবুর কাগজপত্রের মধ্যে ছিল কিছু পুরনো চিঠি, কিছু ক্যাশ মেমো, দুটো ওষুধের প্রেসক্রিপশন, স্পীগ্‌লার নামে একটা জার্মান কোম্পানির পুরনো ক্যাটালগ — তাতে নানারকম বাজনার ছবি ও দাম—খাতার কাগজে লেখা কয়েকটা বাংলা গানের স্বরলিপি, খবরের কাগজ থেকে নানান সময়ে কাটা পাঁচটা নাটকের সমালোচনা — সেগুলোতে সঞ্জয় লাহিড়ী বলে একজন অভিনেতার প্রশংসা নীল পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা।

এর মধ্যে তিনটি জিনিস নিয়ে ফেলুদা মন্তব্য করল। স্বরলিপিগুলো দেখে বলল, 'সুরজিৎবাবু যে পোস্টকার্ডটা দেখালেন, তার হাতের লেখার সঙ্গে এ লেখা মিলে যাচ্ছে।' ক্যাটালগটা দেখে বলল, 'মেলোকর্ড বলে কোনও যন্ত্রের নাম এতে দেখছি না।' আর থিয়েটারের সমালোচনাগুলো দেখে বলল, 'যদ্দুর মনে হচ্ছে, এই সঞ্জয় লাহিড়ী আর ধরণীধর সমাদ্দার একই লোক। আর তাই যদি হয় তা হলে বলতে হবে নাতির মুখ না দেখলেও তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরটা রাখতেন রাধারমণবাবু।'

কাগজগুলো সযত্নে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে ফেলুদা থিয়েটারের পত্রিকা 'মঞ্চলোক'-এ টেলিফোন করে সঞ্জয় লাহিড়ী কোন যাত্রার দলে আছে জিজ্ঞেস করল। জানা গেল দলের নাম মডার্ন অপেরা। সেখানে সঞ্জয় লাহিড়ী হিরোর পার্ট করে। তারপর মডার্ন অপেরার অফিসে ফোন করে জানা গেল যাত্রার দল তিন সপ্তাহ হল জলপাইগুড়ি ট্যুরে বেরিয়ে গেছে। ফিরতে আরও দিন সাতেক। এ খবরটা অবিশ্যি মণিবাবু আগেই দিয়েছিলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে আমরা বেরোলাম। একদিনে একসঙ্গে এতরকম জায়গায় অনেকদিন যাইনি। প্রথমে জাদুঘর। কেন যাচ্ছি আগে থেকে জানি না, কারণ ফেলুদার এখন মৌনীপর্ব। তার উপরে মাঝে মাঝে আঙুল মটকাচ্ছে। বোঝাচ্ছে সে ভীষণ মন দিয়ে ভাবছে, তাই ডিসটার্ব করা চলবে না। জাদুঘরে যে এরকম একটা বাজনার সংগ্রহ আছে সেটা জানতাম না। অবিশ্যি সবই দিশি বাজনা—একেবারে মহাভারতের যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত। শুধু বাঁশিই যে এতরকম হতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

এর পরে বিলিতি বাজনার দোকান। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের সালদানহা কোম্পানি বলল মেলোকর্ডের নাম কখনও শোনেনি। সেখান থেকে গেলাম লালবাজারে। লালবাজারের মণ্ডল কোম্পানির একটা ক্যাশমেমো রাধারমণবাবুর কাগজপত্তরের মধ্যে ছিল, তাই বোধহয় ফেলুদা সেখানে গেল। দোকানের মালিক একেবারে জহর রায়ের মতো দেখতে। বললেন, 'সমাদ্দার মশাই আমাদের অনেকদিনের খদ্দের। সেই আমার ফাদারের টাইম থেকে।'

'মেলোকর্ড বলে কোনও যন্ত্রের নাম শুনেছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'মেলোকর্ড? কই, না তো। ক্ল্যারিয়োনেট টাইপের কিছু? ফুঁ দেওয়া যন্ত্র? উইন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট?'

ফেলুদা বলল, 'না। বলতে পারেন হারমোনিয়াম টাইপের। সাইজে অনেক ছোট। আওয়াজটা পিয়ানো আর সেতারের মাঝামাঝি।'

'ছোট সাইজের বাজনা ? তাতে ক'টা অকটেভ পাচ্ছেন আপনি ?'

আমি জানি যে সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা — এই আটটা সুরে মিলে একটা অকটেভ হয়। মণ্ডলের দোকানেই একটা হারমোনিয়ামে দেখছি তিন অকটেভের বেশি পর্দা রয়েছে। মেলোকর্ডে মাত্র একটা অকটেভ রয়েছে শুনে মণ্ডল মাথা নেড়ে বললেন, 'না মশাই। এ শুনে মনে হচ্ছে খেলনা-টেলনা ধরনের কিছু হবে। আপনি বরঞ্চ নিউ মার্কেটে দেখুন।'

এর পরে ফেলুদা কলেজ স্ট্রিটের দাশগুপ্তের দোকান থেকে উনিশ টাকা দিয়ে তিনটে সংগীতের বই কিনল। তারপর সেখান থেকে বিধান সরণিতে মঞ্চলোকের অফিসে গিয়ে অনেক খুঁজে সঞ্জয় লাহিড়ীর একটা দুমড়ানো ছবি চেয়ে নিল। দাম দিতে হবে কি না জিজ্ঞেস করাতে সম্পাদক প্রতুল হাজরা জিভ কেটে বলল, 'দামের কথা কী বলছেন। আপনি ফেলু মিত্তির না ?'

রাস্তার মোড়ের একটা দোকান থেকে ঠাণ্ডা লস্যি খেয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে সাতটা। এসে দেখি পাড়া ঘুরঘুট্টি, লোড-শেডিং চলছে। ফেলুদা তার মধ্যেই মোমবাতি জ্বালিয়ে গানের বইগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগল। ন'টায় আলো আসার পর বলল, 'তোপ্‌সে — তুই শ্রীনাথকে নিয়ে চট করে একবারটি পল্টুদের বাড়ি চলে যা তো—গিয়ে বল ফেলুদা একদিনের জন্যে হারমোনিয়ামটা চেয়েছে।'

ঘুমোবার আগে পর্যন্ত শুনলাম ফেলুদা প্যাঁ প্যাঁ করে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ঘরে একটা প্রকাণ্ড লোহার দরজা, আর তাতে একটা প্রকাণ্ড ফুটো। ফুটোটা এত বড় যে তার মধ্যে দিয়ে অনায়াসে উল্টো দিকে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু তা না করে আমি, ফেলুদা আর মণিমোহনবাবু তিনজনে একসঙ্গে একটা প্রকাণ্ড চাবিকে আঁকড়ে ধরে সেটাকে ফুটোটার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করছি আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত একটা আলখাল্লা পরে তিড়িং-বিড়িং লাফাচ্ছেন আর সুর করে বলছেন, 'এইট টু নাইন ওয়ান — এইট টু নাইন ওয়ান — এইট টু নাইট ওয়ান !'

॥ ৪ ॥

পরদিন মঙ্গলবার। মণিমোহনবাবু বলেছিলেন বুধবার আবার খবর দেবেন, কিন্তু সকাল সাতটায় তাঁর টেলিফোন এসে হাজির। ফোনটা আমিই ধরেছিলাম; ফেলুদাকে ডেকে দিচ্ছি বলাতে বললেন, 'দরকার নেই। তুমি ওঁকে বলো আমি এক্ষুনি আসছি, জরুরি কথা আছে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক এসে গেলেন। বললেন, 'অবনীবাবু এই একটুক্ষণ আগে বামুনগাছি থেকে ফোন করেছিলেন। কাকার শোবার ঘরে মাঝরাত্রে লোক ঢুকেছিল।'

'ওই জার্মান তালার সংকেত আর কে জানে?' ফেলুদা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল।

'আমার ভাইপো জানত। অবনীবাবু জানেন কি না জানি না। বোধহয় না। তবে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকেনি সে লোক।'

'তবে?'

'বাথরুমে জমাদার ঢোকার দরজা দিয়ে।'

'কিন্তু কাল যখন বাথরুমে গেলাম তখন তো সে দরজা বন্ধ ছিল। আমি নিজে দেখেছি।'

'পরে হয়তো কেউ খুলেছিল। যাই হোক — কিছু নিতে পারেনি। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল টের পেয়ে গেসল।...আপনি এখন ফ্রি আছেন? একবার যেতে পারবেন?'

'নিশ্চয়ই। তবে তার আগে একটা প্রশ্ন আছে। রাধারমণবাবুর নাতিকে — অর্থাৎ আপনার ভাইপো ধরণীধরকে — এখন দেখলে চিনতে পারবেন?' মণিবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'অনেক কাল দেখা নেই ঠিকই, তবু হাজার হোক ভাইপো তো!'

ফেলুদা তার ঘর থেকে একটা ছবি এনে মণিমোহনবাবুকে দিল। মঞ্চলোকের অফিস থেকে আনা সঞ্জয় লাহিড়ীর ছবি, তার উপর ফেলুদা কালি দিয়ে একজোড়া গোঁফ আর একটা মোটা

ফ্রেমের চশমা এঁকে দিয়েছে। মণিবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আরে, এ যে দেখছি —'

'সুরজিৎ দাশগুপ্তের মতো মনে হচ্ছে কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেবল নাকের কাছটায় একটু...'

'যাই হোক, মিল একটা আছে। এটা আসলে আপনার ভাইপোরই ছবি, আমি কেবল একটু রং চড়িয়েছি।'

'আশ্চর্য।...আমারও কথাটা মনে হয়নি তা নয়। ইন ফ্যাক্ট, কাল রাত্রে একবার ভেবেছিলাম আপনাকে ফোন করে বলি। কিন্তু প্রেসে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল, ফিরতে অনেক রাত হল, তাই আর বলা হয়নি। অবিশ্যি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভবও হত না। ধরণীকে গত পনেরো বছরে প্রায় দেখিনি বললেই চলে। থিয়েটারেও না, কারণ ও বাতিকটা আমার একদম নেই ; আর যাত্রা তো ছেড়েই দিলাম। অথচ আপনার অনুমান যদি সত্যি হয় তা হলে তো...

'তা হলে দুটো জিনিস প্রমাণ করতে হয়। এক — সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে আসলে কেউ নেই, দুই — সঞ্জয় লাহিড়ী যাত্রার দল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে, এবং সেটা এসেছে আপনার কাকার মৃত্যুর আগেই। তোপ্‌সে — মিনার্ভা হোটেলের নম্বরটা বার কর তো।'

হোটেলের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল সুরজিৎ দাশগুপ্ত বলে একজন সেখানে এসেছিলেন বটে, কিন্তু গতকাল সন্ধ্যাবেলা তিনি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

মডার্ন অপেরায় ফোন করে লাভ নেই, কারণ কালকেই তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, আর তারা বলেছে যে সঞ্জয় লাহিড়ী ট্যুরে গেছে।

বামুনগাছি পৌঁছিয়ে ফেলুদা প্রথমে পাঁচিলের বাইরেটা ঘুরে দেখল। যেই আসুক, তাকে গাড়ি বা ট্যাক্সি করে আসতে হয়েছে। আর সে গাড়ি বাড়ি থেকে দূরে রেখে বাকি পথটা হেঁটে এসে পাঁচিল টপকাতে হয়েছে। শেষের কাজটা কঠিন নয়, কারণ তিন জায়গায় পাঁচিলের বাইরে গাছ রয়েছে, আর সে গাছের নিচু ডাল

পাঁচিলের উপর দিয়ে কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকেছে। মুশকিল হচ্ছে কী, বর্ষার দিন হলে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ত, কিন্তু এ মাটি একেবারে খটখটে শুকনো।

অনুকূলের শরীর ভাল নয়। সে তার ঘরে বিছানায় শুয়ে কুঁই-কুঁই করে যা বলল তাতে বোঝা গেল যে মাথার যন্ত্রণায় আর মশার কামড়ে রাত্রে তার ভাল ঘুম হচ্ছিল না। সে যেখানে শোয় সেখান থেকে তার খাটের পাশের জানালা দিয়ে সোজা রাধারমণবাবুর ঘরের জানালা দেখা যায়। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সেই ঘরে একটা আলো দেখে সে ধড়মড়িয়ে উঠে 'কে কে' বলে হাঁক দিয়ে ছুটে যায়। কিন্তু সে পৌঁছবার আগেই দেখে একজন লোক রাধারমণবাবুর বাথরুমের দরজা দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বাকি রাতটা নাকি অনুকূল রাধারমণবাবুর ঘরের মেঝেতে শুয়ে থাকে।

'অন্ধকারের মধ্যে সে লোককে চিনতে পারনি বোধহয়?' মণিবাবু প্রশ্ন করলেন।

'না বাবু। আমি বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখি না, আর কাল আবার ছিল অমাবস্যা...'

রাধারমণবাবুর ঘরে গিয়ে দেখলাম জিনিসপত্তর যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু তাও ফেলুদার গম্ভীর গলার স্বরে বেশ ঘাবড়ে গেলাম।

'মণিবাবু, বারাসত থানায় খবর দিতে হবে। এ বাড়িতে আজ রাত থেকে পাহারার বন্দোবস্ত করতে হবে। সে লোক আবার আসতে পারে। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি সঞ্জয় লাহিড়ী নাও হন, তা হলেও তাকে সন্দেহ করতে হবে, কারণ ওই দুটো যন্ত্রের উপর তার যথেষ্ট লোভ। পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব না হলে অন্য উপায়ে ওগুলো হাত করার চেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। এই সব কালেক্টরদের গোঁ বড় সাংঘাতিক।'

মণিবাবু বললেন, 'আমি অবনীবাবুর বাড়ি থেকে এক্ষুনি থানায় ফোন করে দিচ্ছি। ও-সির সঙ্গে আমার আলাপ আছে।'

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফেলুদা

মেলোকর্ডটাকে নিয়ে খাটের ওপর বসে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। দারুণ মজবুত তৈরি, দু'পাশের কাঠে সুন্দর কাজ করা। জিনিসটাকে চিত করে আলোতে ধরতে একটা রং চটে যাওয়া লেবেল দেখা গেল। ফেলুদা চোখ কুঁচকে লেখাটা পড়ে বলল, 'স্পীগ্লার কোম্পানির তৈরি। মেড ইন জার্মানি।'

ফেলুদা হারমোনিয়াম বাজাতে জানে না ঠিকই, কিন্তু কাঁচা হাতে একটা একটা করে পর্দা টিপে যখন জনগণমন-র খানিকটা মেলোকর্ডে বাজাল, তখন যন্ত্রটার গুণে সেটা শুনতে বেশ ভালই লাগছিল। তারপর সেটাকে আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, 'একবার ইচ্ছে করে জিনিসটাকে ভেঙে ভেতরে কী আছে দেখি ; কিন্তু যদি দেখি কিছু নেই তা হলে বাজনাটার জন্য আপসোস হবে। সুরজিৎ দাশগুপ্ত এক হাজার টাকা অফার করছিল এটার জন্যে।'

অনুকূল এই শরীর নিজেই শরবত করে এনেছিল, সেটায় চুমুক দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মণিমোহনবাবু ফিরে এসে বললেন, 'থানায় বলে দিয়েছি। দু'জন লোক থাকবে সন্ধ্যা থেকে। অবনীবাবু বাড়ি ছিলেন না ; সাধনকে নিয়ে কলকাতা গেছেন। ফিরবেন বিকেলে।'

ফেলুদা বলল, 'রাধারমণবাবুর টাকা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারটা আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারে ?'

মণিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমি নিজে জেনেছি কাকার মৃত্যুর পরে। টাকা যে খোঁজাখুঁজি হচ্ছে সেটা অবিশ্যি অবনীবাবু জানেন, কিন্তু তার অ্যামাউন্টটা কত হতে পারে সেটা জানার কথা নয়। আর সুরজিৎ দাশগুপ্ত যদি আসলে ধরণীধর হয়ে থাকে, তা হলে সে যেদিন কাকার সঙ্গে এসে কথা বলেছিল সেদিন কিছু জেনে থাকতে পারে। আমার তো বিশ্বাস সে কাকার কাছে টাকাই চাইতে এসেছিল। তারপর কাকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়, তার ফলে...'

মণিবাবু কথাটা শেষ করলেন না।

ফেলুদা তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, 'তার ফলে আপনার কাকার হার্ট অ্যাটাক হয়। আর সেই অবস্থাতেই ধরণীধর ঘরের

মধ্যে টাকার অনুসন্ধান করে। আপনি এই ভাবছেন তো?'

'হুঁ...কিন্তু আমি এটাও জানি যে সে টাকা খুঁজে পায়নি।'

'যদি পেত তা হলে সে বাজনা কেনার অজুহাতে আবার ফিরে আসত না — এই তো?'

'ঠিক তাই। তার ধারণা ওই দুটো বাজনার একটার মধ্যে টাকাটা রয়েছে।'

'মেলোকর্ড।'

মণিবাবু ফেলুদার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন।

'আপনি তাই বলছেন?'

'আমার মন তাই বলছে,' ফেলুদা বলল। 'তবে আমি আন্দাজে ঢিল মারা পছন্দ করি না। আর আপনার কাকার শেষ কথাগুলোও আমি ভুলতে পারছি না। আপনার শুনতে কোনও ভুল হয়নি তো? উনি "চাবি" কথাটাই বলেছিলেন তো?'

মণিবাবু হঠাৎ কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'কী জানি মশাই, চাবি বলেই তো মনে হল। অবিশ্যি...এমন হতে পারে যে কাকা আসলে প্রলাপ বকছিলেন। চাবি কথাটার হয়তো কোনও অর্থ নেই।'

কথাটা শুনে আমার মনটা বেশ দমে গিয়েছিল। কিন্তু ফেলুদার মধ্যে দমবার কোনও লক্ষণ দেখলাম না। ও বলল, 'প্রলাপই হোক আর যাই হোক, এ ঘরে টাকা আছে। আমি যেন সে টাকার গন্ধ পাচ্ছি। চাবিটা আসল কথা নয়। আসল কথা টাকা।'

'তা হলে আপাতত কী করবেন সেটা ঠিক করুন।'

'করেছি। আপাতত বাড়ি ফিরব। দিনের বেলা কোনও ভয় নেই। অনুকূলকে বলে দেবেন চোখ রাখতে আর বাইরের কোনও লোককে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয়। রাত্রে তো পাহারাই থাকবে। আমি বাড়ি গিয়ে আমার খাতা নিয়ে আমার ঘরে আমার খাটের উপর বালিশে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে চিন্তা করব। একটা আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি, সেটা আরও উজ্জ্বল হওয়া দরকার। তবে একটা কথা, তেমন বুঝলে আজ রাতটা আমি এখানে কাটাতে চাই। আপনার আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না। আটটা নাগাদ আপনাকে তুলে নিতে পারি।'

'ভাল কথা — আপনি সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাস করেন?'

'সংখ্যাতত্ত্ব?' মণিমোহন ভ্যাবাচ্যাকা।

ফেলুদা তার একপেশে হাসি হেসে বলল, 'আপনাদের সবাইয়ের নাম দেখছি পাঁচ অক্ষরের — রাধারমণ, মুরলীধর, ধরণীধর, মণিমোহন — তাই প্রশ্নটা মনে এল।'

॥ ৫ ॥

'আগে লেখ — মৃত ব্যক্তির নাম কী ছিল?'

ফেলুদা তার খাটে বসে আছে, আমি তার পাশের চেয়ারে। আমার হাতে সে খাতা পেনসিল ধরিয়ে দিয়েছে। আমি লিখলাম—

'রাধারমণ সমাদ্দার।'

'তার নাতির নাম?'

'ধরণীধর সমাদ্দার।'

'নাতির থিয়েটারি নাম?'

'সঞ্জয় লাহিড়ী।'

'দেরাদুনের বাজনা সংগ্রাহকের নাম?'

'সুরজিৎ দাশগুপ্ত।'

'রাধারমণের প্রতিবেশীর নাম?'

'অবনী সেন।'

'তার ছেলের নাম?'

'সাধন সেন।'

'রাধারমণের শেষ কথা কী ছিল?'

'আমার নামে...চাবি...চাবি..'

'গানে একটা সা থেকে তার পরের সা পর্যন্ত ক'টা সুর থাকে?'

এর মধ্যে ফেলুদা তার কেনা সংগীত প্রবেশিকার প্রথম চ্যাপ্টারটা আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে। গান নিয়ে সে কেন এত মেতে উঠেছে জানি না। যাই হোক, আমি লিখলাম—

'বারোটা।'

'কী কী ?'

'সাতটা শুদ্ধ, চারটে কোমল, একটা কড়ি।'

'শুদ্ধ সুর কী কী ? কীভাবে লেখে ?'

'স র গ ম প ধ ন।'

'কোন-কোনটা কোমল হয় ?'

'র গ ধ ন।'

'কীভাবে লেখে ?'

'ঋ জ্ঞ দ ণ।'

'আর কড়ি ?'

'ম।'

'কীভাবে লেখে ?'

'হ্ম।'

'এবার দে কাগজটা।'

দিলাম।

'এবার বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বোস। দরজাটা ভেজিয়ে দে। আমি কাজ করব।'

গেলাম বৈঠকখানায়। দরজা ভেজালাম। সোফায় বসলাম। চাঁদের পাহাড় বইটা তিনবার পড়েছি, আবার পড়তে শুরু করলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ফেলুদার ঘরের এক্সটেনশন টেলিফোনে ডায়াল করার আওয়াজ পেলাম। কৌতূহল সামলাতে না পেরে দরজার কাছে গিয়ে কান লাগালাম। ফেলুদার গলা পেলাম, 'ডাক্তার বোস আছেন, চিন্তামণি বোস ?'

ফেলুদা সেই হার্ট স্পেশালিস্টকে ফোন করছে, যাকে মণিবাবু নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাকাকে দেখাতে।

ফোনটা কাকে করছে সেটাই জানতে চাইছিলাম, বাকি কথা শোনার দরকার নেই। আমি আবার জায়গায় এসে বসলাম।

দশ মিনিট পরে আবার কটর কটর শব্দ। ডায়ালিং-এর।

উঠে দরজায় গেলাম। কান লাগালাম।

'ইউরেকা প্রেস ? কে কথা বলছেন ?'

মণিমোহনবাবুর প্রেস। ব্যস্ — এইটুকুই যথেষ্ট ! আমি আবার চাঁদের পাহাড় নিয়ে বসলাম।

চারটের সময় যখন শ্রীনাথ চা আনল, তখনও ফেলুদা ঘর থেকে বেরোল না। শেষে যখন দেয়াল ঘড়িতে দেখি চারটে পঁয়ত্রিশ, আর আমি ভাবছি আমার ওই ক'টা লেখা নিয়ে ফেলুদা অত কী ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে ও দরজা খুলে হাতে একটা আধপোড়া চারমিনার নিয়ে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'মাথা ভোঁ ভোঁ করছে রে তোপ্‌সে, একটা বিরাশি বছরের বুড়োর মরার মুখে বলা সামান্য তিনটে কথার মানে নিয়ে এত কেন ভাবতে হল সেটা ভেবে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে ! এর জন্যে অবিশ্যি দায়ী আমাদের বাংলা ভাষা...'

আমি অবিশ্যি ফেলুদার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। দেখতে পাচ্ছি ওর মুখের চেহারা বদলে গেছে, আর বুঝতে পারছি যে, যে অবস্থা আলোটার কথা ও বলছিল সেটা ওর এসেছে আর অবস্থা নেই।

'সা ধা নি সা নি...সব ক'টা শুদ্ধ সুর। শুনে কিছু মনে পড়ছে ? কোনও মানে বুঝতে পারছিস ?'

আমার মাথা আরও গুলিয়ে গেল। ফেলুদা বলল, 'তোর বুঝতে পারার কথা নয়। পারলে তোতে আর ফেলু মিত্তিরে কোনও তফাত থাকত না।'

ভাগ্যিস তফাতটা আছে ! আমি ফেলুদার স্যাটিলাইটের বেশি আর কিছু হতে চাই না।

ফেলুদা এই প্রথম সিগারেটটা ছাইদানে না ফেলে ক্যারামের স্ট্রাইকার মারার মতো করে জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে বৈঠকখানার টেলিফোনে গিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল। দশ সেকেন্ড পরেই কথা।

'কে — মিস্টার সমাদ্দার ? চলে আসুন — এক্ষুনি — থামুনগাছি যেতে হবে — হ্যাঁ, হয়ে গেছে — সব পরিষ্কার...মেলোকর্ড...হ্যাঁ, মেলোকর্ডই আমাদের রহস্যের চাবিকাঠি।'

তারপর টেলিফোনটা রেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'একটা রিস্ক আছে তো তোপ্সে, কিন্তু সেটা না নিলেই নয়।'

মণিবাবুর ড্রাইভার গুরুচরণ দেখতে বুড়ো হলেও ভি আই পি রোডে পঁচাশি কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড তুলল। ফেলুদার ভাব দেখে মনে হল হান্ড্রেড-টান্ড্রেড হলে সে আরও খুশি হত। এয়ারপোর্টের পর খানিকটা রাস্তা লোকজনের ভিড়ে স্পিড অনেক কমল, কিন্তু পরের দিকে আবার ঘাটে উঠল — যদিও রাস্তা তত চওড়া নয়, আর সন্ধেও হয়ে আসছে।

রাধারমণবাবুর গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল, 'পাহারার লোক আসার সময় হয়নি বোধহয় এখনও।'

গেট দিয়ে ঢুকতেই বাগানে দেখলাম বন্দুক হাতে সাধন দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে ফেলুদা বলল, 'কী সাধনবাবু, এই সন্ধের আলোতে কী শিকার হচ্ছে?'

সাধন বলল, 'বাদুড়।'

রাধারমণবাবুর কম্পাউন্ডের ঠিক বাইরে একটা অশথ গাছ থেকে কয়েকটা বাদুড় ঝুলছে সেটা গাড়ি থেকে নেমেই আমার চোখে পড়েছিল।

অনুকূল গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল; মণিবাবু তাকে লণ্ঠন জ্বালতে বলে বাড়ির ভিতর ঢুকলেন, আর আমরাও ঢুকলাম তাঁর পিছন পিছন। এইট-টু-নাইন-ওয়ান তালাটা খুলতে খুলতে মণিবাবু বললেন, 'রহস্যের কীভাবে সমাধান হল সেটা জানতে খুব ইচ্ছে করছে।' আসলে ফেলুদা সারা রাস্তা কোনও কথা বলেনি, কাজেই মণিবাবুর যা অবস্থা, আমারও তাই।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে ফেলুদা তার ভীষণ জোরালো টর্চটা ঘরে পশ্চিমের দেয়ালের নীচের দিকে ফেলল। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। আলোটা সোজা গিয়ে টেবিলে রাখা মেলোকর্ডের উপর পড়েছে। ঝকঝকে সাদা পর্দাগুলো দেখে মনে হচ্ছে বাজনাটা দাঁত বের করে হাসছে। ফেলুদা টর্চটা সেইভাবেই ধরে রেখে বলল —

'চাবি। ইংরিজিতে Key, বাংলায় চাবি। এই যে সাদা-কালো পর্দাগুলো দেখছিস, ওর আর একটা নাম হল চাবি, আর সেই চাবির কথাই—'

চোখের পলকে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যেটা ভাবতে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মণিবাবু হঠাৎ বাঘের মতো লাফিয়ে মেলোকর্ডটাকে তুলে নিয়ে সেটা দিয়ে ফেলুদার মাথায় একটা প্রকাণ্ড বাড়ি মেরে আমাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ফেলুদা মার খাবার ঠিক আগেই নিজেকে বাঁচানোর জন্য টর্চ সমেত হাত দুটো মাথার উপর তুলেছিল। তাই হয়তো তার মাথায় চোট লাগেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতের যন্ত্রণাতেই সে দেখি খাটে

বসে পড়েছে। আমি নিজে মেঝে থেকে উঠতে না উঠতেই বুঝলাম মণিবাবু বাইরে থেকে এইট-টু-নাইন-ওয়ান বন্ধ করে দিয়েছেন।

আমি তাও দৌড়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে দরজায় একটা ধাক্কা মেরেছি, এমন সময় ফেলুদার গলা পেলাম — 'বাথরুম!'

বাইরে থেকে গাড়ি স্টার্ট দেবার একটা শব্দ, আর তারপরেই ঠাঁই করে একটা আওয়াজ।

আমরা দু'জনে ঝড়ের মতো বাথরুমে ঢুকে জমাদারের দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। বাগানের দিক থেকে গোলমাল, অনুকূলের গলা, অবনীবাবুর গলা। মণিবাবুর গাড়িটা বাঁই করে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমরা সামনের দরজার কাছে পৌঁছে গেছি।

ওটা কে বসে আছে কাঁকর বিছানো রাস্তার উপর? অবনীবাবু চেঁচাচ্ছেন — 'তুমি কী করলে সাধন! এটা কী করলে তুমি! ছি-ছি-ছি!'

সাধন তার সরু অথচ গম্ভীর গলায় বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'ও যে দাদুর বাজনা নিয়ে পালাচ্ছিল!'

এবার ফেলুদা বলল, 'ও ঠিকই করেছে, অবনীবাবু! অপরাধীকে এয়ারগান দিয়ে পঙ্গু করে ও আমাদের সাহায্যই করেছে — যদিও ভবিষ্যতে ওকে একটু সাবধানে বন্দুক চালাতে হবে।...আপনি এক্ষুনি থানায় ফোন করে দিন। গাড়িটাকেও যেন পালাতে না দেয় — ওর নম্বর হল ডব্লু এম এ সিক্স ওয়ান সিক্স ফোর।'

অনুকূল আর ফেলুদা দু'জনে মিলে মণিবাবুকে ধরে তুলল। তাঁর কপালের বাঁ দিক থেকে ছর্‌রার গুলি লেগে রক্ত পড়ছে। ভদ্রলোক একেবারে থুম মেরে গেছেন।

মেলোকর্ডটা মণিবাবুর পাশেই কাঁকরের উপর পড়ে ছিল, আমি সেটাকে খুব সাবধানে তুলে নিলাম।

আমরা চারজন রাধারমণবাবুর খাটের পাশে গোল হয়ে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি। চারজন মানে আমি, ফেলুদা, অবনীবাবু, আর বারাসত থানার দীনেশ গুঁই, ইনি বোধহয় ইনস্পেক্টর-টিনস্পেক্টর

হবেন। ঘরের এক কোণে সিন্দুকটার সামনে আরও দু'জন লোক রয়েছে। একজন দাঁড়িয়ে, সে বোধহয় কনস্টেবল, আর অন্যেকজন চেয়ারে ঘাপটি মেরে বসে। ইনি হলেন অপরাধী মণিমোহন সমাদ্দার, যার কপালে এখন ব্যান্ডেজ বাঁধা। এ ছাড়া সাধনও রয়েছে। সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে দেখছে। আমাদের পাঁচজনের মাঝখানে টেবিলের উপর রাখা রয়েছে মেসোকর্ড। এইবার বোধহয় ফেলুদা একটা রহস্য উদ্ঘাটন করবে। ফেলুদার ঘড়ির কাচ ভেঙে গেছে, আর বাঁ হাতের কবজির খানিকটা ছাল উঠে গেছে। রাধারমণবাবুর বাথরুম থেকে ডেটল নিয়ে লাগিয়ে সেখানে সে রুমাল বেঁধে রেখেছে।

হাত থেকে চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ফেলুদা বলতে আরম্ভ করল — 'মণিমোহন সমাদ্দারকে অল্পিস্বল্প সন্দেহ করতে আরম্ভ করি আজ দুপুর থেকে। কিন্তু তিনি, কোনও একটা বেচাল না চাললে তাঁকে বাগে আনা যাচ্ছিল না, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব। আমি তাই খানিকটা রিস্ক নিয়েই তাঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলাম। আমাকে আচমকা আক্রমণ করে বাজনা নিয়ে পালানোটাই হল তাঁর ভুল চাল। শেষ পর্যন্ত তিনি পালাতে পারতেন না ঠিকই, কিন্তু তিনি যে এত তাড়াতাড়ি সায়েস্তা হলেন তার জন্য অবিশ্যি দায়ী সাধনের এয়ারগান।

'মণিমোহনবাবুর একটা কথায় প্রথম খটকা লাগে। কথাটা যখন বলেছিলেন তখন লাগেনি, পরে লাগে। উনি বলেছিলেন পরশু ওঁর প্রেসে ওভারটাইম কাজ হচ্ছিল, তাই ওঁর বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল। পরশু ছিল সোমবার। আমি জানি যে-পাড়ায় মণিবাবুর প্রেস, সে-পাড়ায় সন্ধ্যায় নিয়মিত লোড-শেডিং হয়; আমার এক প্রোফেসর বন্ধু সেই একই পাড়ায় থাকে। আজ ইউরেকা প্রেসে ফোন করে জানতে পারি যে প্রথমত, সোমবার বিকেল থেকে লোড-শেডিং-এর জন্য কাজ বন্ধ ছিল, আর দ্বিতীয়ত, মণিমোহনবাবু দুপুরের পর আর সেদিন প্রেসেই যাননি। এই মিথ্যে কথাটাতেই আমার মনে ভীষণ খটকা লাগে। আর তার পরেই সন্দেহ হয় — উনি রাধারমণবাবুর শেষ কথা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন

সেটা সত্যি তো ? রাধারমণের মৃত্যুর সময় মণিবাবু ছাড়াও একজন লোক সেখানে ছিলেন। তিনি হলেন ডাক্তার চিন্তামণি বোস। তাঁকে ফোন করে জানতে পারি যে মণিবাবু পুরোপুরি সত্যি কথা বলেননি --- রাধারমণের একটা কথা তিনি গোপন করেছিলেন। রাধারমণ আসলে বলেছিলেন — "ধরণী...আমার নামে...চাবি...চাবি..."। ধরণী হল রাধারমণবাবুর নাতি। মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তাঁর নাতিকেই কিছু বলার কথা মনে এসেছিল, ভাইপোকে নয়। ভাইপোকে হয়তো সেই অবস্থায় তিনি চিনতেই পারেননি। আসলে নাতির সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তার উপর থেকে রাধারমণবাবুর স্নেহ যায়নি। তার অভিনয়ের প্রশংসা কাগজে বেরোলে তিনি তা কেটে রাখতেন। কিন্তু যে কথাটা তিনি নাতিকে বলতে চেয়েছিলেন সেটা শুনে ফেলল তাঁর ভাইপো। 'চাবি' কথাটা শুনে মণিমোহন বুঝলেন যে টাকা পয়সার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু শেষটায় চাবি দিয়ে কিছুই বেরোল না। তখন মণিবাবুকে গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্তিরের কাছে আসতে হল। মতলব এই যে আমি টাকার সন্ধান দেব, আর উনি সুযোগ বুঝে সেটি আত্মসাৎ করবেন। উইল আছে কি না জানা নেই। না থাকলে টাকা নাতি পাবে। আর থাকলেও মণিবাবুর পাবার সম্ভাবনা কম, কারণ আমার বিশ্বাস রাধারমণবাবু তাঁর ভাইপোকে পছন্দ করতেন না।

'এখন কথা হচ্ছে, আমার কাছ থেকে কিছু একটা লুকোবার জন্যই নিশ্চয়ই মণিবাবুর মিথ্যে কথা বলার দরকার হয়েছিল। তাঁর মাথায় কি সেদিন কোনও ক্রূর অভিসন্ধি খেলছিল, যে কারণে তাঁর পক্ষে প্রেসে যাওয়া সম্ভব হয়নি ? সেইদিনই মাঝরাত্রে যে-লোক রাধারমণবাবুর ঘরে হানা দিয়েছিল সে কি তা হলে মণিমোহন সমাদ্দার ? এটা আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, কারণ সেদিনই সকালে আমি যখন রাধারমণবাবুর বাথরুম পরীক্ষা করে দেখি, তখন জমাদারের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। সে দরজা খুলবে কে, এবং কেন ? বাথরুমটা তো আর ব্যবহারই হচ্ছে না। আসলে যে লোক ঢুকেছে সে সামনের দরজা দিয়ে জার্মান

তালা খুলে ঢুকেছে, সে তালার সংকেত তার জানা, ঘরে ঢুকে সে লোক জমাদারের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জার্মান তালা বন্ধ করে, আবার বাথরুম দিয়ে ঢুকেছে। এই লোক যে মণিমোহন সমাদ্দার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি বোধহয় বাকি কথাটার মানে বুঝে ফেলে মেলোকর্ড নামক চাবিওয়ালা যন্ত্রটা নিতে এসেছিলেন, তাই না?'

আমাদের সকলের দৃষ্টি মণিবাবুর দিকে গেল। মাথা হেঁট অবস্থাতেই তিনি আবছা অন্ধকারে দু'বার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

ফেলুদা বলল, 'চাবি যে বাজনার চাবি সেটা বুঝলেও মণিবাবু বোধহয় রাধারমণের বাকি সংকেতটা ধরতে পারেনি। কারণ অতটা বুদ্ধি ওঁর নেই। এই বাকি সংকেতটা আমি বুঝতে পারি আজ বিকেলে, আর সেটার জন্যেও দায়ী শ্রীমান সাধন।'

এবার আমরা সকলে অবাক হয়ে সাধনের দিকে চাইলাম। সেও দেখি বড় বড় চোখ করে ফেলুদার দিকে দেখছে। ফেলুদা বলল, 'তোমার দাদু সুরের বিষয়ে কী বলেছিলেন সেটা আরেকবার বলে দাও তো সাধন।'

সাধন প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'যার নামে সুর থাকে, তার গলাতেও সুর থাকে।'

ফেলুদা বলল, 'ভেরি গুড। এবার রাধারমণবাবুর আশ্চর্য বুদ্ধির দিকটা ক্রমে বোঝা যাবে। যার নামে সুর থাকে। বেশ। সাধনের নামটাই ধরা যাক। সাধন সেন। এবার অ-কার এ-কার বাদ দিয়ে কী দাঁড়ায় দেখা যাক। স, ধ, ন, স, ন। অর্থাৎ গানের সুরের ভাষায় সা ধা নি সা নি। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নতুন দিক খুলে গেল। "আমার নামে...চাবি।" রাধারমণবাবু কি এখানে নিজের নামের কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছেন? রাধারমণ সমাদ্দার রে ধা রে মা নি সা মা দা দা রে! কী সহজ, অথচ কী ক্লেভার, কী চতুর! ধরণীধরও কিন্তু গাইতে পারত, আর তার নামেও দেখছি সুর — ধা রে নি ধা রে সা মা দা দা রে!

'এইটে বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম যে ওই মেলোকর্ডেই রাধারমণের ব্যাঙ্ক। যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকে

রাধারমণবাবুর যে একটা ঝোঁক ছিল সেটা ওই জার্মান তালা থেকে বোঝা যায়। এই মেলোকর্ডও জার্মানিতেই তৈরি। স্পীগ্লার কোম্পানি নামে একটি বিখ্যাত বাজনা প্রস্তুতকারক রাধারমণবাবুর বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী এই মেলোকর্ড তৈরি করে। কী ভাগ্যিস এটি সুরজিৎ দাশগুপ্তের হাতে চলে যায়নি। অবিশ্যি যন্ত্র বেচার আগে রাধারমণ তার ভিতরের জিনিস নিশ্চয়ই বার করে নিতেন। বোধহয় ব্যাঙ্কের আর প্রয়োজন বোধ করছিলেন না তিনি। হয়তো তাঁর আর বেশিদিন বাঁচা হবে না এটা তিনি সত্যিই বুঝতে পেরেছিলেন। সুরজিৎ ভদ্রলোকটিকে আমরা মিছিমিছি সন্দেহ করছিলাম, ভাবছিলাম উনি ছদ্মবেশী ধরণীধর। আসলে সুরজিৎবাবু সত্যিই একজন বাজনা পাগল সংগীতজ্ঞ লোক। তার উল্লেখ আমি গানের বইয়েতে পেয়েছি। আর ধরণীধর সত্যিই তার যাত্রার দলের সঙ্গে ট্যুরে বেরিয়েছে। এখন জানা দরকার যে তার ভাগ্যে সত্যিই কোনও অর্থপ্রাপ্তি আছে কি না। তার অনেক দিন থেকেই একটা নিজের যাত্রা দল করার শখ; মঞ্চলোকের একটা ইন্টারভিউতে সে তাই বলেছে। তোপ্‌সে — লণ্ঠনটা কাছে এনে ধর তো।'

আমি লণ্ঠনটা খাটের পাশের টেবিল থেকে তুলে মেলোকর্ডের পাশে এনে ধরলাম।

ফেলুদা বলল, 'অনেক ধকল গেছে এটার উপর দিয়ে। তবে জার্মান জিনিস তো — দেখা যাক রাধারমণের বুদ্ধি আর স্পীগ্লার কোম্পানির কারিগরি মিলে কী জিনিস দাঁড়িয়েছে।'

রাধারমণ সমাদ্দারের নামের অক্ষর ধরে ধরে ফেলুদা চাবি টিপতে আরম্ভ করে দিল। টুং টাং টুং টাং করে একটা অদ্ভুত সুর বেরোচ্ছে মেলোকর্ড থেকে। শেষ সুরটা টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাবুকের মতো শব্দ করে সকলকে চমকে দিয়ে মেলোকর্ডের ডান পাশের কাঠটা দরজার মতো খুলে গেল। আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলাম সেই দরজাটার পিছনে রয়েছে লাল মখমলের লাইনিং দেওয়া একটা খুপরি, আর সেই খুপরিতে ঠাসা রয়েছে তাড়া তাড়া একশো টাকার নোট!

নোটগুলো টেনে বার করে ফেলুদা বলল, 'কমপক্ষে পঞ্চাশ

হাজার। আসুন অবনীবাবু, গোনা যাক।'

ফেলুদার চোখ লণ্ঠনের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। আমি জানি সেটা লোভ নয়। সেটা তার শান দেওয়া বুদ্ধির খানিকটা অংশ খাটিয়ে মনধাঁধানো জটিল রহস্য সমাধান করার আনন্দ।

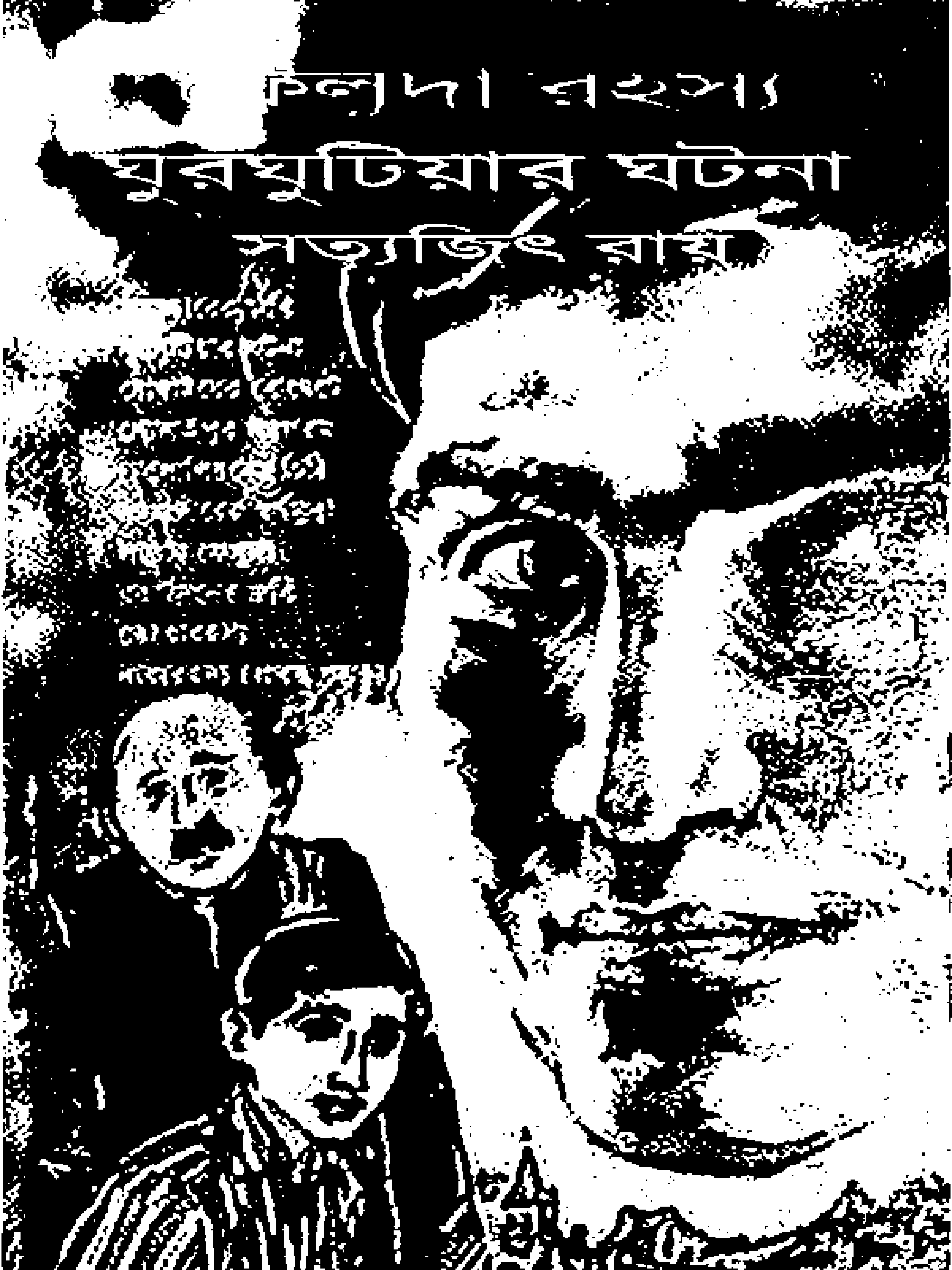
ফেলুদা রহস্য
ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা
সত্যজিৎ রায়

ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা

গ্রাম—ঘুরঘুটিয়া
পোঃ—পলাশী
জেলা—নদীয়া
৩রা নভেম্বর ১৯৭৪

শ্রী প্রদোষচন্দ্র মিত্র মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

আপনার কীর্তিকলাপের বিষয় অবগত হইয়া আপনার সহিত একটিবার সাক্ষাতের বাসনা জাগিয়াছে। ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে অবশ্যই। সেটি আপনি আসিলে জানিতে পারিবেন। আপনি যদি তিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হন, তবে অবিলম্বে পত্র মারফত জানাইলে বাধিত হইব।

ঘুরঘুটিয়া আসিতে হইলে পলাশী স্টেশনে নামিয়া সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে যাইতে হয়। শিয়ালদহ হইতে একাধিক ট্রেন আছে; তন্মধ্যে ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার দুপুর একটা আটান্ন মিনিটে ছাড়িয়া সন্ধ্যা ছ'টা এগারো মিনিটে পলাশী পৌঁছায়। স্টেশনে আমার গাড়ি থাকিবে। আপনি রাত্রে আমারই গৃহে অবস্থান করিয়া পরদিন সকালে সাড়ে দশটার একই ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ফিরিতে পারিবেন।

ইতি আশীর্বাদক
শ্রীকালীকিঙ্কর মজুমদার

চিঠিটা পড়ে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে বললাম, 'পলাশী মানে কি সেই যুদ্ধের পলাশী?'

'আর কটা পলাশী আছে ভাবছিস বাংলাদেশে?' বলল ফেলুদা। 'তবে তুই যদি ভাবিস যে সেখানে এখনও অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, তা হলে খুব ভুল করবি। কিস্যু নেই। এমন কী সিরাজদ্দৌল্লার আমলে যে পলাশবন থেকে পলাশীর নাম হয়েছিল, তার একটি গাছও এখন নেই।'

'তুমি কি যাবে?'

ফেলুদা চিঠিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'বুড়ো মানুষ ডাকছে এভাবে!—তা ছাড়া উদ্দেশ্যটা কী সেটা জানারও একটা কৌতূহল হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা—পাড়াগাঁয়ে শীতকালের সকাল-সন্ধেতে মাঠের উপর কেমন ধোঁয়া জমে থাকে দেখেছিস? গাছগুলোর গুঁড়ি আর মাথার উপরটা খালি দেখা যায়। আর সন্ধেটা নামে ঝপ্‌ করে, আর তারপরেই কনকনে ঠাণ্ডা, আর—নাঃ, এ সব কতকাল দেখিনি।...তোপ্‌সে, দে তো একটা পোস্টকার্ড।'

চিঠি পৌঁছাতে তিন-চার দিন লেগে যেতে পারে হিসেব করেই ফেলুদা যাবার তারিখটা জানিয়েছিল কালীকিঙ্কর মজুমদারকে। আমরা সেই অনুযায়ী ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চেপে পলাশী পৌঁছলাম বারোই নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। ট্রেনের কামরা থেকেই ধান ক্ষেতের উপর ঝপ্‌ করে সন্ধে নামা দেখছি। স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন চারিদিকে বাতিটাতি জ্বলে গেছে, যদিও আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। কালেক্টরবাবুর কাছে টিকিট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যে গাড়িটা চোখে পড়ল সেটাই যে মজুমদার মশাইয়ের গাড়ি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এরকম গাড়ি আমি কখনও দেখিনি; ফেলুদা বলল ছেলেবেলায় এক-আধটা দেখে থাকতে পারে, তবে নামটা শোনা এটুকু বলতে পারে। কাপড়ের হুডওয়ালা, অ্যাম্বাসাডরের চেয়ে দেড়া লম্বা আমেরিকান গাড়ি, নাম হাপমোবিল। গায়ের গাঢ় লাল রং এখানে ওখানে চটে গেছে, হুডের কাপড়ে তিন জায়গায় তাপ্পি, তাও কেন জানি গাড়িটাকে দেখলে বেশ সমীহ হয়।

এমন গাড়ির সঙ্গে উর্দিপরা ড্রাইভার থাকলে মানাত ভাল; যিনি রয়েছেন তিনি পরে আছেন সাধারণ ধুতি আর সাদা শার্ট। তিনি গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন, আমাদের এগিয়ে আসতে দেখে সেটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মজুমদার বাড়িতে আপনারা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বলল ফেলুদা, 'ঘুরঘুটিয়া।'

'আসুন।'

ড্রাইভার দরজা খুলে দিলেন, আমরা চল্লিশ বছরের পুরনো গাড়ির ভিতর ঢুকে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলাম। ড্রাইভার হ্যান্ডল মেরে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরঘুটিয়ার দিকে রওনা করিয়ে দিলেন।

রাস্তা ভাল নয়, গাড়ির স্প্রিংও পুরনো, তাই আরাম বেশিক্ষণ টিকল না। তবুও, পলাশীর বাজার ছাড়িয়ে গাড়ি গ্রামের খোলা রাস্তায় পড়তেই চোখ আর মন এক সঙ্গে জুড়িয়ে গেল। ফেলুদা ঠিকই বলেছিল; ধানে ভরা ক্ষেতের ওপরে গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে, আর তারই আশেপাশে জমাটবাঁধা ধোঁয়া ছড়িয়ে বিছিয়ে আছে মেঘের মতো মাটি থেকে আট-দশ হাত উপরে। চারিদিক দেখে মনে হচ্ছিল একেই বোধ হয় বলে ছবির মতো সুন্দর।

এরকম একটা জায়গায় যে আবার একটা পুরনো জমিদার বাড়ি থাকতে পারে সেটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না; কিন্তু মিনিট দশেক চলার পর রাস্তার দুপাশের গাছপালা দেখে বুঝতে পারলাম আম জাম কাঁঠাল ভরা একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলেছি। তারপর রাস্তাটা ডান দিকে ঘুরে একটা পোড়ো মন্দির পেরোতেই সামনে দেখতে পেলাম নহবৎখানা সমেত একটা শেওলাধরা প্রকাণ্ড সাদা ফটক। আমাদের গাড়িটা তিনবার হর্ন দিয়ে ফটকের ভিতরে ঢুকতেই সামনে বিশাল বাড়িটা বেরিয়ে পড়ল।

পিছনে সন্ধ্যার আকাশ থেকে লালটাল উবে গিয়ে এখন শুধু একটা গাঢ় বেগুনি ভাব রয়েছে। অন্ধকার বাড়িটা আকারে সামনে একটা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার অবস্থা যে প্রায় যাদুঘরে রাখার মতো সেটা কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম। দেয়ালে স্যাঁতা ধরেছে, সর্বাঙ্গে পলেস্তারা খসে গিয়ে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, সেই ইটের মধ্যেও আবার ফাটল ধরে তার ভিতর থেকে গাছপালা গজিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'এদিকে ইলেকট্রিসিটি নেই বোধহয়?'

'আজ্ঞে না;' বলল ড্রাইভার, 'তিন বছর থেকে শুনছি আসবে আসবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসেনি।'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে উপর দিকে চাইলে দোতলার অনেকগুলো ঘরের জানালা দেখা যায়; কিন্তু তার একটাতেও আলো আছে বলে মনে হল না। ডান দিকে কিছু দূরে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট ঘর দেখা যাচ্ছে, যাতে টিমটিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। বোধহয় মালি বা দারোয়ান বা ওইরকম কেউ থাকে ঘরটাতে। মনে মনে বললাম, ফেলুদা ভাল করে খোঁজখবর না নিয়ে এ কোথায় এসে হাজির হল কে জানে।

একটা লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বাইরের জমিতে। তারপরেই একজন বুড়ো চাকর এসে দরজার মুখটাতে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ড্রাইভার গাড়িটাকে নিয়ে গেছে বোধহয় গ্যারেজের দিকে। চাকরটা ভুরু কুঁচকে একবার আমাদের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'ভিতরে আসুন।' আমরা দুজনে তার পিছন পিছন বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

লম্বায়-চওড়ায় বাড়িটা যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আর সবই কেমন যেন ছোট ছোট। দরজাগুলো বেঁটে বেঁটে, জানালাগুলো কলকাতার যে কোনও সাধারণ বাড়ির জানালার অর্ধেক, ছাতটা প্রায় হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করাতে বলল দেড়শো-দুশো বছর আগের বাংলা দেশের জমিদার বাড়িগুলোর বেশির ভাগই নাকি এই রকমই ছিল।

লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই একটা আশ্চর্য নতুন জিনিস দেখলাম। ফেলুদা বলল, 'একে বলে চাপা-দরজা।

ডাকাতদের আটকাবার জন্য এরকম দরজা তৈরি হত। এ দরজা বন্ধ করলে আর খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে না ভাঁজ হয়ে মাথার উপরে সিলিং-এর মতো টেরচাভাবে শুয়ে পড়ে। দরজার গায়ে যে ফুটোগুলো দেখছিস, সেগুলো দিয়ে বল্লম ঢুকিয়ে ডাকাতদের খুঁচিয়ে তাড়ানো হত।'

দরজা পেরিয়ে একটা লম্বা বারান্দা, তার শেষ মাথায় কুলঙ্গিতে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তারই পাশে একটা দরজা দিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম আমরা তিনজনে।

এ ঘরটা বেশ বড়। আরও বড় মনে হত যদি এত জিনিসপত্র না থাকত। একটা প্রকাণ্ড খাট ঘরের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে আছে। তার মাথার দিকে বাঁ পাশে একটা টেবিল, তার পাশে একটা সিন্দুক। এ ছাড়া চেয়ার রয়েছে তিনটে, একটা এমনি আলমারি, আর মেঝে থেকে ছাত অবধি বইয়ে ঠাসা বাঁ পাশে একটা টেবিল, তার পাশে একটা সিন্দুক। এ ছাড়া চেয়ার রয়েছে আর রয়েছে খাটের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। টেবিলের উপর রাখা একটা মোমবাতির আলো তাঁর মুখে পড়েছে, আর সেই আলোতে বুঝতে পারছি সাদা দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে হাসছেন :

'বসুন', বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'নাকি বোসো বলব? তুমি তো দেখছি বয়সে আমার চেয়ে অর্ধেকেরও বেশি ছোট। তুমিই বলি, কী বলো?'

'নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা আমার কথা চিঠিতেই লিখে দিয়েছিল, এখন আলাপ করিয়ে দিল। একটা জিনিস লক্ষ করলাম যে আমাদের দুজনেরই নমস্কারের উত্তরে উনি কেবল মাথা নাড়লেন।

খাটের সামনেই দুটো পাশাপাশি চেয়ারে বসলাম আমরা দুজনে।

'চিঠিটা পেয়ে কৌতূহল হয়েছিল নিশ্চয়ই', ভদ্রলোক হালকা হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

'না হলে আর এ্যাদ্দুর আসি?'

'বেশ, বেশ।' মজুমদার মশাই সত্যিই খুশি হয়েছে, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। 'না এলে আমি দুঃখ পেতাম। মনে করতাম তুমি দাম্ভিক। আর তা ছাড়া তুমিও একটা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে। অবিশ্যি জানি না এ সব বই তোমার আছে কি না।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি টেবিলের দিকে ঘুরে গেল। চারটে মোটা মোটা বই রাখা রয়েছে মোমবাতির পাশেই। ফেলুদা উঠে গিয়ে বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখে বলল, 'সর্বনাশ, এ যে দেখছি সবই দুষ্প্রাপ্য বই। আর প্রত্যেকটা আমার পেশা সম্পর্কে। আপনি নিজে কি কোনওকালে—?'

'না', ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমি নিজে কোনওদিন গোয়েন্দাগিরি করিনি। ওটা বলতে পার আমার যুবাবয়সের একটা শখ বা "হবি"। আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে আমাদের পরিবারে একটা খুন হয়। পুলিশ লাগানো হয়। ম্যালকম বলে এক সাহেব-গোয়েন্দা খুনি ধরে দেয়। সেই ম্যালকমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে কৌতূহল হয়। তখনই এইসব বই কিনি। সেই সঙ্গে অবিশ্যি গোয়েন্দা কাহিনী পড়ারও খুব শখ হয়। এমিল গ্যাবোরিও-র নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল ফেলুদা, 'ফরাসি লেখক, প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন।'

'হুঁ', মাথা নেড়ে বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার, 'তার সব কটা বই আমার আছে। আর তা ছাড়া এডগার অ্যালেন পো, কোনান ডয়েল, এ তো আছেই। বই যা কিনেছি তার সবই চল্লিশ বছর বা তারও বেশি আগে। তার চেয়ে বেশি আধুনিক কিছু নেই আমার কাছে। আজকাল অবিশ্যি এ লাইনের কাজ অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে, অনেক সব নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তবে তোমার বিষয় যেটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয় তুমি আরও সরলভাবে, প্রধানত মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে কাজ করছ। আর বেশ সাক্সেসফুলি করছ।—কথাটা ঠিক বলেছি কি?'

'সাক্সেসের কথা জানি না, তবে পদ্ধতি সম্বন্ধে যেটা বললেন সেটা ঠিক।'

'সেটা জেনেই আমি তোমাকে ডেকেছি।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে।

মোমবাতির স্থির শিখাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'আমার যে শুধু সত্তরের উপর বয়স হয়েছে। তা নয়, আমার শরীরও ভাল নেই। আমি চলে গেলে এ সব বইয়ের কী দশা হবে জানি না; তাই ভাবলাম অন্তত এই ক'টা যদি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি তা হলে এগুলোর যত্ন হবে, কদর হবে।'

ফেলুদা অবাক হয়ে তাকের বইগুলোর দিকে দেখছিল। বলল, 'এ সবই কি আপনার নিজের বই?'

কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'বইয়ের শখ মজুমদার বংশে একমাত্র আমারই। আর নানা বিষয়ে যে উৎসাহ ছিল আমার সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

'তা তো বটেই। আর্কিয়লজির বই রয়েছে, আর্টের বই, বাগান সম্বন্ধে বই, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী...এমন কী থিয়েটারের বইও তো দেখছি। তার মধ্যে কিছু বেশ নতুন বলে মনে হচ্ছে। এখনও বই কেনেন নাকি?'

'তা কিনি বইকী। রাজেন বলে আমার একটি ম্যানেজার গোছের লোক আছে, তাকে মাসে দু'তিনবার করে কলকাতায় যেতে হয়, তখন লিস্ট করে দিই, ও কলেজ স্ট্রিট থেকে নিয়ে আসে।'

ফেলুদা টেবিলের উপর রাখা বইগুলোর দিকে দেখে বলল, 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।'

কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'বইগুলো নিজের হাতে করে তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে আরও বেশি খুশি হতাম, কিন্তু আমার দুটো হাতই অকেজো হয়ে আছে।'

আমরা দুজনেই একটু অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। উনি হাত দুটো কম্বলের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটার যে কোনও বিশেষ কারণ আছে সেটা বুঝতে পারিনি।

'আরথ্রাইটিস জানো তো? যাকে সোজা বাংলায় বলে গেঁটে বাত। হাতের আঙুলগুলো আর ব্যবহার করতে পারি না। এখন অবিশ্যি আমার ছেলে কিছুদিন হল এখানে এসে রয়েছে, নইলে আমার চাকর গোকুলই আমাকে খাইয়ে-টাইয়ে দেয়।'

'আপনার চিঠিটা কি আপনার ছেলে লিখেছিলেন?'

'না, ওটা লিখেছিল রাজেন। বৈষয়িক ব্যাপারগুলো ওই দেখে। ডাক্তার ডাকার দরকার হলে গাড়ি করে গিয়ে নিয়ে আসে বহরমপুর থেকে। পলাশীতে ভাল ডাক্তার নেই।'

লক্ষ করছিলাম ফেলুদার দৃষ্টি মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে ঘরের কোণায় রাখা সিন্দুকটার দিকে। ও বলল, 'আপনার সিন্দুকটার একটু বিশেষত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। তালা-চাবির ব্যবস্থা নেই দেখছি। কম্বিনেশনে খোলে বুঝি?'

কালীকিঙ্করবাবু হেসে বললেন, 'ঠিক ধরেছ। একটা বিশেষ সংখ্যা আছে;

সেই অনুযায়ী নবটা ঘোরালে তবে খোলে। এ সব অঞ্চলে এককালে ডাকাতদের খুব উপদ্রব ছিল, জানো তো। আমার পূর্বপুরুষরাই তো ডাকাতি করে জমিদার হয়েছে। তারপর আবার আমরাই ডাকাতের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছি। তাই মনে হয়েছিল তালার বদলে কম্বিনেশন করলে হয়তো আর একটু নিরাপদ হবে।'

কথাটা শেষ করে ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন। তারপর তাঁর চাকরের নাম ধরে একটা হাঁক দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো গোকুল এসে হাজির হল। কালীকিঙ্করবাবু বললেন, 'একবার খাঁচাটা আন তো গোকুল। এঁদের দেখাব।'

গোকুল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটা খাঁচায় একটা টিয়া নিয়ে এসে হাজির। মোমবাতির আলোয় টিয়ার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

কালীকিঙ্করবাবু পাখিটার দিকে চেয়ে বললেন, 'বলো তো মা,—ত্রিনয়ন, ত্রিনয়ন—বলো তো।'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর আশ্চর্য পরিষ্কার গলায় পাখি বলে উঠল, 'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন!'

আমি তো থ। পাখিকে এত পরিষ্কার কথা বলতে কখনও শুনিনি। কিন্তু ওখানেই শেষ না। সঙ্গে আরও দুটো কথা জুড়ে দিল টিয়া—'একটু জিরো!'

তারপর আবার পুরো কথাটা পরিষ্কার করে বলে উঠল টিয়া—'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন—একটু জিরো।'

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেছে। বলল, 'ত্রিনয়ন কে?'

কালীকিঙ্করবাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'সেটি বলব না তোমাকে। শুধু এইটুকু বলব যে যেটা বলছে সেটা হল একটা সংকেত। বারো ঘণ্টা সময় আছে তোমার। দেখো তো তুমি সংকেতটা বার করতে পার কি না। আমার সিন্দুকের সঙ্গে সংকেতটার যোগ আছে বলে দিলাম।'

ফেলুদা বলল, 'টিয়াকে ওটা শেখানোর পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না সেটা জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই পার', বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'বয়সের সঙ্গে অধিকাংশ মানুষের স্মরণশক্তি কমে আসে সেটা জানো তো? বছর তিনেক আগে একদিন সকালে হঠাৎ দেখি সিন্দুকের সংকেতটা মনে আসছে না। বিশ্বাস করবে?—সারাদিন চেষ্টা করেও নম্বরটা মনে করতে পারিনি। শেষটায় মনে পড়ল মাঝরাত্তিরে! নম্বরটা লিখে রাখিনি কোথাও, কারণ কখন যে কার কী অভিসন্ধি হয় সেটা তো বলা যায় না। তাই মনে হয়েছিল ওটা মাথায় রাখাই ভাল। এক আমার ছেলে জানত, কিন্তু সে থাকে বাইরে বাইরে। তাই পরদিনই একটা টিয়া সংগ্রহ করে নম্বরটা একটা সাংকেতিক চেহারা দিয়ে পাখিটাকে পড়িয়ে নিই। এখন ও মাঝে মাঝেই সংকেতটা বলে ওঠে—অন্য পাখি যেমন বলে "রাধাকিষণ" বা "ঠাকুর ভাত দাও"।'

ফেলুদা সিন্দুকটার দিকে দেখছিল। হঠাৎ ভ্রূকুটি করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেল সেটার দিকে। তারপর ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে মোমবাতিটা তুলে নিয়ে আবার গেল সিন্দুকটার দিকে।

'কী দেখছ ভাই?' বললেন কালীকিঙ্করবাবু। 'তোমার ডিটেকটিভের চোখে কিছু ধরা পড়ল নাকি?'

ফেলুদা সিন্দুকের সামনেটা পরীক্ষা করে বলল, 'আপনার সিন্দুকের দরজার উপর কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয়। বোধহয় কেউ দরজাটা খুলতে চেষ্টা করেছিল।'

কালীকিঙ্করবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত?'

ফেলুদা মোমবাতিটা আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, 'ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে এরকম দাগ পড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ ধরনের ঘটনার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।'

কালীকিঙ্করবাবু একটু ভেবে বললেন, 'বাড়িতে লোক বলতে তো আমি, গোকুল, রাজেন, আমার ড্রাইভার মণিলাল ঠাকুর আর মালি। আমার ছেলে বিশ্বনাথ দিন পাঁচেক হল এসেছে। ও থাকে কলকাতায়। ব্যবসা করে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ নেই। এবারে এসেছে—ওই যা বললাম—আমার অসুখের খবর পেয়ে। গত সোমবার সকালে আমার বাগানের বেঞ্চিটায় বসে ছিলাম। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখে আবার বেঞ্চিতেই পড়ে যাই।

রাজেন পলাশী থেকে বিশ্বনাথকে ফোন করে দেয়। ও পরদিন ডাক্তার নিয়ে চলে আসে। মনে হচ্ছে একটা ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। যাই হোক—আমার এমনিতেও আর বেশিদিন নেই, সেটা আমি জানি। এই শেষ ক'টা দিন কি সংশয়ের মধ্যে কাটাতে হবে? আমার ঘরে ঢুকে ডাকাত আমার সিন্দুক ভাঙবে?'

ফেলুদা কালীকিঙ্করবাবুকে আশ্বাস দিল।

'আমার সন্দেহ নির্ভুল নাও হতে পারে। হয়তো সিন্দুকটা যখন প্রথম বসানো হয়েছিল তখন ঘষাটা লেগেছিল। দাগগুলো টাটকা না পুরনো সেটা এই মোমবাতির আলোতে বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে আর একবার দেখব। আপনার চাকরটি বিশ্বাসী তো?'

'গোকুল আছে প্রায় ত্রিশ বছর।'

'আর রাজেনবাবু?'

'রাজেনও পুরনো লোক। মনে তো হয় বিশ্বাসী। তবে ব্যাপারটা কী জান—আজ যে বিশ্বাসী, কাল যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এমন তো কোনও গ্যারান্টি নেই।'

ফেলুদা মাথা নেড়ে কথাটায় সায় দিয়ে বলল, 'যাই হোক, গোকুলকে বলবেন একটু দৃষ্টি রাখতে। আমার মনে হয় না চিন্তার কোনও কারণ আছে।'

'যাক!'

কালীকিঙ্করবাবুকে খানিকটা আশ্বস্ত বলে মনে হল। আমরা উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক বললেন, 'গোকুল তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে। লেপ কম্বল তোশক বালিশ মশারি—সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। বিশ্বনাথ একটু বহরমপুরে গেছে—এই ফিরল বলে। ও এলে তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ো। কাল সকালে যাবার আগে যদি চাও তো আমার গাড়িতে করে আশেপাশে একটু ঘুরে দেখে নিয়ো। যদিও দ্রষ্টব্য বলে খুব যে একটা কিছু আছে তা নয়।'

ফেলুদা টেবিলের উপর থেকে বইগুলো নিয়ে এল। গুড নাইট করার আগে কালীকিঙ্করবাবু আর একবার হেঁয়ালির কথাটা মনে করিয়ে দিলেন।—

'ওটার সমাধান করতে পারলে তোমাকে আমার প্যাবোরিওর সেটটা উপহার দেব।'

গোকুল আমাদের সঙ্গে নিয়ে দুটো বারান্দা পেরিয়ে আমাদের ঘর দেখিয়ে দিল।

আগে থেকেই ঘরে একটা লণ্ঠন রাখা ছিল। সুটকেশ আর হোল্ডঅলও দেখলাম ঘরের এক কোণে রাখা রয়েছে। কালীকিঙ্করবাবুর ঘরের চেয়ে এ ঘরটা ছোট হলেও, জিনিসপত্র কম থাকাতে হাঁটাচলার জায়গা এটাতে একটু বেশিই। ফরসা চাদর পাতা খাটের উপর বসে ফেলুদা বলল, সংকেতটা মনে পড়ছে, তোপসে?'

এইরে! ত্রিনয়ন নামটা মনে আছে, কিন্তু সমস্ত সংকেতটা জিজ্ঞেস করে ফেলুদা প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে।

'পারলি না তো? ঝোলা থেকে আমার খাতাটা বার করে সংকেতটা লিখে ফেল। গ্যাবোরিওর বইগুলোর ওপর বেজায় লোভ হচ্ছে।'

খাতা পেনসিল নিয়ে বসার পর ফেলুদা বলল, আর আমি গোটা গোটা অক্ষরে লিখে ফেললাম—

'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন... একটু জিরো।'

লিখে নিজেরই মনে হল এ আবার কীরকম সংকেত। এর তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। ফেলুদা এর সমাধান করবে কী করে?

ফেলুদা এদিকে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালা খুলে বাইরে দেখছে। জ্যোৎস্না রাত। বোধহয় পূর্ণিমা। আমি ফেলুদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এটা বাড়ির পিছন দিক। ফেলুদা বলল, 'একটা পুকুর-টুকুর গোছের কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে ডান দিকটায়।' ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরে জল চিক্‌মিক্ করছে সেটা আমিও দেখেছি।

একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। তার সঙ্গে এই মাত্র যোগ হল শেয়ালের ডাক। আমার মনে হল এত নির্জন জায়গায় এর আগে কখনও আসিনি।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল, ফেলুদা পাল্লা দুটো বন্ধ করতেই একটা মটোরের আওয়াজ পেলাম। এটা অন্য গাড়ি, সেই বিশাল প্রাচীন আমেরিকান গাড়ি নয়।

'বিশ্বনাথ মজুমদার এলেন বলে মনে হচ্ছে', ফেলুদা মন্তব্য করল। তার মানে এবার খেতে ডাকবে। সত্যি বলতে কী, বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। এগারোটায় ট্রেন ধরব বলে সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। পথে রাণাঘাট স্টেশনে অবিশ্যি মিষ্টি আর চা খেয়ে নিয়েছিলাম। হয়তো এমনিতে খিদে পেত না, কারণ ঘড়িতে বলছে সবেমাত্র আটটা বেজেছে, কিন্তু এখানে তো আর কিছু করার নেই—এমন কী লণ্ঠনের আলোতে বইও পড়া যাবে না—তাই মনে হচ্ছিল খেয়ে-দেয়ে কম্বলের তলায় ঢুকতে পারলে মন্দ হয় না।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, এবার দেখলাম আমাদের ঘরের দেওয়ালে একটা ছবি রয়েছে, আর ফেলুদা সেটার দিকে চেয়ে আছে। ফোটো নয়; আঁকা ছবি আর বেশ বড়। সেটা যে কালীকিঙ্করবাবুর পূর্বপুরুষের ছবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খালি গায়ে বসে আছেন বাবু চেয়ারের উপর; পাকানো গোঁফ, কাঁধ অবধি লম্বা চুল, টানাটানা চোখ, আর বিরাট চওড়া কাঁধ।

'মুগুর ভাঁজা কুস্তি করা শরীর', ফিস্ ফিস্ করে বলল ফেলুদা। 'মনে হচ্ছে ইনিই সেই প্রথম ডাকাত জমিদার।'

বাইরে পায়ের শব্দ। আমরা দুজনেই দরজার দিকে চাইলাম। গোকুল বাইরে একটা লণ্ঠন রেখে গিয়েছিল, তার আলোটা ঢেকে প্রথমে একটা ছায়া

ঘরের মেঝেতে পড়ল, আর তারপর একটা অচেনা মানুষ চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়াল।

ইনিই কি বিশ্বনাথ মজুমদার? না, হতেই পারে না! খাটো করে পরা ধুতি, গায়ে ছাই রঙের পাঞ্জাবি, ঝুঁপো গোঁফ আর চোখে পুরু চশমা। ভদ্রলোক গলা বাড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বোধহয় আমাদের খুঁজছেন।

'কিছু বলবেন রাজেনবাবু?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

ভদ্রলোক যেন এতক্ষণে আমাদের দেখতে পেলেন। এবার সর্দি-বসা গলায় কথা এল—

'ছোটবাবু ফিরেছেন। ভাত দিতে বলেছি; গোকুল আপনাদের খবর দেবে।'

রাজেনবাবু চলে গেলেন।

'কীসের গন্ধ বলো তো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম ফেলুদাকে।

'বুঝতে পারছিস না? ন্যাফথ্যালিন। গরম পাঞ্জাবিটা সবেমাত্র বার করেছে ট্রাঙ্ক থেকে।'

রাজেনবাবুর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বুঝতে পারলাম আমরা কী আশ্চর্য থমথমে পরিবেশের মধ্যে রয়েছি। এরকম জায়গায় দিনের পর দিন মানুষ থাকে কী করে? ফেলুদা পাশে থাকলে সাহসের অভাব হবে না জানি, কিন্তু না থাকলে এই আদ্যিকালের পোড়ো জমিদার বাড়িতে পাঁচ মিনিটও থাকার সাধ্যি হত না আমার। কালীকিঙ্করবাবু আবার নিজেই বললেন এ বাড়িতে নাকি এককালে খুন হয়েছিল। কোন্ ঘরে কে জানে!

ফেলুদা এর মধ্যে লণ্ঠন সমেত টেবিলটাকে কাছে টেনে এনে খাটে বসে খাতা খুলে সংকেত নিয়ে ভাবা শুরু করে দিয়েছে। 1-একবার যেন ত্রিনয়ন বলে বিড়বিড় করতেও শুনলাম। আমি আর কী করি, দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ওটা কী? বুকটা ধড়াস করে উঠল। কী জানি একটা নড়ে উঠেছে বারান্দার এদিকটা—যেখানে লণ্ঠনের আলো অন্ধকারে মিশে গেছে।

দাঁত দাঁতে চেপে রইলাম অন্ধকারের দিকে। এবার বুঝলাম ওটা একটা বেড়াল। ঠিক সাধারণ সাদা বা কালো বেড়াল নয়; এটার গায়ে বাঘের মতো ডোরা। বেড়ালটা কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একটা হাই তুলে উলটো দিকে ফিরে হেলতে দুলতে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কিছু পরেই শুনলাম কর্কশ গলায় টিয়ার ডাক। তারপরেই আবার সব চুপচাপ। বিশ্বনাথ বাবুর ঘরটা কোথায় কে জানে। তিনি কি দোতলায় থাকেন না একতলায়? রাজেনবাবুই বা কোথায় থাকেন? আমাদের এমন ঘর দিয়েছে কেন যেখান থেকে কারুর কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না?

আমি ঘরে ফিরে এলাম। ফেলুদা খাটের উপর পা তুলে দিয়ে খাতা হাতে নিয়ে ভাবছে। আর না পেরে বললাম, 'এরা এত দেরি করছে কেন বলো তো?'

ফেলুদা ঘড়ি দেখে বলল, 'তা মন্দ বসিসনি। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল।' বলেই আবার খাতার দিকে মন দিল।

আমি ফেলুদার পাওয়া বইগুলো উল্টে-পাল্টে দেখলাম। একটা বই আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে, একটার নাম 'ক্রিমিনলজি', আর একটা 'ক্রাইম অ্যান্ড ইট্স ডিটেকশন'। চার নম্বর বইটার নামের মানেই বুঝতে পারলাম না। তবে এটায় অনেক ছবি রয়েছে, তার মধ্যে পর পর দশ পাতায় শুধু বিভিন্ন রকমের পিস্তল আর বন্দুক। ফেলুদা রিভলভারটা সঙ্গে এনেছে কি?

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মনে পড়ল ফেলুদা তো গোয়েন্দাগিরি করতে আসেনি; আর সেটার কোনও প্রয়োজনও নেই। কাজেই রিভলভারেরই বা দরকার হবে কেন?

বইগুলো সুটকেসে রেখে খাটে বসতে যাব, এমন সময় আচমকা অচেনা গলায় আওয়াজ পেয়ে বুকটা আবার ধড়াস করে উঠল।

এবারের লোকটিকে চেনায় কোনও অসুবিধা নেই। ইনি গোকুল নন, রাজেনবাবু নন; গাড়ির ড্রাইভার নন, আর রান্নার ঠাকুর তো ননই। কাজেই ইনি বিশ্বনাথবাবু ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

'আপনাকে অনেক দেরি করিয়ে দিলাম', ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন। 'আমার নাম বিশ্বনাথ মজুমদার।'

সেটা আর বলে দিতে হয় না। বাপের সঙ্গে বেশ মিল আছে চেহারায়। বিশেষ করে চোখ আর নাকে। বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে, মাথার চুল এখনও সবই কাঁচা, গোঁফ-দাড়ি নেই, ঠোঁট দুটো অসম্ভব রকম পাতলা। ভদ্রলোককে আমার ভাল লাগল না। কেন ভাল লাগল না সেটা অবিশ্যি বলা মুশকিল। একটা কারণ বোধহয় উনি আমাদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন, আর আরেকটা কারণ—যদিও এটা ভুল হতে পারে—ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেও সে হাসিটা কেন জানি খাঁটি বলে মনে হল না। যেন আসলে সত্যি করে আমাদের দেখে খুশি হননি; সেটা হবেন আমরা চলে গেলে পর।

ফেলুদা আর আমি বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে নীচে নেমে সোজা গিয়ে হাজির হলাম খাবার ঘরে। আমি ভেবেছিলাম মাটিতে বসে খেতে হবে—এখন দেখছি বেশ বড় একটা ডাইনিং টেবিল রয়েছে, আর তার উপরে রুপোর থালা বাটি গেলাস সাজানো রয়েছে।

যে-যার জায়গায় বসার পর বিশ্বনাথবাবু বললেন, 'আমার আবার কি শীত কি গ্রীষ্ম দুবেলা স্নান করার অভ্যাস, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।'

ভদ্রলোকের গা থেকে দামি সাবানের গন্ধ পেয়েছি আগেই ; এখন মনে হচ্ছে বোধহয় সেন্টও মেখে এসেছেন। বেশ শৌখিন লোক সন্দেহ নেই। সাদা সিল্কের শার্টের উপর গাঢ় সবুজ রঙের হাত কাটা কার্ডিগ্যান, আর তার সঙ্গে ছাই রঙের টেরিলিনের প্যান্ট।

বাটি চাপা ভাত ভেঙে মোচার ঘন্ট দিয়ে খাওয়া শুরু করে দিলাম। থালার চারপাশে গোল করে সাজানো বাটিতে রয়েছে আরও তিন রকমের তরকারি, সোনা মুগের ডাল, আর রুই মাছের ঝোল।

'বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বনাথবাবু।

'হ্যাঁ', বলল ফেলুদা। 'উনি আমাকে ভীষণ লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন।

'বই উপহার দিয়ে?'

'হ্যাঁ। আজকের বাজারে ওই বই যদি পাওয়াও যেত তা হলে দাম পড়ত কমপক্ষে পাঁচ-সাত শো টাকা।'

বিশ্বনাথবাবু হেসে বললেন, 'আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন জেনে আমি বাবাকে বেশ একটু ধমকই দিয়েছিলাম। শহুরে লোকদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে ডেকে এনে কষ্ট দেবার কোনও মানে হয় না।'

ফেলুদা কথাটার প্রতিবাদ করল,

'কী বলছেন মিস্টার মজুমদার। আমার তো এখানে এসে দারুণ লাভ হয়েছে। কষ্টের কোনও কথাই ওঠে না।'

বিশ্বনাথবাবু ফেলুদার কথায় তেমন আমল না দিয়ে বললেন, 'আমার তো এই চার দিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। বাবা যে কী করে একটানা এতদিন রয়েছেন জানি না।'

'বাইরে একেবারেই যান না?'

'শুধু তাই না। বেশির ভাগ সময়ই ওঁর এই অন্ধকার ঘরে খাটের উপর শুয়ে থাকেন। দিনে কেবল দুবার কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে বসেন। এখন অবিশ্যি শরীরের জন্য সেটাও বন্ধ।'

'আপনি আর ক'দিন আছেন?'

'আমি? আমি কালই যাব। বাবার এখন ইমিডিয়েট কোনও ডেঞ্জার নেই। আপনারা তো বোধহয় সাড়ে আটটার ট্রেনে ফিরছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনারাও যাবেন, আর আমিও বেরোব।'

ফেলুদা ভাতে ডাল ঢেলে বলল, 'আপনার বাবার তো নানারকম শখ দেখলাম; আপনি নিজে কি একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট ব্যবসাদার?'

'হ্যাঁ মশাই। কাজকর্ম করে আর অন্য কিছু করার প্রবৃত্তি থাকে না।'

বিশ্বনাথবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যখন ঘরে ফিরে এলাম তখন বেজেছে প্রায় সাড়ে নটা। এখানে ঘড়ির টাইমের আর কোনও মানে নেই আমার কাছে, কারণ সাতটা থেকেই মনে হচ্ছে মাঝরাত্তির।

ফেলুদাকে বললাম, 'বালিশগুলোকে উলটো দিকে করে শুলে তোমার কোনও আপত্তি আছে?'

'কেন বল্ তো?'

'তা হলে আর চোখ খুললেই ডাকাতবাবুটিকে দেখতে হবে না।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'ঠিক আছে। আমার কোনও আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের চাহনিটা যে আমারও খুব ভাল লাগছিল তা বলতে পারি না।'

শোবার আগে ফেলুদা লণ্ঠনের আলোটাকে কমিয়ে দিল, আর তার ফলে ঘরটাও যেন আরও ছোট হয়ে গেল।

চোখ যখন প্রায় বুজে এসেছে, তখন হঠাৎ ফেলুদার মুখে ইংরিজি কথা শুনে অবাক হয়ে এক ধাক্কায় ঘুম ছুটে গেল। স্পষ্ট শুনলাম ফেলুদা বলল—

'দেয়ার ওয়াজ এ ব্রাউন ক্রো।'

আমি কনুইয়ের ভর করে উঠে বসলাম, 'ব্রাউন ক্রো? কাক আবার ব্রাউন হয় নাকি? এ সব কী আবোল-তাবোল বকছ ফেলুদা?'

'গ্যাবোরিওর বইগুলো বোধহয় পেয়ে গেলাম রে তোপ্‌সে।'

'সে কী? সমাধান হয়ে গেল?'

'খুব সহজ।...এদেশে এসে সাহেবরা যখন গোড়ার দিকে হিন্দি শিখত, তখন উচ্চারণের সুবিধের জন্য কতগুলো কায়দা বার করেছিল। দেয়ার ওয়জ এ ব্রাউন ক্রো—এই কথাটার সঙ্গে কিন্তু বাদামি কাকের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা আসলে সাহেব তার বেয়ারাকে দরজা বন্ধ করতে বলছে—দরওয়াজা বন্‌ধ্ করো। এই ত্রিনয়নের ব্যাপারটাও কতকটা সেই রকম। গোড়ায় ত্রিনয়নকে তিন ভেবে বার বার হোঁচট খাচ্ছিলাম।'

'সে কী? ওটা তিন নয় বুঝি? আমিও তো ওটা তিন ভাবছিলাম।'

'উঁহু। তিন নয়। ত্রিনয়নের ত্রি-টা হল তিন। আর নয়ন হল নাইন। দুইয়ে মিলে থ্রি-নাইন। "ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন হল থ্রি-নাইন-ও-থ্রি-নাইন। এখানে "ও" মানে "জিরো" অর্থাৎ শূন্য।'

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

'তা হলে একটু জিরো মানে—'

'এইট-টু-জিরো। জলের মতো সোজা।—সুতরাং পুরো সংখ্যা হচ্ছে—থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো। কেমন, ঢুকল মাথায়? এবার ঘুমো।'

মনে মনে ফেলুদার বুদ্ধির তারিফ করে আবার বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজতে যাব, এমন সময় আবার বারান্দায় পায়ের আওয়াজ।

রাজেনবাবু।

এত রাত্রে ভদ্রলোকের কী দরকার?

আবার ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে হল, 'কিছু বলবেন রাজেনবাবু?'

'ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের আর কিছু দরকার লাগবে কি না।'

'না না, কিচ্ছু না। সব ঠিক আছে।'

ভদ্রলোক যেভাবে এসেছিলেন সেইভাবেই আবার চলে গেলেন।

চোখ বন্ধ করার আগে বুঝতে পারলাম জানালার খড়খড়ি দিয়ে আসা চাঁদের

আলোটা হঠাৎ ফিকে হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে শোনা গেল দূর থেকে ভেসে আসা মেঘের গর্জন। তারপর বেড়ালটা কোত্থেকে জানি দুবার ম্যাও ম্যাও করে উঠল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

সকালে উঠে দেখি ফেলুদা ঘরের জানালাগুলো খুলছে। বলল, 'রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল টের পাসনি?'

রাত্রে যাই হোক, এখন যে মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ বেরিয়েছে সেটা খাটে শোয়া অবস্থাতেও বাইরের গাছের পাতা দেখে বুঝতে পারছি।

আমরা ওঠার আধ ঘণ্টার মধ্যে চা এনে দিল বুড়ো গোকুল। দিনের আলোতে ভাল করে ওর মুখ দেখে মনে হল গোকুল যে শুধু বুড়ো হয়েছে তা নয়; তার মতো এমন ভেঙে পড়া দুঃখী ভাব আমি খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি।

'কালীকিঙ্করবাবু উঠেছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

গোকুল কানে কম শোনে কি না জানি না; সে প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন ফ্যাল-ফ্যাল মুখ করে ফেলুদার দিকে দেখল; তারপর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাড়ে সাতটা নাগাত আমরা কালীকিঙ্করবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ভদ্রলোক ঠিক কালকেরই মতো বিছানায় শুয়ে আছেন কম্বলের তলায়। তাঁর পাশের জানালাটা দিয়ে রোদ আসে বলেই বোধহয় উনি সেটাকে বন্ধ করে রেখেছেন। ঘরটা তাই সকাল বেলাতেও বেশ অন্ধকার। যেটুকু আলো আছে সেটা আসছে বারান্দার দরজাটা দিয়ে। আজ প্রথম লক্ষ্য করলাম ঘরের দেয়ালে কালীকিঙ্করবাবুর একটা বাঁধানো ফোটোগ্রাফ রয়েছে। ছবিটা বেশ কিছুদিন আগে তোলা, কারণ তখনও ভদ্রলোকের গোঁফ-দাড়ি পাকতে শুরু করেনি।

ভদ্রলোক বললেন, 'গ্যাবোরিওর বইগুলো আগে থেকেই বার করে রেখেছি, কারণ আমি জানি তুমি সফল হবেই।'

ফেলুদা বলল, 'হয়েছি কি না সেটা আপনি বলবেন। থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো।—ঠিক আছে?'

'সাবাশ গোয়েন্দা!' হেসে বলে উঠলেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। 'নাও, বইগুলো নিয়ে তোমার থলির মধ্যে পুরে ফেলো। আর দিনের আলোতে একবার সিন্দুকের গায়ের দাগগুলো দেখো দেখি। আমার তো দেখে মনে হচ্ছে না ওটা নিয়ে চিন্তা করার কোনও কারণ আছে।'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকলেই হল।'

ফেলুদা আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে প্রথম ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিকের লেখা বই চারখানা তার ঝোলার মধ্যে পুরে নিল।

'তোমরা চা খেয়েছ তো?' কালীকিঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ড্রাইভারকে বলা আছে। গাড়ি বার করেই রেখেছে। তোমাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে। বিশ্বনাথ খুব ভোরে বেরিয়ে গেছে। বলল ওর দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে পারলে সুবিধে হয়। রাজেন গেছে বাজারে। গোকুল তোমাদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দেবে।...তোমরা কি স্টেশনে যাবার আগে একটু আশেপাশে ঘুরে দেখতে চাও?'

ফেলুদা বলল, 'আমি ভাবছিলাম সাড়ে দশটার ট্রেনটার জন্য অপেক্ষা না করে এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়তো ৩৭২ ডাউনটা ধরতে পারব।'

'তা বেশতো, তোমাদের মতো শহুরে লোকেদের পল্লীগ্রামে বন্দি করে রাখতে চাই না আমি। তবে তুমি আসাতে আমি যে খুবই খুশি হয়েছি—সেটা আমার একেবারে অন্তরের কথা।'

কাল রাত্তিরের বৃষ্টিতে ভেজা রাস্তা দিয়ে গাড়িতে করে পলাশী স্টেশনের দিকে যেতে আমি সকাল বেলার রোদে ভেজা ধান ক্ষেতের দৃশ্য দেখছি, এমন সময় শুনলাম ফেলুদা ড্রাইভারকে একটা প্রশ্ন করল।

'স্টেশনে যাবার কি এ ছাড়া আর অন্য কোনও রাস্তা আছে?'

'আজ্ঞে না বাবু', বলল মণিলাল ড্রাইভার।

ফেলুদার মুখ গম্ভীর। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি ও কী ভাবছে, কোনও সন্দেহের কারণ ঘটেছে কি না; কিন্তু সাহস হল না।

রাস্তায় কাদা ছিল বলে দশ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট লাগল স্টেশনে পৌঁছতে। মাল নামিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলাম। ফেলুদা কিন্তু টিকিট ঘরের দিকে গেল না। মালগুলো স্টেশনমাস্টারের জিম্মায় রেখে আবার বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এল।

রাস্তায় সাইকেল রিকশার লাইন। সবচেয়ে সামনের রিকশার মালিককে কাছে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'এখানকার থানাটা কোথায় জানেন?'

'জানি, বাবু।'

'চলুন তো। তাড়া আছে।'

প্রচণ্ডভাবে প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন দিতে দিতে ভিড় কাটিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে থানায় পৌঁছে গেলাম। ফেলুদার খ্যাতি যে এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেটা বুঝলাম যখন সাব-ইন্সপেক্টর মিস্টার সরকার ওর পরিচয় দিতে চিনে ফেললেন। ফেলুদা বলল, 'ঘুরঘুটিয়ার কালীকিঙ্কর মজুমদার সম্বন্ধে কী জানেন বলুন তো।'

'কালীকিঙ্কর মজুমদার?' সরকার ভুরু কুঁচকোলেন। 'তিনি তো ভাল লোক বলেই জানি মশাই। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তাঁর সম্বন্ধে তো কোনওদিন কোনও বদনাম শুনিনি।'

'আর তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ? তিনি কি এখানেই থাকেন?'

'সম্ভবত কলকাতায়। কেন, কী ব্যাপার, মিস্টার মিত্তির?'

'আপনার জিপটা নিয়ে একবার আমার সঙ্গে আসতে পারবেন? ঘোরতর গোলমাল বলে মনে হচ্ছে।'

কাঁচা রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে জিপ ছুটে চলল ঘুরঘুটিয়ার দিকে। ফেলুদা প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনার মধ্যে শুধু একটিবার মুখ খুলল, যদিও তার কথা আমি ছাড়া কেউ শুনতে পেল না।

'আরথ্রাইটিস, সিন্দুকে দাগ, ডিনারে বিলম্ব, রাজেনবাবুর গলা ধরা, ন্যাফথ্যালিন—সব ছকে পড়ে গেছে রে তোপ্‌সে। ফেলু মিত্তির ছাড়াও যে অনেক লোকে অনেক বুদ্ধি রাখে সেটা সব সময় খেয়াল থাকে না।'

মজুমদার-বাড়ি পৌঁছে প্রথম যে জিনিসটা দেখে অবাক লাগল সেটা হল একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডর গাড়ি। ফটকের বাইরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে এটাই নিঃসন্দেহে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ি। জিপ থেকে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, 'লক্ষ কর গাড়িটাতে কাদাই লাগেনি। এ গাড়ি সবেমাত্র রাস্তায় বেরোল।'

বিশ্বনাথবাবুর ড্রাইভারই বোধহয়—কারণ এ লোকটাকে আগে দেখিনি—আমাদের দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ফ্যাকাশে করে গেটের ধারে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি এ গাড়ির ড্রাইভার?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আ-আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'বিশ্বনাথবাবু আছেন?'

লোকটা ইতস্তত করছে দেখে ফেলুদা আর অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে ঢুকল বাড়ির ভিতর—তার পিছনে দারোগা, আমি, আর একজন কনস্টেবল।

আবার সেই প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে ফেলুদা এবং আমরা তিনজন সোজা ঢুকলাম কালীকিঙ্করবাবুর ঘরে।

ঘর খালি বিছানায় কম্বলটা পড়ে আছে। আর যা ছিল সব ঠিক তেমনি আছে, কিন্তু মালিক নেই।

'সর্বনাশ!' বলে উঠল ফেলুদা।

সে সিন্দুকটার দিকে চেয়ে আছে। সেটা হাঁ করে খোলা। বেশ বোঝা যাচ্ছে তার থেকে অনেক কিছু বার করে নেওয়া হয়েছে।

দরজার বাইরে গোকুল এসে দাঁড়িয়েছে। সে থরথর করে কাঁপছে। তার চোখে জল। দেখে মনে হয় যেন তার শেষ অবস্থা।

তার উপর হুমড়ি দিয়ে পড়ে ফেলুদা বলল, 'বিশ্বনাথবাবু কোথায়?'

'তিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন।'

'দেখুন তো মিস্টার সরকার!'

দারোগা আর কনস্টেবল অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে গেল।

'শোনো গোকুল'—ফেলুদা দুহাত দিয়ে গোকুলের কাঁধ দুটোকে শক্ত করে

ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—'একটিও মিথ্যে কথা বললে তোমায় হাজতে যেতে হবে।—কালীকিঙ্করবাবু কোথায়?'

গোকুলের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

'আজ্ঞে—আজ্ঞে—তাঁকে খুন করেছেন।'

'কে?'

'ছোটবাবু।'

'কবে?'

'যেদিন ছোটবাবু এলেন। সেদিনই রাত্তির বেলা। বাপ-বেটায় কথা কাটাকাটি হল। ছোটবাবু সিন্দুকের নম্বর চাইলেন, কর্তাবাবু বললেন—আমার টিয়া জানে, তার কাছ থেকে জেনে নিয়ো, আমি বলব না। তারপরে—তারপরে—তার কিছুক্ষণ পরে—ছোটবাবু আর তেনার গাড়ির ডেরাইভারবাবু, দুজনে মিলে—'

গোকুলের গলা ধরে এল। বাকিটা তাকে খুব কষ্ট করে বলতে হল—

'দুজনে মিলে কর্তাবাবুর লাশ নিয়ে গিয়ে ফেলল ওই পিছনের দিঘির জলে—গলায় পাথর বেঁধে। আমার মুখ বন্ধ করেছেন ছোটবাবু—প্রাণের ভয় দেখিয়ে।'

'বুঝেছি। —আর রাজেনবাবু বলে তো কোনও লোকই নেই, তাই না?'

'ছিলেন, তবে তিনি মারা গেছেন আজ দুবছর হয়ে গেল।'

আমি আর ফেলুদা এবার ছুটলাম নীচে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁয়ে ঘুরলেই পিছনের বাগানে যাবার দরজা। বাইরে বেরোনো মাত্র মিস্টার সরকারের চিৎকার শুনলাম—

'পালাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার মজুমদার—আমার হাতে অস্ত্র রয়েছে!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল একটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ আর একটা পিস্তলের আওয়াজ।

আমরা দুজনে দৌড়ে গাছ-গাছড়া ঝোপ-ঝাড় ভেঙে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের নীচে মি. সরকার হাতে রিভলভার নিয়ে আমাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছেন। তেঁতুল গাছের পরেই কালকের দেখা পুকুরটা—তার জলের বেশির ভাগই সবুজ পানায় ঢাকা।

'লোকটা আগেই লাফ দিয়েছে।' বললেন মি. সরকার। 'সাঁতার জানে না।—গিরিশ, দেখো তো দেখি টেনে তুলতে পার কি না।'

কনস্টেবল বিশ্বনাথবাবুকে শেষ পর্যন্ত টেনে তুলেছিল। এখন ছোটবাবুর দশা ওই টিয়াপাখির মতো; খাঁচায় বন্দি। সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি গয়নাগাটি যা নিয়েছিলেন সবই উদ্ধার পেয়েছে। লোকটা ব্যবসা করত ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে জুয়া ইত্যাদি অনেক বদ-অভ্যাস ছিল, যার ফলে ইদানীং ধার-দেনায় তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

ফেলুদা বলল, 'কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করার প্রায় কুড়ি মিনিট পর রাজেনবাবু হাজির হন, আর রাজেনবাবু চলে যাবার প্রায় আধ ঘণ্টা পর বিশ্বনাথবাবুর সাক্ষাৎ পাই। তিনজনকে একসঙ্গে একবারও দেখা যায়নি। এটা ভাবতে ভাবতেই প্রথমে সন্দেহটা জাগে—তিনটে লোকই আছে তো? নাকি একজনেই পালা করে তিনজনের ভূমিকা পালন করছে? তখন অ্যাকটিং-এর বইগুলোর কথা মনে হল। তা হলে কি বিশ্বনাথবাবুর এককালে শখ ছিল থিয়েটারের? তিনি যদি ছদ্মবেশে ওস্তাদ হয়ে থাকেন, অভিনয় জেনে থাকেন তা

হলে এইভাবে এই অন্ধকার বাড়িতে আমাদের বোকা বানানো তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। হাতটা তাঁকে কম্বলের নীচে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল কারণ নিজের হাতকে মেক-আপ করে কী করে ঊনআশি বছরের বুড়ো হাত করতে হয় সে বিদ্যে তাঁর জানা ছিল না। সন্দেহ একেবারে পাকা হল যখন সকালে দেখলাম কাদার উপরে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ির টায়ারের ছাপ পড়েনি।'

আমি কথার ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমাকে এখানে আসতে লিখেছিল কে?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা কালীকিঙ্করবাবুই লিখেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশ্বনাথবাবু সেটা জেনেছিলেন। তিনি আসতে বাধা দেননি কারণ আমার বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর সংকেতটি জানার প্রয়োজন হয়েছিল।'

শেষ পর্যন্ত আমাদের দশটার ট্রেনই ধরতে হল।

রওনা হবার আগে ফেলুদা তার সুটকেস আর ঝোলা থেকে আটখানা বই বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'খুনির হাত থেকে উপহার নেবার বাসনা নেই আমার। তোপ্‌সে, বুকশেলফের ফাঁকগুলো ভরিয়ে দিয়ে আয় তো।'

আমি যখন বই রেখে কালীকিঙ্করবাবুর ঘর থেকে বেরোচ্ছি, তখনও টিয়া বলছে, 'ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন—'একটু জিরো।'

গোলোকধাম রহস্য

Pradosh C. Mitter

Private Investigator

গোলোকধাম রহস্য

'জয়দ্রথ কে ছিল ?'

'দুর্যোধনের বোন দুঃশলার স্বামী।'

'আর জরাসন্ধ ?'

'মগধের রাজা।'

'ধৃষ্টদ্যুম্ন ?'

'দ্রৌপদীর দাদা।'

'অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরের শাঁখের নাম কী ?'

'অর্জুনের দেবদত্ত, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়।'

'কোন্ অস্ত্র ছুড়লে শত্রুরা মাথা গুলিয়ে সেমসাইড করে বসে ?'

'ত্বাষ্ট্র।'

'ভেরি গুড।'

যাক বাবা, পাশ করে গেছি! ইদানীং রামায়ণ-মহাভারত হল ফেলুদার যাকে বলে স্টেপ্‌ল রীডিং। সেই সঙ্গে অবিশ্যি আমিও পড়ছি। আর তাতে কোনো আপসোস নেই। এ তো ওষুধ গেলা না, এ হল একধার থেকে নন্‌স্টপ ভূরিভোজ। গল্পের পর গল্পের পর গল্প। ফেলুদা বলে ইংরিজিতে বইয়ের বাজারে আজকাল একটা বিশেষণ চালু হয়েছে—অনপুটডাউনেব্‌ল। যে বই একবার পড়ব বলে পিকআপ করলে আর পুট ডাউন করবার জো নেই। রামায়ণ-মহাভারত হল সেইরকম অনপুটডাউনেব্‌ল। ফেলুদার হাতে এখন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের দ্বিতীয় খণ্ড। আমারটা অবিশ্যি কিশোর সংস্করণ। লালমোহনবাবু বলেন ওঁর নাকি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকখানি মুখস্থ; ওঁর ঠাকুমা পড়তেন, সেই শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ নেই; ভাবছি একটা জোগাড় করে রুটাস্থুর

স্মরণশক্তিটা পরীক্ষা করে দেখব। ভদ্রলোক আপাতত ঘরবন্দী অবস্থায় পুজোর উপন্যাস লিখছেন, তাই দেখা-সাক্ষাৎটা একটু কম।

বই থেকে মুখ তুলে রাস্তার দরজাটার দিকে চাইতে হল ফেলুদাকে। কলিং বেল বেজে উঠেছে। হিজলীতে একটা খুনের রহস্য সমাধান করে গত শুক্রবার ফিরেছে ফেলুদা। এখন আয়েশের মেজাজ, তাই বোধহয় বেলের শব্দে তেমন আগ্রহ দেখাল না। ও যা পারিশ্রমিক নেয় তাতে মাসে একটা করে কেস পেলেই ওর দিব্যি চলে যায়। জটায়ুর ভাষায় ফেলুদার জীবনযাত্রা 'সেন্ট পার্সেন্ট অনাড়ম্বর'। এখানে বলে রাখি, জটায়ুর জিভের সামান্য জড়তার জন্য 'অনাড়ম্বর'টা মাঝে মাঝে 'অনাম্বড়' হয়ে যায়। সেটা শোধরাবার জন্য ফেলুদা ওঁকে একটা সেন্টেন্স গড়গড় করে বলা অভ্যেস করতে বলেছিল; সেটা হল—'বারো হাঁড়ি রাবড়ি বড় বাড়াবাড়ি।' ভদ্রলোক একবার বলতে গিয়েই চারবার হোঁচট খেয়ে গেলেন।

ফেলুদা বলে, 'নতুন চরিত্র যখন আসবে, তখন গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে দিবি। তুই না দিলে পাঠক নিজেই একটা চেহারা কল্পনা করে নেবে; তারপর হয়তো দেখবে যে তোর বর্ণনার সঙ্গে তার কল্পনার অনেক তফাত।' তাই বলছি, ঘরে যিনি ঢুকলেন তাঁর রং ফর্সা, হাইট আন্দাজ পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি, বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ, কানের দু'পাশের চুল পাকা, থুতনির মাঝখানে একটা আঁচিল, পরনে ছাই রঙের সাফারি স্যুট। ঘরে ঢুকে যেভাবে গলা খাঁকরালেন তাতে একটা ইতস্তত ভাব ফুটে ওঠে, আর খাঁকরানির সময় ডান হাতটা মুখের কাছে উঠে আসাতে মনে হল ভদ্রলোক একটু সাহেবীভাবাপন্ন।

'সরি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসতে পারিনি,' সোফার এক পাশে বসে বললেন আগন্তুক—'আমাদের ওদিকে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িতে লাইনগুলো সব ডেড।'

ফেলুদা মাথা নাড়ল। খোঁড়াখুঁড়িতে শহরটা কী অবস্থা সেটা আমাদের সকলেরই জানা আছে।

'আমার নাম সুবীর দত্ত।'—গলার স্বরে মনে হয় দিব্যি টেলিভিশনে খবর পড়তে পারেন।—'ইয়ে, আপনিই তো প্রাইভেট ইনভেস্—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি এসেছি আমার দাদার ব্যাপারে।'

ফেলুদা চুপ। মহাভারত বন্ধ অবস্থায় তার কোলের উপরে, তবে একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল গোঁজা রয়েছে।

'অবিশ্যি তার আগে আমার পরিচয়টা একটু দেওয়া দরকার। আমি করবেট অ্যান্ড নরিস কোম্পানিতে সেল্স এগজিকিউটিভ। আমার স্টাফের দীনেশ চৌধুরীকে বোধহয় আপনি চেনেন; উনি আমার কলেজের সহপাঠী ছিলেন।'

দীনেশ চৌধুরী ফেলুদার একজন মক্কেল সেটা জানতাম।

'আই সী'—ভীষণ সাহেবী কায়দায় গম্ভীর গলায় বলল ফেলুদা। ভদ্রলোক এবার তাঁর দাদার কথায় চলে গেলেন—

'দাদা এককালে বায়োকেমিস্ট্রিতে খুব নাম করেছিলেন। নীহার দত্ত। ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিলেন। এখানে নয়, আমেরিকায়। মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে। ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে একটা এক্সপ্লোশন হয়। দাদার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়; কিন্তু শেষে ওখানকারই হাসপাতালের এক ডাক্তার ওঁকে বাঁচিয়ে তোলে। তবে চোখ দুটোকে বাঁচানো যায়নি।'

'অন্ধ হয়ে যান?'

'অন্ধ। সেই অবস্থায় দাদা দেশে ফিরে আসেন। ওখানে থাকতেই একজন আমেরিকান মেয়েকে বিয়ে করেন; অ্যাক্সিডেন্টের পর মহিলা দাদাকে ছেড়ে চলে যান। তারপর আর দাদা বিয়ে করেননি।'

'তাঁর গবেষণাও তো তাহলে শেষ হয়নি?'

'না। সেই দুঃখেই হয়তো দাদা প্রায় মাস ছয়েক কারোর সঙ্গে কথা বলেননি। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শেষে ক্রমে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।'

'এখন কী অবস্থা?'

'বিজ্ঞানে এখনো উৎসাহ আছে সেটা বোঝা যায়। একটি ছেলেকে রেখেছেন—ওঁর হেল্পার বা সেক্রেটারি বলতে পারেন—সেও বায়োকেমিস্ট্রির ছাত্র ছিল—তার একটা কাজ হচ্ছে সায়েন্স ম্যাগাজিন থেকে প্রবন্ধ পড়ে শোনানো। এমনিতে যে দাদা একেবারে হেল্পলেস তা নন; বিকেলে আমাদের বাড়ির ছাতে একাই লাঠি হাতে পায়চারি করেন। এমন-কি বাড়ির বাইরেও রাস্তার মোড় পর্যন্ত একাই মাঝে মাঝে হেঁটে আসেন। বাড়িতে এঘর ওঘর করার সময় ওঁর কোনো সাহায্যের দরকার হয় না।'

'ইনকাম আছে কিছু?'

'বায়োকেমিস্ট্রির উপর দাদার একটা বই বেরিয়েছিল আমেরিকা থেকে, তার থেকে একটা রোজগার আছে।'

'ঘটনাটা কী?'

'আজ্ঞে?'

'মানে, আপনার এখানে আসার কারণটা...'

'বলছি।'

পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে, বললেন সুধীর দত্ত—

'দাদার ঘরে কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল।'

'সেটা কী করে বুঝলেন?'

ফেলুদা এতক্ষণে হাত থেকে মহাভারত নামিয়ে সামনের টেবিলের ওপর রেখে প্রশ্নটা করল।

'দাদা নিজে বোঝেননি। ওঁর চাকরটাও যে খুব বুদ্ধিমান তা নয়। ন'টার সময় ওঁর সেক্রেটারি এসে ঘরের চেহারা দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। ডেস্কের দুটো দেরাজই আধখোলা, কাগজপত্র কিছু মেঝেতে ছড়ানো, ডেস্কের উপরের জিনিসপত্র ওলটপালট, এমন-কি গোদরেজের আলমারির চাবির চারপাশে ঘষটানোর দাগ; বোঝাই যায় কেউ আলমারিটা খোলার চেষ্টা করেছে।'

'আপনাদের পাড়ায় চুরি হয়েছে ইদানীং?'

'হয়েছে। আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে। পাড়ায় এখন দুটো পুলিশের লোক টহল দেয়। পাড়া বলতে বালিগঞ্জ পার্ক। আমাদের বাড়িটা প্রায় আশি বছরের পুরানো। ঠাকুরদার তৈরি। খুলনায় জমিদারী ছিল আমাদের। ঠাকুরদা চলে আসেন কলকাতায় এইটিন নাইনটিতে। রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ব্যবসা শুরু করেন। কলেজ স্ট্রীটে বড় দোকান ছিল আমাদের। বাবাও চালিয়েছিলেন কিছুদিন ব্যবসা। বছর ত্রিশেক আগে উঠে যায়।'

'আপনার বাড়িতে এখন লোক ক'জন?'

'আগের তুলনায় অনেক কম। বাবা-মা দু'জনেই মারা গেছেন। আমার স্ত্রীও, সেভেনটি ফাইভে। আমার দুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, বড় ছেলে জার্মানিতে। এখন মেম্বার বলতে আমি, দাদা, আর আমার ছোট ছেলে। দুটি চাকর আর একটি রান্নার লোক আছে। আমরা দোতলায় থাকি। একতলাটা দু'ভাগ করে ভাড়া দিয়েছি।'

'কারা থাকে সেখানে?'

'সামনের ফ্ল্যাটটাতে থাকেন মিঃ দস্তুর। ইলেকট্রিক্যাল গুড্‌সের ব্যবসা। পিছনে থাকেন মিঃ সুখওয়ানি, অ্যান্টিকের দোকান আছে লিন্ডসে স্ট্রীটে।'

'এদের ঘরে চোর ঢোকেনি? শুনে তো বেশ অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়।'

'পয়সা তো আছেই। ফ্ল্যাটগুলোর ভাড়া আড়াই হাজার করে। সুখওয়ানির ঘরে দামী জিনিস আছে বলে ও দরজা বন্ধ করে শোয়। দস্তুর বলে বন্ধ ঘরে ওর সাফোকেশন হয়।'

'চোর আপনার দাদার ঘরে ঢুকেছিল কী নিতে অনুমান করতে পারেন।'

'দেখুন, দাদার অসমাপ্ত গবেষণার কাগজপত্র দাদার আলমারিতেই থাকে, আর সেগুলো যে অত্যন্ত মূল্যবান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবিশ্যি সাধারণ চোর

আর তার মূল্য কী বুঝবে। আমার ধারণা চোর টাকা নিতেই ঢুকেছিল। অন্ধ লোকের ঘরে চুরির একটা সুবিধে আছে সেটা তো বুঝতেই পারেন।'

'বুঝেছি', বলল ফেলুদা, 'অন্ধ মানে বোধহয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, কারণ চেক সই করা তো...'

'ঠিক বলেছেন। বই বাবদ দাদা যা টাকা পান সব আমার নামে আসে। আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। তারপর আমি চেক কেটে টাকা তুলে দাদাকে দিয়ে দিই। সেই ব্যাঙ্কের টাকা সব ওই গোদরেজের আলমারিতেই থাকে। আমার আন্দাজ হাজার ত্রিশেক টাকা ওই আলমারিতে রয়েছে।'

'চাবি কোথায় থাকে?'

'যতদূর জানি, দাদার বালিশের নীচে। বুঝতেই পারছেন, দাদা অন্ধ বলেই দুশ্চিন্তা। রাত্তিরে দরজা খুলে শোন, চৌকাঠের বাইরে শোয় চাকর কৌমুদী—যাতে মাঝরাত্তিরে প্রয়োজনে ডাক দিলে আসতে পারে। ধরুন যদি তেমন বেপরোয়া চোর হয়, আর চাকরের ঘুম না ভাঙে, তাহলে তো দাদার আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকে না। অথচ পুলিশে উনি খবর দেবেন না। বলেন ওরা কেবল জানে জেরা করতে, কাজের বেলায় ঢু঱, সব ব্যাটা ঘুষখোর ইত্যাদি। তাই আপনার কথা বলতে উনি রাজি হলেন। আপনি যদি একবারটি আমাদের বাড়িতে আসেন, তাহলে অন্তত প্রিভেনশনের ব্যাপারে কী করা যায় সেটা একটু ভেবে দেখতে পারেন। এমন-কি বাইরের চোর না ভেতরের চোর সেটাও একবার—'

'ভেতরের চোর?'

আমি আর ফেলুদা দু'জনেই উৎকর্ণ মানে কান খাড়া।

ভদ্রলোক চুরুটের ছাই অ্যাশট্রেতে ফেলে গলাটা যতটা পারা যায় খাদে নামিয়ে এনে বললেন, 'দেখুন মশাই, আমি স্পষ্টবক্তা। আপনার কাছে যখন এসেছি, তখন জানি ঢেকেঢুকে কথা বললে আপনার কোনো সুবিধে হবে না। প্রথমত আমাদের দু'জন ভাড়াটের একটিকেও আমার খুব পছন্দ না। সুখওয়ানি এসেছে বছর তিনেক হল। আমি নিজে জানি না, কিন্তু যারা পুরোনো আর্টের জিনিস-টিনিস কেনে, তেমন লোকের কাছে শুনেছি সুখওয়ানি লোকটা সিধে নয়। পুলিশের নজর আছে ওর ওপর।'

'আর অন্য ভাড়াটে?'

'দস্তুর এসেছে মাস চারেক হল। ও ঘরটায় আমার বড় ছেলে থাকত, সে পার্মানেন্টলি দেশের বাইরে। ডুসেলডর্ফে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি করে, জার্মান মেয়ে বিয়ে করেছে। দস্তুর লোকটা সম্বন্ধে বদনাম শুনিনি, তবে সে এত অতিরিক্ত রকম চাপা যে সেটাই সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর, ইয়ে—'

ভদ্রলোক থামলেন। তারপর বাকি কথাটা বললেন মুখ নামিয়ে, দৃষ্টি ফুলদানির দিকে রেখে।

'শঙ্কর, আমার ছোট ছেলে, একেবারে সংস্কারের বাইরে চলে গেছে।'

ভদ্রলোক আবার চুপ। ফেলুদা বলল, 'কত বড় ছেলে?'

'তেইশ বছর বয়স। গত মাসে জন্মতিথি গেল, যদিও তার মুখ দেখিনি সেদিন।'

'কী করে?'

'নেশা, জুয়া, ছিনতাই, গুণ্ডাগিরি কোনোটাই বাদ নেই। পুলিশের খপ্পরে পড়েছে তিনবার। আমাকেই গিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে। আমাদের পরিবারের একটা খ্যাতি আছে সেটা তো বুঝতেই পারছেন, তাই নাম করলে এখনো কিছুটা ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সে নাম আর কদ্দিন টিকবে জানি না।'

'চোর যেদিন আসে সেদিন ও বাড়িতে ছিল?'

'রাত্তিরে খেতে এসেছিল—সেটাও রোজ আসে না—তারপর আর দেখিনি।'

ঠিক হল আজই বিকেলে আমরা একবার যাব বালিগঞ্জ পার্কে। কেসটাকে এখনো ঠিক কেস বলা যায় না, কিন্তু আমি জানি বিস্ফোরণে অন্ধ হয়ে যাওয়া বৈজ্ঞানিকের ব্যাপারটা ফেলুদার মন টেনেছে। তার মাথায় নিশ্চয়ই ঘুরছে ধৃতরাষ্ট্র।

খবরের কাগজের কাটিং-এর বাইশ নম্বর খাতা থেকে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে বিস্ফোরণে উদীয়মান বাঙালী জীবরাসায়নিক নীহাররঞ্জন দত্ত-র চোখ নষ্ট হয়ে যাওয়ার খবরটা খুঁজে বার করে দিতে সিধু জ্যাঠার লাগল সাড়ে তিন মিনিট। তার মধ্যে অবিশ্যি দু'মিনিট গেল ফেলুদা অ্যাদ্দিন ডুব মেরে থাকার জন্য তাকে ধমকানিতে। সিধু জ্যাঠা আমাদের সত্যি জ্যাঠা না হলেও আত্মীয়ের বাড়া। কোনো অতীতের ঘটনার বিষয় জানতে হলে ফেলুদা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে না গিয়ে সিধু জ্যাঠার কাছে যায়। তাতে কাজ হয় অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আর অনেক বেশি ফুর্তিতে।

ফেলুদা প্রসঙ্গটা তুলতেই সিধু জ্যাঠা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'নীহার দত্ত? যে ভাইরাস নিয়ে রিসার্চ করছিল? এক্সপ্লোশনে চোখ হারায়?'

বাপরে বাপ!—কী স্মৃতিশক্তি! বাবা বলেন শ্রুতিধর। ফেলুদা বলে ফোটোগ্রাফিক মেমরি; একবার কোনো ইন্টারেস্টিং খবর পড়লে বা শুনলে তৎক্ষণাৎ মগজে চিরকালের মতো ছাপা হয়ে যায়। '—কিন্তু সে তো একা ছিল না।'

এ খবরটা নতুন।

'একা ছিল না মানে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'তার মানে, যদ্দুর মনে পড়ছে—' সিধু জ্যাঠা ইতিমধ্যে তাঁর বুকশেলফের সামনে গিয়ে খবরের কাটিং-এর খাতা টেনে বার করেছেন—'এই গবেষণায় তাঁর একজন পার্টনার ছিল—হ্যাঁ এই যে।'

বাইশ নম্বর খাতার একটা পাতা খুলে সিধু জ্যাঠা খবরটা পড়লেন। ১৯৬২-র খবর। তাতে জানা গেল যে নীহার দত্তর গবেষণার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কাজ করছিলেন আরেকটি বাঙালি বায়োকেমিস্ট, নাম সুপ্রকাশ চৌধুরী। অ্যাক্সিডেন্টে চৌধুরীর কোনো ক্ষতি হয়নি, কারণ সে ছিল ঘরের অন্য দিকে। এই চৌধুরীর জন্যই নাকি নীহার দত্ত নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, কারণ আগুন নেবানো ও তৎক্ষণাৎ নীহার দত্তকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থাটা চৌধুরীই করেন।

'এই চৌধুরী এখন— ?'

'তা জানি না,' বললেন সিধু জ্যাঠা। 'সে খবর আমার কাছে পাবে না। এদের জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলে যদি সেটা খবরের কাগজে স্থান পায় তবেই সেটা আমার নজরে আসে। আমি যেচে কারুর খবর নিই না। কী দরকার? আমার খবর ক'জন নেয় যে ওদের খবর আমি নেব? তবে এটা ঠিক যে, এই চৌধুরী যদি বিজ্ঞানের জগতে সাড়া জাগানো একটা কিছু করত, তাহলে সে খবর আমি নিশ্চয়ই পেতাম।'

॥ ২ ॥

সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের বাড়িতে যে বয়সের ছাপ পড়েছে সেটা আর বলে দিতে হয় না। এটাও ঠিক যে বাড়ির মালিকের যদি সে ছাপ ঢাকবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে ঢাকা পড়ত নিশ্চয়ই। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দত্ত পরিবারের অবস্থা এখন খুব একটা ভালো নয়। বাগানটা বোধহয় বাড়ির পিছন দিকে। সামনে একটা গোল ঘাসের চাকতির উপর একটা অকেজো ফোয়ারা, সেই গোলের দু'পাশ দিয়ে নুড়িবেছানো রাস্তা চলে গেছে গাড়িবারান্দার দিকে। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে 'গোলোকধাম' দেখে ফেলুদা কৌতূহল প্রকাশ করাতে সুবীরবাবু বললেন যে ওঁর ঠাকুরদাদার নাম ছিল গোলোকবিহারী দত্ত। বাড়িটা তিনিই তৈরি করেছিলেন।

গোলোকধাম যে এককালে দারুণ বাড়ি ছিল সেটা এখনো দেখলে বোঝা যায়। গাড়িবারান্দা থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে শ্বেতপাথরের বাঁধানো

ল্যান্ডিং-এর বাঁ দিক দিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সামনে একটা দরজা দিয়ে ভিতরে করিডর দেখা যাচ্ছে, তার ডান দিকে নাকি পর পর দুটো ফ্ল্যাট। বাঁ দিকে একটা প্রকাণ্ড হলঘর, যেটা দত্তরা ভাড়া দেননি। এই ঘরে নাকি এককালে অনেক খানাপিনা গানবাজনা হয়েছে।

হলঘরের ঠিক ওপরেই হল দোতলার বৈঠকখানা। আমরা সেখানেই গিয়ে বসলাম। মাথার ওপর কাপড়ে মোড়া চিরকালের মতো অকেজো ঝাড়লণ্ঠন, তার যে কত ডালপালা তার ঠিক নেই। একদিকে দেয়ালে গিল্‌ট-করা ফ্রেমে বিশাল আয়না, সুধীরবাবু বললেন সেটা বেলজিয়াম থেকে আনানো। মেঝেতে পুরু গালিচার এখানে ওখানে খুবলে গিয়ে দাবার ছকের মতো সাদা-কালো শ্বেতপাথরের মেঝেটা বেরিয়ে পড়েছে।

সুধীরবাবু সুইচ টিপে একটা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিতে ঘরের অন্ধকার খানিকটা দূর হল। আমরা সোফায় বসতে যাব, এমন সময় বাইরের করিডর থেকে একটা শব্দ পাওয়া গেল—খট্ খট্ খট্ খট্।

লাঠি আর চটি মেশানো শব্দ।

শব্দটা চৌকাঠের বাইরে এসে মুহূর্তের জন্য থামল, আর তার পরেই লাঠির মালিকের প্রবেশ। সেই সঙ্গে আমরা তিনজনেই দণ্ডায়মান।

'অচেনা গলার আওয়াজ পেলাম—এঁরা এলেন বুঝি?'

গম্ভীর গলা, ছ'ফুট লম্বা চেহারার সঙ্গে সম্পূর্ণ মানানসই। এনার চুল সব পাকা, কিছুটা এলোমেলো, চোখে কালো চশমা, পরনে আদ্দির পাঞ্জাবি আর সিল্কের পায়জামা। বিস্ফোরণ যে শুধু চোখই নষ্ট করেনি, মুখের অন্যান্য অংশেও যে তার ছাপ রেখে গেছে, সেটা ল্যাম্পের চাপা আলোতেও বোঝা যাচ্ছে।

সুধীরবাবু দাদাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেলেন। —'বোস, দাদা।'

'বসছি। আগে এঁদের বসাও।'

'নমস্কার,' ফেলুদা বলল, 'আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আমার বাঁ পাশে আমার কাজিন তপেশ।'

আমিও খাটো গলায় একটা নমস্কার বলে দিলাম। শুধু হাত জোড় করাটা তো অন্ধ লোকের কাছে মাঠে মারা যাবে।

'আমারই মতো হাইট বলে মনে হচ্ছে মিত্তির মশাইয়ের, আর কাজিন বোধ করি পাঁচ সাত কি সাড়ে সাত।'

'আমি পাঁচ সাত,' বলে ফেললেন তপেশরঞ্জন মিত্র।

মনে মনে ভদ্রলোকের আন্দাজের তারিফ না করে পারলাম না।

'বসুন এবং বোস' বলে ভাইয়ের সাহায্য না নিয়েই আমাদের সামনের সোফায়

বসে পড়লেন নীহার দত্ত। —'চায়ের কথা বলেছ?'

'বলেছি,' বললেন সুধীর দত্ত।

ফেলুদা অভ্যাসমতো ভনিতা না করে সোজা কাজের কথায় চলে গেল।

'আপনি যে রিসার্চ করছিলেন, সে ব্যাপারে বোধ হয় আপনার একজন

পার্টনার ছিল, তাই না ?'

সুধীরবাবুর উসখুসে ভাব দেখে বুঝলাম যে এ ব্যাপারটা তিনিও জানতেন, এবং আমাদের না বলার জন্য অপ্রস্তুত বোধ করেছেন।

'পার্টনার নয়,' বললেন নীহার দত্ত—'অ্যাসিসট্যান্ট। সুপ্রকাশ চৌধুরী। সে আমেরিকাতেই পড়াশুনা করেছিল। পার্টনার বললে বেশি বলা হবে। আমাকে ছাড়া তার এগোনোর পথ ছিল না।'

'তিনি এখন কোথায় বা কী করছেন সে খবর জানেন ?'

'না।'

'অ্যাক্সিডেন্টের পর তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি ?'

'না। এটুকু বলতে পারি যে তার একাগ্রতার অভাব ছিল। বায়োকেমিস্ট্রি ছাড়াও অন্য পাঁচ রকম ব্যাপারে তার ইন্টারেস্ট ছিল।'

'বিস্ফোরণটা কি অসাবধানতার জন্য হয় ?'

'আমি নিজে সজ্ঞানে কখনো অসাবধান হইনি।'

চা এল। ঘরটা কেমন যেন থমথম করছে। সুধীরবাবুর দিকে আড়চোখে দেখলাম। তাঁরও যেন তটস্থ ভাব। ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো চশমাটার দিকে।

চায়ের সঙ্গে সিঙাড়া আর রাজভোগ। আমি প্লেটটা হাতে তুলে নিলাম। ফেলুদার যেন খাওয়ার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই। ও একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বলল—

'আপনি যে ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করছিলেন, সেটা তাহলে অসমাপ্তই রয়ে গেছে !'

'সে দিকে কেউ অগ্রসর হলে খবর পেতাম নিশ্চয়ই।'

'সুপ্রকাশবাবু সে নিয়ে আর কোনো কাজ করেননি সেটা আপনি জানেন ?'

'এটুকু জানি যে আমার নোটস ছাড়া তার কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। গবেষণার শেষ পর্বের নোটস আমার কাছে ছিল আমার ব্যক্তিগত লকারে। তার নাগাল পাওয়া বাইরের কারোর সাধ্যি ছিল না। সেসব কাগজপত্র আমার সঙ্গেই দেশে ফিরে আসে, আমার কাছেই আছে। এটা জানি যে গবেষণা সফল হলে নোবেল প্রাইজ এসে যেত আমার হাতের মুঠোয়। ক্যানসারের চিকিৎসার একটা রাস্তা খুলে যেত।'

ফেলুদা চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়েছে। আমিও ইতিমধ্যে চুমুক দিয়ে বুঝেছি এ চা ফেলুদার মতো খুঁতখুঁতে লোককেও খুশি করবে। কিন্তু চুমুক দিয়ে তার মুখের অবস্থা কী হয় সেটা আর দেখা হল না।

ঘরের বাতি নিভে গেছে। লোড শেডিং।

'ক'দিন থেকে ঠিক এই সময়টাতেই যাচ্ছে,' সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন সুধীরবাবু। —'কৌমুদী!'

বাইরে এখনো অল্প আলো রয়েছে; সেই আলোতেই সুধীরবাবু চাকরের খোঁজে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'বাতি গেল বুঝি?' প্রশ্ন করলেন নীহার দত্ত। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এতে আমার কিছু এসে যায় না।'

গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটা ঠিক এই সময় আমাদের চমকে দিয়ে বেজে উঠল—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং। ছ'টা।

সুধীরবাবু ফিরলেন, পিছনে মোমবাতি হাতে চাকর কৌমুদী।

মাঝের টেবিলে মোমবাতি রাখায় সকলের মুখ আবার দেখা যাচ্ছে। নীহারবাবুর কালো চশমার দুই কাচে দুটি কম্পমান হলদে বিন্দু। মোমবাতির শিখার ছায়া।

ফেলুদা চায়ে আরেকটা চুমুক দিয়ে আবার চশমার দিকে চেয়ে বলল, 'আপনার গবেষণার নোট্স যদি অন্য কোনো বায়োকেমিস্টের হাতে পড়ে তাহলে তাঁর পক্ষে সেটা লাভজনক হবে কি?'

'নোবেল প্রাইজটা যদি লাভ বলে মনে করেন তাহলে হতে পারে বৈকি।'

'আপনার কি মনে হয় এই কাগজপত্র চুরি করার জন্য চোর আপনার ঘরে ঢুকেছিল?'

'সেরকম মনে করার কোনো কারণ নেই।'

'আরেকটা প্রশ্ন। আপনার এই নোট্সের কথা আর কে জানে?'

'বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই এটার অস্তিত্ব অনুমান করতে পারে। আর জানে আমার বাড়ির লোকেরা আর আমার সেক্রেটারি রণজিৎ।'

'বাড়ির লোক বলতে কি একতলার দুই ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কথাও বলছেন?'

'তারা কী জানে না-জানে তা আমি জানি না। এরা ব্যবসাদার লোক। জানলেও কোনো ইন্টারেস্ট হবার কথা না। অবিশ্যি আজকাল তো সব জিনিস নিয়েই ব্যবসা চলে; এ ধরনের কাগজপত্র নিয়েই বা চলবে না কেন। বিজ্ঞানী হলেই তো আর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয় না।'

নীহারবাবু উঠে পড়লেন; সেই সঙ্গে আমরাও।

'আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি?' ফেলুদা প্রশ্ন করল। ভদ্রলোক চৌকাঠের মুখে থেমে গিয়ে বললেন, 'দেখবেন বৈকি। সুধীর দেখিয়ে দেবে। আমি ছাতে সান্ধ্যভ্রমণটা সেরে আসি।'

করিডরে বেরিয়ে এলাম চারজনে। অন্ধকার আরো ঘনিয়ে এসেছে।

করিডরের ডাইনে বাঁয়ে ঘরগুলোর ভিতর থেকে মোমবাতির ক্ষীণ আলো বাইরে এসে পড়েছে। নীহারবাবু লাঠি ঠক্ ঠক্ করে ছাতের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। শুনলাম তিনি বলছেন, 'স্টেপ গোনা আছে। সতেরো স্টেপ গিয়ে বাঁয়ে ঘুরে সিঁড়ি। সেভেন প্লাস এইট—পনেরো ধাপ উঠে ছাত। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন...'

॥ ৩ ॥

নীহারবাবুর বেশ বড় ঘরের একপাশে অনেকখানি জুড়ে পুরানো আমলের খাট। খাটের পাশে একটা ছোট গোল টেবিল। তাতে ঢাকনি-চাপা গেলাসে জল, আর তার পাশে রাঙতায় মোড়া গোটা দশেক বড়ি। বোধহয় ঘুমের ওষুধ।

এই টেবিলের পাশে জানালার সামনে একটা আরাম কেদারা। তার পিঠে অনেক দিনের ব্যবহারের ফলে বেতের বুনুনিতে কালসিটে পড়ে গেছে। মনে হল এই আরাম কেদারাতেই বেশির ভাগ সময় কাটান নীহারবাবু।

এছাড়া আছে একটা কাজের টেবিল—যার উপর এখন একটা মোমবাতি টিমটিম করছে—একটা স্টীলের চেয়ার, টেবিলের উপর লেখার সরঞ্জাম, চিঠির র‍্যাক, একটা পুরানো টাইপরাইটার আর এক তাড়া বৈজ্ঞানিক পত্রিকা।

এই টেবিলের পাশেই, দরজার ঠিক বাঁয়ে, রয়েছে গোদরেজের আলমারিটা।

ঘরে ঢুকেই একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেলুদা তার মিনি টর্চ দিয়ে আলমারির চাবির গর্তটা ভালো করে দেখে বলল, 'খোলার চেষ্টার অভাব হয়নি। গর্তের চারপাশে দাগ।' তারপর এগিয়ে গিয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে বড়ির পাতাটা তুলে নিয়ে বলল, 'সোনেরিল। ...বুঝেছিলাম নীহারবাবু বেশ কড়া ওষুধ খান। না হলে ঘুম ভেঙে যাবার কথা।'

তারপর চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ানো চাকর কৌমুদীর দিকে ফিরে বলল, 'তোমার ঘুম ভাঙল না? তুমি কীরকম পাহারা দাও বাবুকে?'

কৌমুদীর মাথা হেঁট হয়ে গেল। সুধীরবাবু বললেন, 'ও বেজায় ঘুমকাতুরে। এমনিতেই তিনবার না ডাকলে ওঠে না।'

বাইরে থেকে পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম আগেই; এবার একটি বছর ত্রিশেকের ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকলেন। রোগা, চোখে চশমা, চুল কোঁকড়া। সুধীরবাবু আলাপ করিয়ে দিতে বুঝলাম ইনিই নীহারবাবুর সেক্রেটারি, নাম রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'কে জিতল?'

ফেলুদার অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন, করা হয়েছে সেক্রেটারি মশাইকে। রণজিৎবাবুর

ফ্যালফ্যালে ভাব দেখে ফেলুদা হেসে বলল, 'আপনার পাতলা টেরিলিনের শার্টের পকেটে স্পষ্ট দেখছি খেলার টিকিটের কাউন্টারফয়েল। তার উপর রোদে মুখ ঝলসানো—লীগের বড় খেলা দেখে এলেন সেটা অনুমান করাটা কি খুব কঠিন?'

'ইস্টবেঙ্গল,' হেসে বললেন রণজিৎবাবু। সুধীরবাবুর মুখেও তারিফ আর বিস্ময় মেশানো হাসি।

'আপনি এখানে কদ্দিন কাজ করছেন?'

'চার বছর।'

'নীহারবাবু তাঁর বিস্ফোরণের ঘটনার বিষয় কখনো কিছু বলেছেন?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম,' বললেন রণজিৎবাবু, 'কিন্তু উনি খুলে কিছু বলতে চাননি। তবে চোখ গিয়ে যে সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে সেটা উনি মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন।'

'আর কিছু বলেন?'

রণজিৎবাবু একটু ভেবে বললেন, 'একটা কথা বলতে শুনেছি যে, উনি যে এখনো বেঁচে আছেন তার কারণ হল যে ওঁর একটা কাজ এখনো অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সেটা কী কাজ আমি জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। মনে হয় উনি এখনো আশা রাখেন যে ওঁর গবেষণাটা শেষ করবেন।'

'নিজে তো আর পারবেন না। অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন এটাই হয়তো ভেবেছেন। তাই নয় কি?'

'তাই বোধহয়।'

'আপনার এখানে ডিউটি কতক্ষণ?'

'ন'টায় আসি, ছ'টায় যাই। আজ খেলা দেখার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটি চেয়েছিলাম, উনি আপত্তি করেননি। তবে বাইরে গেলেও সন্ধেবেলা একবার এখানে হয়ে যাই। যদি ওঁর কোনো...'

'গোদরেজের চাবি কোথায় থাকে?' ফেলুদা হঠাৎ প্রশ্ন করল।—'টাকা আর গবেষণার নোট্স কী অবস্থায় থাকে সেটা একবার দেখে নিতে চাই।'

'ওই বালিশের নীচে।'

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে পাঁচটা চাবি সমেত একটা রিং বার করে আনল। তারপর তা থেকে প্রয়োজনীয় চাবিটা বেছে নিয়ে আলমারি খুলল।

'টাকা কোথায় থাকে?'

'ওই দেরাজে।'—রণজিৎবাবু আঙুল দেখালেন।

ফেলুদা দেরাজটা টেনে খুলল।

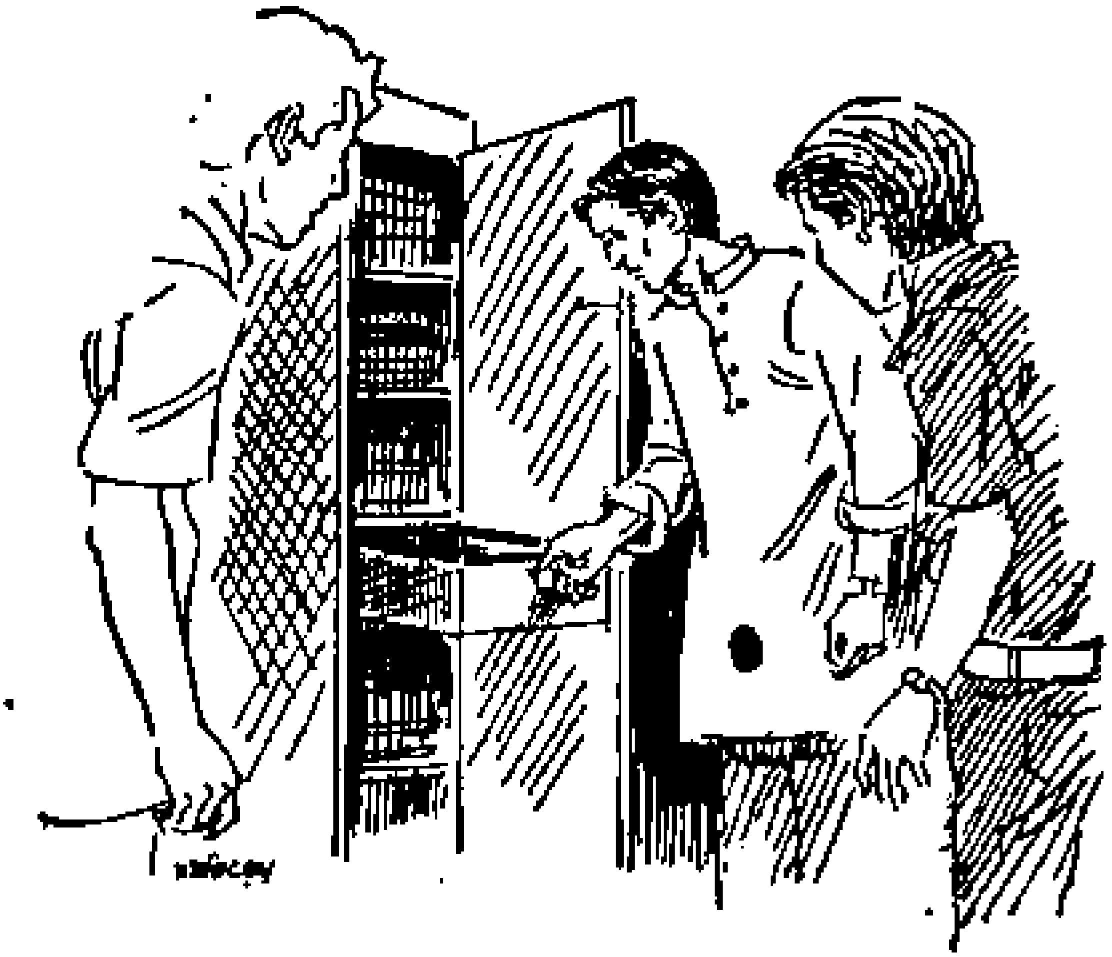

'সে কী !'

রণজিৎবাবুর চোখ কপালে। মোমবাতির আলোতেই বুঝলাম তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

দেরাজের মধ্যে একটা পাকানো কাগজ—খুলে দেখা গেল সেটা কুষ্ঠী—আর একটা কাশ্মীরী কাঠের বাক্সে কিছু পুরানো চিঠিপত্র। আর কিচ্ছু নেই।

'এ কী করে হয় ?'—রণজিৎবাবুর গলা দিয়ে যেন আওয়াজ বেরোতে চাইছে না।—'তিনটে বাণ্ডিল করা একশো টাকার নোট...সব মিলিয়ে প্রায় তেত্রিশ হাজার...'

'গবেষণার কাগজপত্র কি এই অন্য দেরাজটায় ?'

রণজিৎবাবু মাথা নাড়লেন। ফেলুদা দ্বিতীয় দেরাজটা খুলল।

এটা একেবারেই খালি।

বাইরে পায়ের শব্দ—খট্ খট্ খট্ খট্। নীহারবাবু ছাত থেকে নামছেন।

'মিশিগান ইউনিভার্সিটির একটা লম্বা সীলমোহর লাগানো খামে ছিল গবেষণার নোট্স...' রণজিৎবাবুর গলা খটখটে শুকনো।

'আজ সকালে ছিল টাকা আর কাগজপত্র ?'

'আমি নিজে দেখেছি,' বললেন সুবীরবাবু।—'একশো টাকার নোটের নম্বরগুলো সব নোট করা আছে। দাদাই এ ব্যাপারে ইনসিস্ট করতেন।'

ফেলুদা থমথমে ভাব করে বলল, 'তার মানে গত মিনিট পনেরোর মধ্যে—অর্থাৎ লোড শেডিং হবার পরেই—ব্যাপারটা ঘটেছে। আমরা যখন বৈঠকখানায় ছিলাম তখন।'

নীহারবাবু ঢুকলেন ঘরে। তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম তিনি বাইরে থেকে সব শুনেছেন।

আমরা পথ করে দিতে ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে তাঁর আরাম কেদারায় বসলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বোঝো!—গোয়েন্দার নাকের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল।'

'সামনের সিঁড়ি ছাড়া দোতলায় ওঠার অন্য সিঁড়ি আছে ?' নীহারবাবুর ঘর থেকে করিডরে বেরিয়ে এসে সুবীরবাবুকে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

সুবীরবাবু বললেন, 'জমাদারের সিঁড়ি আছে পিছন দিকে।'

'লোড শেডিং কি রোজই এই সময় হয় ?'

'তা দিন দশেক হল হচ্ছে। অনেকে তো ঘড়ি মেলাতে শুরু করেছে। ছ'টায় যায়, আসে দশটায়।'

ভাবতে চেষ্টা করলাম ফেলুদার গোয়েন্দা জীবনে এরকম অদ্ভুত ঘটনা আর ঘটেছে কিনা। একটাও মনে পড়ল না।

'নীচের বাসিন্দারা কেউ ফিরেছেন কি ?' সিঁড়ির মুখটায় এসে ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'সেটা একবার খোঁজ করা যেতে পারে,' বললেন সুবীরবাবু, 'মোটামুটি এই সময়টাতেই আসে।'

নীচে ল্যান্ডিং-এ সিঁড়ির উল্টোদিকে মিঃ সম্বরের ঘরের দরজা। সেটা এখন বন্ধ, আর ঘর যে অন্ধকার সেটা বাইরে থেকেই বোঝা যায়।

'সুখওয়ানির ঘরে যেতে হলে পিছন দিক দিয়ে যেতে হবে,' বললেন সুবীরবাবু।

বাড়ির পুব দিক দিয়ে গিয়ে বাগানের পাশের পথ দিয়ে সুখওয়ানির ঘরের দিকে এগোলাম আমরা। ঘরে ফ্লুওরেসেন্ট আলো জ্বলছে, ব্যাটারি লাইট, যেমন আজকাল চালু হয়েছে।

পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ফেলুদার টর্চের আলো দেখতে পাচ্ছেন, অথচ মানুষগুলো কে বোঝার উপায় নেই। সুবীরবাবু ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন—

'একটু আসতে পারি কি ?'

গলা চিনতে পেরে ভদ্রলোকের চাহনি পাল্টে গেল।

'সার্টন্‌লি, সার্টন্‌লি !'

ফেলুদার পরিচয় পেয়ে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'ইউ সী, মিস্টার মিটার—আমার ঘরভর্তি ভ্যালুয়েব্‌ল জিনিস। চুরির কথা শুনলে আমার হৃৎকম্প হয়। আজ সকালে যখন শুনলাম যে রাত্রে চোর এসেছিল, বুঝতেই পারেন তখন আমার কী মনের অবস্থা !'

সত্যি, এত দামী জিনিস যে একটা ঘরে থাকতে পারে সে আমার ধারণাই ছিল না। তাণ্ডবমূর্তি, ভৈরবমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি ইত্যাদি পাথর, পেতল আর ব্রঞ্জের স্ট্যাচুয়েটের সংখ্যাই অন্তত গোটা তিরিশ। তাছাড়া ছবি, বই, পুরানো ম্যাপ, নানারকম পাত্র, ঢাল-তলোয়ার, পিকদান, গড়গড়া, আতরদান এসব তো আছেই। ফেলুদা পরে বলেছিল, 'টাকা থাকলে অন্তত বই আর প্রিন্টগুলো সব কিনে ফেলতাম রে তোপ্‌শে !'

ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করাতে বললেন তিনি নাকি লোড শেডিং-এর ঠিক দশ মিনিট আগে ফিরেছেন।

'এই দশ মিনিটের মধ্যে কেউ এদিকটা এসেছিল কি ? দোতলায় যাবার একটা সিঁড়ি রয়েছে আপনার ঘরের পিছনেই ; ওদিক থেকে কোনো আওয়াজ পেয়েছিলেন ?'

ভদ্রলোক বললেন উনি এসেই স্নানের ঘরে ঢুকেছিলেন।—'আর তাছাড়া এই অন্ধকারে দেখার প্রশ্ন আর উঠছে কী করে ? আর ইয়ে, ভালো কথা, আপনারা কি বাইরের লোককে সন্দেহ করছেন ?'

'কেন বলুন তো ?'

'আপনারা মিঃ দস্তুরের সঙ্গে কথা বলেছেন ?'

ভাবটা যেন, আমরা দস্তুরের সঙ্গে কথা বললেই বুঝে যাব যে তাকে ছাড়া আর কাউকে সন্দেহ করা চলতে পারে না।

ফেলুদা কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বললেন, 'হি ইজ এ মোস্ট পিকিউলিয়ার ক্যারেকটার। আমি জানি আমার প্রতিবেশী সম্বন্ধে এরকম করে বলা উচিত নয়, কিন্তু আমি ওকে কিছুদিন থেকেই ওয়াচ্‌ করছি। গোড়ায় আলাপ হবার আগে শুধু ওর নাকডাকার শব্দ পেতাম ওর জানালা দিয়ে। আমার বিশ্বাস সে শব্দ দোতলা অবধি পৌঁছে যায়।'

সুবীরবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে মনে হল সুখওয়ানি খুব বাড়িয়ে বলেনি।

'তারপর আলাপ হয়, যখন একদিন সকালে ও আমার টাইপরাইটার ধার নিতে

আসে। আমার ঘরের জিনিসপত্রের দিকে যেরকম লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছিল সেটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি। সাধারণ কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করলাম ও কী করে। বলল ইলেকট্রিক্যাল গুড্‌সের ব্যবসা। আরে বাপু, তাই যদি হবে, তাহলে এই লোড শেডিং-এর বাজারে ঘরে একটা ব্যাটারি লাইট আর পাখার ব্যবস্থা করেনি কেন ? সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক।'

ভদ্রলোক থামলেন, আর আমরা সেই ফাঁকে উঠে পড়লাম। ফেলুদা বেরোবার আগে বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু দেখলে মিঃ দত্তকে জানালে আমাদের কাজের খুব সুবিধা হবে।'

পুবের গলিটা দিয়ে বাড়ির সামনের দিকে এগোনোর সময়ই একটা ট্যাক্সির হর্ন পেয়েছিলাম, এবার দেখলাম একটি ভদ্রলোক নুড়ি ফেলা পথের উপর দিয়ে গাড়িবারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। অস্বচ্ছ আলোতেও দেখতে পাচ্ছি ভদ্রলোক মাঝারি হাইটের এবং মোটা, পরনে খয়েরি টেরিলিনের সুট, পরিচ্ছন্ন করে ছাঁটা কাঁচা-পাকা মেশানো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। রংটা বোধহয় বেশ ফরসাই। হাতের ব্রীফকেসটা দেখে নতুন বলে মনে হয়।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরতেই সুধীরবাবু তাঁকে গুড ইভনিং জানালেন। তাতে উনি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলাম এ বাড়িতে কারুর মুখ থেকে গুড মর্নিং, গুড ইভনিং শুনতে অভ্যস্ত নন।

'গুড ইভনিং, মিঃ ডাট্‌।'

অদ্ভুত খ্যানখ্যানে গলার স্বর। কথাটা বলেই চলে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, ফেলুদা চাপা ফিসফিসে গলায় সুধীরবাবুকে বললেন, 'ওকে থামান।'

সুধীরবাবু তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করলেন।

'ইয়ে, মিঃ দস্তুর !'

দস্তুর থামলেন। সুধীরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এগিয়ে গেলাম।

সুধীরবাবু সংক্ষেপে আজকের ঘটনাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

'এই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল ? ইওর ব্রাদার মাস্ট বি টেরিব্‌লি আপসেট !'

ফেলুদা বলেছিল যে অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় মানুষের গলার স্বর এত বদলে যেতে পারে যে অনেক সময় চেনাই যায় না। মিঃ দস্তুর ইংরেজিতে আতঙ্ক ও বিস্ময় মেশানো স্বরে এই কথাগুলো বলার সময় লক্ষ করলাম যে খ্যানখ্যানে ভাবটা একেবারেই নেই। প্রায় মনে হয় যেন আরেকজন মানুষ কথাটা বলল।

'আপনি যখন এলেন তখন কাউকে বেরোতে দেখলেন এ বাড়ি থেকে ?'

ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'কই না তো?' বললেন মিঃ দস্তুর। 'অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে অন্ধকারে দেখতে পাইনি। থ্যাঙ্ক গড যে আমার ঘরে কোনো মূল্যবান জিনিস নেই!'

'কে?'

প্রশ্নটা এল দোতলার ল্যান্ডিং থেকে। নীহারবাবুর গলা। আমরা সবাই গাড়িবারান্দার সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার ভিতরে ঢুকে উপরে চেয়ে দেখলাম অন্ধকারেও নীহারবাবুর কালো চশমাটা চকচক করছে।

'ইটস্ মী, মিস্টার ডাট্', দৃষ্টি উপরে করে বললেন দস্তুর—'আপনার ভাই এই মাত্র আপনার লস্-এর কথাটা বলল। আমি আপনাকে আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি।'

চশমাটা সরে গেল। আর তার পরেই মিলিয়ে এল চটি আর লাঠির শব্দ।

'আপনারা একটু বসে যাবেন না আমার ঘরে!' বললেন মিঃ দস্তুর।—'সারাদিন কাজের পরে একটু সঙ্গ পেলে ভালো লাগে।'

ফেলুদা আপত্তি করল না। তার কারণ অবিশ্যি আমি জানি। যে বাড়িতে ক্রাইম ঘটেছে, সে বাড়ির লোকেদের চিনে রাখা গোয়েন্দার গোড়ার কাজ।

সুখওয়ানির ঘরের পর মিঃ দস্তুরের বৈঠকখানার চেহারা ভাবটা সত্যিই দেখবার মতো। আসবাব বলতে একটা সোফা, দুটো কাউচ, একটা রাইটিং ডেস্ক আর একটা বুকশেল্ফ। সোফার সামনে একটা নীচু টেবিল আছে বটে, তবে সেটা নেহাতই ছোট। তারই উপর একটা মোমবাতি রাখা ছিল। ফেলুদা সেটা ওর লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে দিল; এখন দেখলাম দেয়ালে একটিমাত্র ক্যালেন্ডার ছাড়া আর কিছুই নেই।

ভদ্রলোক ভিতর দিকে গিয়েছিলেন বোধহয় চাকরকে ডাকতে; ফিরে আসতে ফেলুদা তাঁকে একটা সিগারেট অফার করল।

'নো, থ্যাঙ্কস্। ক্যানসারের ভয়ে ধূমপানটা বছর তিনেক হল ছেড়ে দিয়েছি।'

'অন্যের ধূমপানে আশা করি আপত্তি নেই। আপনার অ্যাশট্রেতে অলরেডি একটা আধখাওয়া সিগারেট পড়ে আছে।'

ফেলুদা টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল, 'আমারই ব্র্যান্ড। চারমিনারের টুকরো আমিও দূর থেকেই চিনতে পারি।'

দস্তুর বলল, 'অনেকবার ভেবেছি সুখওয়ানির মতো আমিও আলো-পাখার একটা ব্যবস্থা করে নিই। তারপর যখনই মনে হয়েছে যে কলকাতার শতকরা নব্বই ভাগ লোককে গরম আর অন্ধকার ভোগ করতে হচ্ছে, তখনই মনটা খারাপ

হয়ে যায়। সেই কারণে আমিও...'

'আপনার তো ইলেকট্রিক্যাল গুডস্-এর ব্যবসা ?'

'ইলেকট্রিক্যাল ?'

'সুখওয়ানি যে বলছিলেন—'

'সুখওয়ানি ওই রকমই বলে। ইলেকট্রিক্যাল নয়, ইলেকট্রনিক্স্। বছরখানেক হল শুরু করেছি।'

'আপনি নিজেই ?'

'না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে। আমি বোম্বাই-এর লোক, তবে অনেকদিন দেশের বাইরে। জার্মানিতে একটা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মে কাজ করতাম। বন্ধু কলকাতা থেকে লিখল এখানে চলে আসতে। পয়সা ওর, আমি যোগাচ্ছি অভিজ্ঞতা।'

'কবে এলেন কলকাতায় ?'

'গত নভেম্বরে। বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম মাস তিনেক ; এই ফ্ল্যাটের খবরটা পেয়ে এখানে চলে আসি।'

চাকর কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে এল। থাম্‌স আপ। মিঃ দস্তুর ফেলুদার পরিচয় আগেই পেয়েছেন, এবার গলাটা নামিয়ে বললেন, 'মিঃ মিটার, আমার ঘরে মূল্যবান জিনিস নেই ঠিকই, কিন্তু একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না। আমার প্রতিবেশীটি কিন্তু খুব সিধে লোক নন। তার ঘরে নানারকম গোপন কারবার চলে। গর্হিত ব্যাপার।'

'আপনি জানলেন কী করে ?'

'আমার স্নানের ঘর আর ওর স্নানের ঘর লাগোয়া। দুটোর মাঝখানে একটা বন্ধ দরজা আছে। সে দরজায় কান লাগালে মাঝে মাঝে ওর শোবার ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যায়।'

ফেলুদা গলা খাঁকরিয়ে বলল, 'এই ভাবে কান লাগানোও একটা গর্হিত ব্যাপার নয় কি ?'

মিঃ দস্তুর একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন, 'সেটা করতাম না। যখন দেখলাম যে আমার চিঠি ভুল করে ওর হাতে পড়লে ও জল দিয়ে খাম খুলে তারপর আবার আঠা দিয়ে সেঁটে ফেরত দেয়, তখন একটা পাল্টা দুষ্টুমি করার লোভ সামলাতে পারলাম না। আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। কিন্তু উনি যদি আমার পিছনে লাগেন তাহলে আমিও ওকে ছাড়ব না, এই বলে দিলাম।'

কোল্ড ড্রিঙ্কসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

গেটের কাছে এসে ফেলুদা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল গত আধ ঘণ্টার মধ্যে কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেছে কিনা। সে বলল সুখওয়ানি আর দস্তুরকে

ছাড়া কাউকে দেখেনি। এটা আশ্চর্য না। সাতের এক বালিগঞ্জ পার্কের কম্পাউন্ড ওয়াল রয়েছে বাড়ির চারদিক ঘিরে। পিছন দিকের একটা বাড়ি নাকি খালি পড়ে আছে আজ কয়েক মাস যাবৎ। জোয়ান চোর হলে পাঁচিল টপকে আসায় কোনো অসুবিধা নেই—যদিও আমাদের সকলেরই মন বলছে এ কাজ বাড়ির লোকেই করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার বলছে—ভেতরের লোকই যে বাইরের লোককে দিয়ে কাজটা করায়নি তারই বা বিশ্বাস কী?

আমাদের গাড়ি নেই। সুবীরবাবু বলেছিলেন তাঁর গাড়িতে আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার কথা, কিন্তু ফেলুদা বলল হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সি পেতে কোনো অসুবিধা হবে না।

'পুলিশে একটা খবর দিলে ভালো করতেন কিন্তু।'

ফেলুদার এ প্রস্তাবটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সুবীরবাবুও বেশ একটু অবাক হলেন। বললেন, 'কেন বলছেন বলুন তো!'

'পুলিশ সম্বন্ধে আপনার দাদার ধারণা যাই হোক না কেন পলাতক চোর ধরার যে সব উপায় পুলিশের আছে কোনো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের তা নেই। বিশেষ করে যখন এতগুলো টাকা, তখন পুলিশকে বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। নোটের নম্বর লেখা আছে বলছেন। কাজটা এমনিতেই অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।'

সুবীরবাবু বললেন, 'আপনাকে যখন আসতে বলেছি, এবং দুর্ঘটনা যখন একটা ঘটেছে, তখন আপনাকে বাদ দেবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। পুলিশ আসুক, কিন্তু তার পাশে আপনিও থাকলে শুধু আমিই নিশ্চিন্ত হব না, দাদাও হবেন। অবিশ্যি, সত্যি বলতে কি, চোর যে কে সেটা কারুর সাহায্য ছাড়াই আমি বলতে পারি।'

'আপনার ছেলের কথা বলছেন কি?'

সুবীরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।—'এ শঙ্কর ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সে জানে এ পাড়ায় ছ'টায় বাতি নিভে যায়। ডানপিটে ছেলে, পাঁচিল টপকানো তার কাছে কিছুই নয়। তার পর পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে জ্যাঠার ঘরে ঢুকে আলমারি খোলা—এসবই তো তার কাছে নস্যি!'

'কিন্তু নীহারবাবুর গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে সে কী করবে? বৈজ্ঞানিক মহলে কি তার খুব যাতায়াত আছে?'

'সেটার দরকার কি বলুন! সে তো সেই কাগজপত্রের বিনিময়ে তার জ্যাঠার কাছ থেকেই টাকা আদায় করতে পারে। এই কাগজপত্রের দাম যে দাদার কাছে কতখানি সেটা তো সে খুব ভালোভাবেই জানে!'

এই অল্প সময়ের মধ্যে এত রকম ঘটনা ঘটার ফলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছিল। তার পরেও একই দিনে যে আরো কিছু ঘটতে পারে সেটা ভাবতেই পারিনি। অবিশ্যি সেটার কথা বলার আগে বাড়ি ফিরে এসে ফেলুদা আর আমার মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেটা বলা দরকার।

রাত্রে খাবার পরে ফেলুদার ঘরে গিয়ে দেখি সে খাটে চিত হয়ে শুয়ে সিলিং-এর দিকে চেয়ে পান চিবোচ্ছে আর চারমিনার ফুঁকছে। আমিও গিয়ে খাটে বসলাম। যে প্রশ্নটা গোলোকধাম থেকেই মনে খোঁচা দিচ্ছিল সেটা না বলে পারলাম না।

'তুমি কেসটা ছেড়ে দিতে চাইছিলে কেন ফেলুদা ?'

ফেলুদা পর পর দুটো মোক্ষম রিং ছেড়ে বলল, 'কারণ আছে রে, কারণ আছে।'

'কারণ তো বললেই তুমি—পালানো চোর ধরা পুলিশের পক্ষে আরো সহজ—বিশেষ করে যদি অনেক টাকা নিয়ে পালায়।'

'সুধীরবাবুর ছেলেই নিয়েছে বলে তোর মনে হয় ?'

'আর কে নেবে বল। বাড়ির লোক নিয়েছে সে তো বোঝাই যাচ্ছে। দস্তুর তো ছিলেনই না। মুখওয়ালি চুরি করে দিব্যি ঘরে বসে থাকবেন সেটাও কেমন কেমন লাগে। রণজিৎবাবুও এলেন চুরির পরে। আর আছে চাকরবাকর...'

'কিন্তু ধর যদি মক্কেল নিজেই কিছু করে থাকেন ?'

আমি অবাক হয়ে চাইলাম ফেলুদার দিকে।

'সুধীরবাবু !'

'একটু মাথা ঠাণ্ডা করে চুরি আবিষ্কারের ঠিক আগের ঘটনাগুলো ভেবে দেখ।'

আমি চোখ বুজে কল্পনা করলাম আমরা চারজনে বৈঠকখানায় বসে আছি। চা এল। আমরা চা খাচ্ছি। ফেলুদার হাতে কাপ। ঘরের বাতি নিভল। তারপর—ধাঁ করে একটা জিনিস মনে পড়ে গিয়ে বুকটা কেঁপে উঠল।

'লোড শেডিং-এর সঙ্গে সঙ্গে সুধীরবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফেলুদা—চাকরকে ডাকতে !'

'তবে !—ভেবে দেখ আমার পোজিশনটা কী হবে যদি বেরোয় যে সুধীরবাবুই আলমারি খুলেছিলেন। এটা অসম্ভব নয় এই কারণেই যে ওই একটি লোক সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। চাকরের কথা যেটা বলেছেন সেটা অবিশ্যি অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ধর যদি শেয়ার বাজারে বা রেসের মাঠে বা জুয়োর আড্ডায় ভদ্রলোকের অনেক টাকা খোয়া গিয়ে থাকে,

বাজারে একগাদা ধারদেনা থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে টাকাটা নেওয়া খুব আশ্চর্য কী ?'

'কিন্তু উনি তো নিজেই এলেন তোমার কাছে। উনিই তো তোমায় গোয়েন্দা অ্যাপয়েন্ট করলেন !'

'উনি যদি খুব উচ্চস্তরের ধূর্ত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে নিজের উপর যাতে সন্দেহ না পড়ে তার জন্যে ঠিক এই কাজটাই করা কিছুই আশ্চর্য নয় !'

এর পরে আর কোনো কথা বলা যায় না।

ফেলুদা কালী সিংহের মহাভারতটা হাতে নিয়ে রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালিয়েছে দেখে আমি খাট থেকে উঠে পড়লাম।

নিজের ঘরে আসতেই বাইরে থেকে একটা শব্দ পেলাম। স্কুটার। একটা নয়, একটার বেশি।

নির্জন নিস্তব্ধ পাড়াটাকে কাঁপিয়ে যেন আমাদের বাড়ির সামনেই এসে থামল। আর তার পরেই আমাদের দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

দিনকাল ভালো নয়, আর তাছাড়া আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বেটাইমে লোক এলেও স্কুটারে আসে না।

আমি দরজার দিকে না গিয়ে আগে ফেলুদার ঘরের পর্দাটা ফাঁক করে একবার উঁকি দিলাম। ফেলুদা বই রেখে খাট থেকে উঠে পড়েছে। বলল—'দাঁড়া।' অর্থাৎ তুই খুলিস না, আমি খুলছি।

দরজা খুলতেই যিনি প্রবেশ করলেন তিনি যে শয়তানের অবতার সেটা বুঝতে পাঁচ সেকেন্ডও লাগল না। বসবারও দরকার নেই; ঘরে ঢুকে পিঠ দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ফেলুদার দিকে ঘোলাটে চোখ করে তাকিয়ে কথার চাবুক আছড়াতে শুরু করলেন সুধীর দত্তর ছেলে শঙ্কর দত্ত।

'শুনুন মশাই, আমার বাবা আমার বিষয়ে কী বলেছেন জানি না, কিন্তু গেস করতে পারি। এইটুকু শুধু বলে দিচ্ছি আপনাকে—আমার পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে কারুর বাপের সাধ্যি নেই কিছু করে। আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি; আমি একা নই। আমাদের গ্যাং আছে। বেশি ওস্তাদী করলে পস্তাবেন। বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব এই বলে দিলাম।'

শঙ্কর দত্ত যেরকম নাটকীয় ভাবে ঢুকেছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই বেরিয়ে গেলেন স্পীচ ঝাড়া শেষ করে। তারপরই আওয়াজ পেলাম তিনটে স্কুটার স্টার্ট নিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

ফেলুদা এতক্ষণ স্থির হয়ে ছিল। স্নায়ুর উপর অসাধারণ দখল আছে বলেই এত অপমানেও ও পাথর। ও বলে প্রচণ্ড রাগে যে ফেটে পড়ে তার চেয়ে সেই রাগ যে দমিয়ে রাখতে পারে তার মনের জোর বেশি।

স্কুটারের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই কিন্তু ফেলুদা ঝড়ের বেগে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে পকেটে তার মানিব্যাগটা নিয়ে নিয়েছে।

'চ তোপশে—ট্যাক্সি...'

তিন মিনিটের মধ্যে সাদার্ন এভিনিউতে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়লাম দুজনে। উত্তর দিকে গেছে স্কুটারগুলো এটা জানি।

'ল্যানসডাউন রোড,' বলল ফেলুদা। বড় রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি, তাই ল্যানসডাউন রোড ধরেই যাবে ওরা এটা আমারও মনে হয়েছিল।

পৌনে এগারোটা। সাদার্ন এভিনিউ প্রায় ফাঁকা। ট্যাক্সিচালক বাঙালী, আমাদের মুখ চেনা। বললেন, 'কাউকে ফলো করবেন, স্যার?'

'তিনটে স্কুটার,' চাপা গলায় বলল ফেলুদা।

আন্দাজে ভুল নেই। এলগিন রোডের মোড়ের কাছে এসে স্কুটার তিনটের দেখা পাওয়া গেল। শঙ্কর একাই বসেছে একটায়, অন্য দুটোয় দু'জন করে লোক। এরা সব মার্কামারা মস্তান সেটা আর বলে দিতে হয় না। আমাদের ট্যাক্সি ওদের লেজ ধরে চলতে লাগল।

লোয়ার সার্কুলার রোড, ক্যামাক স্ট্রীট পেরিয়ে স্কুটারগুলো পার্ক স্ট্রীটে পড়ে বাঁ দিকে ঘুরল। এঁকেবেঁকে সাপের মতো চালানোয় বোঝা যাচ্ছে এদের বেপরোয়া ফুর্তির ভাবটা। ফেলুদা রাস্তার আলো বাঁচিয়ে ভিতর দিকে চেপে বসেছে, তার মাথায় কী খেলছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মির্জা গালিব স্ট্রীট দিয়ে কিছুদূর গিয়ে স্কুটারগুলো আবার বাঁয়ে ঘুরল। মার্কুইস স্ট্রীট। রাস্তা সরু হয়ে আসছে, পাড়া অন্ধকার, বাতিগুলো টিমটিমে। যাতে ওরা সন্দেহ না করে তাই ফেলুদার আদেশে আমাদের ড্রাইভার ট্যাক্সির স্পীড কমিয়ে ওদের সঙ্গে দূরত্বটা একটু বাড়িয়ে নিল।

আরো দুটো মোড় ঘুরে দেখলাম স্কুটারগুলো একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে।

'চালিয়ে বেরিয়ে যান,' বলল ফেলুদা।

বাড়ি না। এক ধরনের হোটেল। নাম নিউ কোরিনথিয়ান লজ। নিউ? বাড়ির বয়স কম করে একশো বছর।

ফেলুদার কাজ শেষ। বুঝলাম এদের ডেরাটা জানার দরকার ছিল।

বাড়ি যখন ফিরলাম তখন এগারটা চল্লিশ। ভাড়া উঠেছে উনিশ পঁচাত্তর।

পরদিন ভোরে সিধু জ্যাঠার আবির্ভাবটা একেবারে আনএক্সপেকটেড। উনি সকালে হাঁটতে বেরোন জানি, কিন্তু সেটা লেকের দিকে। আমাদের বাড়িতে আসার মানেই কোনো একটা বিশেষ কারণ আছে।

'খাতার ওজন অনেক, তাই খবরটা কপি করে এনেছি,' বললেন সিধু জ্যাঠা। —'সুপ্রকাশ কিনা জানি না, তবে এস. চৌধুরী বলে লিখেছে, আর বায়োকেমিস্ট সেটাও লিখেছে।'

'কবেকার খবর?'

'উনিশশো একাত্তর। মেক্সিকোতে একটা ড্রাগ কোম্পানির উপর পুলিশের

হামলায় একটি বাঙালী বায়োকেমিস্ট ধরা পড়ে, নাম এস. চৌধুরী। ভেজাল ড্রাগের ব্যবসা চালাচ্ছিল ; তার ফলে সব মারাত্মক ব্যাধি দেখা দিয়েছিল। লোকটার জেল হয়। এইটুকুই খবর আসলে মাথায় ঘুরছে সুপ্রকাশ, তাই এস. চৌধুরীর সঙ্গে নামটা ঠিক কানেক্ট করতে পারিনি। অবিশ্যি এ সেই একই এস. চৌধুরী কিনা—'

'একই,' গম্ভীর ভাবে বলল ফেলুদা।

সিধু জ্যাঠা উঠে পড়লেন। তাঁর আজ চুল কাটার দিন, নাপিত এসে বসে থাকবে। ফেলুদার পিঠ চাপড়ে, আমার কান ধরে একটা মোচড় দিয়ে, মালকোচাটা একটু ভালো করে গুঁজে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

ফেলুদা খাতা খুলে হিজিবিজি লেখা শুরু করেছে দেখে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। পর পর তিনটে প্রশ্ন লেখা রয়েছে খাতায়—

১) চাবির গর্তের ধারে আঁচড়ের বাড়াবাড়ি কেন ?

২) 'কে'-র অর্থ কী ?

৩) অসমাপ্ত কাজটা কী ?

প্রশ্নগুলো পড়ে সে সম্বন্ধে আমিও খানিকটা না ভেবে পারলাম না।

আলমারির চাবির গর্তের চারিধারে আঁচড় কালই ফেলুদার টর্চের আলোয় দেখেছিলাম। এটার খটকা লাগার একটা কারণ থাকতে পারে। রীতিমতো জোরে ঘষা না লাগলে ইস্পাতের ওপর ওরকম দাগ পড়তে পারে না। নীহারবাবুর ঘুম কি এতই গভীর যে এত ঘষাঘষিতেও ঘুম ভাঙবে না ?

'কে'-র ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। তারপর মনে পড়ল যে মিঃ দস্তুরের গলা শুনে দোতলার ল্যান্ডিং থেকে নীহারবাবু 'কে' বলে উঠেছিলেন। ফেলুদা এই 'কে' প্রশ্নে খটকার কারণ কী দেখল সেটা বুঝলাম না।

অসমাপ্ত কাজের কথাটাও নীহারবাবুই বলেছেন। অন্তত রণজিৎবাবু তাই বলেন। সেটা যে উনি ওঁর গবেষণার বিষয় বলছিলেন সেটা কি ফেলুদা বিশ্বাস করে না ?

ফেলুদা আরো কী সব লিখতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। এর ঘরেই এক্সটেনশন ফোন—বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিল।

'হ্যালো।'

দু'চারবার হুঁ হুঁ করে এবং শেষে 'আমি এক্ষুনি আসছি' বলে ফোনটা রেখে ফেলুদা আলনা থেকে শার্ট ও ট্রাউজার সমেত হ্যাঙ্গারটা একটানে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'তৈরি হয়ে নে। গোলোকধামে খুন।'

আমার বুক ধড়াস।

'কে খুন হল ?'

'মিঃ নন্দুর।'

বড় রাস্তা থেকে বালিগঞ্জ পার্কে ঢুকতেই দূরে সাতের একের সামনে দেখলাম পুলিশের ভ্যান আর লোকের জটলা। তাও সাহেবী পাড়া বলে রক্ষে, নইলে ভিড় আরো অনেক বেশি হত।

কলকাতার পুলিশ মহলে ফেলুদাকে চেনে না এমন লোক নেই। গোলোকধামে ঢুকতেই ওকে দেখে ইন্সপেক্টর বকশী হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'এসে পড়েছেন? গন্ধে গন্ধে হাজির ?'

ফেলুদা ওর একপেশে হাসিটা হেসে বলল, 'সুধীরবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে সম্প্রতি; ফোন করেছিলেন, তাই চলে এলাম। আপনাদের কাজে কোনো ব্যাঘাত করব না গ্যারান্টি দিচ্ছি। খুনটা হল কী ভাবে ?'

'মাথায় বাড়ি। একটা নয়, তিনটে। ঘুমন্ত অবস্থায়। লাশ নিয়ে যাবে এইবার পোস্টমর্টেমের জন্য। ডাঃ সরকার একবার এসে দেখে গেছেন। আন্দাজ রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে।'

'লোকটার সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলেন ?'

'খুব গণ্ডগোল। সুটকেস গুছোতে শুরু করেছিল। সটকাবার তালে ছিল।'

'টাকাকড়ি গেছে কিছু ?'

'মনে তো হয় না। খাটের পাশের টেবিলে ওয়লেটে শ'তিনেক টাকা রয়েছে। বাড়িতে ক্যাশ বেশি রাখত বলে মনে হয় না। অথচ ব্যাঙ্কের জমার খাতা, চেক বই এসব কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না। একটা সোনার ঘড়ি পাওয়া গেছে বালিশের পাশে। এখনো ভালো করে সার্চ করা হয়নি; এবার করবে। এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা থেকে লোকটার সঠিক পরিচয় কিচ্ছু পাওয়া যায়নি।'

সুধীরবাবু মিনিটখানেক হল এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। মিঃ বকশীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সুখওয়ানি বেজায় তম্বি করছে। বলছে তার নাকি একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ডালহাউসিতে। আমি বলেছি জেরা না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া যাবে না।'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন মিঃ বকশী। 'অবিশ্যি জেরাতে আপনিও বাদ যাবেন না।'

শেষের কথাটা হালকা হেসে বললেন মিঃ বকশী। সুধীরবাবু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে সেটা তিনি জানেন।

'তবে আমার দাদাকে যত অল্পের উপর দিয়ে সারতে পারেন ততই ভালো।'

'ন্যাচারেলি।'

'ঘরটা একবার দেখতে পারি কি ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

নিশ্চয়ই!'

বকশীও ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন, পিছনে আমি। ঘরে ঢোকার আগে ফেলুদা সুধীরবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'ভালো কথা, আপনার ছেলে কাল আমার বাড়িতে এসেছিল।'

'কখন!'—সুধীরবাবু অবাক।

ফেলুদা সংক্ষেপে কাল রাত্তিরের ঘটনাটা বলে বলল, 'সে কি কাল ফিরেছিল?'

'ফিরে থাকলেও টের পাইনি,' বললেন সুধীরবাবু। 'সকালে উঠে তাকে দেখিনি।'

'যাক্, তাহলে আপনার ছেলের ডেরার একটা সন্ধান পাওয়া গেল,' বললেন মিঃ বকশী, 'ওই হোটেলটা মোটেই সুবিধের নয়। বার দুয়েক রেড হয়ে গেছে ওখানে অলরেডি।'

কালকের দেখা ঘরের চেহারা আজ একেবারে পাল্টে গেছে। কাল ছিল অন্ধকার, আর আজ পুবের দুটো জানালা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে সোফা আর মেঝের উপর পড়েছে। আশ্চর্য লাগল দেখে যে কালকের দেখা চারমিনারের টুকরোটা এখনো অ্যাশট্রেতে পড়ে আছে। ঘরে দু'জন পুলিশের লোক রয়েছে, আর পুলিশের ফোটোগ্রাফার তাঁর কাজ শেষ করে সরঞ্জাম ব্যাগে পুরছেন।

খুনটা অবিশ্যি হয়েছে পাশের শোবার ঘরে। ফেলুদা বকশীর সঙ্গে সেই ঘরেই গিয়ে ঢুকল। আমি চৌকাঠ অবধি গিয়ে একবার বিছানার দিকে চেয়ে চাদরে ঢাকা লাশটা দেখে নিলাম। একজন পুলিশের লোক খানাতল্লাসী চালিয়ে যাচ্ছে। মেঝেতে একটা খোলা সুটকেসের মধ্যে দেখলাম কিছু জামাকাপড় ভাঁজ করে রাখা রয়েছে। তার পাশে মাটিতে দাঁড় করানো রয়েছে গতকাল দপ্তরের হাতে দেখা নতুন ব্রীফকেসটা।

আমি আরো মিনিট তিনেক বসবার ঘরে জিনিসপত্র দেখে কাটিয়ে দিলাম। কোনো কিছুতেই হাত দেওয়া চলবে না এটা জানি, তার উপর দুটো পুলিশই আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে।

'চ তোপ্‌শে।'

ফেলুদা বেরিয়ে এসেছে শোবার ঘর থেকে। 'আপনি আছেন কিছুক্ষণ?' বকশী প্রশ্ন করল।

'একবার বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাব,' বলল ফেলুদা। 'ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে বলবেন।'

সুধীরবাবু দোতলায় অপেক্ষা করছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ভদ্রলোক তাঁর আরাম কেদারায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চোখে কালো চশমা, হাতের লাঠি পাশে খাটের উপর শোয়ানো। অ্যাদ্দিন লাঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দেখেছি, তাই সেটার মাথা যে রূপো দিয়ে বাঁধানো সেটা বুঝতে পারিনি। মাথার নকশার মধ্যে খোদাই করা জি বি ডি দেখে বুঝলাম লাঠিটা ছিল নীহারবাবুর ঠাকুরদা গোলোকবিহারী দত্তর।

আমরা এসেছি সে খবরটা দেওয়াতে নীহারবাবু কাত করা ঘাড়টাকে একটু সোজা করে বললেন, 'শব্দ পেয়েছি। পায়ের শব্দ। শব্দ আর স্পর্শ—এই দুই নিয়েই তো কাটিয়ে দিলাম বিশ বছর। আর স্মৃতি...কী হতে পারত, কী হল না। লোকে বলে দুর্ভাগ্য। আমি তো জানি এটা ভাগ্য-টাগ্য কিছু নয়। আপনি সেদিন জিজ্ঞেস করলেন বিস্ফোরণটা অসাবধানতার জন্য হয়েছিল কিনা; আজ আপনাকে বলছি মিঃ মিত্তির—সমস্ত ব্যাপারটা করা হয়েছিল আমার শ্রম পণ্ড করার জন্য। ঈর্ষা যে মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে সেটা আপনি গোয়েন্দা হয়ে নিশ্চয়ই বোঝেন।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা বলল, 'তার মানে আপনার ধারণা সুপ্রকাশ চৌধুরীই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী?'

'বাঙালী যে বাঙালীর সবচেয়ে বড় শত্রু সেটা আপনি মানেন কি?'

ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে কালো চশমার দিকে। নীহারবাবুও যেন উত্তরের অপেক্ষা করছেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি এখন যে কথাটা যে ভাবে আমাদের বলছেন, সেটা এর আগে কাউকে বলেছেন কি?'

'না, বলিনি। কোনোদিন না। হাসপাতালে জ্ঞান হবার পর আমার এই কথাটাই প্রথম মনে হয়েছিল। কিন্তু বলিনি। বলে কী করব? আমার সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেছে। যে এটার জন্য দায়ী, তার শাস্তি হলে তো আর আমি দৃষ্টি ফিরে পাব না, বা আমার গবেষণাও শেষ করতে পারব না।'

'কিন্তু আপনাকে চিরকালের মতো অসহায় করে চৌধুরীরই বা কী লাভ হল বলুন। সে কি ভেবেছিল যে আপনার কাগজপত্রগুলো হাত করে সে-ই গবেষণা চালিয়ে নিজে নাম কিনবে?'

'নিশ্চয়ই তাই। তবে তার সে ধারণা ভুল। আমি তো বলেইছি আপনাকে। আমাকে ছাড়া এগোনোর পথ ছিল না তার।'

আমরা দু'জনেই খাটে বসেছি। ফেলুদাকে দেখে বুঝতে পারছি সে গভীর ভাবে চিন্তা করছে। রণজিৎবাবু ইতিমধ্যে ঘরে এসে টেবিলটার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সুধীরবাবু কোনো কাজে বাইরে গেছেন।

ফেলুদা বলল, 'টাকার কথা জানি না, সেটা হয়তো পুলিশের পক্ষে উদ্ধার

করা আরো সহজ. কিন্তু আপনার এত মূল্যবান কাগজপত্র আমি এ বাড়িতে উপস্থিত থাকতে চুরি হয়ে গেল, এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না। ওগুলো উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা আমি চালিয়ে যাব।'

'আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।'

আমরা আর বেশিক্ষণ থাকলাম না। পুলিশ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বক্সী ফেলুদাকে বলে দিলেন যে তাদের জেরা আর খানাতল্লাসীর কী ফল হয় সেটা ফোনে জানিয়ে দেবেন।

'আর নিউ কোরিনথিয়ান লজের খবরটাও জানাতে ভুলবেন না,' বলে দিল ফেলুদা।

আমরা বাড়ি ফিরেছি সাড়ে দশটায়। তখন থেকে শুরু করে দুপুরের খাওয়ার আগে পর্যন্ত ফেলুদা পায়চারি করে, থেমে, শুয়ে-বসে, চোখ খুলে, চোখ বুজে, ভ্রুকুটি করে, মাথা নেড়ে, বিড়বিড় করে, মাঝে মাঝে ছোট বড় মাঝারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তার মনের মধ্যে নানারকম প্রশ্ন সন্দেহ খটকা দ্বন্দ্ব ইত্যাদির হুটোপাটি চলছিল। একবার হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'গোলোকধামের একতলার প্ল্যানটা তোর মোটামুটি মনে পড়ছে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'মোটামুটি।'

'সুখওয়ানির ঘর থেকে দস্তুরের ঘরে কীভাবে যাওয়া যায় বল তো?'

আমি আবার একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'যদ্দুর মনে পড়ছে, দুটো ফ্ল্যাটের পাশ দিয়ে বাড়ির ভিতরে যে বারান্দাটা গেছে, তার মাঝখানে একটা দরজা রয়েছে, আর সে দরজাটা বোধ হয় বন্ধ থাকে। সেটা খোলা থাকলে সেই বারান্দা দিয়েই সোজা এক ফ্ল্যাট থেকে আরেক ফ্ল্যাটে চলে যাওয়া যেত।'

'ঠিক বলেছিস। তার মানে সুখওয়ানিকে যদি দস্তুরের ফ্ল্যাটে আসতে হয় তাহলে বাগান ঘুরে বাড়ি আর কম্পাউন্ড-ওয়ালের মধ্যের গলি দিয়ে একেবারে সামনে এসে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়।'

'কিন্তু সামনের কোল্যাপ্সিবল গেট কি মাঝরাত্তিরে খোলা থাকবে?'

'নিশ্চয়ই না।'

তারপর আবার পায়চারি শুরু করে বলতে লাগল—

'X. Y. Z....X. Y. Z...X হল গবেষণার কাগজ, Y হল টাকা, আর Z হল খুন। এখন কথা হচ্ছে—X. Y. Z. কি একই সূত্রে গাঁথা, না তিনটে আলাদা...'

আমি এক ফাঁকে বলে ফেললাম, 'ফেলুদা, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে সুপ্রকাশ চৌধুরী দস্তুর সেজে নীহারবাবুর বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন।'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে যে ফেলুদা মোটেই আমার কথাটা উড়িয়ে দিল

না। বরং আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে বলল, 'যদিও এ ধারণাটা আমার মাথায় আগেই এসেছে, তবুও বলতেই হয় আজকাল তোর চিন্তায় মাঝে মাঝে বেশ ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু দস্তুর যদি সুপ্রকাশ হয়, তাহলে মনে করা যেতে পারে সে গবেষণার নোটসের লোভেই ওখানে আস্তানা নিয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই যদি খামটা চুরি করে থাকে তাহলে সেটা গেল কোথায় ? আর তার পক্ষে নিজে চুরি করাটা সম্ভবই বা হয় কী করে ? সে তো দোতলায় কোনোদিন যায়ইনি।'

আমার সত্যিই মাথা খুলে গেছে। ব্যাপারটা তো জলের মতো সোজা। বললাম, 'উনি যাবেন কেন ? ধর যদি ওঁর সঙ্গে শঙ্কর নন্তর যড় হয়ে থাকে ? শঙ্করই কাগজটা চুরি করে ওঁকে এনে দিয়েছে, আর তার জন্য কিছু টাকাও পেয়ে গেছে।'

'এক্সেলেন্ট', বলল ফেলুদা। 'আদ্দিনে বলা যায় তুই আমার উপযুক্ত আসিস্টান্ট হলি। কিন্তু এতে তো খুনের রহস্যের সমাধান হচ্ছে না।'

'ধর যদি রণজিৎবাবু বুঝে থাকেন যে দস্তুর আসলে সুপ্রকাশ। রণজিৎবাবু তো নীহারবাবুর সব ব্যাপারই জানেন, আর সেই সঙ্গে নীহারবাবুকে দারুণ ভক্তিও করেন। যে লোক নীহারবাবুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছিল, তার উপর প্রচণ্ড আক্রোশে খুন করতে পারেন না রণজিৎবাবু ?'

ফেলুদা মাথা নাড়ল।

'খুন জিনিসটা অত সহজ নয় রে তোপ্‌শে। রণজিতের মোটিভটাকে মোটেই জোরালো বলা চলে না। আসল আপসোসের ব্যাপার হচ্ছে যে দস্তুর লোকটার ঘরে সার্চ করে এখন অবধি কিছু পাওয়া গেল না। অত্যন্ত সাবধানী লোক ছিলেন এই দস্তুর।'

'আমার কী মনে হয় জান ফেলুদা ?'

ফেলুদা পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে চাইল। আমি বললাম, 'পুলিশের বদলে তুমি যদি সার্চ করতে তাহলে অনেক রকম ক্লু পেতে।'

'বলছিস ?'

ফেলুদা নিজের ওপর কনফিডেন্স হারাচ্ছে এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না; কিন্তু ওর এই 'বলছিস' কথাটাতে যেন ওটারই একটা আভাস পেলাম। আর তারপর যে কথাটা বলল তাতে মনটা আরো দমে গেল।

'এই গরম আর এই লোড শেডিং-এ আইনস্টাইনেরও মাথা খুলত কিনা সন্দেহ।'

দুটো নাগাদ ইন্সপেক্টর বক্সীর ফোন এল। দস্তুরের একটা জুতোর গোড়ালির মধ্যে একটা চোরা খুপরিতে আমেরিকান ডলার আর জার্মান মার্ক

। প্রায় সতের হাজার টাকা পাওয়া গেছে। কিন্তু এমন কোনো কাগজ বা ন পাওয়া যায়নি যা থেকে লোকটার বিষয় কিছু জানা যায়। কটুনিক্স-এর নতুন কোনো দোকানের হদিস মেলেনি, দপ্তরের কোনো বন্ধুরও ন পাওয়া যায়নি। চিঠিপত্র প্রায় ছিল না বললেই চলে। একটি মাত্র ক্তগত চিঠি, আর্জেনটিনা থেকে লেখা, যা থেকে বোঝা যায় যে সে দক্ষিণ মেরিকায় কিছুদিন কাটিয়েছিল।

বকশীর দ্বিতীয় খবর হচ্ছে এই যে, নিউ কোরিনথিয়ান লজের ম্যানেজারকে ছবি দেখাতে সে শঙ্করকে চিনেছে; কাল সারারাত নাকি শঙ্কর কয়েকজন বন্ধু সমেত হোটেলের একটা ঘর ভাড়া করে সেখানে নেশা করেছে আর জুয়া খেলেছে। সকাল হতে তারা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। বকশী বললেন এবার শঙ্করকে ধরা নাকি 'এ ম্যাটার অফ মিনিট্‌স'।

ফেলুদা সব শুনেটুনে ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, 'শঙ্করবাবু যদি হোটেলের পেমেন্টটা চুরির টাকায় করতেন তাহলে খুব সুবিধে হত। যাই হোক, এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে খুনটা সে করেনি, কারণ সেই সময়টা তার অ্যালিবাই ছিল।'

অ্যালিবাই কথাটার মানে অবিশ্যি আমি অনেকদিন থেকেই জানি, কিন্তু যারা জানে না তাদের বাঙলায় কীভাবে বোঝানো যায় জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল, 'ডিকশনারিতে যা লেখা আছে তাই লিখে দে'। তাই বলছি, অ্যালিবাই মানে হল—'অপরাধের অনুষ্ঠানকালে অন্যত্র থাকার অজুহাতে রেহাই পাইবার দাবি।' তার মানে 'আমার বাড়িতে যখন খুন হয় তখন আমি কোরিনথিয়ান লজে বসে জুয়া খেলছিলাম'—এটাই হবে শঙ্করের অ্যালিবাই।

টেলিফোনটা পেয়েও ফেলুদার উসখুস ভাব গেল না। তিনটে নাগাদ দেখি ও পায়জামা ছেড়ে ট্রাউজারস পরেছে। বলল কতগুলো তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তাই বেরোচ্ছে। ফিরল প্রায় সাড়ে চারটেয় আমি এই দেড় ঘণ্টা একটানা মহাভারত পড়ে শেষ করে ফেলেছি।

মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদী নকুল সহদেব সবাই একে একে মরে গিয়ে ঠিক যখন অর্জুনের পতন হব-হব, তখন ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ফেলুদার ফোন, গোলোকধাম থেকে সুধীরবাবু কথা বলতে চাইছেন।

ফেলুদা তার ঘরেই ফোন ধরল; আমি বসবার ঘরের ফোনে কান লাগিয়ে দু' তরফের কথাই শুনে নিলাম।

'হ্যালো।'

'কে মিঃ মিত্তির?'

'বলুন মিঃ দত্ত।'

'দাদার গবেষণার নোট্‌স সমেত সীল করা খামটা পাওয়া গেছে।'

'দস্তুরের ঘরে ছিল কি ?'

'ঠিক বলেছেন। খাটের পাটাতনের তলায় সেলোটেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল। একদিকের সেলোটেপ খুলে গিয়ে খামটা ঝুলছিল। পেয়েছে আমাদের চাকর ভগীরথ।'

'আপনার দাদা জানেন খবরটা ?'

'তা জানেন। তবে দাদার মধ্যে কেমন যেন একটা হাল-ছেড়ে-দেওয়া ভাব এসেছে। কোনো ব্যাপারেই যেন বিশেষ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। আজ সারাদিন চেয়ার ছেড়ে ওঠেননি। আমি আমাদের ডাক্তারকে আসতে বলেছি।'

'আপনার ছেলের কোনো খবর আছে ?'

'আছে। জি টি রোডে ওদের পুরো দলটাই ধরা পড়েছে।'

'আর চোরাই টাকা ?'

'সেটা নিলেও অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে। অবিশ্যি চুরির ব্যাপারটা শঙ্কর সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে।'

'খুনের ব্যাপারে পুলিশ কী বলছে ?'

'ওরা সুখওয়ানিকেই সন্দেহ করছে। তাছাড়া একটা নতুন ক্লু-ও পাওয়া গেছে। দস্তুরের জানলার বাইরে পড়ে থাকা একটা দলা পাকানো কাগজ।'

'কী লেখা আছে তাতে ?'

'ইংরিজিতে এক লাইন হুমকি—"অতিরিক্ত কৌতূহলের পরিণাম কী জান তো" ?'

'সুখওয়ানি কী বলে ?'

'সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। তার ঘর থেকে যে দস্তুরের ঘরে যাবার কোনো উপায় নেই সেটা ঠিকই, কিন্তু একটা ভাড়াটে গুণ্ডা পাইপ বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে অনায়াসেই সে কাজটা করতে পারে।'

'হুঁ...ঠিক আছে, আমি একবার আসছি।'

ফেলুদা ফোনটা রেখে দিয়ে প্রথমে আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, 'X আর Y তাহলে একই লোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে Z-কে নিয়ে।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'ডেসটিনেশন গোলোকধাম। তৈরি হয়ে নে তোপ্‌শে।'

॥ ৪ ॥

'আপনি চললেন নাকি ?'

গোলোকধামের গেট দিয়ে ঢুকে দেখি রণজিৎবাবু আসছেন। বাইরে পুলিশ

দেখে বুঝেছি বাড়িটার উপর নজর রাখা হয়েছে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন রণজিৎবাবু, 'নীহারবাবু বললেন আজ আর আমাকে প্রয়োজন হবে না।'

'উনি আছেন কেমন?'

'ডাক্তার এসেছিলেন। বললেন বাড়িতে এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটাতে শক্ পেয়েছেন। প্রেশারটা ওঠানামা করছে।'

'কথা বলছেন কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বলছেন,' আশ্বাসের সুরে বললেন রণজিৎবাবু।

'যে খামটা পাওয়া গেছে দস্তুরের ঘর থেকে সেটা একবার দেখব। আপনার খুব তাড়া না থাকলে আর একবারটি চলুন ওপরে। আলমারিতে আছে তো ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখব না কথা দিচ্ছি। এ বাড়িতে তো আর বিশেষ আসা-টাসা হবে না।'

'কিন্তু খাম তো সীল করা,' কিন্তু-কিন্তু ভাব করে বললেন রণজিৎবাবু।

'তাহলেও আমি জিনিসটা একবার শুধু হাতে নিয়ে দেখতে চাই।'

রণজিৎবাবু আর আপত্তি করলেন না।

আজও বাড়ি অন্ধকার, দশটার আগে আলো আসবে না, এখন বেজেছে মাত্র সোয়া ছ'টা। দোতলার বারান্দায় আর ল্যান্ডিং-এ কেরোসিন ল্যাম্প জ্বললেও আনাচে-কানাচে অন্ধকার।

রণজিৎবাবু আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়ে সুধীরবাবুকে খবর দিতে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন যে নীহারবাবু যদি খামটা আলমারি থেকে বার করার ব্যাপারে আপত্তি করেন, তাহলে কিন্তু সেটা দেখানো সম্ভব হবে না।

'সেটা বলাই বাহুল্য,' বলল ফেলুদা।

সুধীরবাবুকে দেখে বেশ ক্লান্ত বলে মনে হল। বললেন সারাদিন নাকি খবরের কাগজের রিপোর্টারদের ঠেকিয়ে রাখতেই কেটে গেছে।—'তবে একটা ভালো এই যে, দাদার নামটা লোকে ভুলতে বসেছিল, এই সুবাদে আবার মনে পড়ছে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই রণজিৎবাবু এলেন, হাতে লম্বা সাদা খাম। বললেন, 'নীহারবাবু আপনার নাম শুনেই বোধ হয় আপত্তি করলেন না। এমনিতেই কাউকে দেখতে দিতেন না।'

'আশ্চর্য,' ফেলুদা খামটা হাতে নিয়ে ল্যাম্পের তলায় এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখে মন্তব্য করল। আমার চোখে মনে হচ্ছে সাধারণ লম্বা খাম, পিছনে লাল

গন্ধার সীল, সামনের দিকে ওপরের বাঁ কোণে ছাপার হরফে লেখা "ডিপার্টমেন্ট অব বায়োকেমিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান, মিশিগ্যান, ইউ এস এ"। এতে যে আশ্চর্যের কী আছে জানি না। সুধীরবাবু আর রণজিৎবাবু বসে আছেন আবছা অন্ধকারে, তাঁদেরও মনের অবস্থা নিশ্চয়ই আমারই মতো।

ফেলুদা সোফায় এসে বসল, তার দৃষ্টি তখনো খামটার দিকে। তারপর দুই ভদ্রলোককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, শুধু আমাকেই উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করল। ভাবটা স্কুলমাস্টারের। এই মেজাজে অনেক সময় অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান দিয়েছে ফেলুদা আমাকে।

'বুঝেছিস তোপ্‌শে, আশ্চর্য জিনিস এই ইংরেজি হরফ। বাংলায় সব মিলিয়ে গোটা দশ বারো ধাঁচের হরফ আছে, আর ইংরিজিতে আছে কম পক্ষে হাজার দুয়েক। একটা তদন্তের ব্যাপারে আমাকে এই নিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করতে হয়েছিল। হরফের শ্রেণী আছে, জাত আছে, প্রতিটি শ্রেণীর আলাদা নাম আছে। যেমন এই বিশেষ ডিজাইনের হরফের নাম হল গ্যারামন্ড।'—ফেলুদা খামের উপর ছাপা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের দিকে আঙুল দেখাল। তারপর বলে চলল—

'এই গ্যারামন্ড টাইপের উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে, ফ্রান্সে। তারপর ক্রমে এই টাইপ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ড, জার্মানি, সুইটজারল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে শুধু যে এই টাইপের প্রচলন হয় তা নয়, ক্রমে এই সব দেশের নিজস্ব কারখানায় এই টাইপের ছাঁচ তৈরি করা শুরু হয়। এমন-কি সম্প্রতি ভারতবর্ষেও এটা হচ্ছে। মজা এই যে, খুব ভালো করে দেখলে দেখা যায় যে এক দেশের গ্যারামন্ডের সঙ্গে অন্য দেশের গ্যারামন্ডের সূক্ষ্ম তফাত রয়েছে। কয়েকটা বিশেষ বিশেষ অক্ষরের গড়নে এই তফাতটা ধরা পড়ে। যেমন এই খামের উপরের হরফটা হওয়া উচিত আমেরিকান গ্যারামন্ড, কিন্তু তা না হয়ে এটা হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান গ্যারামন্ড। এমন-কি ক্যালকাটা গ্যারামন্ডও বলতে পারিস।'

ঘরে থমথমে স্তব্ধতা। ফেলুদার দৃষ্টি খাম থেকে চলে গেছে রণজিৎবাবুর দিকে। লন্ডনে মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়ামে মোমের তৈরি বিখ্যাত লোকের মূর্তির ছবি দেখেছি; তার সব কিছু অবিকল মানুষের মতো হলেও, শুধু কাচের চোখগুলো দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটা জ্যান্ত নয়। রণজিৎবাবু জ্যান্ত হলেও, তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটো দেখাচ্ছে অনেকটা সেই মোমের মূর্তির চোখের মতো।

'কিছু মনে করবেন না রণজিৎবাবু, আমি এই খামটা খুলতে বাধ্য হচ্ছি।'

রণজিৎবাবু তাঁর ডান হাতটা তুলে একটা বাধা দেওয়ার ভঙ্গির মাঝপথে

থেমে গেলেন।

একটা তীক্ষ্ণ শব্দের সঙ্গে ফেলুদার দু' আঙুলের এক টানে খামের পাশটা ছিঁড়ে গেল। তারপর সেই দু' আঙুলেরই আরেকটা টানে খামের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক তাড়া ফুলস্ক্যাপ কাগজ।

রুল টানা ফুলস্ক্যাপ।

তাতে শুধু রুলই আছে, লেখা নেই। অর্থাৎ যাকে বলে ব্ল্যাঙ্ক পেপার।

কাচের চোখ এখন বন্ধ, মাথা হেঁট, দু' হাতের কনুই হাঁটুর উপর, হাতের তেলোয় মুখ ঢাকা।

'রণজিৎবাবু,'—ফেলুদার গলা গম্ভীর—'আপনি গতকাল সকালে এসে যে চোর আসার ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটা একেবারে ধাপ্পা, তাই না?'

রণজিৎবাবুর মুখ দিয়ে উত্তরের বদলে বেরোল শুধু একটা গোঙানির শব্দ। ফেলুদা বলে চলল—

'আসলে রাত্তিরে চোর এসেছে এমন একটা ধারণা প্রচার করার দরকার ছিল আপনার। কারণ আপনি নিজেই চুরির জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, এবং সন্দেহটা যাতে আপনার উপর না পড়ে সেদিকটা দেখা দরকার ছিল। আমার বিশ্বাস সকালে চোর আসার ধাপ্পাটা দিয়ে দুপুরের দিকে সুযোগ বুঝে আপনিই আলমারি খোলেন এবং খুলে দুটি কাজ সারেন—তেত্রিশ হাজার টাকা এবং নীহারবাবুর গবেষণার নোট্‌স হস্তগত করা। আমার বিশ্বাস এই জাল খামটা কাল তৈরি ছিল না; এটা আপনি রাতারাতি ছাপিয়ে নিয়েছেন। এটার হঠাৎ প্রয়োজন হল কেন সেটা জানতে পারি কি?'

রণজিৎবাবু এবার ফেলুদার দিকে চোখ তুললেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, 'কাল বিকেলে দত্তরের গলা শুনে নীহারবাবু ওকে সুপ্রকাশ চৌধুরী বলে চিনতে পেরেছিলেন! আমাকে বললেন, "বিশ বছর পরে লোকটার লোভ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমার কাগজপত্র ওই সরিয়েছে।" এখন...'

'বুঝেছি। তখন আপনি ভাবলেন চুরিটা দত্তরের ঘাড়ে চাপানোর এই সুযোগ। আপনিই তো পুলিশ চলে যাবার পর সেলোটেপ দিয়ে খামটাকে খাটের তলায় আটকে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন—ঠিক এমন ভাবে যাতে নীচু হলেই সেটা চোখে পড়ে, তাই না?'

রণজিৎবাবু প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

'আমায় মাপ করবেন! আমি ফেরত দিয়ে দেব! টাকা আর কাগজপত্র আমি কালই ফেরত দিয়ে দেব, মিঃ মিত্তির! আমি...আমি লোভ সামলাতে পারিনি। সত্যি বলছি, আমি লোভ সামলাতে পারিনি!'

'ফেরত আপনাকে দিতেই হবে। না হলে আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে

দেব সেটা বুঝতেই পারছেন।'

'আমি জানি,' বললেন রণজিৎবাবু।—'তবে একটা অনুরোধ। নীহারবাবু যেন জানতে না পারেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি এ শক্ সহ্য করতে পারবেন না।'

'বেশ। তিনি জানবেন না এটা কথা দিচ্ছি। কিন্তু আপনি এত ভালো ছাত্র হয়ে এটা কী করলেন?'

রণজিৎবাবু ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইলেন। ফেলুদা বলে চলল—

'আমি আপনার প্রোফেসর বাগচীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আপনার উপর আমার সন্দেহ পড়ে চাবির গর্তের পাশের দাগ দেখে। চোর অত অসাবধানে কাজ করে না। বিশেষত যেখানে ঘরে লোক রয়েছে, দরজার বাইরে চাকর রয়েছে। যাই হোক, আপনার ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল ছিল সেটা উনি বললেন। পরীক্ষা দিলে আপনি ফার্স্ট ক্লাস পেতেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। হঠাৎ পড়াশুনা বন্ধ করে সেক্রেটারির চাকরিটা নেওয়া কি শর্ট কাটে নোবেল প্রাইজের লোভ?'

রণজিৎবাবু ভয়ে, লজ্জায়, অনুশোচনায় আর কথাই বলতে পারলেন না। ওঁর অবস্থা দেখে আমার মতো ফেলুদারও যে মায়া হচ্ছিল সেটা ওর পরের কথা থেকেই বুঝলাম।

'আপনি এবার বাড়ি যেতে চান যেতে পারেন। কালকের জন্য আর অপেক্ষা করব না আমরা। আপনি আজই আসল কাগজপত্র আর টাকা নিয়ে চলে আসুন। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার সঙ্গে যাতে পুলিশ থাকে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এতগুলো টাকা নিয়ে যাতায়াত করাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

সুবোধ বালকের মতো মাথা নাড়লেন রণজিৎ ব্যানার্জি।

সুবীরবাবু তাঁর ছেলে সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না কেন, সে যে চুরি করেনি, সেটা জেনে তাঁর নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। অন্তত তাঁর চেহারা দেখে আর গলার স্বরে তাই মনে হল। বললেন, 'একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবেন কি?'

'নিশ্চয়ই,' বলল ফেলুদা, 'সেটাই তো আসল কাজ।'

সুবীরবাবুর পিছন পিছন আমরা নীহারবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

'আপনারা এসেছেন?' চেয়ারে শোয়া অবস্থায় প্রশ্ন করলেন নীহারবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা। 'আপনার গবেষণার কাগজপত্রগুলো ফেরত পেয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন?'

'ওগুলোর আর বিশেষ কোনো মূল্য নেই আমার কাছে,' নিচু গলায় ক্লান্ত ভাবে বললেন নীহারবাবু। এক দিনে একজন মানুষ এত ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। কালকেও দেখে মনে হয়েছে ভদ্রলোক রীতিমতো শক্ত।

'আপনার কাছে মূল্য না থাকলেও আমাদের কাছে আছে,' বলল ফেলুদা। 'বিশ্বের অনেক বৈজ্ঞানিকের কাছে আছে।'

'সে আপনারা বুঝবেন।'

'আপনাকে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই। কথা দিচ্ছি এর পরে আর বিরক্ত করব না।'

নীহারবাবুর ঠোঁটের কোণে একটা ম্লান হাসি দেখা দিল। বললেন, 'বিরক্ত আর করবেন কী করে ? বিরক্তির অনেক উর্ধ্বে চলে গেছি যে আমি !'

'তাহলে বলি শুনুন। কাল টেবিলের উপর দেখেছিলাম ঘুমের ট্যাবলেট দশটা। আজও দেখছি দশটা। আপনি কি কাল তাহলে ঘুমের ওষুধ খাননি ?'

'না, খাইনি। আজ খাব।'

'তাহলে আসি আমরা !'

'দাঁড়ান।'

নীহারবাবু তাঁর ডান হাতটা ফেলুদার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দু'জনের হাত মিলল। ভদ্রলোক ফেলুদার হাতটা বেশ ভালো করে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন— 'আপনি বুঝবেন। আপনার দৃষ্টি আছে।'

বাড়িতে এসেও ফেলুদা গম্ভীর। কিন্তু তা বলে আমি অত রহস্য বরদাস্ত করব কেন ? চেপে ধরে বললাম, 'ঢাক ঢাক গুড় গুড় চলবে না। সব খুলে বল।'

ফেলুদা উত্তরে রামায়ণে চলে গেল। ওর সাসপেন্স বাড়ানোর কিছু কায়দা আমি সত্যিই বুঝে উঠতে পারি না।

'রামকে বনবাসে পাঠানোর ছ'দিন পর দশরথের হঠাৎ মনে পড়েছিল যে তিনি যুবরাজ অবস্থায় একটা সাংঘাতিক কুকীর্তি করে ফেলেছিলেন, আর সেই কারণেই আজ তাঁকে পুত্রশোক ভোগ করতে হচ্ছে। তোর মনে আছে সে কুকীর্তিটা কী ?'

রামায়ণটা টাটকা পড়া ছিল না, কিন্তু এ ঘটনাটা মনে ছিল। বললাম, 'অন্ধমুনির ছেলে রাত্রে নদীতে জল তুলছিল কলসীতে। দশরথ অন্ধকারে শব্দ শুনে ভাবলেন বুঝি হাতি জল খাচ্ছে। উনি শব্দভেদী বাণ মেরে ছেলেটিকে মেরে ফেলেছিলেন।'

'গুড। অন্ধকারে শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করার এই ক্ষমতাটা ছিল দশরথের। নীহারবাবুরও ছিল।'

'নীহারবাবু!'—আমি প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম।

'ইয়েস স্যার,' বলল ফেলুদা।—'রাত জাগতে হবে বলে ঘুমের ওষুধ খাননি। সবাই যখন ঘুমে অচেতন, তখন খালি পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যান দস্তুর সুপ্রকাশের ঘরে। এই ঘরে এক কালে ওঁর ভাইপো থাকত। ঘর ওঁর চেনা। হাতে ছিল অস্ত্র—রূপো দিয়ে বাঁধানো জাঁদরেল লাঠি। খাটের কাছে গিয়ে লাঠি দিয়ে মোক্ষম ঘা। একবার নয়, তিনবার।'

'কিন্তু...কিন্তু...'

আমার এখনো সাংঘাতিক গোলমাল লাগছে। এসব কী বলছে ফেলুদা? লোকটা তো অন্ধ।

'একটা কথা কি মনে পড়ছে না তোর?' অসহিষ্ণুভাবে বলল ফেলুদা। 'সুখওয়ানি কী বলেছে দস্তুর সম্পর্কে?'

বিদ্যুতের ঝলকের মতো কথাটা মনে পড়ে গেল।

'দস্তুরের নাক ডাকত!!'

'এগজ্যাক্টলি!' বলল ফেলুদা।—'তার মানে বালিশের কোনখানে মাথা, কোন পাশে ফিরে রয়েছে, এ সবই বুঝতে পেরেছিলেন নীহারবাবু। তার আর এর চেয়ে বেশি জানার কী দরকার? এক ঘায়ে যদি না হয়, তিন ঘায়ে তো হবেই!'

আমি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এই অসমাপ্ত কাজটার কথাই কি বলেছিলেন নীহারবাবু? প্রতিশোধ?'

'প্রতিশোধ,' বলল ফেলুদা, 'জিঘাংসা। অন্ধেরও দেহমনে প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার করতে পারে এই প্রবৃত্তি। এই জিঘাংসাই তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিল। এখন তিনি মৃত্যুশয্যায়। আর সেই কারণেই তিনি আইনের নাগালের বাইরে।'

আরো সাতের দিন বেঁচে ছিলেন নীহাররঞ্জন দত্ত। মারা যাবার ঠিক আগে তিনি উইল করে তাঁর গবেষণার কাগজপত্র আর জমানো টাকা দিয়ে গেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত মেধাবী সেক্রেটারি রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

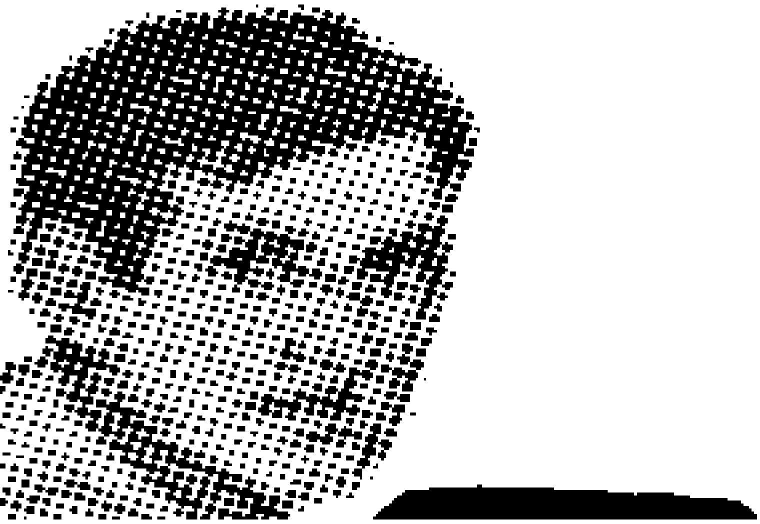

নেপোলিয়নের চিঠি

Pradosh C. Mitter

Private Investigator

নেপোলিয়নের চিঠি

॥ ১ ॥

'তুমি কি ফেলুদা ?'

প্রশ্নটা এল ফেলুদার কোমরের কাছ থেকে। একটি বছর ছয়েকের ছেলে ফেলুদার পাশেই দাঁড়িয়ে মাথাটাকে চিত করে তার দিকে চেয়ে আছে। এই সে দিনই একটা বাংলা কাগজে ফেলুদার একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে, তার সঙ্গে হাতে চারমিনার নিয়ে একটা ছবি। তার ফলে ফেলুদার চেহারাটা আজকাল রাস্তাঘাটে লোকে ফিল্মস্টারের মতোই চিনে ফেলছে। আমরা এসেছি পার্ক স্ট্রিট আর রাসেল স্ট্রিটের মোড়ে খেলনা আর লাল মাছের দোকান হবি সেন্টারে। সিধু জ্যাঠার সত্তর বছরের জন্মদিনে তাঁকে একটা ভাল দাবার সেট উপহার দিতে চায় ফেলুদা।

ছেলেটির মাথায় আলতো করে হাত রেখে ফেলুদা বলল, 'ঠিক ধরেছ তুমি।'

'আমার পাখিটা কে নিয়েছে বলে দিতে পারো ?' বেশ একটা চ্যালেঞ্জের সুরে বলল ছেলেটি। ততক্ষণে ফেলুদারই বয়সী এক ভদ্রলোক ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা লম্বা প্যাকেট নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন, তাঁর মুখে খুশির সঙ্গে একটা অপ্রস্তুত ভাব মেশানো।

'তোমার নিজের নামটাও বলে দাও ফেলুদাকে', বললেন ভদ্রলোক।

'অনিরুদ্ধ হালদার', গম্ভীর মেজাজে বলল ছেলেটা।

'ইনি আপনার খুদে ভক্তদের একজন', বললেন ভদ্রলোক। 'আপনার সব গল্প ওর মার কাছ থেকে শোনা।'

'পাখির কথা কী বলছিল ?'

'ও কিছু না', ভদ্রলোক হালকা হেসে বললেন, 'পাখি পোষার শখ হয়েছিল, তাই ওকে একটা চন্দনা কিনে দিয়েছিলাম। যে দিন আসে সে দিনই কে খাঁচা থেকে পাখিটা বার করে নিয়ে যায়।'

'খালি একটা পালক পড়ে আছে', বলল ফেলুদার খুদে ভক্ত।

'তাই বুঝি ?'

'রাত্তিরে ছিল পাখিটা, সকালবেলা নেই। রহস্য।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। তা অনিরুদ্ধ হালদার এই রহস্যের ব্যাপারে কিছু করতে পারেন না ?'

'আমি বুঝি গোয়েন্দা ? আমি তো ক্লাস টু-তে পড়ি।'

ছেলের বাবা আর বেশিদূর কথা এগোতে দিলেন না।

'চলো অনু। আমাদের আবার নিউ মার্কেট যেতে হবে। তুমি বরং ফেলুদাকে একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে বলো।'

ছেলে বাবার অনুরোধ চালান করে দিল। এবার ভদ্রলোক একটা কার্ড বের করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমার নাম অমিতাভ হালদার।'

ফেলুদা কার্ডটায় একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'বারাসতে থাকেন দেখছি।'

'আপনি হয়তো আমার বাবার নাম শুনে থাকতে পারেন। পার্বতীচরণ হালদার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ওঁর লেখা-টেখাও তো পড়েছি। ওঁরই সব নানারকম জিনিসের কালেকশান আছে না ?'

'ওটা বাবার নেশা। ব্যারিস্টারি ছেড়ে এখন ওসবই করেন। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন ওই সবের পিছনে। আপনার তো অনেক ব্যাপারে ইয়ে আছে, আমার মনে হয় আপনি দেখলে আনন্দ পাবেন। আদ্যিকালের গ্রামোফোন, মুগল আমলের দাবা বড়ে, ওয়ারেন হেস্টিংসের নস্যির কৌটো, নেপোলিয়নের চিঠি...। তা ছাড়া আমাদের বাড়িটাও খুব ইন্টারেস্টিং। দেড়শো বছরের পুরনো। এক দিন যদি ফ্রি থাকেন, একটা ফোন করে দিলে—রোববার-টোববার...। আমিই বরং একটা ফোন করব। ডাইরেক্টরিতে তো আপনার— ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নামেই আছে। এই যে।'

ফেলুদাও তার একটা কার্ড ভদ্রলোককে দিয়ে দিল।

কথা হয়ে গেল আমরা এই মাসেই এক দিন বারাসত গিয়ে হাজির হব। লালমোহনবাবুর গাড়ি আছে, যাবার কোনও অসুবিধে নেই। এখানে বলে রাখি, লালমোহনবাবু বহাল তবিয়তে এবং খোশমেজাজে আছেন, কারণ এই পুজোয় জটায়ুর জায়ান্ট অমনিবাস বেরিয়েছে, তাতে বাছাই করা দশটা সেরা রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস। দাম পঁচিশ টাকা এবং লালমোহনবাবুর ভাষায় 'সেলিং লাইক হট কচুরিজ।'

সন্ধ্যাবেলা ফেলুদার মুখ শুকনো দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার। ও বলল, 'খুদে মক্কেলের আরজিটা মাথায় ঘুরছে রে।'

'সেই চন্দনার ব্যাপারটা?'

'খাঁচা থেকে পাখি চুরি যায় শুনেছিস কখনও?'

তা শুনিনি সেটা স্বীকার করতেই হল।—'তুমি কি এর মধ্যেও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ নাকি?'

'ব্যাপারটা ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে পড়ে না। চন্দনা তো আর বার্ড অফ প্যারাডাইজ নয়। এক যদি না কারও নেগলিজেন্সে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুল হয়ে গিয়ে থাকে।'

'কিন্তু সেটা তো আর জানবার কোনও উপায় নেই।'

'তা থাকবে না কেন? ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়। আসলে বুঝতে পারছি এ ব্যাপারটা ও-বাড়ির কেউ সিরিয়াসলি নেয়নি। ঘটনাটা যে অস্বাভাবিক সেটা কারুর মাথায় ঢোকেনি। অথচ ছেলের মনটা যে খচ্ খচ্ করছে সেটা বুঝতে পারছি, না হলে আমায় দেখে ও কথাটা বলত না। অন্তত একবার যদি গিয়ে দেখা যেত...'

'তা ভদ্রলোক তো বললেনই যেতে।'

'হ্যাঁ—কিন্তু সেটাও হয়তো আমাকে সামনা-সামনি দেখলেন বলে। বাড়ি ফিরে সে কথা আর মনে নাও থাকতে পারে। ছোট্ট ছেলের অনুরোধ বলেই মনে হচ্ছে সেটাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

ক্রিসমাসের যখন আর পাঁচ দিন বাকি তখনই এক শনিবারের সকালে এসে গেল অমিতাভবাবুর ফোন। আমি কলটা ফেলুদার ঘরে ট্রানসফার করে বসবার ঘরের মেন টেলিফোনে কান লাগিয়ে শুনলাম।

'মিঃ মিত্তির ?'

'বলুন কী খবর।'

'আমার ছেলে তো মাথা খেয়ে ফেলল। কবে আসছেন ?'

'পাখির কোনও সন্ধান পেলেন ?'

'নাঃ—সে আর পাওয়া যাবে না।'

'ভয় হয়, আপনার ছেলে যদি ধরে বসে থাকে তার পাখি উদ্ধার করে দেব, তখন সেটা না পাওয়া গেলে তো বেইজ্জতের ব্যাপার হবে।'

'সে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। ছেলেকে খানিকটা সময় দিলেই সে খুশি হয়ে যাবে। আসলে আমার বাবার সঙ্গে একবার আপনার আলাপ করিয়ে দিতে চাই। আজ তো আমার ছুটি আপনি কী করছেন ?'

'তেমন কিছুই না। আজ দশটা নাগাদ হলে হবে ?'

'নিশ্চয়ই।'

শনি রবি দু' দিনই আমাদের বাড়িতে সকাল ন'টায় লালমোহনবাবুর আসাটা একেবারে হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আসাটা কলকাতা শহরে আজকাল আর সম্ভব নয়, তবে দশ মিনিট এদিক ওদিকের বেশি হয় না কোনও দিনই। আজও হল না। ঠিক ন'টা বেজে পাঁচ মিনিটে ঘরে ঢুকে ধপ্ করে সোফায় বসে পড়ে বললেন, 'কালি কলম মন, লেখে তিনজন। মশাই, পুজোর লেখার ধকলের পর শীতকালটা এলে লেখার চিন্তাটা থাউজ্যান্ড মাইলস দূরে চলে যায়—কালি কলম খাতার দিকে আর চাইতেই ইচ্ছা করে না।'

লালমোহনবাবু ইদানীং প্রবাদ নিয়ে ভীষণ মেতে উঠেছেন। সাড়ে তিনশো প্রবাদ নাকি উনি মুখস্থ করেছেন। লেখার ফাঁকে ফাঁকে লাগসই প্রবাদ গুঁজে দিতে পারলে সাহিত্যের রস নাকি

ঘনীভূত হয়। তিনি অবিশ্যি শুধু লেখায় নয়, কথাতেও যখন-তখন প্রবাদ লাগাচ্ছেন। আজ ভদ্রলোকের পরনে ছাই রঙের টেরিলিনের প্যান্ট আর সবুজ সোয়েটার, আর হাতে এক চাঙাড়ি কচুরি। কচুরির কারণ আর কিছুই না—হট কচুরির আজকাল আর তেমন ডিমান্ড আছে কি না ফেলুদার এই প্রশ্নের উত্তরে লালমোহনবাবু বলেন, 'মশাই, বাগবাজারের মোহন ময়রার দোকানে কচুরির জন্য কিউ দেখলে মনে হবে সেখানে কোনও বোম্বাই-মার্কা হিন্দি হিট ছবি চলছে। আপনাকে খাওয়ালে বুঝবেন উপমাটা কত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট।'

সঙ্গে এক ফ্লাস্ক জল আর কচুরির চাঙাড়িটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবু পার্বতী হালদারের নাম শোনেননি। তবে নেপোলিয়নের চিঠি শুনে ভয়ানক ইমপ্রেস্‌ড হলেন। বললেন ইস্কুলে থাকতে ওঁর হিরো নাকি ছিল নেপোলিয়ন। 'গ্রেট ম্যান, বোনাপার্টি' কথাটা বার তিনেক চাপা গলায় বললেন যাবার পথে।

ভি আই পি রোডের আগে স্পিড তুলতে পারলেন না লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু। বারাসতে যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

অমিতাভবাবুদের বাড়িটা মেন রোডের উপরেই, তবে গাছপালায় ঘেরা বলে আসল বাড়িটা রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। গেট দিয়ে ঢুকে নুড়ি ফেলা রাস্তায় খানিকটা গিয়ে তবে থামওয়ালা দালানটা দেখা যায়। একেবারে সাহেবি ঢঙের বাড়ি, বয়সের ছাপ যতটা থাকার কথা ততটা নেই; মনে হয় বছরখানেকের মধ্যেই অন্তত সামনের অংশটায় চুনকাম ও রিপেয়ার দুই-ই হয়েছে। বাড়ির সামনে একটা বাঁধানো পুকুরের চারিপাশে সুপুরি গাছের সারি।

অমিতাভবাবু নীচেই অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য, ফেলুদা লালমোহনবাবুর সঙ্গে আলাপ করানোতে বললেন, 'আমি নিজে আপনার লেখা পড়িনি বটে, তবে আমার স্ত্রী রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের ভীষণ ভক্ত।'

আমরা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম।

পার্বতীবাবুর কালেকশনের জিনিস নাকি সবই দোতলায়।

'বাবার আগে আমার পুত্রের সঙ্গে দেখাটা সেরে নিন', বললেন অমিতাভবাবু। 'বাবার কাছে এখন লোক আছে। উনি বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎগুলো সকালেই করেন।'

'অ্যাদ্দুরেও লোক এসে উৎপাত করে?'

'বাবার মতো কিছু কালেক্টর আছেন, তাঁরা প্রায়ই আসেন। তা ছাড়া সম্প্রতি বাবা একজন সেক্রেটারির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তার জন্য কিছু লোক দেখা করতে আসছে।'

'ওনার সেক্রেটারি নেই?'

'আছে, তবে তিনি দিল্লি চলে যাচ্ছেন সামনের সপ্তাহে একটা ভাল কাজ পেয়ে। লোকটি বেশ কাজের ছিল। আসলে সেক্রেটারির ব্যাপারে বাবার লাকটাই খারাপ। গত দশ বছরে চারটি সেক্রেটারি এল গেল। একটি তো বছরখানেক কাজ করার পর মেনিনজাইটিসে মারা গেলেন। আরেকটি কথা নেই বার্তা নেই, সাঁইবাবার ভক্ত হয়ে বিবাগী হয়ে গেলেন। এখন যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাবা কথা বলছেন, তাকে সাত বছর আগে তাড়িয়ে দেন। সেও ছিল সেক্রেটারি।'

'কেন, তাড়ান কেন?'

'ভদ্রলোক কাজ খুব ভালই করতেন, তবে অসম্ভব কুসংস্কারী। বাবা সেটা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। একবার ইজিপ্ট থেকে একটা জেড পাথরের মূর্তি আনার পর কলকাতায় এসে বাবার অসুখ করে। সাধনবাবু বাবাকে সিরিয়াসলি বলেন যে, মূর্তিটি যে দেবীর, তাঁর অভিশাপ পড়েছে বাবার ওপর। এই এক কথাতেই বাবা তাঁকে একরকম ঘাড় ধরে বার করে দেন।'

'এই সাধনবাবু যদি আবার এসে থাকেন তা হলে তাঁকে খুবই অপটিমিস্টিক বলতে হবে, এবং আপনার বাবাকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল বলতে হয়।'

'আসলে লোকটাকে তাড়িয়ে দেবার পর বাবার একটু অনুশোচনা হয়েছিল। কারণ ভদ্রলোকের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। আর বাবা ওঁকে সার্টিফিকেটও দেননি।'

বাড়িটা বাইরে থেকে বিলিতি ধাঁচের হলেও, ভিতরটা বাংলা জমিদারি বাড়ির মতোই। মাঝখানের নাটমন্দিরকে ঘিরে দোতলার বারান্দার এক পাশে সারি সারি ঘর। বৈঠকখানা, আর পার্বতীচরণের স্টাডি বা কাজের ঘর সামনের দিকে, আর ভিতর দিকে সব শোবার ঘর। ফেলুদার খুদে মক্কেল বারান্দায় তার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাব, এমন সময় জুতোর শব্দ শুনে বৈঠকখানার দিকে চেয়ে দেখি, নীল কোট পরা হাতে ব্রিফকেসওয়ালা একজন লোক গটগটিয়ে ঘরটা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। অমিতাভবাবু বললেন, 'এই সেই প্রাক্তন সেক্রেটারি সাধনবাবু। ভদ্রলোককে খুব প্রসন্ন বলে মনে হল না।'

'এই যে আমার পাখির খাঁচা', ফেলুদা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল অনিরুদ্ধ।

'আমি তো সেটাই দেখতে এলাম।'

খাঁচাটা একটা হুক থেকে ঝুলছে বারান্দায় রেলিং-এর উপরে। ঝকঝকে ভাবটা দেখে বোঝা যায় খাঁচাটাও কেনা হয়েছিল পাখির সঙ্গেই। ফেলুদা সেটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা এখনও খোলাই রয়েছে।

'আপনার বাড়ির কোনও চাকরের পাখিতে অ্যালার্জি আছে বলে জানেন?'

অমিতাভবাবু হেসে উঠলেন।

'সেটা ভাববার তো কোনও কারণ দেখি না। আমাদের বাড়ির কোনও চাকরই কুড়ি বছরের কম পুরনো নয়। তা ছাড়া এক কালে এ বাড়িতে একসঙ্গে দুটো গ্রে প্যারট ছিল। বাবা নিজেই এনেছিলেন। অনেক দিন ছিল তারপর মারা যায়।'

'এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন কি?'

ফেলুদা বেশ কিছুক্ষণ হাত দিয়ে খাঁচাটাকে নেড়ে-চেড়ে প্রশ্নটা করল।

অমিতাভবাবুর সঙ্গে আমরা দুজনও এগিয়ে গেলাম।

ফেলুদা খাঁচার দরজাটার একটা অংশে আঙুল দিয়ে দেখাল।

'ছোট্ট একটা লালের ছোপ বলে মনে হচ্ছে?' বললেন

অমিতাভবাবু। 'তার মানে কি— ?'

'যা ভাবছেন তাই। ব্লাড।'

'চন্দনা মার্ডার ?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'পাখির রক্ত না মানুষের রক্ত সেটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস না করে বোঝা যাবে না। তবে একটা স্ট্রাগল হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অবিশ্যি সেটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটা বোঝাই যাচ্ছে যে খাঁচার দরজা খোলা রাখার জন্য পাখি পালায়নি ; দরজা খুলে পাখিকে বার করে নেওয়া হয়েছে। আপনারা কোত্থেকে কিনেছিলেন পাখিটা ?'

'নিউ মার্কেট,' বলে উঠল অনিরুদ্ধ।

অমিতাভবাবু বললেন, 'নিউ মার্কেটের তিনকড়িবাবুর পাখির দোকান খুব পুরনো দোকান। আমাদের জানাশোনা অনেকেই ওখান থেকে পাখি কিনেছে।'

অনিরুদ্ধর ইচ্ছা ছিল তার নতুন কেনা খেলনাগুলো আমাদের দেখায়, বিশেষ করে মেট্রিমোনটা, কিন্তু অমিতাভবাবু বললেন, 'এঁরা আবার তোমার কাছে আসবেন। তখন তোমার খেলনা দেখবেন, তোমার মা-র সঙ্গে আলাপ করবেন, চা খাবেন—সব হবে। আগে দাদুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, কেমন ?'

আমরা পার্বতীবাবুর স্টাডির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

কিন্তু দাদুর সঙ্গে আর আলাপ হল না। লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন, এক-একটা ঘটনার শক্-এর এফেক্ট নাকি সারা জীবন থাকে। এটা সেইরকম একটা ঘটনা।

বৈঠকখানায় ঢুকেই বুঝেছিলাম চারিদিকে দেখবার জিনিস গিজগিজ করছে। সে সব দেখার সময় ঢের আছে মনে করে আমরা এগিয়ে গেলাম ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পরদা দেওয়া স্টাডির দরজার দিকে।

'আসুন' বলে অমিতাভবাবু গিয়ে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। আর ঢোকামাত্র এক অস্ফুট চিৎকার দিয়ে উঠলেন—

'বাবা !'

ফেলুদার অমিতাভবাবুকে দু' হাত দিয়ে ধরতে হল, কারণ ভদ্রলোক প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন।

তক্ষণে আমরা দুজনেও ঘরে ঢুকেছি।

বিরাট মেহগনি টেবিলের পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন পার্বতীচরণ হালদার। তাঁর মাথাটা চিত, দুটো পাথরের মতো চোখ চেয়ে আছে সিলিং-এর দিকে, হাত দুটো ঝুলে রয়েছে চেয়ারের দুটো হাতলের পাশে।

ফেলুদা এক দৌড়ে চলে গেছে ভদ্রলোকের পাশে। নাড়ীটা দেখার জন্য হাতটা বাড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোরা দৌড়ে গিয়ে ওই সাধন লোকটাকে আটকা...দারোয়ানকে বল। দরকার হলে বাইরে রাস্তায় দ্যাখ্—'

আমার সঙ্গে সঙ্গে লালমোহনবাবুও ছুট দিলেন। মন বলছিল, দশ মিনিট চলে গেছে, সে লোককে আর পাওয়া যাবে না—বিশেষ করে যদি সে খুন করে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায় কোলিশন হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম উনি পার্বতীচরণের বর্তমান সেক্রেটারি হৃষীকেশবাবু। দুজন অচেনা লোককে এইভাবে তড়িঘড়ি নামতে দেখে তিনি কী ভাবলেন সেটা আর তখন ভাবার সময় ছিল না।

বাইরে কেউ নেই, রাস্তায়ও না, কারুর থাকার কথাও নয়। যেটা সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সেটা হল এই যে দারোয়ান জোর গলায় বলল গত দশ মিনিটের মধ্যে কেউ গেট দিয়ে বাইরে যায়নি। বাবুর কাছে লোক আসবে বলে সে সকাল থেকে ডিউটিতে রয়েছে, তার ভুল হতেই পারে না।

'চলো বাগানের দিকটা দেখি', বললেন লালমোহনবাবু, 'হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।'

তাই করলাম। দক্ষিণের পুকুরের ধার, পশ্চিমের গোলাপ বাগান, কম্পাউন্ড ওয়ালের পাশটা, চাকরদের ঘরের আশেপাশে, কোথাও বাদ দিলাম না। পাঁচিল টপকানোও সহজ নয়, কারণ প্রায় আট ফুট উঁচু। হাল ছাড়তে হল। সাধনবাবু উধাও।

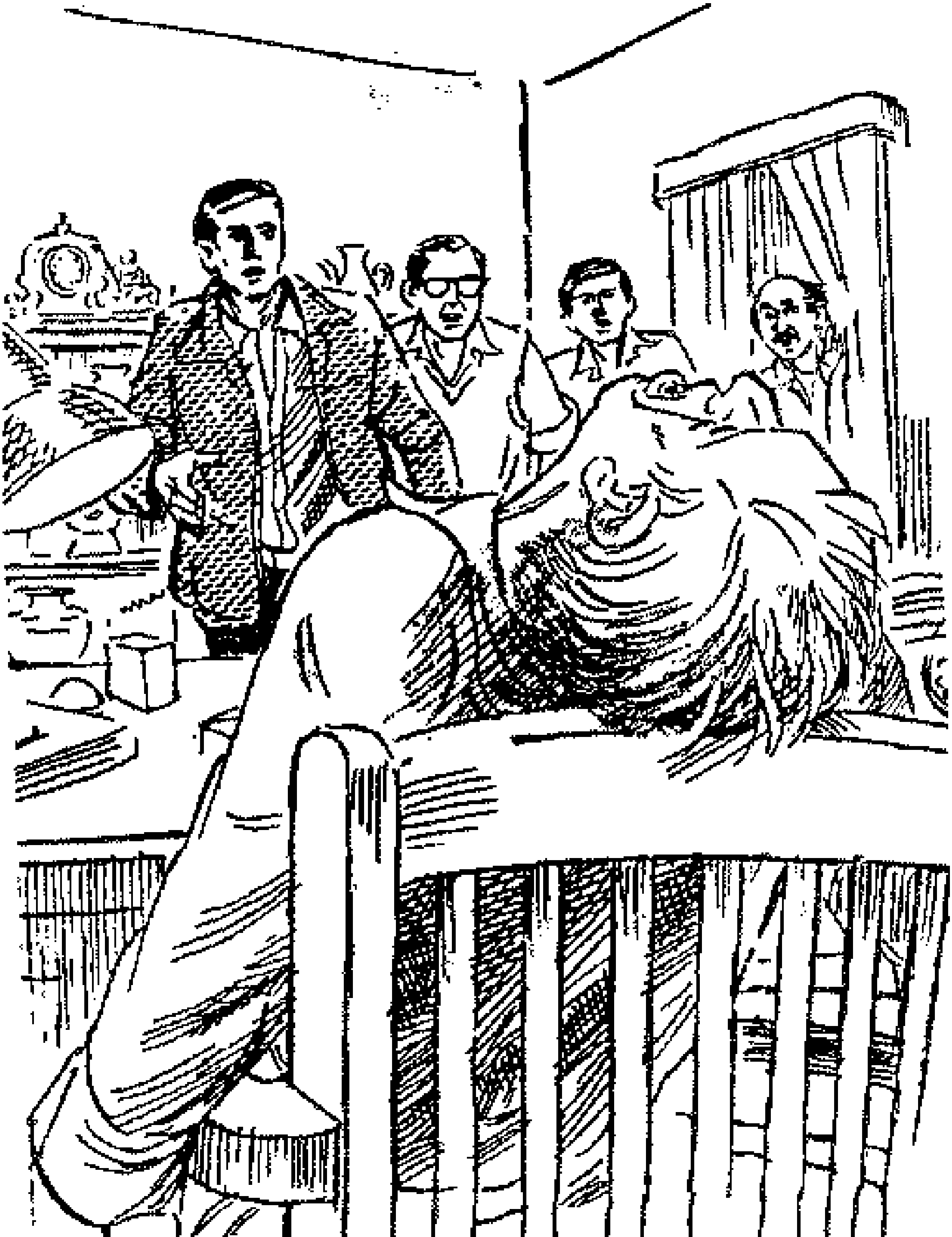

॥ ২ ॥

পার্বতীবাবুকে মাথার উপরের একটা ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত মেরে খুন করা হয়েছে। এঁদের বাড়ির ডাক্তার সৌরীন সোম বললেন, মৃত্যুটা হয়েছে মারার সঙ্গে সঙ্গেই। ভদ্রলোকের রক্তের চাপ ওঠা-নামা করত, হার্টেরও গোলমাল ছিল।

ইতিমধ্যে পুলিশও এসে গেছে। ইনস্পেক্টর হাজরা ফেলুদাকে চেনেন। মোটামুটি খাতিরও করেন। সাধারণ পুলিশের লোক প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরকে যে রকম অবজ্ঞার চোখে দেখে, সে রকম নয়। বললেন, 'আমাদের যা রুটিন কাজ তা করে যাচ্ছি আমরা, যদি কিছু তথ্য বেরোয় তো আপনাকে জানাব।'

ফেলুদা বলল, 'যে ভারী জিনিসটা দিয়ে খুন করা হয়েছিল সেটা সম্বন্ধে কোনও আইডিয়া করেছেন?'

হাজরা বললেন, 'তেমন তো কিছু দেখছি না আশেপাশে। খুনি সেই জিনিসটা নিয়েই ভেগেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'পেপারওয়েট।'

'পেপারওয়েট?'

'একবার আসুন আমার সঙ্গে।'

হাজরা ও ফেলুদার পিছন পিছন আমরাও ঢুকলাম ঘরের মধ্যে।

ফেলুদা টেবিলের একটা অংশে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সবুজ ফেল্টের উপর মিহি ধুলো জমে আছে। তারই একটা অংশে একটা ধুলোহীন গোল চাকতি। খুব ভাল করে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না।

'অমিতাভবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম', বলল ফেলুদা, 'একটা বেশ বড় এবং ভারী ভিক্টোরীয় আমলের কাচের পেপারওয়েট থাকত এই টেবিলের উপর। এখন নেই।'

'ওয়েল ডান, মিস্টার মিত্তির!'

'কিন্তু আসল লোক তো বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে', ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল ফেলুদা।

হাজরা বললেন, 'নাম আর ডেসক্রিপশন যখন পাওয়া গেছে, তখন তাকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া সে তো অ্যাপ্লিকেশন করেছিল; সেটা থেকে থাকলে তো তার ঠিকানাই পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় দারোয়ান সত্যি কথা বলছে না। একটা সময় সে গেটের কাছে ছিল না; তখনই লোকটা পালিয়েছে। মেন রোডের উপর বাড়ি, হয়তো বেরিয়েই বাস পেয়ে গেছে। অবিশ্যি সে ছাড়াও তো আরও লোক এসেছিল সকালে। সাধনবাবু আসার ঠিক আগেই আরেকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। খুনটা তিনিও করে থাকতে পারেন।'

'কিন্তু পার্বতীবাবুকে মৃত দেখলে সাধনবাবু আর থাকবেন কেন?'

'আপনি তো দেখেছেন ঘরটা। ও তো কিউরিওর দোকান মশাই। একজন লোক যদি অসৎ হয়, ও ঘরে ঢুকে মালিক মৃত দেখলে তো তার পোয়াবারো!'

'আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন কোনও জিনিস গেছে কি না?'

ফেলুদা প্রশ্নটা করল বর্তমান সেক্রেটারি হৃষীকেশ দত্তকে। ভদ্রলোক দশটার ঠিক আগে বেরিয়েছিলেন পোস্ট আপিসে দুটো জরুরি বিদেশি টেলিগ্রাম করতে। ফেরার পরেই আমাদের সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হয়।

'তা হয়তো পারতে পারি', বললেন হৃষীকেশবাবু। 'বাইরের যা জিনিস তা মোটামুটি সবই আমার জানা। ভিতরে আলমারিবন্দি জিনিসেরও একটা তালিকা একবার আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন মিঃ হালদার। তার কিছু জিনিস বোধ হয় আজ পেস্টনজীকে দেখাবার জন্য বার করেছিলেন। পেস্টনজী আসেন সাড়ে ন'টায়।'

'এই পেস্টনজীর সঙ্গে কি আগেই আলাপ ছিল পার্বতীবাবুর?'

'খুব। প্রায় দশ বছরের আলাপ। মাসে অন্তত দুবার করে আসতেন। উনিও একজন কালেক্টার। মিঃ হালদারের সংগ্রহে

একটা চিঠি ছিল, সেটা দেখতেই ভদ্রলোক আসেন।'

'এটা কি সেই নেপোলিয়নের চিঠি?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি মিঃ হালদার বিক্রি করার কথা ভাবছিলেন?'

'মোটেই না। পেস্টনজীর খুব লোভ ছিল ওটার উপর। তিনি মোটা টাকা অফার করবেন, আর মিঃ হালদার রিফিউজ করবেন—তাতে পেস্টনজীর মুখের ভাবটা কেমন হবে সেটা দেখেই মিঃ হালদারের আনন্দ। এ ব্যাপারে ওঁর একটা জিদও ছিল। এই চিঠিটা কেনার জন্য একবার এক আমেরিকান দাম চড়াতে চড়াতে বিশ হাজার ডলারে উঠেছিল। মিঃ হালদার ক্রমাগত মাথা নেড়ে গেলেন। সাহেবের মুখ লাল, শেষ পর্যন্ত মুখ খারাপ করতে আরম্ভ করল, আর সমস্ত ব্যাপারটা বসে বসে উপভোগ করলেন মিঃ হালদার। আজও পেস্টনজী গলা চড়াতে শুরু করেছিলেন সেটা আমি বাইরে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম।'

'কীসের মধ্যে থাকত জিনিসটা?'

'একটা অ্যালক্যাথিনের খামে।'

'তা হলে বোধ হয় যায়নি চিঠিটা। কারণ খামটা টেবিলের উপরই রয়েছে। আর তার মধ্যে একটা সাদা ভাঁজ করা কাগজও দেখলাম।'

'না গেলেই ভাল। ও চিঠির মর্ম সকলে বুঝবে না।'

চুরি হয়েছে কি না সেটা এখন জানা যাবে না, কারণ পুলিশ ও ঘরে কাজ করছে; তা ছাড়া পুলিশের ডাক্তার এইমাত্র এসেছেন, তিনি লাশ পরীক্ষা করছেন।

হৃষীকেশবাবু বললেন, 'আশ্চর্য। যে সময় সাধনবাবু গেলেন, প্রায় সে সময়ই আমি ফিরেছি। অথচ লোকটার সঙ্গে দেখা হল না।'

'আপনি বেরিয়েছেন ক'টায়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক দশটা বাজতে পাঁচ। এখান থেকে পাঁচ মিনিট লাগে পোস্টাপিস যেতে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রামগুলো দিতে চেয়েছিলাম।'

'সে তো পাঁচ মিনিটের কাজ, তা হলে ফিরতে এত দেরি হল কেন?'

হৃষীকেশবাবু মাথা নাড়ালেন।—'আর বলবেন না মশাই! ঘড়ির ব্যান্ডের খোঁজ করছিলুম স্টেশনারি দোকানগুলোতে। দেখছেন না ডান হাতে ঘড়ি পরেছি। ব্যান্ডটা ঢিলে হয়ে গেছে। বাঁ কব্জি আমার ডান কব্জির চেয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি সরু। ব্যান্ড ঢলঢল করে। কোনও লাভ হল না। সেই নিউ মার্কেট ছাড়া গতি নেই।'

ভদ্রলোক ডান হাতে ঘড়ি পরেন সেটা আগেই লক্ষ করেছি।

'আপনি এ বাড়িতেই থাকেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। অমিতাভবাবু ভিতরে সামলাচ্ছেন, তা ছাড়া উনি নিজেও বেশ ভেঙে পড়েছেন, তাই ফেলুদা হৃষীকেশবাবুর কাছ থেকে যা তথ্য পাওয়া যায় বার করে নিচ্ছে।

'হ্যাঁ, এ বাড়িতেই', বললেন হৃষীকেশবাবু, 'একতলায়। ফ্যামিলি-ট্যামিলি নেই, তাই মিঃ হালদার বললেন এখানেই থাকতে; ঘরের তো অভাব নেই। সাধনবাবুও শুনেছি এ বাড়িতেই থাকতেন।'

'এ কাজ তো ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন আপনি। ভাল লাগছিল না বুঝি?'

'প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল মশাই। তা ছাড়া উন্নতির সুযোগ আজকের দিনে কে ছাড়ে বলুন। মিঃ হালদার অবিশ্যি এমপ্লয়ার হিসেবে ভালই ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই আমার।'

আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এর মধ্যে আলাপ হয়েছে, যদিও কথা হয়নি। তিনি হলেন অমিতাভবাবুর ছোট ভাই অচিন্ত্যবাবু। ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন, তাই বোধ হয় পুলিশ এখন তাঁকে জেরা করছে। ফেলুদা হৃষীকেশবাবুকেই জিজ্ঞেস করলেন ছোট ভাইয়ের কথা।

'অচিন্ত্যবাবু কী করেন?'

'থিয়েটার।'

'থিয়েটার?'

আমরা তিনজনেই অবাক।

'পেশাদারি থিয়েটার? মানে থিয়েটার করেই ওঁর রোজগার?'

হৃষীকেশবাবুকে উত্তরটা দিতে যেন বেশ একটু ভাবতে হল। বললেন, 'এ সব ভেতরের ব্যাপার। আর সত্যি, আমার পক্ষে বলাটা বোধ হয় খুব শোভা পায় না। এ ফ্যামিলিতে থিয়েটার কথাটা বেমানান তাতে সন্দেহ নেই, তবে আমার একটা সন্দেহ হয়েছে যে অচিন্ত্যবাবুর মনে একটা বড় রকমের অভিমান ছিল। চার ভাইয়ের মধ্যে উনিই একমাত্র বিলেত যাননি পড়াশুনো করতে। আসলে বড় ফ্যামিলিতে ছোট ভাই অনেক সময় একটু নেগলেকটেড হয়। ওঁনার ক্ষেত্রে মনে হয় সেটাই হয়েছে। আমার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কথাবার্তা থেকেও সেটাই মনে হয়েছে। চাকরি একটা করিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ হালদারই, কিন্তু অচিন্ত্যবাবু সেটা ছেড়ে দেন। থিয়েটারের শখটা বোধ হয় এমনিতেই ছিল। ধারাসঙ্গে একটা ড্রামাটিক ক্লাব নিয়ে খুব মেতে ওঠেন, কিন্তু তাতে মন ভরে না। এখন নতুন দলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছেন। দু-একটা হিরোর পার্টও নাকি করেছেন। কালও দেখছিলাম পার্ট মুখস্থ করছেন।'

এবারে ইনস্পেক্টর হাজরা এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। অচিন্ত্যবাবুর জেরা শেষ। তিনি গোমড়া মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাজরা বললেন, 'খুনটা হয়েছে দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। পেস্টনজী ছিলেন সাড়ে ন'টা থেকে দশটার কিছু পর অবধি। সাধন দস্তিদার এসেছেন সোয়া দশটায়, গেছেন সাড়ে দশটায়। ছোট ছেলের ঘর থেকে বাইরের বারান্দা দিয়ে সোজা বাপের ঘরে যাওয়া যায়। বাড়ির ভেতরের লোক দেখতে পাবে না। দশটা পাঁচ থেকে সোয়া দশটার মধ্যে অচিন্ত্যবাবু বাপের ঘরে এসে থাকতে পারেন। উনি বলছেন সারা সকাল পার্ট মুখস্থ করেছেন, কেবল সাড়ে দশটা নাগাদ একবার ভাইপো অনিরুদ্ধর ডাক পেয়ে তার কাছে যান তার খেলার মেশিনগানটা দেখতে। তখনও তিনি বাপের মৃত্যু-সংবাদ পাননি। যাই হোক, মোটামুটি তিন জনেরই মোটিভ ছিল। ছেলের সঙ্গে বাপের বনত না,

পেস্টনজী ছিলেন মিঃ হালদারের রাইভ্যাল, আর সাধন দস্তিদারের ছিল পুরনো আক্রোশ। এই হল ব্যাপার। এবার আপনি এসে একটু দেখে বলুন তো কিছু চুরি গেছে কি না।'

শেষ অনুরোধটা করা হল হৃষীকেশবাবুকে। ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন স্টাডির দিকে, আমরা তাঁর পিছনে।

ঘরটায় ঢুকে হৃষীকেশবাবু একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। মেক্যানিক্যাল জিনিসে পার্বতীবাবুর খুব শখ ছিল, কারণ বৈঠকখানায় দেখেছি একটা প্রথম যুগের সিলিন্ডার গ্রামোফোন, আর এ ঘরে দেখছি একটা আদিকালের ম্যাজিক ল্যানটার্ন। তা ছাড়া ছোট ছোট মূর্তি, পাত্র, দোয়াত, কলম, পিস্তল, পুরনো ছবি, ম্যাপ, বই—এ সব তো আছেই। বাইরের জিনিসপত্র দেখে, চাবি দিয়ে আলমারি, বাক্স দেরাজ ইত্যাদি খুলে দেখে অবশেষে হৃষীকেশবাবু জানালেন যে কোনও জিনিস গেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

ফেলুদা বলল, 'আপনি অ্যালক্যাথিনের খামটা একবার দেখলেন না ?'

'ওতে তো চিঠিটা রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।'

'তবু একবার দেখে নেওয়া উচিত।'

হৃষীকেশবাবুকে খামটা খুলে ভেতরের কাগজটা টেনে বার করতে হল। কাগজের রংটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল; পুরনো কাগজ কি এত সাদা হয় ? ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ফেলেই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন।

'এ কী ! এ তো প্যাড থেকে ছেঁড়া হালদার মশাইয়ের নিজের চিঠির কাগজ !'

অর্থাৎ নেপোলিয়নের চিঠি উধাও।

॥ ৩ ॥

আরও আধ ঘণ্টা ছিলাম আমরা হালদারবাড়িতে। সেই সময়টা ফেলুদা বাড়ির কম্পাউন্ডটা ঘুরে দেখল। বাগানটা দেখা শেষ করে, কম্পাউন্ড ওয়ালের কোনও অংশ নিচু বা ভাঙা আছে কি না দেখে আমরা পুকুরের কাছে এলাম। ফেলুদার দৃষ্টি মাটির দিকে, জানি ও পায়ের ছাপ খুঁজছে। শুকনো মাটি, পায়ের ছাপের সম্ভাবনা কম, তবে পুকুরের পূর্ব পাড়ে একটা অংশে ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সে থেমে গেল।

একটা ছোট্ট বুনো ফুলের গাছ যেন কীসের চাপে পিষে গেছে। আর সেটা হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই।

ফেলুদা ফুলের আশপাশটা দেখে পুকুরের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এ পুকুর ব্যবহার হয় না, তাই জলটা পানার আবরণে ঢেকে গেছে। আমরা যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে হাত পাঁচেক দূরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে পানা সরে গিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছে।

কিছু ফেলা হয়েছে কি জলের মধ্যে ? তাই তো মনে হয়।

কিন্তু ফেলুদা এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করল না। যা দেখবার ও দেখে নিয়েছে।

বাড়ি ফেরার সময় লালমোহনবাবু হঠাৎ বললেন, 'বাগানে একটা চন্দনা দেখলুম বলে মনে হল। একটা পেয়ারা গাছ থেকে উড়ে একটা সজনে গাছে গিয়ে বসল।'

'সেটা আমাদের বললেন না কেন?' ধমকের সুরে বলল ফেলুদা।

'কী জানি, যদি বেরিয়ে যায় টিয়া! দুটো পাখি এত কাছাকাছি। তবে এ পাখিটা কথা বলে।'

'আপনি শুনলেন কথা?'

'শুনলুম বইকী। আপনারা তখন বাগানের উল্টো দিকে। আমি আরেকটু হলেই একটা তেঁতুলে বিছের উপর পা ফেলেছি, এমন সময় শুনলুম, "বাবু, সাবধান!" আর মুখ তুলে দেখি পাখি।'

'পাখি বলল বাবু সাবধান?'

'তাই তো স্পষ্ট শুনলুম। আপনারা বিশ্বাস করবেন না বলেই বলিনি।'

বিশ্বাস করাটা সত্যিই কঠিন, তাই কথা আর এগোল না।

তবে এটা ঠিক যে এ রকম একটা খুন আর এ রকম চুরির পরেও ফেলুদার মন থেকে চন্দনার ব্যাপারটা যাচ্ছে না। খুনের দু' দিন পর, সোমবার সকালে চা খাওয়ার পর ফেলুদার কথায় সেটা বুঝতে পারলাম। ও বলল, 'পার্বতীবাবুর খুন আর নেপোলিয়নের চিঠি চুরি—এই দুটো ঘটনাই গতানুগতিক। কিন্তু আমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছে এই পাখি চুরির ব্যাপারটা।'

গতকাল অমিতাভবাবু ফোন করেছিলেন; ফেলুদা জানিয়ে দিয়েছে যে নেহাত দরকার না পড়লে এই অবস্থায় ও আর ওঁদের বিরক্ত করবে না, বিশেষ করে পুলিশ যখন তদন্ত চালাচ্ছেই। লালমোহনবাবু বলেছেন সোমবার হলেও আজ একবার আসবেন, কারণ কী ডেভেলাপমেন্ট হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানার ওঁর বিশেষ আগ্রহ।

আমি বললাম, 'পাখির খাঁচার গায়ে রক্তটা পাখির না মানুষের সেটা তো এখনও জানা গেল না।'

'ওটা যে মানুষের সেটা, অ্যানালিসিস না করেই বলা যায়', বলল ফেলুদা। 'কেউ যদি পাখিকে খাঁচা থেকে বার করতে যায় তা হলে সেটা সাবধানেই করবে, কিন্তু পাখি ছটফট করতে পারে, খামচাতে পারে, ঠোকরাতে পারে। অর্থাৎ যে লোকে পাখিটাকে বার করেছে, তার হাতে জখমের চিহ্ন থাকা উচিত।'

'সে জিনিস ও বাড়ির কারুর হাতে দেখলে?'

'উহুঁ। সেটার দিকে আমি চোখ রেখেছিলাম। বাবু, চাকর কারুর হাতেই দেখিনি। অথচ টাট্‌কা জখম। অমিতাভবাবু বললেন পার্ক স্ট্রিটে আমাদের সঙ্গে দেখা হবার দু' দিন আগে পাখিটা কিনেছিলেন। তার মানে ১৩ ডিসেম্বর। খুনটা হয় ১৯ ডিসেম্বর।...এই পাখির জন্য আমি অন্য ব্যাপারগুলোতে পুরোপুরি মনও দিতে পারছি না।'

'খুনের সুযোগ কার কার ছিল তার একটা লিস্ট করছিলে না তুমি কাল রাত্তিরে?'

'শুধু সুযোগ নয়, মোটিভও।'

ফেলুদার পাশেই সোফায় পড়েছিল খাতাটা। সে ওটা খুলে বলল, 'সাধন দস্তিদার সম্বন্ধে নতুন কথা বলার বিশেষ কিছু নেই। রহস্যটা হচ্ছে তার অন্তর্ধানে। এটা সম্ভব হয় একমাত্র যদি দারোয়ান মিথ্যে কথা বলে থাকে। সাধন তাকে ভালরকম ঘুষ দিয়ে থাকলে এটা হতে পারে। সেটা পুলিশে বার করুক। মিথ্যেবাদীকে সত্যি বলানোর রাস্তা তাদের জানা আছে।

'দ্বিতীয় সাসপেক্ট—পেস্টনজী। তবে পেস্টনজীর সত্তর বছর বয়স ; বুড়ো মানুষের পক্ষে এ খুন সম্ভব কি না সেটা ভাবতে হবে। আঘাতটা করা হয়েছিল রীতিমতো জোরে। অবিশ্যি সত্তরেও অনেকের স্বাস্থ্য দিব্যি ভাল থাকে। সেটা ভদ্রলোককে চাক্ষুষ না দেখা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।

'তৃতীয়—অচিন্ত্য হালদার। বাপের উপর ছেলের টান না থাকলেও খুন করার মতো আক্রোশ ছিল কিনা সেটা ভাবার কথা।

তবে নেপোলিয়নের চিঠি হাতাতে পারলে ওর আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটত ঠিকই। আর কেউ না হোক, পেস্টনজী যে সে চিঠি কিনতে রাজি হতেন, সেটা বোধহয় অনুমান করা যায়। চতুর্থ—'

'আবার আরও একজন আছে নাকি?'

'তাকে সাসপেক্ট বলে বলছি না, কিন্তু অমিতাভবাবু সে সময়টা কী করছিলেন, সেটা জানা দরকার বইকী। তাঁর জবানিতে তিনি বলেছেন সকালে তিনি বাগানে থাকেন। ওঁর খুব ফুলের শখ। সে দিন দশটা পর্যন্ত তিনি বাগানে ছিলেন। মাঝে একবার আমাদের ফোন করতে ন'টার সময় তাঁকে নীচের বৈঠকখানায় আসতে হয়। তারপর আমরা আসার আগে আর দোতলায় যাননি। চাকর তাঁকে চা দিয়ে যায় দশটার সময় একতলায় বাগানের দিকের খোলা বারান্দায়। আমাদের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তিনি সামনের দিকে চলে আসেন। দোতলায় যান তিনি একেবারে আমাদের নিয়ে, তার আগে নয়।

'সব শেষে হলেন হৃষীকেশবাবু। ইনি দশটা বাজতে পাঁচে বেরিয়েছেন সেটা দারোয়ান দেখেছে, কিন্তু ফিরতে দেখেছে কিনা মনে করতে পারছে না। দারোয়ানের কথাবার্তা খুব রিলায়েবল বলে মনে হয় না। চল্লিশ বছর চাকরি করছে বটে হালদার বাড়িতে, হয়তো এমনিতে বিশ্বস্ত, কিন্তু বয়স হয়েছে সত্তরের উপর, কাজেই স্মরণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসা অস্বাভাবিক নয়। হৃষীকেশবাবু স্টেশনারি দোকানে অতটা সময় কাটিয়েছেন কিনা সেটা জানা দরকার। যদি সে ব্যাপারে মিথ্যেও বলে থাকেন, তার খুনের সুযোগ সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। একমাত্র নেপোলিয়নের চিঠি হাত করা ছাড়া মোটিভও খুঁজে পাওয়া যায় না।'

ফেলুদা খাতাটা বন্ধ করল। আমি বললাম, 'চাকর-বাকরদের বোধহয় সব ক'টাকেই বাদ দেওয়া যায়?'

'শুনলিই তো চাকর সব ক'টাই পুরনো। তাদের মধ্যে বেয়ারা মুকুন্দ পার্বতীচরণের ঘরে কফি নিয়ে যায় পেস্টনজী ও পার্বতীবাবুর জন্য। পার্বতীচরণ একা থাকলেও রোজ দশটায় কফি খেতেন। এ ছাড়া আর কোনও চাকর ন'টার পর পার্বতীচরণের ঘরে যায়নি।

বাড়িতে লোক বলতে আর আছে অমিতাভবাবুর স্ত্রী, অনিরুদ্ধ, পার্বতীবাবুর আশি বছরের বুড়ি মা, মালি, মালির এক ছেলে, ড্রাইভার ও দারোয়ান। অচিন্ত্যবাবু বিয়ে করেননি।'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেজে উঠল। ইনস্পেক্টর হাজরা।

'কী খবর বলুন স্যার', বলল ফেলুদা।

'সাধন দস্তিদারের ঠিকানা পাওয়া গেছে।'

'ভেরি গুড।'

'ভেরি ব্যাড, কারণ সে ঠিকানায় ওই নামে কেউ থাকে না।'

'বটে?'

'এবং কোনও দিন ছিলও না।'

'তা হলে?'

'তা হলে আর কী—যে তিমিরে সেই তিমিরে। মহা ফিচেল লোক বলে মনে হচ্ছে।'

'আর হৃষীকেশবাবুর অ্যালিবাই ঠিক আছে?'

'উনি পোস্টাপিসে গিয়েছিলেন দশটায় এবং টেলিগ্রামগুলো করেছেন এটা ঠিক। তারপর স্টেশনারি দোকানে যাবার কথা যেটা বললেন সেটা ভেরিফাই করা গেল না, কারণ দোকানে কেউ মনে করতে পারল না।'

'আর পেস্টনজী?'

'অসম্ভব তিরিক্ষি মেজাজের লোক। প্রচণ্ড ধনী। দেড়শো বছর কলকাতায় আছে এই পার্শি ফ্যামিলি। এমনিতে বেশ শক্ত সমর্থ লোক, তবে কাবু হয়ে আছেন আরথ্রাইটিসে, ডান হাত কাঁধের উপর ওঠে না। ওঁর পক্ষে এই খুন প্রায় ইমপসিবল। লর্ড সিন্‌হা রোডে গিয়ে রোজ সকালে ফিজিওথেরাপি করান। চেক করে দেখেছি; কথাটা সত্যি।'

'তা হলে তো সাধন দস্তিদারের সন্ধানেই লেগে থাকতে হয়।'

'আমার ধারণা লোকটা বারাসতেই থাকে, কারণ ওর অ্যাপ্লিকেশনের খামে বারাসতের পোস্টমার্ক রয়েছে।'

'সে কী, এ তো খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।'

'আমরা খোঁজ করছি। এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। ও, ভাল কথা, খোকার ঘরে চোর এসেছিল।'

'আবার ?'

'আবার মানে ?'

হাজরা পাখির কথাটা জানেন না। ফেলুদা সেটা চেপে গিয়ে বলল, 'না, বলছিলাম—একটা চুরি তো হল বাড়িতে, আবার চোর ?'

'যাই হোক, কিছু নেয়নি।'

'খোকা টের পেল কী করে ?'

'সে বাবা-মায়ের পাশের ঘরে একা শোয়। বিলিতি কায়দা আর কী! তা কাল মাঝ রাত্তিরে নাকি খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ছেলের সাহস আছে। "কে" বলে চেঁচিয়ে ওঠে, আর তাতেই নাকি চোর পালিয়ে যায়। আমি খোকাকে জিজ্ঞেস করলুম—তোমার ভয় করল না ? তাতে সে বললে যে বাড়িতে খুন হবার পর থেকে নাকি সে বালিশের তলায় মেশিনগান নিয়ে শোয়, আর সেই কারণেই নাকি তার ভয় নেই।'

দশটার সময় লালমোহনবাবু এসে হাজির। ফেলুদাকে গম্ভীর দেখে ভদ্রলোক ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—'সে কী মশাই, আপনি এখনও অন্ধকারে নাকি ?'

'কী করি বলুন—রোজ যদি একটা করে নতুন রহস্যের উদ্ভব হয়, তা হলে ফেলু মিত্তির কী করে ?'

'আবার রহস্য ?'

'খোকার ঘরে চোর ঢুকেছিল কাল রাত্তিরে।'

'বলেন কী ? চোরের কি কোনও বাছবিচার নেই ? মুড়ি-মিছরি এক দর ?'

'এখন আপনার উপর ভরসা।'

'হুঁ—চন্দ্র-সূর্য অস্ত গেল, জোনাক ধরে বাতি—ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হল রথী! তবে হ্যাঁ—চন্দনার ব্যাপারটা কিন্তু আমায় হন্ট করছে। ওটা নিয়ে একটা আলাদা তদন্ত করা উচিত। আপনার সময় না থাকলে আমি করতে রাজি আছি। তিনকড়িবাবুর

দোকানে আমার খুব যাতায়াত ছিল এককালে।'

'সে কী, এটা তো বলেননি আগে।'

'আরে মশাই, এককালে খুব পাখির শখ ছিল আমার। একটা ময়না ছিল, সেটাকে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম লাইন আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলাম।'

'জল পড়ে পাতা নড়ে দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল আপনার।'

ভদ্রলোক ফেলুদার খোঁচাটা অগ্রাহ্য করে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কী হে তপেশবাবু, যাবে নিউমার্কেট?'

ফেলুদা বলল, 'যেতে হয় তো বেরিয়ে পড়ুন। আমি ঘণ্টাখানেক পরে আপনাদের মিট করব।

'কোথায়?'

'নিউ মার্কেটের মধ্যিখানে, কামানটার পাশে। বিস্তর ঘোরাঘুরি আছে, বাইরে খাওয়া আছে।'

সপ্তাহে এক দিন রেস্টুরান্টে খাওয়াটা আমাদের রেগুলার ব্যাপার।

লালমোহনবাবুর গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম।

নিউ মার্কেটের পাখির বাজারের জবাব নেই। তবে তিনকড়িবাবু যে জটায়ুকে চিনবেন না তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ ভদ্রলোক এ দোকানে শেষ এসেছেন সিক্সটি এইটে। লালমোহনবাবু এক গাল হেসে 'চিনতে পারছেন?' জিজ্ঞেস করাতে তিনকড়িবাবু তাঁর মোটা চশমার উপর দিয়ে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'চেনা মুখ তো ভুলি না চট করে। নাকু বাবু তো? আপনি কারবালা ট্যাঙ্ক রোডে থাকেন না?'

লালমোহনবাবুর চুপসানো ভাব দেখে আমিই কাজের কথাটা পাড়লাম।

'আপনার এখান থেকে গত দিন দশেকের মধ্যে কি কেউ একটা চন্দনা কিনে নিয়ে গেছে? বারাসতের এক ভদ্রলোক?'

'বারাসতে কিনা জানি না, তবে দু'খানা চন্দনা বিক্রি হয়েছে দিন দশেকের মধ্যে। একটা নিল জয়শক্তি ফিল্মস কোম্পানির নেপেনবাবু। বলল চিন্ময়ী মা না মৃন্ময়ী মা কি একটা বইয়ের

শুটিং-এ লাগবে। ভাড়ায় চাইছিল—আমি বললুম সে দিন আর নেই। নিলে ক্যাশ দিয়ে নিয়ে যান, কাজ হয়ে গেলে পর আপনাদের হিরোইনকে দিয়ে দেবেন।'

'আর অন্যটা যে বেচলেন, সেটা কোত্থেকে এসেছিল আপনার দোকানে মনে আছে?'

'কেন মশাই, অত ইনফরমেশনে কী দরকার?'

ভদ্রলোক একটু সন্দিগ্ধ বলে মনে হল।

'সেই পাখিটা খাঁচা থেকে চুরি গেছে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে', বললেন লালমোহনবাবু, 'সেটা ফিরে পাওয়া দরকার।'

'ফিরে পেতে চান তো কাগজে অ্যাডভারটাইজ দিন।'

'তা না হয় দেব, কিন্তু আপনার দোকানে কোত্থেকে এসেছিল সেটা—'

'অতশত বলতে পারব না। আপনি অ্যাডভারটাইজ দিন।'

'পাখিটা কথা বলত কি?'

'তা বলবে না কেন? তবে কী বলত জিজ্ঞেস করবেন না। সতেরোটা টকিং বার্ড আছে আমার দোকানে। কেউ বলে গুড মর্নিং, কেউ বলে ঠাকুর ভাত দাও, কেউ বলে জয় গুরু, কেউ বলে রাধাকেষ্ট—কোনটা কোন পাখি বলে সেটা ফস্ করে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।'

আধ ঘণ্টা সময় ছিল হাতে, তার মধ্যে লালমোহনবাবু একটা নখ কাটার ক্লিপ, আধ ডজন দেশবন্ধু মিলসের গেঞ্জি আর একটা সিগন্যাল টুথপেস্ট কিনলেন। তারপর চীনে জুতোর দোকানে গিয়ে একটা মোকাসিনের দাম করতে করতে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় এসে গেল। আমরা কামানের কাছে যাবার তিন মিনিটের মধ্যেই ফেলুদা হাজির।

'এবার কোথায় যাওয়া?' মার্কেট থেকে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'পার্শিরা প্রায় দুশো বছর ধরে কলকাতায় আছে, সেটা জানতেন?'

'বলেন কী? সেই সিরাজদ্দৌল্লার আমল থেকে?'

'সেই রকম একটি প্রাচীন পার্শি বাড়িতে এখন যাব আমরা। ঠিকানা হচ্ছে'—ফেলুদা পকেট থেকে খাতা বার করল—

'একশো তেত্রিশের দুই বৌবাজার স্ট্রিট।'

॥ ৪ ॥

একশো তেত্রিশের দুই বৌবাজার স্ট্রিট দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি কি না জানি না। তবে এত পুরনো বাড়িতে এর আগে আমি কখনও যাইনি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দুটো দোকানের মাঝখানে একটা খিলেনের মধ্যে দিয়ে প্যাসেজ পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় গিয়ে ডান দিকে ঘুরে সামনেই দরজার উপর পিতলের ফলকে লেখা 'আর. ডি. পেস্টনজী'। কলিং বেল টিপতেই একজন বেয়ারা এসে দরজা খুলল। ফেলুদা তার হাতে তার নিজের নাম আর পেশা লেখা একটা কার্ড দিয়ে দিল।

মিনিট তিনেক পর বেয়ারা এসে বলল, 'পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারবেন না বাবু।'

তাই সই। আমরা তিনজন বেয়ারার সঙ্গে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকলাম।

বিশাল অন্ধকার বৈঠকখানা, তারই এক পাশে দেওয়ালের সামনে সোফায় বসে আছেন ভদ্রলোক। সামনে টেবিলে রাখা বোতলে পানীয় ও গেলাস। গায়ের রং ফ্যাকাশে। নাকটা টিয়া পাখির মতো ব্যাঁকা, চওড়া কপাল জুড়ে মেচেতা।

সোনার চশমার মধ্যে দিয়ে ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে চেয়ে কর্কশ গলায় বললেন, 'বাট ইউ আর নট ওয়ান ম্যান, ইউ আর এ ক্রাউড!'

ফেলুদা ক্ষমা চেয়ে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিল যে তিনজন হলেও, সে একাই কথা বলবে ; বাকি দুজনকে ভদ্রলোক অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারেন।

'ওয়েল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ন্ট ?'

'আপনি পার্বতী হালদারকে চিনতেন বোধহয় ?'

'মাই গড্, এগেন !'

ফেলুদা হাত তুলে ভদ্রলোককে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে বলল, 'আমি পুলিশের লোক নই সেটা আমার কার্ড দেখেই নিশ্চয় বুঝেছেন। তবে ঘটনাচক্রে আমি এই খুনের তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি ; আমি শুধু জানতে চাইছিলাম—এই যে নেপোলিয়নের চিঠিটা চুরি হয়েছে, সেটা সম্বন্ধে আপনার কী মত।'

পেস্টনজী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি দেখেছ চিঠিটা ?'

ফেলুদা বলল, 'কী করে দেখব, যে দিন ভদ্রলোকের মৃত্যু, সে দিনেই তো আমি প্রথম গেলাম তার বাড়িতে।'

পেস্টনজী বললেন, 'নেপোলিয়নের বিষয় পড়েছ তো তুমি ?'

'তা কিছু পড়েছি।'

ফেলুদা গত দু' দিনে নেপোলিয়ন সম্বন্ধে আর পুরনো আর্টিস্টিক জিনিস সম্বন্ধে সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে বেশ কিছু বই ধার করে এনে পড়েছে সেটা আমি জানি।'

'সেন্ট হেলেনায় তার শেষ নির্বাসনের কথা জানো তো ?'

'তা জানি।'

'কোন সালে সেটা হয়েছিল মনে আছে ?'

'১৮১৫।'

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুঝলাম তিনি ইমপ্রেস্‌ড হয়েছেন। বললেন, 'এই চিঠি লেখা হয়েছিল ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। সেন্ট হেলেনায় যে ছ' বছর বেঁচেছিলেন নেপোলিয়ন, সেই সময়টা তাঁকে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়নি। তার মানে এই চিঠিটা তাঁর শেষ চিঠিগুলির মধ্যে একটা। কাকে লেখা সেটা জানা যায়নি—শুধু 'মঁশেরামী'—অর্থাৎ "আমার প্রিয় বন্ধু।" চিঠির ভাব ও ভাষা অপূর্ব। সব হারিয়েছেন তিনি, কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি এক বিন্দু আদর্শচ্যুত হননি। এ চিঠি লাখে এক। জুরিখ শহরে এক সর্বস্বান্ত মাতালের কাছ থেকে জলের দরে এ চিঠি কিনেছিলেন পার্বতী হালদার। আর সে জিনিস আমার হাতে চলে আসত মাত্র বিশ

হাজার টাকায়।'

'কী রকম?'—আমরা সকলেই অবাক—'মাত্র বিশ হাজার টাকায় এ চিঠি আপনাকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন মিঃ হালদার?'

পেস্টনজী মাথা নাড়লেন।—'নো নো। হি ডিডন্ট ওয়ন্ট টু সেল ইট। হালদারের গোঁ ছিল সাংঘাতিক। ওঁর এদিকটা আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম।'

'তা হলে?'

পেস্টনজী গেলাসটা তুলে মুখে খানিকটা পানীয় ঢেলে বললেন, 'তোমাদের কিছু অফার করতে পারি? চা, বিয়ার—?'

'না না, আমরা এখুনি উঠব।'

'ব্যাপারটা আর কিছুই না' বললেন পেস্টনজী, 'এটা পুলিশকে বলিনি। ওদের জেরার ঠেলায় আমার ব্লাড প্রেশার চড়িয়ে দিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে। ইউ লুক লাইক এ জেন্টলম্যান, তাই তোমাকে বলছি। কাল সকালে একটা বেনামি টেলিফোন আসে। লোকটা সরাসরি আমায় জিজ্ঞেস করে, আমি বিশ হাজার টাকায় নেপোলিয়নের চিঠিটা কিনতে রাজি আছি কি না। আমি তাকে গতকাল রাত্রে আসতে বলি। সে বলে সে নিজে আসবে না, লোক পাঠিয়ে দেবে, আমি যেন তার হাতে টাকাটা দিই। সে এও বলে যে, আমি যদি পুলিশে খবর দিই তা হলে আমারও দশা হবে পার্বতী হালদারের মতো।'

'এসেছিল সে লোক?'—আমরা তিনজনেই যাকে বলে উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ।

পেস্টনজী মাথা নাড়লেন।—'নো। নোবডি কেম।'

আমরা তখনই উঠে পড়তাম, কিন্তু ফেলুদার হঠাৎ পেস্টনজীর পিছনের তাকের উপর রাখা একটা জিনিসের দিকে দৃষ্টি গেছে।

'ওটা মিং যুগের পোর্সিলেন বলে মনে হচ্ছে?'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

'বাঃ, তুমি তো এ সব জানেটানো দেখছি। এক্সকুইজিট জিনিস।'

'একবার যদি...'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। হাতে নিয়ে না দেখলে বুঝতে পারবে না।'

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে জিনিসটার দিকে হাত বাড়িয়েই 'আউচ!' বলে যন্ত্রণায় কুঁচকে গেলেন।

'কী হল?' ফেলুদা গভীর উৎকণ্ঠার সুরে বলল।

'আর বোলো না! বুড়ো বয়সের যত বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম। আরথ্রাইটিস। হাতটা কাঁধের উপর তুলতেই পারি না।'

শেষকালে ফেলুদা নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাক থেকে চীনেমাটির পাত্রটা নামিয়ে নিয়ে হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বার দু'-এক 'সুপার্ব' বলে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

'ভদ্রলোকের সত্যিই হাত ওঠে কি না সেটা যাচাই করা দরকার ছিল', রাস্তায় এসে বলল ফেলুদা।

'ধন্যি মশাই আপনার মস্তিষ্ক! বলুন, এবার কোন্‌দিকে?'

'বলতে সংকোচ হচ্ছে। এবার একেবারে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট।'

'কেন, সংকোচের কী আছে?'

'যা দাম হয়েছে আজকাল পেট্রোলের।'

'আরে মশাই, দাম তো সব কিছুরই বেশি। আমার যে বই ছিল পাঁচ টাকা, সেটা এখন এইট রুপিজ। অথচ সেল একেবারে স্টেডি। আপনি ওসব সংকোচ-টংকোচের কথা বলবেন না।'

কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের নতুন থিয়েটার নবরঙ্গমঞ্চে গিয়ে হাজির হলাম। প্রোপ্রাইটারের নাম অভিলাষ পোদ্দার। ফেলুদা কার্ড পাঠাতেই তৎক্ষণাৎ আমাদের ডাক পড়ল। দোতলার আপিস ঘরে ঢুকলাম গিয়ে।

'আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার, স্বনামধন্য লোকের পায়ের ধুলো পড়ল এই গরিবের ঘরে!'

নাদুস-নুদুস বার্নিশ করা চেহারাটার সঙ্গে এই বাড়িয়ে কথা বলাটা বেশ মানানসই। হাতে সোনার ঘড়ি, ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল—এই সবে এক খিলি পান পুরেছেন মুখে, গা থেকে ভুরভুরে আতরের গন্ধ।

ফেলুদা লালমোহনবাবুকে আলাপ করিয়ে দিল 'গ্রেট থ্রিলার রাইটার' বলে।

'বটে ?' বললেন পোদ্দারমশাই।

'একটা হিন্দি ফিল্ম হয়ে গেছে আমার গল্প থেকে', বললেন জটায়ু। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে। নাটকও হয়েছে একটা গল্প থেকে। গড়পারের রিক্রিয়েশন ক্লাব করেছিল সেভেনটি এইটে।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার জায়ান্ট অমনিবাস একটা পাঠিয়ে দেবেন না মিস্টার পোদ্দারকে।'

'সার্টেনলি, সার্টেনলি', বললেন মিঃ পোদ্দার। 'আমি নিজে অবিশ্যি বই-টই পড়ি না, তবে আমার মাইনে করা লোক আছে। তারা পড়ে ওপিনিয়ন দেয় আমাকে। তা বলুন মিঃ মিত্তির, আপনার কী কাজে লাগতে পারি।'

'আপনাদের একটি হিরো সম্বন্ধে ইনফরমেশন চাই।'

'হিরো ? মানস ব্যানার্জি ?'

'অচিন্ত্য হালদার।'

'অচিন্ত্য হালদার ? কই, ও রকম নামে তো—ও হো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই নামে একটি ছেলে ঘোরাঘুরি করছে বটে। একটা বইয়ে একটা পার্টও করেছিল। চেহারা মোটামুটি ভাল, তবে ভয়েসে গণ্ডগোল। বরং সিনেমা লাইনে কিছু হতে পারে। আমি সেই কথাই বলেছি তাকে। ইন ফ্যাক্ট, ছেলেটি আমাকে টাকা অফার করেছে।'

'মানে ? হিরোর পার্ট পাবার জন্য ?'

'আপনি আকাশ থেকে পড়লেন যে। এ রকম হয় মিঃ মিত্তির।'

'আপনি আমল দেননি ?'

'নো মিঃ মিত্তির। আমাদের নতুন কোম্পানি, এ সব ব্যাপার খুব রিস্কি। এ প্রস্তাবে রাজি হবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ইয়ে—চা, কফি... ?'

'নো, থ্যাঙ্কস।'

আমরা উঠে পড়লাম। দেড়টা বাজে, পেটে বেশ চনচনে খিদে।

রয়েল হোটেলে খাবারের অর্ডার দিয়ে ফেলুদা চন্দনা চুরির ব্যাপারে একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া করে ফেলল। ওর চেনা আছে

খবরের কাগজের আপিসে ; সম্ভব হলে কালকে না হয় লেটেস্ট পরশু কাগজে বেরিয়ে যাবে। গত দশ দিনের মধ্যে নিউ মার্কেটে তিনকড়িবাবুর দোকানে কেউ যদি একটা চন্দনা বিক্রি করে থাকেন, তা হলে তিনি যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায়, ইত্যাদি।

বিরিয়ানি খেতে খেতে একটা নলী হাড় কামড় দিয়ে ভেঙে ম্যারো-টা মুখে পুরে ফেলুদা বলল, 'রহস্য যে রকম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলা মুশকিল।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, দেখি গেস্ করতে পারি কি না', বললেন লালমোহনবাবু, 'এই নতুন রহস্য হচ্ছে—সেই লোক চিঠি নিয়ে আসবে বলে এল না কেন, এই তো ?'

'ঠিক ধরেছেন! আমার মতে এর মানে একটাই। সে লোক চিঠিটা পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়নি।'

আমি বললাম, 'তার মানে যে চুরি করেছে সে নয়, অন্য লোক।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ওরেব্বাস', বললেন লালমোহনবাবু, 'তার মানে তো একজন ক্রিমিন্যাল বাড়ল।'

'আচ্ছা ফেলুদা'—এ প্রশ্নটা ক' দিন থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে—'পেপারওয়েট দিয়ে মাথায় মারলে লোক মরবেই এমন কোনও গ্যারান্টি আছে কি ?'

'গুড কোয়েশ্চেন', বলল ফেলুদা। 'উত্তর হচ্ছে, না নেই। তবে এ ক্ষেত্রে যে মেরেছে তার হয়তো ধারণা ছিল মরবেই।'

'কিংবা অজ্ঞান করে জিনিসটা নিতে চেয়েছিল : মরে যাবে ভাবেনি।'

'রয়েলের খাওয়া যে ব্রেন টনিকের কাজ করে, সেটা তো জানতাম না। তুই ঠিক বলেছিস তোপ্‌সে। সেটাও একটা পসিব্‌ল ব্যাপার। কিন্তু সেগুলো জানলেও যে এ ব্যাপারে খুব হেল্‌প হচ্ছে তা তো নয়। যে লোকটাকে দরকার সে এমন আশ্চর্য ভাবে গা ঢাকা দিয়েছে যে, ঘটনাটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে।'

অবিশ্যি ভ্যানিশ যে করেনি সে লোক সেটা সন্ধেবেলা জানতে

পারলাম, আর সেটা ঘটল বেশ নাটকীয় ভাবে।

সেটা বলার আগে জানানো দরকার যে সাড়ে চারটের সময় হাজরা ফোন করে জানালেন বারাসতে সাধন দস্তিদারের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

লালমোহনবাবু হোটেল থেকে আর বাড়ি ফেরেননি। আমাদের পৌঁছে দিয়ে আমাদের এখানেই রয়ে গিয়েছিলেন। সাড়ে সাতটার সময় শ্রীনাথ আমাদের কফি এনে দিয়েছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। শীতকালের সন্ধে, পাড়াটা এর মধ্যেই নিঝুম, তাই বেলের শব্দে বেশ চমকে উঠেছিলাম।

দরজা খুলে আরও এক চমক।

এসেছেন হৃষীকেশবাবু।

'কিছু মনে করবেন না—অসময়ে খবর না দিয়ে এসে পড়লাম—আমাদের টেলিফোনটা ডেড পাওয়া যাচ্ছে না মিঃ হালদারের মৃত্যুর পর থেকেই।'

শ্রীনাথকে বলতে হল না, সে নতুন লোকের গলা পেয়েই আরেক কাপ কফি দিয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আপনাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বসে ঠাণ্ডা হয়ে কী ঘটনা বলুন।'

হৃষীকেশবাবু কফিতে একটা চুমুক দিয়ে দম নিয়ে বললেন, 'আপনি আমার একতলার ঘরটা দেখেননি, তবে আমি বলতে পারি ও ঘরটায় থাকতে বেশ সাহসের দরকার হয়। অত বড় বাড়ির একতলায় আমি একমাত্র বাসিন্দা। চাকরদের আলাদা কোয়ার্টারস আছে। এ ক' বছরে অভ্যেস খানিকটা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি হয় না। সন্ধে থেকে গাটা কেমন ছমছম করে। যাই হোক, কাল রাত্তিরে, তখন সাড়ে দশটা হবে, আমি খাওয়া সেরে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে মশারিটা ফেলেছি সবে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। সত্যি বলতে কী, নক্ করার লোক ও বাড়িতে কেউ নেই। যারা আমাকে চায় তারা বাইরে থেকে হাঁক দেয়—এমন কী চাকর-বাকরও। কাজেই বুঝতে পারছেন, আমার মনে বেশ একটু খট্‌কা লাগল। খোলার আগে জিজ্ঞেস করলুম,

কে ? উত্তরের বদলে আবার টোকা পড়ল। একবার ভাবলুম খুলব না। কিন্তু সারারাত যদি ওই ভাবে খট্‌খট্‌ চলে তা হলে তো আরও গণ্ডগোল। তাই কোনওরকমে সাহস সঞ্চয় করে যা থাকে কপালে করে দরজাটা খুললুম ; খোলামাত্র একটি লোক ঢুকে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তখনও মুখ দেখিনি ; তারপর আমার দিকে ফিরতে চাপ-দাড়ি দেখে আন্দাজ করলুম কে। ভদ্রলোক আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়ে সোজা গড়গড় করে তাঁর কথা বলে গেলেন এবং যতক্ষণ বললেন ততক্ষণ তাঁর ডান হাতে একটি ছোরা সোজা আমার দিকে পয়েন্ট করা।'

বর্ণনা শুনে আমারই ভয় করছিল। লালমোহনবাবুর দেখলাম মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'কী বললেন সাধন দস্তিদার ?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'সাংঘাতিক কথা', বললেন হৃষীকেশবাবু। 'মিঃ হালদারের কালেকশনে কী জিনিস আছে-না-আছে যেমন মোটামুটি আমি জানি, তেমনি ইনিও জানেন। বললেন বাহাদুর শা-র যে পান্না বসানো সোনার জর্দার কৌটোটা মিঃ হালদারের সংগ্রহে রয়েছে, সেটার একজন ভাল খদ্দের পাওয়া গেছে, সেটা তার চাই। আমি যেন আজ রাত্তিরে এগারোটার সময় মধুমুরলীর দিঘির ধারে ভাঙা নীলকুঠির পাশে শ্যাওড়া গাছটার নীচে ওয়েট করি—ও এসে নিয়ে যাবে।'

'এই যে কাজটা করতে বলেছে তার জন্য আপনার পারিশ্রমিক কী ?'

'কচু পোড়া। এ তো হুমকির ব্যাপার। বললে যদি পুলিশে খবর দিই, তা হলে নির্ঘাত মৃত্যু।'

'রাত্তিরে দারোয়ান গেটে থাকে না ?'

'থাকে বইকী, কিন্তু আমার ধারণা হয়েছে লোকটা পাঁচিল টপকে আসে।'

'আপনার ঘর চিনল কী করে ?'

'সাধু দস্তিদারও তো ওই ঘরেই থাকত—চিনবে না কেন ?'

'ভদ্রলোকের ডাক নাম সাধু ছিল বুঝি ?'

'মিঃ হালদারকে তো সেই নামই বলতে শুনেছি!'

'আপনি তাকে কী বললেন?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'আমি বললুম, এখন মিঃ হালদারের জিনিসপত্রে কড়া পাহারা, সে কৌটো আমি নেব কী করে? সে বললে, চেষ্টা করলেই পারবে। তুমি মিঃ হালদারের সেক্রেটারি ছিলে; জরুরি কাগজপত্র দেখার জন্য তোমার সে ঘরে ঢোকার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; ব্যস্—এই বলেই সে চলে গেল। আমি জানি, আপনি ছি ছি করবেন, বলবেন পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল, অন্তত বাড়ির লোককে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু প্রাণের ভয়ের মতো ভয় আর কী আছে বলুন! আপনার কথাটাই মনে হল। আপনিও যে তদন্ত করছেন সেটা আমার মনে হয় সাধু জানে না।'

'আপনি তা হলে কৌটো বার করেননি?'

'পাগল!'

'আপনি কি প্রস্তাব করছেন যে, আমরা সেখানে যাই?'

'আপনারা যদি একটু আগে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকেন—আমি গেলাম এগারোটায়—তারপর সে এলে যা করার দরকার সে তো আপনিই ভাল বুঝবেন। এইভাবে হাতেনাতে লোকটাকে ধরার সুযোগ তো আর পাবেন না।'

'পুলিশকে খবর দেব না বলছেন?'

'অমন সর্বনাশের কথা উচ্চারণ করবেন না, দোহাই। আপনি আসুন, সঙ্গে এঁদেরও নিতে পারেন। তবে সশস্ত্র অবস্থায় যাবেন, কারণ লোকটা ডেঞ্জারাস।'

'লেগে পড়ুন', বিনা দ্বিধায় বললেন লালমোহনবাবু। 'রাজস্থানের ডাকাত যখন আমাদের পেছু হটাতে পারেনি, তখন এর জন্য কী ভয়? এ তো নস্যি মশাই।'

'আমি অবিশ্যি জায়গাটা দেখিয়ে দেব', বললেন হৃষীকেশবাবু; 'মেন রোড ছেড়ে খানিকটা ভেতর দিকে যেতে হয়। স্টেশন থেকে মাইল চারেক।'

ফেলুদা রাজি হয়ে গেল। হৃষীকেশবাবু কফি শেষ করে উঠে পড়ে বললেন, 'দশটা নাগাদ তা হলে আপনারা মিট করছেন

আমাকে।'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে দু' ফার্লং গেলেই একটা তেমাথার মোড় পাবেন। সেখানে দেখবেন একটা মিষ্টির দোকান। সেই দোকানের সামনে থাকব আমি।'

॥ ৫ ॥

রাত্রে বিশেষ ট্রাফিক নেই, তাও এক ঘণ্টা হাতে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। খাওয়াটা বাড়িতেই সেরে নিলাম। এত তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যেস নেই আমাদের; লালমোহনবাবু বললেন, 'খিদে পেলে ওই মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়া যাবে। কচুরি আর আলুর তরকারি নির্ঘাত পাওয়া যাবে।'

একটা সুবিধে এই যে লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু ফেলুদার ভীষণ ভক্ত। তার উপর বোম্বাই মার্কা ফাইটিং-এর ছবি দেখার সুযোগ ছাড়েন না কখনও। এ রকম না হলে রাতবিরেতে বারাসতে ঠ্যাঙাতে অনেক ড্রাইভারই গজগজ করত; ইনি যেন নতুন লাইফ পেলেন।

ভি আই পি রোডে পড়ে লালমোহনবাবু গান ধরেছিলেন—'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে', কিন্তু ফেলুদা তাঁর দিকে চাইতে অমাবস্যার গানটা বেমানান হচ্ছে বুঝতে পেরে থেমে গেলেন।

আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই। তারার আলো বলে একটা জিনিস আছে, সেটা হয়তো আমাদের কিছুটা হেল্প করতে পারে। ফেলুদার ফরমাশ অনুযায়ী গাঢ় রঙের জামা পরেছি। লালমোহনবাবুর পুলোভারটা ছিল হলদে, তাই তার উপর ফেলুদার রেনকোটটা চাপিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোক এখন গাড়িতে বসা; যখন হাঁটবেন তখন একটা পকেট ভীষণ ঝুলে থাকবে, কারণ তাতে ভরা আছে একটা হামানদিস্তার লোহার ডাণ্ডা। ওয়েপন হিসেবে

ব্যবহার করার জন্য ভদ্রলোক ওটা চেয়ে নিয়েছেন শ্রীনাথের কাছে। ফেলুদার পকেটে অবশ্য রয়েছে তার কোল্ট রিভলভার।

আমাদের আন্দাজ ভুল হয়নি; দশটার কিছু আগে আমরা তেমাথায় পৌঁছে গেলাম। মিষ্টির দোকানের পাশেই একটা পানের দোকান—তার সামনে থেকে হৃষীকেশবাবু এগিয়ে এসে আমাদের গাড়িতে উঠে হরিপদবাবুকে বললেন, 'ডাইনের রাস্তাটা নিন।'

খানিক দূর যেতেই বাড়ি কমে এল। আলোও বেশি নেই; রাস্তায় যা আলো ছিল তাও ফুরিয়ে গেল বাঁয়ে মোড় নিতে। বুঝলাম এটা প্রায় পল্লীগ্রাম অঞ্চল। 'বারাসতেই ছিল প্রথম নীলকুঠি।' বললেন হৃষীকেশবাবু। 'এ দিকটাতে এককালে অনেক সাহেব থাকত; দিনের আলোয় তাদের সব ভাঙা বাগানবাড়ি দেখতে পেতেন।'

মিনিট কুড়ি চলার পর একটা জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন হৃষীকেশবাবু।

'আসুন।'

গাড়ি থেকে নামলাম চার জনে। 'গাড়িটা এখানেই ওয়েট করুক', বললেন হৃষীকেশবাবু, 'আমি আপনাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি, তারপরে এই গাড়িই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসবে। আমি সাইকেল রিকশা করে ঠিক এগারোটার সময় চলে আসব।'

লালমোহনবাবু হরিপদবাবুকে টাকা দিয়ে বললেন, 'তুমি এঁকে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় কোনও দোকান-টোকান থেকে খাওয়াটা সেরে নিও। ফিরতে রাত হবে আমাদের।'

ঘাসের উপর দিয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটতে একটা জংলা জায়গা এসে পড়ল।

'এখানেই ছিল মধুমুরলীর দিঘি', বললেন হৃষীকেশবাবু। 'আমাদের যেতে হবে ওখানটায়।'

খুবই কম আলো, কিন্তু তাও বুঝতে পারছি যে গাছপালা ছাড়াও ও দিকে একটা দালানের ভগ্নস্তূপ রয়েছে। শীতকাল বলে রক্ষে, না হলে এ জায়গাটা হত সাপ ব্যাঙের ডিপো!

'এখন টর্চের আলোটা বোধ হয় তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়', বলল ফেলুদা।

'মনে তো হয় না', বললেন হৃষীকেশবাবু।

ছোট্ট পকেট টর্চের আলোতে ঝোপঝাড় খানাখন্দ বাঁচিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম নীলকুঠির ভগ্নস্তূপের পাশে।

'ওই যে দেখুন শ্যাওড়া গাছ', বললেন হৃষীকেশবাবু। ফেলুদা সে দিকে একবার টর্চ ফেলে সেটা নিবিয়ে পকেটে পুরল।

'আমি তা হলে আসি।'

'আসুন।'

'তিন কোয়ার্টার আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

আমরা যে দিক দিয়ে এসেছিলাম সে দিক দিয়েই চলে গেলেন হৃষীকেশবাবু। এক মিনিটের মধ্যেই তাঁর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

'ওডোমসটা লাগিয়ে নিন।'

ফেলুদা পকেট থেকে টিউব বার করে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

'যা বলেছেন মশাই। ম্যালেরিয়া শুনছি আবার খুব বেড়েছে।'

আমরা তিন জনেই ওডোমস লাগিয়ে নিয়ে একটা বড় রকম দম নিয়ে অপেক্ষার জন্য তৈরি হলাম। আমাদের কাউকেই দাঁড়াতে হবে না, কারণ ভগ্নস্তূপে নানান হাইটের ইটের পাঁজা রয়েছে, তাতে চেয়ার চৌকি মোড়া সব কিছুরই কাজ হয়। কথা বলতে হলে ফিস্‌ফিস্ ছাড়া গতি নেই, তাও প্রথম দিকটায়। পরের দিকে কমপ্লিট মৌনী। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে, এখন চারিদিকে চাইলে বট, অশ্বথ, আমগাছ, বাঁশঝাড়—এসব বেশ তফাত করা যায়। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়াও যে অন্য শব্দ আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। ট্রেনের আওয়াজ, সাইকেল রিকশার চড়া হর্ন, রাস্তার কুকুরের ঘেউ ঘেউ, এমন কী দূরের কোনও বাড়ি থেকে ট্রানজিস্টারের গান পর্যন্ত। ফেলুদার ঘড়িতে রেডিয়াম ডায়াল, তাই অন্ধকারেও টাইম দেখতে পারে।

শীত যেন মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। শহরের চেয়ে নিমতি

পাঁচ-সাত ডিগ্রি কম। লালমোহনবাবু তাঁর টুপি আনেননি, রুমাল সাদা, তাই সেটা বাঁধলেও চলে না; নিরুপায় হয়ে দু' হাতের তেলো দিয়ে টাক ঢেকেছেন। একবার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করাতে ফেলুদা বলল, 'কিছু বললেন?' তাতে ভদ্রলোক ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিলেন, 'শ্যাওড়া গাছেই বোধহয় পেত্নি না শাঁকচুন্নি কী যেন থাকে।'

'শ্যাওড়া গাছের নামই শুনেছি,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল ফেলুদা, 'চোখে এই প্রথম দেখলাম।'

আকাশে তারাগুলো সরছে। একটু আগে একটা তারাকে দেখেছিলাম নারকোল গাছের মাথার উপরে, এখন দেখছি গাছটায় ঢাকা পড়ে গেছে। কোনও চেনা কনস্টেলেশন আছে কি না দেখার জন্য মাথাটা উপর দিকে তুলেছি, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল। পায়ের শব্দ।

এগারোটা বাজেনি এখনও। ফেলুদা দু' মিনিট আগে ঘড়ি দেখে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছে, 'পৌনে।'

আমরা পাথরের মতো স্থির।

যে দিক দিয়ে এসেছি, সে দিক দিয়েই আসছে শব্দটা। ঘাসের উপর মাঝে মাঝে ইট-পাটকেল রয়েছে, তার জন্যই শব্দ। তাও কান না পাতলে, আর অন্য শব্দ না কমলে শোনা যায় না। এখন ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

এবার লোকটাকে দেখা গেল। সে এগিয়ে এসেছে শ্যাওড়া গাছটাকে লক্ষ্য করে।

এবারে তার হাঁটার গতি কমাল। আমরা খাটিতে ঘাপটি মেরে বসা, সামনে একটা ভাঙা পাঁচিল আমাদের শরীরের নীচের অংশটা ঢেকে রেখেছে। আমরা তার উপর দিয়ে দেখছি।

'হৃষীকেশবাবু—'

লোকটা চাপা গলায় ডাক দিয়েছে। হাঁটা থামিয়ে। তার দৃষ্টি যে শ্যাওড়া গাছটার দিকে সেটা মাথাটা দেখে আন্দাজ করতে পারছি, যদিও মানুষ চেনার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

'হৃষীকেশবাবু—'

ফেলুদা ওঠার জন্য তৈরি। তার শরীর টান সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

লালমোহনবাবুর ডান কনুইটা উঁচিয়ে উঠেছে। উনি পকেট হাতড়াচ্ছেন হামানদিস্তার ডাণ্ডাটার জন্য।

লোকটা এখন দশ হাতের মধ্যে।

'হৃষীকেশ—'

ফেলুদা বাঘের মতো লাফিয়ে উঠতেই একটা রক্ত জল করা ব্যাপার ঘটে গেল।

আমাদের পিছন থেকে দুটো লোক এসে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

ফেলুদার সঙ্গে থেকেই বোধ হয় আমার নার্ভও শক্ত হয়ে গেছে। চট করে বিপদে মাথা গুলোয় না। আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সামনের দিকে। ফেলুদার ঘুঁষি খেয়ে একটা লোক আমারই দিকে ছিটকে এসেছিল। আমি তাকে লক্ষ্য করে আরেকটা ঘুঁষি চালাতে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘাসের উপর।

কিন্তু এ কী, আরও লোক এসে পড়েছে পিছন থেকে! তার মধ্যে একটা আমায় জাপটে ধরেছে, আরও দুটো গিয়ে আক্রমণ করেছে ফেলুদাকে। ধস্তাধস্তির শব্দ পাচ্ছি। কিন্তু আমি নিজে বন্দি, যদিও তারই মধ্যে জুতো পরা ডান পা-টা দিয়ে ক্রমাগত পিছন দিকে লাথি চালাচ্ছি।

লালমোহনবাবু কী করছেন এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই থুতনিতে একটা বিরাশি শিক্কা ঘা খেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের অন্ধকার যেন আরও দশ গুণ গাঢ় হয়ে গেল।

তারপর আর কিছু জানি না।

'কীরে, ঠিক হ্যায়?'

ফেলুদার চেহারাটাই প্রথম দেখতে পেলাম জ্ঞান হয়ে।

'ঘাবড়াসনি, আমিও নক-আউট হয়ে গেসলাম দশ মিনিটের

জন্য।'

এবারে দেখলাম ঘরের অন্য লোকেদের। অমিতাভবাবু তাঁর পাশে একজন মহিলা—নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রী—লালমোহনবাবু, হৃষীকেশবাবু, আর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অচিন্ত্যবাবু। এ ঘরটা আগে দেখিনি ; বাড়ির বত্রিশটা ঘরের কোনও একটা হবে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। একটা কনকনে ব্যথা থুতনির কাছটায়। তা ছাড়া আর কোনও কষ্ট নেই। ফেলুদা ঘুঁষিটা খেয়েছিল ডান চোখের নীচে সেটা কালসিটে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ব্ল্যাক-আই ব্যাপারটা অনেক বিদেশি ছবিতে দেখেছি ; স্বচক্ষে এই প্রথম দেখলাম।

'একমাত্র জটায়ুই অক্ষত', বলল ফেলুদা।

সে কী। আশ্চর্য ব্যাপার তো!—'কী করে হল?'

'মোক্ষম ওয়েপন ওই হামানদিস্তাটা', বললেন লালমোহনবাবু, 'হাতে নিয়ে মাথার উপর তুলে হেলিকপ্টারের মত বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে গেলাম। আমার ধারে কাছেও এগোয়নি একটি গুণ্ডাও।'

'ওরা গুণ্ডা ছিল বুঝি?'

'হায়ার্ড গুণ্ডাজ', বললেন লালমোহনবাবু।

'বললাম লোকটা ডেঞ্জারাস', বললেন হৃষীকেশবাবু। 'তবে ও যে এতটা করবে তা ভাবিনি। আমি তো গিয়ে অবাক। একজন শোয়া একজন বসা একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাটিতে। আর আসল যে লোক সে হাওয়া।'

ফেলুদা আর লালমোহনবাবু নাকি আমাকে ধরাধরি করে গাড়িতে এনে তোলেন। অমিতাভবাবু নিজে বেশ রাত অবধি পড়েন, তাই উনি জেগে ছিলেন। যে ঘরটায় আমরা রয়েছি সেটা একতলার একটা গেস্টরুম। বেশ বড় ঘর, পাশেই বাথরুম। পুবে জানালা দিয়ে নাকি বাগান দেখা যায়। অমিতাভবাবুই জোর করলেন আজ রাতটা এখানে থাকার জন্য। অসুবিধা এই যে বাড়তি কাপড় নেই, যা পরে আছি তাই পরেই শুতে হবে। 'হৃষীকেশবাবুর ভয়ের জন্যই এই গোলমালটা হল', বললেন অমিতাভবাবু, 'পুলিশকে বলা থাকলে সাধু সমেত গুণ্ডারা এতক্ষণে হাজতে।'

হৃষীকেশবাবুও অবিশ্যি অ্যাপলজাইজ করলেন। কিন্তু ভদ্রলোককেই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে? ও রকম শাসানির পর যে কোনও মানুষেরই ভয় হতে পারে।

অমিতাভবাবুর স্ত্রীই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বললেন, 'বাড়িতে এই দুর্যোগ, আপনাদের সঙ্গে বসে দু' দণ্ড কথা বলারও সুযোগ হল না। এনার এত বই আমি পড়েছি—কী যে আনন্দ পাই তা বলতে পারি না।'

শেষের কথাটা অবিশ্যি লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে বলা।

ফেলুদা বলল, 'কাল সকালে যাবার আগে আপনার ছেলের সঙ্গে একবার কথা বলে নেব। ঘরে চোর ঢোকার পরেও ও যা সাহস দেখিয়েছে তেমন সচরাচর দেখা যায় না।'

সাড়ে বারোটা নাগাদ যখন আমরা শোবার আয়োজন করছি তখন ফেলুদা একটা কথা বলল।

'ঘুষিটাও যে ব্রেন টনিকের কাজ করে সেটা আজ প্রথম জানলাম।'

'কী রকম?' বললেন লালমোহনবাবু।

'সাধুবাবু ভ্যানিশ করার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এতদিনে।'

'বলেন কী!'

'তুখোড় লোক। তবে যার সঙ্গে মোকাবিলা করছে, সেও তো কম তুখোড় নয়!'

এর বেশি আর কিছু বলল না ফেলুদা।

॥ ৬ ॥

অনিরুদ্ধ সকালে স্কুলে যায়, তাই চা খাবার আগেই ফেলুদা ওর সঙ্গে দেখা করে নিল।

চোর ঢোকার কথাটা আজ শুনে মনে হল ছেলেটি বেশি রকম কল্পনাপ্রবণ। পরপর দু'বার! একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। ফেলুদা বলল, 'তুমি যে বন্দুকটা দিয়ে চোরকে মারবে ঠিক করেছিলে সেটা তো আমাকে দেখালে না। শুনলাম তোমার

ছোটকাকাকে দেখিয়েছি।'

অনিরুদ্ধ বন্দুকটা বার করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোয়।'

লাল প্লাস্টিকের তৈরি মেশিনগান, ট্রিগার টিপলে মেশিনগানের মতো শব্দের সঙ্গে নলের মুখ দিয়ে সত্যিই স্পার্ক বেরোয়।

ফেলুদা বন্দুকটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে সেটার খুব তারিফ করে ফেরত দিয়ে বলল, 'তোমার যে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, দেখা যাক সেটা বন্ধ করা যায় কি না।'

'তুমি চোর ধরে দেবে?'

'গোয়েন্দার তো ওই কাজ।'

'আর আমার চন্দনা যে চুরি করেছে সেই চোর?'

'সেটারও চেষ্টা চলেছে, তবে কাজটা খুব সহজ নয়।'

'খুব শক্ত?'

'খুব শক্ত।'

'দারুণ রহস্য?'

'দারুণ রহস্য।'

'আর সে দিন যে বললে, খাঁচার দরজায় রক্ত লেগে আছে?'

'ওটাই তো ভরসা। ওটাই তো ক্লু।'

'ক্লু মানে?'

'ক্লু হল যার সাহায্যে গোয়েন্দা দুষ্টু লোককে জব্দ করে।'

লালমোহনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমার পাখিকে কথা বলতে শুনেছ?'

'হ্যাঁ', বলল অনিরুদ্ধ। 'আমি ঘরে ছিলাম, আর শুনলাম পাখিটা কথা বলছে।'

'কী কথা?'

'বলছে: 'দাদু ভাত খান, দাদু ভাত খান। আমি তক্ষুনি বেরিয়ে এলাম কিন্তু তারপর আর কিছু বলল না।'

লালমোহনবাবুর মুখে হাসি। অনিরুদ্ধ শুনেছে, 'দাদু ভাত খান' আর লালমোহনবাবু শুনেছেন, 'বাবু সাবধান'। মানতেই হয় দুটো খুব কাছাকাছি। পাখি নিশ্চয়ই ওই ধরনেরই কিছু বলছিল।

'আপনার এখানে পাখি ধরতে পারে এমন কেউ আছে?' ফেলুদা অমিতাভবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের মালির ছেলে আছে, শঙ্কর', বললেন অমিতাভবাবু। 'এর আগে দু'-একবার ধরেছে পাখি। খুব চালাক-চতুর ছেলে।'

'তাকে বলবেন একটু চোখ রাখতে। খুব সম্ভব চন্দনাটা আপনাদের বাগানেই রয়েছে।'

বারাসতে থাকতেই দেখেছিলাম যে, খবরের কাগজে চন্দনার বিষয় বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। সেটার কাজ যে এত তাড়াতাড়ি হবে তা ভাবতে পারিনি।

বারোটা নাগাদ একটি বছর পঁচিশের ছেলে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বেশ চোখাচোখা চেহারা, পরনে জিন্‌স আর মাথার চুলের কপাল-ঢাকা কায়দা দেখলেই বোঝা যায় ইনি হাল-ফ্যাশানের তরুণ।

ফেলুদা বসতে বলাতে ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'বসব না। আজ একটা ইন্টারভিউ আছে। ইয়ে, আমি আসছি ওই পাখির ব্যাপারে কাগজে যে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন সেইটে দেখে।'

'ওটা আপনাদের পাখি ছিল?'

'আমাদের মানে আমার দাদুর। দাদু মারা গেছেন লাস্ট মান্থ। তাই বাবা ওটাকে বেচে দিলেন। ওটার দেখাশুনা দাদুই করতেন। বাবা কোর্ট-কাচারি করেন, মা রান্না ভোগেন, আর আমার ও সবে ইন্টারেস্ট নেই।'

'কদ্দিন ছিল আপনাদের বাড়ি?'

'তা বছর দশেক। দাদুর খুব পিয়ারের চন্দনা ছিল।'

'কথা বলত?'

'হ্যাঁ। দাদুই শিখিয়েছিলেন। খুব রসিক মানুষ ছিলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শিখিয়েছিলেন।'

'অদ্ভুত মানে?'

'এই যেমন—দাদুর পাশার নেশা ছিল; পাখিটাকে শিখিয়েছিলেন "কচে বারো" বলতে। তারপর ব্রিজও খেলতেন দাদু। খেলার সময় অপোনেন্টের তাস ভাল বুঝতে পারলে

পার্টনারকে একটা কথা খুব বলতেন। সেটা পাখিটা তুলে নিয়েছিল।'

'কী কথা?'

'সাধু সাবধান।'

'ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।'

'আর কিছু— ?'

'না, আর কিছু জানার নেই।

'ইয়ে, বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পারিনি এটা আপনার বাড়ি।'

'সেটা না বোঝারই কথা।'

'আপনাকে মিট করে খুব ইয়ে হলাম।'

ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা তার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থেকে বিকেলে চা খেতে বেরিয়ে এসে ফেলুদা হাজরাকে একটা টেলিফোন করল:

'কাল সকালে কী করছেন?'

'কেন বলুন তো?'

'হালদার বাড়িতে আসতে পারবেন—ন'টা নাগাদ? মনে হচ্ছে রহস্যের কিনারা হয়েছে। তৈরি হয়ে আসবেন।'

লালমোহনবাবুকে টেলিফোনে বলে দেওয়া হল, আমরা ট্যাক্সি করে চলে যাব তাঁর বাড়ি সাড়ে আটটায়। সেখান থেকে তাঁর গাড়িতে বারাসত।

'রহস্য আরও বৃদ্ধি পেল নাকি?'

'না। সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত।'

সব শেষে অমিতাভবাবুকে ফোন করা হল।

'আপনাদের বাড়িতে কাল সকালে একটা ছোটখাটো মিটিং করব ভাবছি।'

'মিটিং?'

'আপনাদের পুরুষ মেম্বার যে ক'জন আছেন তাঁরা যেন থাকেন। আর হাজরাকে থাকতে বলেছি।'

'ক'টায় করতে চাইছেন?'

'ন'টায় হাজিরা। আপনার কাজের হয়তো একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা জরুরি।'

অমিতাভবাবু রাজি হয়ে গেলেন।—'পুরুষ মেম্বার মানে কি অনুকেও চাইছেন ?'

'না। সে না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। এটা শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।'

আমরা যখন পৌঁছলাম, তার আগেই হাজরার দল হাজির। ফেলুদা এ রকম ধরনের মিটিং এর আগেও করেছে। প্রত্যেক বারই আমার মনের মধ্যে একটা চনমনে ভাব, কারণ জানি না কী হতে চলেছে, কার ভাগ্যে হাতকড়া আছে, কীভাবে ফেলুদা রহস্যের সমাধান করেছে। লালমোহনবাবু আমাকে বললেন, 'আমি চিন্তাটাকে স্রেফ অন্য পথে ঘুরিয়ে নিয়েছি। এ ব্যাপারে ব্রেন খাটিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ আমার ঘিলুতে অনেক ভেজাল, তোমার দাদারটা পিওর। নিজের তৈরি রহস্যের সমাধান এক জিনিস, আর অ্যাকচুয়েল লাইফে সমাধান আরেক জিনিস।'

নীচের বৈঠকখানা ঘরে জমায়েত হয়েছি। হৃষীকেশবাবুর দিল্লি যাবার সময় হয়ে এসেছে। বললেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি মশাই। কাজ থাকলে তবু একটা কথা। এখন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।'

অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয়নি। তিনি আপত্তি করেছিলেন এই মিটিং-এ উপস্থিত থাকার ব্যাপারে। তাঁর নাকি একটা বড় পার্ট নিয়ে খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কালই নাকি নাটকটার প্রথম শো। ভদ্রলোক ফেলুদাকে বললেন, 'আপনার এ ব্যাপারটা কতক্ষণ চলবে ?'

ফেলুদা বলল, 'খুব বেশি তো আধ ঘণ্টা।'

ভদ্রলোক তাও গজগজ করতে লাগলেন।

কফি খাবার পর ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। কালশিটে ঢাকার জন্য ও আজ কালো চশমা পরেছে। এটা ওর একেবারে নতুন চেহারা। হাত দুটোকে প্যান্টের পকেটে পুরে সে আরম্ভ করল তার কথা।

'পার্বতীচরণের খুনের ব্যাপারে আমাদের যেটা সবচেয়ে অবাক করেছিল সেটা হল সাধন দস্তিদারের অন্তর্ধান। দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে খুনটা হয়। সাধন দস্তিদার পার্বতীবাবুর ঘরে ছিলেন

সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত। সাড়ে দশটায় তাঁকে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে দেখেছি; দশটা পঁয়ত্রিশে অনিরুদ্ধর সঙ্গে কথা বলে পার্বতীবাবুর ঘরে গিয়ে আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখি। তৎক্ষণাৎ সাধন দস্তিদারকে খোঁজা হয়, কিন্তু পাওয়া যায় না। দারোয়ান বলে, তাঁকে গেট থেকে বেরোতে দেখেনি। বাগানে খোঁজা হয়, সেখানেও পাওয়া যায়নি। কম্পাউন্ডের যে পাঁচিল, সেটা আট ফুট উঁচু। সেটা টপকানো সহজ নয়, বিশেষ করে হাতে একটা ব্রিফকেস থাকলে। আমরা—'

এখানে অচিন্ত্যবাবু ফেলুদাকে বাধা দিলেন।

'সাধনবাবুর আগে যিনি এসেছিলেন, তাকে কি আপনি বাদ দিচ্ছেন?'

'আপনার বাবাকে যেভাবে আঘাত করা হয়েছিল, সেটা শক্ত সমর্থ লোকের পক্ষেই সম্ভব। পেস্টনজীর আরথ্রাইটিস আছে, তিনি ডান হাত কাঁধের উপর তুলতে পারেন না। অবিশ্যি পেস্টনজী ছাড়াও একজন তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন যিনি পেস্টনজী ও সাধনবাবুর ফাঁকে পার্বতীবাবুর ঘরে গিয়ে থাকতে পারেন।'

'তিনি কে?'

'আপনি।'

অচিন্ত্যবাবু সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছেন।

'আ—আপনার কি ধারণা আমি—?'

'আমি শুধু বলেছি আপনার সুযোগ ছিল। আপনি খুন করেছেন সে কথা তো বলিনি।'

'তাও ভাল।'

'যাই হোক—সাধনবাবুর অন্তর্ধান বিশ্বাসযোগ্য হয় এক যদি দারোয়ান ভুল বা মিথ্যে বলে থাকে। আর দুই, যদি সাধনবাবু এ বাড়ি থেকে না বেরিয়ে থাকেন।'

'কোনও চোরা কুঠরিতে আত্মগোপন করার কথা বলছেন?' হৃষীকেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

অমিতাভবাবু বললেন, 'সে রকম লুকোনোর কোনও জায়গা এ বাড়িতে নেই। একতলার অধিকাংশ ঘরই তালাচাবি বন্ধ। এক

বৈঠকখানা খোলা, রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর খোলা আর হৃষীকেশবাবুর ঘর খোলা।'

'এবং সে ঘরে তাকে আমি আশ্রয় দিইনি সেটা আমি বলতে পারি', বললেন হৃষীকেশবাবু। 'শুধু তাই নয়, সাধনবাবু যখন আসেন, তখন আমি ছিলাম না।'

'আমরা পোস্টাপিসে খোঁজ নিয়েছি', বলল ফেলুদা। 'আপনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন পোস্টাপিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে। তখন দশটা। পাঁচ মিনিট লেগেছে আপনার টেলিগ্রাম করতে। তারপরেই আপনি—'

'তারপর আমি যাই ঘড়ির ব্যান্ড কিনতে।'

'দুঃখের বিষয় দোকানের লোক আপনাকে মনে করতে পারছে না।'

'মিঃ মিত্তির, দোকানের লোকের স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই কি আপনি গোয়েন্দাগিরি করেন?'

'না, তা করি না। এবং তাদের কথায় আমরা খুব আমল দিইনি। আর আপনিও যে সত্যি কথা বলছেন সেটা আমরা মানতে বাধ্য নই।'

'কেন, আমি মিথ্যে বলব কেন?'

'কারণ সোয়া দশটার সময় আপনারও তো পার্বতীচরণের ঘরে যাবার প্রয়োজন হয়ে থাকতে পারে!'

'এ সব কী বলছেন আপনি? আপনি নিজেই বলছেন সাধনবাবুকে বেরোতে দেখেছেন, আবার বলছেন আমি গিয়েছি?'

'ধরুন সাধন দস্তিদার যদি নাই এসে থাকেন। তার জায়গায় আপনি গেলেন।'

আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘরে সবাই চুপ, তারই মধ্যে হৃষীকেশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

'মিঃ হালদার কি উন্মাদ না জরাগ্রস্ত, যে আমি দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকব আর তিনি আমাকে চিনবেন না?'

'কী করে চিনবেন, হৃষীকেশবাবু? আপনি যদি গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে চোখের চশমাটা খুলে পোশাক বদলে তাঁর ঘরে ঢোকেন, তা

হলে আপনাকে সাত বছর আগের সাধন দস্তিদার বলে কেন মনে করবেন না পার্বতীবাবু ? আপনি আর সাধন দস্তিদার যে আসলে একই লোক। প্রতিশোধ নেবার জন্য চেহারা পাল্টে নাম পাল্টে সেই একই লোক যে আবার সেক্রেটারি হয়ে ফিরে এসেছে, সেটা তো আর বোঝেননি পার্বতীচরণ !'

হৃষীকেশবাবুর মুখের ভাব একদম পাল্টে গেছে। তাঁর ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। দুজন কনস্টেবল এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

ফেলুদার কথা এখনও শেষ হয়নি।

'খুনের পর কি আপনার ভাড়া করা কোটের পকেটে পেপার ওয়েট পুরে তার ওজন বাড়িয়ে আপনি পুকুরের জলে ফেলে দেননি ? তারপর নিজের ঘরে গিয়ে আবার হৃষীকেশ দত্ত সেজে বেরিয়ে আসেননি ?'

এই শীতকালেও হৃষীকেশবাবুর শার্টের কলার ভিজে গেছে।

'আরও একটা কথা', বলে চলল ফেলুদা। 'সাধু সাবধান কথাটা কি চেনা চেনা লাগছে ? অনিরুদ্ধের জন্য কেনা চন্দনার মুখে কি কথাটা শোনেননি আপনি সম্প্রতি ? আর শুনে আপনার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে কি বিশ্বাস ঢোকেনি যে কথাটা আপনাকে উদ্দেশ করেই বলছে ? আপনি সাধু সেজে মনিবের সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন জেনেই পাখি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করছে ? আপনিই কি এই পাখিকে খাঁচা থেকে বার করে বাগানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেননি ? এবং এই কাজটা করার সময় আপনাকেই কি পাখি জখম করেনি ?'

হৃষীকেশবাবু এবার লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

'অ্যাবসার্ড ! অ্যাবসার্ড ! কোথায় জখম করেছে ? কোথায় ?'

'ইনস্পেক্টর হাজরা, আপনার লোককে বলুন তো ওঁর ডান হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিতে।'

প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও ঘড়ি খুলে এল।

কবজিতে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটা আঁচড়ের দাগ, সেটা দিব্যি ঘড়ির ব্যান্ডের তলায় লুকিয়ে ছিল।

'আমি খুন করতে যাইনি—দোহাই আপনার—বিশ্বাস করুন !'

হৃষীকেশবাবুর অবস্থা শোচনীয়।

'সেটা অবিশ্বাস্য নয়', বলল ফেলুদা, 'কারণ আপনার আসল উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের চিঠিটা নেওয়া। পেস্টনজী বড় রকম দর দিয়েছেন সেটা আপনি জানতেন; মিঃ হালদার বেচবেন না সেটাও আপনি পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন। কিন্তু জিনিসটা চুরি করে তো পেস্টনজীর কাছে বিক্রি করা যায়! তাই—'

'আমি না, আমি না!' মরিয়া হয়ে প্রতিবাদ জানালেন হৃষীকেশবাবু।

'আগে আমার কথা শেষ করতে দিন। ফেলু মিত্তির আধাখেঁচড়াভাবে সমস্যার সমাধান করে না। এ ব্যাপারে আপনি একা নন, সেটা আমি জানি। চিঠিটা বার করে এনে নিজের ঘরে গিয়ে মেক-আপ বদলে আপনি যান আরেকজনের কাছে চিঠিটা দিতে। কিন্তু বাড়িতে খুন হয়েছে, খানাতল্লাশি হবে, সেটা জেনে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও সাময়িকভাবে চিঠিটাকে অন্য জায়গায় চালান দেন। তাই নয়, অচিন্ত্যবাবু?'

প্রশ্নটা একেবারে বুলেটের মতো। কিন্তু লোকটার আশ্চর্য নার্ভ। অচিন্ত্যবাবু ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে দিব্যি বসে আছেন সোফায়।

'বলুন, বলুন, কী বলবেন,' বললেন ভদ্রলোক, 'আপনি তো দেখছি সবই জেনে বসে আছেন।'

'আপনি সাড়ে দশটার একটু পরে একবার আপনার ভাইপোর ঘরে যাননি?'

'গিয়েছিলাম বইকী। আমার ভাইপোর ঘরে যাওয়ায় তো কোনও বাধা নেই। সে ক'দিন থেকেই বলছে তার নতুন খেলনা দেখাবে, তাই গিয়েছিলাম।'

'আপনার ভাইপোর ঘরে গতকাল এবং তার আগের রাত্রে একজন চোর ঢুকেছিল। সে যা খুঁজছিল তা পায়নি। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, সে চোর আপনিই এবং আপনি খুঁজতে গিয়েছিলেন নেপোলিয়নের চিঠি—যেটা আপনিই তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন? চিঠিটা পাবেন এই বিশ্বাসে আপনিই পেস্টনজীকে

ফোন করে অফার দিয়েছিলেন, তারপর সেটা না পেয়ে আর পেস্টনজীর ওখানে যেতে পারেননি ?'

'আমিই যখন লুকিয়েছিলাম, তখন সেটা আমি কেন পাব না সেটা বলতে পারেন ?'

'কারণ যাতে লুকিয়েছিলেন, সেটা ছিল খোকার বালিশের তলায়। এই যে।'

ফেলুদা মিঃ হাজরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। হবি সেন্টার থেকে কেনা লাল প্লাস্টিকের মেশিনগান চলে এল ফেলুদার হাতে। তার নলের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে টান দিতে বেরিয়ে এল গোল করে পাকানো নেপোলিয়নের চিঠি।

'হৃষীকেশবাবুর মেক-আপের ব্যাপারে আপনিই মালমশলা সাপ্লাই করেছিলেন বোধহয় ?' প্রশ্ন করল ফেলুদা, 'ভাগ বাঁটোয়ারা কী রকম হত ? ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি ?'

মালির ছেলে শঙ্কর চন্দনাটা ধরতে পেরেছিল ঠিকই, যদিও পাখি ফেরত পাওয়ার পুরো ক্রেডিটটা তার খুদে মক্কেলের কাছে ফেলুদাই পেল।

অমিতাভবাবু ফেলুদাকে অফার করেছিলেন পার্বতীচরণের কালেকশন থেকে একটা কোনও জিনিস বেছে নিতে। ফেলুদা রাজি হল না। বলল, 'এই কেসটায় আমার জড়িয়ে পড়াটা একটা আকস্মিক ঘটনা। আসলে আমি এসেছিলাম আপনার ছেলের ডাকে। তার কাছ থেকে তো আর কি নেওয়া যায় না!'

ঘটনার দু' দিন পরে শনিবার সকালে লালমোহনবাবু এসে বললেন, 'জলের তল পাওয়া যায়, মনের তল পাওয়া দায়। আপনার অতলস্পর্শী চিন্তাশক্তির জন্য আপনাকে একটি অনারারি টাইটেলে ভূষিত করা গেল।—এ বি সি ডি।'

'এ বি সি ডি ?'

'এশিয়া'জ বেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর।'

অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য

Pradosh C. Mitter

Private Investigator

অম্বর সেন অন্তর্ধান রহস্য

'আপনি তো আমার লেখা শুধরে দেন,' বললেন লালমোহনবাবু, 'সেটা আর এবার থেকে দরকার হবে না।'

ফেলুদা তার প্রিয় সোফাটায় পা ছড়িয়ে বসে রুবিক্‌স কিউবের একটা পিরামিড সংস্করণ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল; সে মুখ না তুলেই বলল, 'বটে?'

'নো স্যার। আমার পাড়ায় এক ভদ্রলোক এয়েচেন, কাল পার্কে দেখা হল। এক বেঞ্চিতে বসে কথা বললুম প্রায় আধ ঘণ্টা। গ্রেট স্কলার। নাম মৃত্যুঞ্জয় সোম।'

'স্কলার?'

'স্কলার। বোধহয় হার্বার্ট ইউনিভার্সিটির ডবল এম. এ., বা ওই ধরনের কিছু।'

'উফ্‌ফ্!' ফেলুদা এবার মুখ না তুলে পারল না। 'হার্বার্ট নয় মশাই, হার্ভার্ড, হার্ভার্ড!'

'তাই হবে। হার্ভার্ড।'

'হার্ভার্ড সেটা বুঝলেন কী করে? নাকিসুরে মার্কিন মার্কা ইংরিজি বলেন ভদ্রলোক?'

'ইংরিজিটা একটু বেশি বলেন। নাকিসুর কিনা লক্ষ করিনি। তবে বিদ্বান লোক। থাকেন বহরমপুর। একটা বই লিখছেন, তাই নিয়ে রিসার্চ করবেন বলে কদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। চেহারাতে বেশ একটা ইয়ে আছে। ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, চোখে সোনার বাই-ফোকাল, জামাকাপড়ও ধোপদুরস্ত। আমার "হন্ডুরাসে হাহাকার"টা পড়তে দিয়েছিলুম। চৌত্রিশটা মিসটেক দেখিয়ে দিলেন। তবে বললেন ভেরি এনজয়েব্‌ল।'

'তাহলে আর কী। আপনার পেট্রল খরচা অনেক কমে যাবে এবার থেকে। আর গড়পার–বালিগঞ্জ ঠ্যাঙাতে হবে না।'

'তবে ব্যাপারটা হচ্ছে কী—'

ব্যাপারটা কী হচ্ছে সেটা আর জানা গেল না, কেন না ঠিক এই সময় এসে পড়লেন ফেলুদার মক্কেল অম্বর সেন। ন-টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আমাদের কলিং বেল বেজে উঠল।

অম্বর সেনের বয়স মনে হয় পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, ফরসা রং, দাড়িগোঁফ কামানো, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা, গায়ে পাঞ্জাবি আর ধুতির উপর একটা পুরনো জামেওয়ার শাল। কাশ্মীরী শাল যে কতরকম হয় সেটা সেদিন ফেলুদার সঙ্গে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখে এসেছি।

অম্বর সেন ফেলুদার মুখোমুখি চেয়ারে বসে বললেন, 'আপনিও ব্যস্ত মানুষ, আমিও ব্যস্ত। কাজেই সময় নষ্ট না করে সোজা কাজের কথায় চলে যাওয়াই ভাল। আগে এই জিনিসটা দেখুন।'

পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ভদ্রলোক ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন। খাতা থেকে ছেঁড়া একটা পাতা, সেটাকে দলা করে পাকানো হয়েছিল, তারপর আবার হাত বুলিয়ে মসৃণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কাগজটাতে গোটা অক্ষরে লাল কালি দিয়ে লেখা—'আমার সর্বনাশের শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হও। আর সাতদিন মেয়াদ। পালিয়ে পথ পাবে না।'

কাগজটা নেড়েচেড়ে দেখে ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'কীভাবে পেলেন এটা?'

'আমার বাড়িতে একতলায় আমার কাজের ঘর', বললেন ভদ্রলোক, 'রাত্তিরে এসে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ডেস্কের উপর ফেলে দিয়ে গেছে। সকালে আমার চাকর লক্ষ্মণ এটা পেয়ে আমার কাছে নিয়ে আসে।'

'আপনার ঘর কি রাস্তার উপর?'

'না। ঘরের বাইরে বাগান, তারপর কম্পাউন্ড ওয়াল, তারপর রাস্তা। তবে দেয়াল টপকানো যায়।'

'সর্বনাশের কথা যে বলছে সেটা কী?'

অম্বর সেন মাথা নাড়লেন।

'দেখুন মিস্টার মিত্তির, আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। আমার পেশা হল ব্যবসা, তবে আসল কাজ আমার তাইই করে। আমার পাঁচ রকম অন্য শখ আছে, সেই সব নিয়ে থাকি। সজ্ঞানে কারুর কখনও কোনও সর্বনাশ করেছি বলে তো মনে পড়ে না। অন্তত এমন সর্বনাশ নিশ্চয়ই নয় যেটা এই হুমকি-চিঠিকে জাস্টিফাই করতে পারে। ব্যাপারটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভেবে বলল, 'অবিশ্যি এটা এক ধরনের রসিকতাও হতে পারে—যাকে বলে প্র্যাকটিক্যাল জোক। আপনার পাড়ায় কাছাকাছির মধ্যে মস্তান ছেলেদের আস্তানা আছে?'

'আমরা থাকি পাম এভিনিউতে,' বললেন অম্বর সেন। 'পুব দিকে কিছু দূরে একটা বস্তি আছে, সেখানে এই ধরনের ছেলে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়।'

'পুজোর চাঁদার জন্য হামলা করে না?'

'তা করে, কিন্তু চাঁদা তো আমরা নিয়মিত দিই।'

শ্রীনাথ চা এনেছে, তাই কাজের কথা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হল। লালমোহনবাবু দুবার বিড়বিড় করে 'রিভেঞ্জ' কথাটা বললেন। ফেলুদা সেই সুযোগে আমাদের দুজনের সঙ্গে ভদ্রলোকের আলাপ করিয়ে দিল।

'আপনিই বিখ্যাত লালমোহন গাঙ্গুলী?'

'হেঁ হেঁ।'

ভদ্রলোক বেশ তৃপ্তি সহকারে চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আসলে আপনার বিষয় আমি আপনার কাহিনীগুলো থেকেই জেনেছি। তাই মনে হল আপনার কাছেই আসি।'

'পুলিশে খবর দেননি?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'আমার ভাই অবিশ্যি পুলিশের কথাই বলেছিল, কিন্তু আমি আবার এ সব ব্যাপারে একটু আন-অর্থডক্স। প্রচলিত নিয়মগুলো চট্ করে মানতে মন চায় না। আর সত্যি বলতে কী, এখনও বোধহয় অতটা বিচলিত হবার কারণ ঘটেনি। আপনার কাছে এলাম, তার একটা কারণ আপনাকে দেখারও একটা ইচ্ছেও ছিল। আমাদের পরিবারের

মোটামুটি সকলেই আপনাকে চেনে।'

'পরিবারে আর কে কে আছেন?'

'আমার ভাই অম্বুজ আছে। সে বিয়ে করেছে, আমি করিনি। অম্বুজের স্ত্রী আছে, একটি মেয়ে আছে বছর দশেকের—ছেলে দুটি বড়, তারা বাইরে থাকে। তা ছাড়া আমার বিধবা মা আছেন, আর আছে আমাদেরই এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সে আমাদেরই বাড়িতে মানুষ। ফ্যামিলি মেম্বার বলতে এই; তার বাইরে তিনজন চাকর, একটি ঠিকে ঝি, রান্নার লোক, মালি, দারোয়ান আর ড্রাইভার। আমরা থাকি ফাইভ বাই ওয়ান পাম এভিনিউতে। বাবা ছিলেন নামকরা হার্ট স্পেশালিস্ট অনাথ সেন।'

ফেলুদা একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব করছে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাকে আমি শুধু ব্যাপারটা জানিয়ে গেলাম। হতে পারে এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক ছাড়া আর কিছুই না; তবে কী জানেন, এ ধরনের রসিকতার টারগেট বিখ্যাত ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে হতে হয় ঠিকই, কিন্তু আমি তো আর তেমন কেউ-কেটা নই, তাই...'

ফেলুদা বলল, 'বুঝতেই পারছেন, এ হুমকি যদি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হয় তাহলে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। যাই হোক—আপাতত এই চিঠিটা আমি রাখতে পারি তো?'

'নিশ্চয়ই। ওটা তো আপনাকে দেবার জন্যেই আনা।'

এমন একটা হুমকি-চিঠি নিয়ে অম্বর সেনের ফেলুদার কাছে আসাটা একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হচ্ছিল, পরদিন সকালে পাম এভিনিউ থেকে যে ফোনটা এল, তাতে সমস্ত ব্যাপারটা একটা অন্য চেহারা নিল।

বসবার ঘর থেকে ফেলুদার ঘরে কলটা ট্রানসফার করে দিয়ে কান লাগিয়ে যা শুনলাম তা হল এই—

'কে, মিস্টার মিত্তির?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার নাম অম্বুজ সেন। কাল আমার দাদা বোধহয় আপনার ওখানে গেছলেন একটা হুমকি-চিঠির ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'ওয়েল, হি ইজ মিসিং।'

'মানে?'

'দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না?'

'না। দাদা রোজ ভোরে গাড়িতে করে বেরোন; গঙ্গার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তারপর মাইল দুয়েক হাঁটেন। আজও গেসলেন, কিন্তু আজ আর ফেরেননি।'

'সে কী।'

'ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছে এক ঘণ্টা ওয়েট করার পর। ও তন্নতন্ন করে খুঁজেও দাদার দেখা পায়নি।'

'পুলিশে জানাননি?'

'সেখানে একটা গোলমাল আছে মি. মিত্তির। আমার মা-র বয়স আশি, শরীরও ভাল নেই। ওঁকে দাদার ব্যাপারটা নিয়ে এখনও কিছুই জানাইনি। পুলিশ এলেই কিন্তু ব্যাপারটা আর চাপা থাকবে না। তখন ওঁকে সামলানো মুশকিল হবে। কাজেই আমাদের ইচ্ছা কেসটা আপনিই হ্যান্ডল করুন। আপনার উপর আমাদের পুরো ভরসা আছে। অবশ্য আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমরা দেব।'

'আমি তাহলে একবার আপনাদের ওখানে আসছি। অসুবিধা হবে না তো?'

'মোটেই না। আপনি এখনই চলে আসুন। আমাদের বাড়ির নম্বরটা জানেন তো?'

'ফাইভ বাই ওয়ান পাম এভিনিউ তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

॥ ২ ॥

সাহেবি ধাঁচের গাড়িবারান্দাওয়ালা দোতলা ছড়ানো বাড়ি, সামনে একটা ছোট বাগান, পিছনেও সবুজ দেখে মনে হল বোধহয় টেনিস কোর্ট জাতীয় কিছু আছে। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে

অম্বরবাবুর বাবার নাম, নামের পরে অনেকগুলো ইংরিজি অক্ষর, কমা, ফুলস্টপ। সব শেষে ব্র্যাকেটের মধ্যে "এডিন" কথাটা দেখে বুঝলাম ভদ্রলোককে স্কটল্যান্ড যেতে হয়েছিল ডাক্তারি পড়তে।

যিনি আমাদের ট্যাক্সির শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে অম্বরবাবুর আদল আছে ঠিকই, কিন্তু ইনি বেঁটে, মোটা আর কালো। অর্থাৎ মুখের মিল বাদ দিলে ইনি অম্বরবাবুর ঠিক উলটো।

আমাদের দেখে ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটে উঠলেও, দুশ্চিন্তার ফলে সেটা সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল।

'আসুন ভিতরে।'

শ্বেতপাথরের মেঝেওয়ালা ল্যান্ডিং পেরিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম। এখানেও মার্বল, তার উপর কার্পেট, আর তার উপর দামি দামি ফারনিচার। যে সোফায় বসলাম, সেটার গদি এত নরম যে, আমার ভারেই প্রায় ছ ইঞ্চি বসে গেল।

'রুনা, এসো।'

একটি ফ্রক-পরা মেয়ে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে অবাক চোখে চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। অম্বুজবাবু ডাকতেই সে গুটি গুটি ঘরের ভিতরে এগিয়ে এল।

'ইনি কে জানো?' জিগ্যেস করলেন অম্বুজবাবু।

'ফেলুদা,' চাপা গলায় উত্তর এল।

'আর ইনি?'

'তোপসে।'

'বাঃ, তুমি তো আমাদের দুজনকেই চেনো দেখছি,' বলল ফেলুদা।

'জটায়ু কোথায়?' জিগ্যেস করল মেয়েটি। বোঝা গেল সে এই তৃতীয় ব্যক্তিটিকে না দেখে কিছুটা হতাশ হয়েছে।

'তিনি তো আসেননি,' বলল ফেলুদা। 'তবে তাঁকে একদিন নিশ্চয়ই নিয়ে আসব।'

'তোপসে এত মিথ্যে কথা বলে কেন?'

এই রে।—আমার সম্বন্ধে হঠাৎ এমন বদনাম কেন?

'মিথ্যে মানে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'একটা বইয়ে লিখেছে ফেলুদা ওর মাসতুতো ভাই, আর একটায়

লিখেছে জ্যাঠতুতো ভাই। মিথ্যেই তো।'

ফেলুদাই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। বলল, 'ওহো—প্রথমে মাসতুতো ভাই লিখেছিল বটে, তখন ও গল্পের মতো বানিয়ে লিখতে চেষ্টা করছিল। আমি ধমক দিতে তারপর সত্যি কথাটা লিখতে শুরু করল। আসলে জ্যাঠতুতো ভাইটাই ঠিক।'

'আপনার সব অ্যাডভেঞ্চার ওর পড়া,' বললেন অম্বুজ সেন।

'জেঠুকে খুঁজে বার করে দিতে পারবে তুমি?' ফেলুদার দিকে সটান তাকিয়ে প্রশ্ন করল ঝুনা।

'চেষ্টা করতে হবে।' বলল ফেলুদা। 'তুমি যদি কোনও ক্লু জোগাড় করে দিতে পারো তাহলে তো কথাই নেই।'

'ক্লু?'

'ক্লু জানো তো?'

'জানি।'

'আছে তোমার কাছে কোনও ক্লু, যাতে আমরা চট করে বের করে দিতে পারি তোমার জেঠুকে?'

'ক্লু তো তুমি বার করবে। তুমি তো ডিটেকটিভ।'

'ঠিক বলেছ। খুব চালাক মেয়ে তুমি। কী নাম তোমার? একটা নাম তো জানি, অন্যটা কী?'

'ভাল নাম ঝর্না।'

ফেলুদা অম্বুজবাবুর দিকে ফিরল।

'দেখুন, আপনাদের দিক থেকে কতকগুলো ব্যাপারে সাহায্য না পেলে কিন্তু আমার পক্ষে এগোনো মুশকিল হবে।'

'কী সাহায্য বলুন।'

'প্রথমত, আপনাদের সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। আপনার দাদার সঙ্গে আমার মাত্র কয়েক মিনিটের আলাপ। তাঁকে আমার আরেকটু ভাল করে চিনতে হবে। তাঁর কাজের ঘরটাও একবার দেখা দরকার। এমনকী, দরকার হলে তাঁর জিনিসপত্র একটু ঘেঁটে দেখতে হতে পারে। আশা করি আপত্তি হবে না।'

'মোটেই না,' বললেন অম্বুজবাবু।

'আর আপনার দাদা যেখানে মর্নিং ওয়াকে যেতেন, সেই

জায়গাটাও একবার দেখে আসা দরকার।'

'কোনওই অসুবিধে নেই। আমাদের ড্রাইভার বিলাস আপনাদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে আনবে।'

ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি আরম্ভ করেছে। তিনটে বড় বড় বুককেস বোঝাই বই, সেইদিকে তার দৃষ্টি।

'এ সব বই কার?'

'সবই দাদার।'

'নানান বিষয়ে ইন্টারেস্ট আছে দেখছি।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এমনকী গোয়েন্দাগিরি সম্বন্ধেও তো বই আছে।'

'হ্যাঁ। এক সময় ওটা নিয়েও পড়াশুনা করেছেন।'

'বিজ্ঞান, ইতিহাস, রান্নার বই, মুদ্রা সংগ্রহ, থিয়েটার...'

'থিয়েটারটা দাদার নেশা বলতে পারেন। আমাদের মাঠে পুজোর সময় স্টেজ বেঁধে নাটক হয়। দাদাই নির্দেশক; ফ্যামিলির সকলেই রংটং মেখে নেমে পড়ে। এমনকী ইনিও।' রুনার দিকে দেখিয়ে দিলেন অম্বুজবাবু। রুনা এখনও সেইভাবেই হাঁ করে চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে।

'এবারে অম্বরবাবুর কাজের ঘরটা একটু দেখতে পারি?'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

অম্বুজবাবু উঠে পড়লেন সোফা থেকে।

বৈঠকখানার পাশে একটা প্যাসেজ, সেইটা পেরিয়ে পিছনের মাঠের দিকের একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম আমরা।

পুব দিকের জানালা দিয়ে রোদ এসে ঘরটাকে আলো করে দিয়েছে। একটা বড় ডেস্ক, তার সামনে একটা রিভলভিং চেয়ার, উলটোদিকে আরও দুটো চেয়ার। জানালার ধারে একটা আরাম-কেদারা। এ ছাড়া টেবিলের পিছন দিকে রয়েছে একটা শেলফ, একটা ক্যাবিনেট আর একটা গোদরেজের আলমারি। তার পাশের দেয়ালে একটা ফোলডিং ব্র্যাকেট থেকে হ্যাঙ্গারে ঝুলছে একটা ছাই রঙের কোট।

ডেস্কের উপরটা দেখলে মনে হয় অম্বরবাবু বেশ গোছানো লোক

ছিলেন। কাগজপত্র টেলিফোন পেনহোলডার পিনকুশন পেপার-ওয়েট চিঠির র‍্যাক, সব পরিপাটি করে সাজানো। একটা ডেট-ক্যালেন্ডার রয়েছে, তার তারিখটা তিনদিন আগের। ব্যাপারটা আমারও খটকা লেগেছিল, ফেলুদা সেটার দিকে অম্বুজবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ভদ্রলোক বললেন, 'দাদাকে কয়েকদিন থেকেই অন্যমনস্ক দেখছিলাম। সচরাচর দাদার এরকম ভুল হয় না কিন্তু।'

ফেলুদা খুঁতখুঁতে মানুষ, সে নিজেই শনিবার দোসরাটা বদলে মঙ্গলবার পাঁচই করে দিল।

'দেরাজ খুলে দেখতে পারি কি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'দেখুন না।'

তিনটে দেরাজই পরপর খুলে তার ভিতরের জিনিসপত্র হাতড়ে দেখল ফেলুদা। ওপরের দেরাজ থেকে পাওয়া এক টুকরো কাগজ সম্বন্ধে মনে হল তার একটু কৌতূহল হয়েছে, কারণ সেটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে।

'হিমালয়ান অপটিক্যালস থেকে চশমা করাতেন বুঝি আপনার দাদা?'

'হ্যাঁ।'

'একটা ক্যাশমেমো দেখছি। তারিখটা সাতদিন আগের। নতুন চশমা করিয়েছিলেন বুঝি?'

'কই, না তো।' বলে উঠল রুনা। সে-ও আমাদের পিছন পিছন এসেছে।

'তুমি কী করে জানলে, রুনা?' জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'আমাকে তো দেখায়নি জেঠু।'

অম্বুজবাবু একটু হেসে বললেন, 'দাদা যে কখন কী করছেন তার খবর আমরা সব সময়ে পেতাম না।'

আমরা অম্বরবাবুর স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলাম।

'আপনাদের এক আত্মীয় এখানে থাকেন বোধ হয়', প্যাসেজে বেরিয়ে এসে বলল ফেলুদা, 'আপনাদের এখানেই মানুষ হয়েছেন?'

'কে, সমরেশ? হ্যাঁ, থাকে বইকী।'

ফেলুদার অনুরোধে সমরেশবাবুকে ডেকে পাঠানো হল। বছর

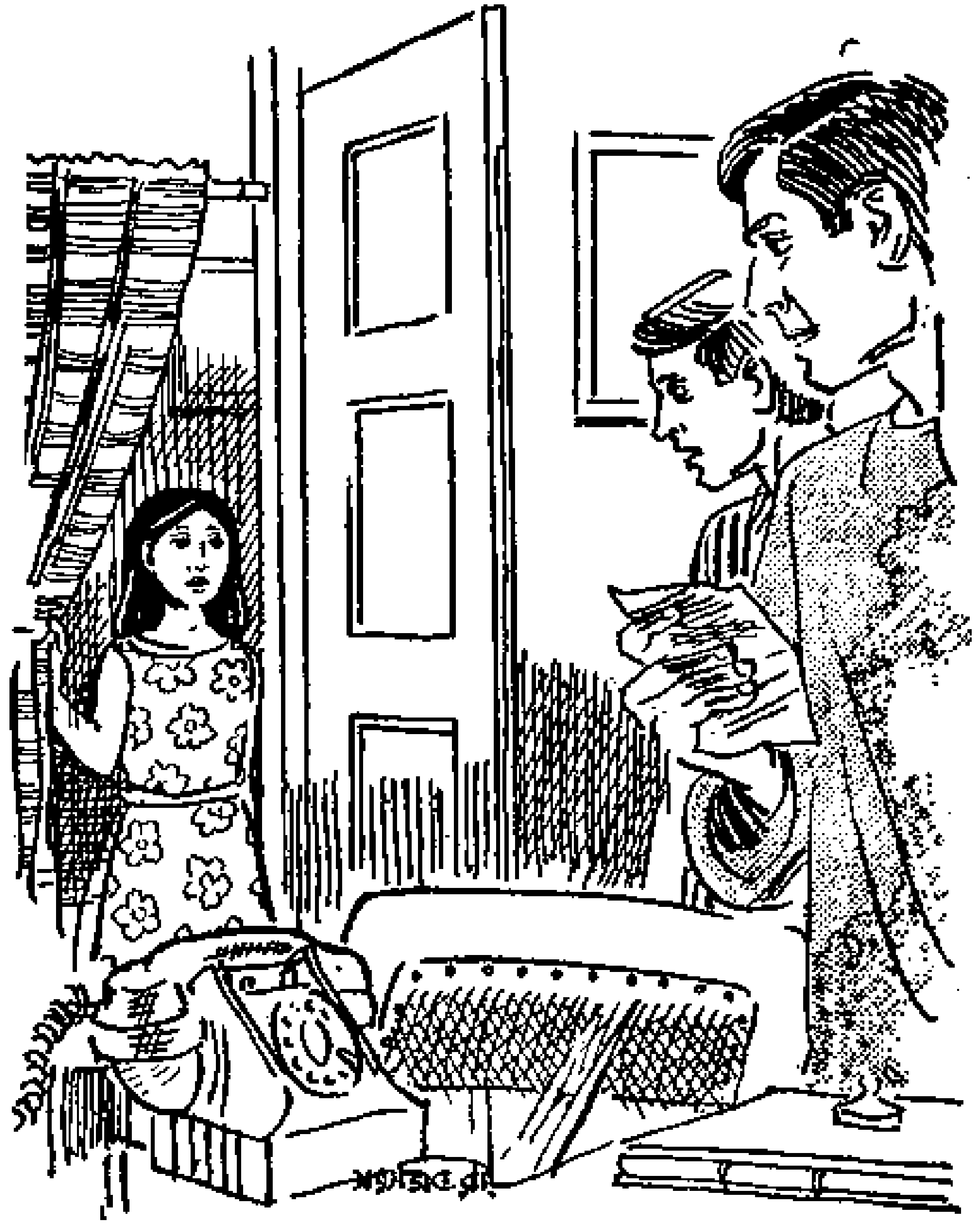

পঁয়ত্রিশ বয়স, মুখে বসন্তের দাগ, চোখে পুরু চশমা। একটু যেন আড়ষ্টভাব নিয়ে ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন আমাদের থেকে হাত দশেক দূরে।

'বসুন,' বলল ফেলুদা।

বেশ কিছুটা দূরে একটা চেয়ারে বসলেন সমরেশবাবু।

'আপনার পদবিটা কী?'

'মল্লিক।'

'কদ্দিন আছেন এ-বাড়িতে?'

'বছর পঁচিশ।'

'কী করেন?'

'একটা ফিল্ম ডিসট্রিবিউশন আপিসে কাজ করি।'

'কোথায়?'

'ধরমতলায়।'

'কী নাম কোম্পানির?'

'কোহিনুর পিকচার্স।'

'কদ্দিন আছেন ওখানে?'

'সাত বচ্ছর।'

'তার আগে কী করতেন?'

'এই...বাড়ির কাজকর্ম।'

হাত দুটোকে ভাঁজ করে হাঁটুর মধ্যে চেপে রেখেছেন ভদ্রলোক—যাকে বলে জবুথবু ভাব।

'আপনি অম্বরবাবুর অন্তর্ধানের ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করতে পারেন?'

সমরেশবাবু চুপ। ফেলুদা বলল, 'তিনি একটা হুমকি-চিঠি পেয়েছিলেন জানেন?'

' জানি।'

'আপনার ঘর কি এ বাড়ির একতলাতে?'

'হ্যাঁ।'

'অম্বরবাবুর কাছে বাইরের লোকজন দেখা করতে আসত?'

'তা আসত, মাঝে-মাঝে।'

'সম্প্রতি এমন কোনও লোককে আসতে দেখেছেন, যাকে আগে দেখেননি?'

'সেটা লক্ষ করিনি। তবে—'

'তবে কী?'

'এই পাড়ায় কিছু ছেলেকে দেখেছি, যাদের আগে দেখিনি।'

'কোথায়?'

'মোড়ের মাথায়।'

'কী করত তারা?'

'মনে হত এই বাড়ির দিকে চোখ রাখছে।'

'বয়স কীরকম তাদের?'

'বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বলে মনে হয়।'

'কজন ছেলে?'

'চারজন।'

ফেলুদা একটুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আপনি আসতে পারেন।'

এইসব কথা থেকে ফেলুদা কোনও ক্লু পেল কিনা জানি না। যেটাতে মনে হয় সত্যি করে কাজ হল, সেটা হল অম্বুজবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তায়।

রীতিমত সুন্দরী মহিলা, তার উপর যাকে বলে 'ব্রাইট'। বয়স চল্লিশের উপর হলেও দেখে বোঝার জো নেই। দোতলার একটা ছোট বৈঠকখানায় বসে কথা হল।

ফেলুদা প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিল ভদ্রমহিলাকে বিব্রত করার জন্য। 'তাতে কী হয়েছে,' বললেন মিসেস অম্বুজ সেন, 'গোয়েন্দাকে যে এভাবে জেরা করতে হয় সে তো ফেলুদার গল্প পড়েই জেনেছি। খুব ভাল লাগে পড়তে গোয়েন্দার কাহিনী।'

'তাহলে তো ভালই হল,' বলল ফেলুদা। 'আমার প্রধান মুশকিলটা কোথায় হচ্ছে বলি। অম্বরবাবু একটা হুমকি-চিঠি পেয়েছিলেন জানেন বোধহয়।'

'তা জানি বইকী।'

'দেখেছেন সে চিঠি?'

'তাও দেখেছি।'

'আমি অম্বরবাবুকে জিগ্যেস করেছিলাম তাঁর জীবনে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছিল কিনা যার ফলে অন্য কোনও মানুষের সর্বনাশ হতে পারে। উনি বলেছিলেন তেমন কোনও ঘটনা তাঁর জানা নেই। অবিশ্যি আমার বলা উচিত ছিল যে, রিসেন্ট ঘটনা হবার দরকার নেই,

অতীতের ঘটনা হলেও চলবে, কেননা প্রতিহিংসার ভাবটা মানুষ অনেক সময়ে অনেক দিন পুষে রাখে। আমি এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি কি এমন কোনও ঘটনার কথা জানেন? দশ-বিশ বছর আগের হলেও চলবে।'

ভদ্রমহিলা একটুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বললেন, 'তা হলে আপনাকে বলি। আপনি দেখুন এমনি ঘটনার কথাই বলছেন কিনা। এটা আমার কাল রাত্তিরে হঠাৎ মনে পড়ে। আমার স্বামীকেও এখনও বলিনি।'

'কী ঘটনা বলুন তো।'

'একটা অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'অনেকদিন আগে। তখনও রুনা হয়নি; বোধহয় তার পরের বছরই হল। আমার ভাসুর তখন নিজেই গাড়ি চালাতেন। আমার শ্বশুরের গাড়ি। অস্টিন। উনি শ্যামবাজারের দিকে একজন লোককে চাপা দেন। সে-লোক মারা যায়।'

আমরা দুজনেই চুপ। ঘরে থমথমে ভাব। অম্বুজবাবু পাশেই ছিলেন, চাপা গলায় বললেন, 'আশ্চর্য, এটা আমার মনেই ছিল না।'

'আর কী মনে পড়ছে?' ফেলুদা দুজনকেই প্রশ্নটা করল।

'নিম্ন-মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি,' বললেন অম্বুজবাবু, 'ক্লার্ক ছিলেন ভদ্রলোক।'

'নাম মনে পড়ছে?'

'উঁহু।'

'স্ত্রী ছিল, আর তিনটি ছেলেমেয়ে,' বললেন মিসেস সেন। 'ছেলেটির বয়স তেরো-চোদ্দো। মেয়ে দুটি আরও ছোট। পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন বিধবার হাতে।'

'কে, অম্বরবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'সেই থেকেই দাদা ড্রাইভিং বন্ধ করে দেন,' বললেন অম্বুজবাবু। 'এখন মনে পড়ছে।'

'হুঁ...' ফেলুদা গম্ভীর। 'তার মানে এখন সে-ছেলের বয়স বছর

পঁচিশ। পরিবারটির যে সর্বনাশ হবে এই ঘটনার ফলে, এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পাঁচ হাজার টাকা আর কদ্দিন চলে?'

'এর বেশি আর কিছু মনে পড়ছে না, জানেন,' বললেন মিসেস সেন।

'আমারও না,' বললেন অম্বুজবাবু।

'অম্বরবাবু কি ডায়রি রাখতেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'কই, সে রকম তো শুনিনি এখনও,' বললেন অম্বুজবাবু।

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'অনেক ধন্যবাদ, মিসেস সেন। আপনি অন্ধকারে একটা আলো দেখিয়েছেন আমাদের, তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।'

'আমরা কিন্তু মনেপ্রাণে চাইছি যে, আপনি ব্যাপারটার একটা সুরাহা করেন।'

কথাটা যে ভদ্রমহিলা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

॥ ৩ ॥

অম্বরবাবুর অসুস্থ মাকে বিরক্ত করার কোনও মানে হয় না, তাই আমরা আপাতত পাম এভিনিউ-এর পাট শেষ করে সেনেদের অ্যামবাসাডরে চলে গেলাম গঙ্গার ধারে। গে রেস্টোরান্টের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার বিলাসবাবু বললেন, 'এইখান থেকে স্যার হাঁটতে আরম্ভ করে সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়ে ঠিক এক ঘণ্টা বাদে আবার ফিরে আসতেন। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়।'

'আপনি গাড়িতেই বসে থাকতেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কদ্দিন ড্রাইভারি করছেন সেন-বাড়িতে?'

'নাইন ইয়ারস।'

'তার মানে অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা আপনি জানেন না?'

'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'অম্বরবাবু বছর বারো আগে একবার একটি লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে মারেন।'

'সেন সাহেব?'

'কেন, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'উনি যে কোনওদিন নিজে ড্রাইভ করেছেন সেইটেই জানতুম না।'

'ওই ঘটনার পরেই ড্রাইভিং ছেড়ে দেন।'

'তা হবে। ড্রাইভারের তো দোষ দেওয়া যায় না সব সময়! রাস্তার লোকে যেভাবে চলাফেরা করে, আরও বেশি লোক মরে না কেন সেইটেই তো ভাবি। ড্রাইভারের আর কী দোষ?'

'অম্বরবাবু যেদিন আর ফিরলেন না, সেদিনের ঘটনাটা একটু বলবেন?'

'সেদিন উনি আসছেন না দেখে আমি হেস্টিংস পর্যন্ত গিয়ে তল্লাশ করেছিলাম। পথে লোক ধরে ধরে জিগ্যেস পর্যন্ত করছি। গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে রাস্তায় নেমে খুঁজেছি যদি কোথাও পড়ে-টড়ে গিয়ে থাকেন। হার্টটা তেমন মজবুত ছিল না তো।'

'লোকজন কেমন ছিল রাস্তায়?'

'সকালে এদিকটা লোক মন্দ থাকে না। সব হাঁটতে আসে। তবে নিউ হাওড়া ব্রিজের সাইডটায় লোক থাকে না বললেই চলে। স্যার তো ওদিকেই যেতেন। ফস করে যদি গাড়িতে কটা জোয়ান লোক এসে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে যায়, কেউ টেরও পাবে না।'

আমরা গাড়িতে করেই দশ মাইল স্পিডে চালিয়ে হেস্টিংস পর্যন্ত ঘুরে এলাম, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেলাম না।

এরপর দু দিন পাম এভিনিউ থেকে কোনও খবর নেই। বিষ্যুদবার বিকেলে লালমোহনবাবু এসেই বললেন, 'ঘটনা এগোল?' অম্বর সেন উধাও শুনে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'আপনার একটি কেসও গোঁজে যেতে দেখলুম না। ধন্যি আপনার লাক্!'

'আপনার গ্রেট কলার প্রতিবেশী মৃত্যুঞ্জয় সোমের কী খবর?'

'দূর দূর। কলার না মুণ্ডু।'

'সে কী মশাই, এর মধ্যে আবার কী হল? সেদিন তো সুপারলেটিভ ছাড়া কথাই বলছিলেন না।'

'আর বলবেন না মশাই।'

'কেন, কী হল?'

'বলতেও লজ্জা করে।'

'আমার কাছে আবার লজ্জা কী? বলে ফেলুন।'

ব্যাপারটা কী জানি না, কিন্তু সেটা যে লালমোহনবাবু চেপে যেতে চাইছেন সেটা বুঝতেই পারছি। এদিকে ফেলুদাও ছাড়বার পাত্র নয়। শেষটায় পীড়াপীড়িতে ভদ্রলোক বলেই ফেললেন।

'আরে মশাই, ভাবতে পারেন, ভদ্রলোক প্রদোষ মিত্তিরের নাম শোনেননি! আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিতে গিয়ে একেবারে ভেড়া বনে গেলুম! বলে কিনা—হু ইজ প্রদোষ মিত্র?'

'তাতে আর কী হল, এত বড় স্কলার, হার্বার্টের ডবল এম. এ., আমিও তো তাঁর নাম শুনিনি।'

কথাটা বোধহয় লালমোহনবাবুকে কিছুটা আশ্বস্ত করল। বললেন, 'তা যা বলেছেন। এত বড় দুনিয়ায় কটা মানুষকে আর কটা মানুষ চেনে। আর ভদ্রলোক বোধহয় বেশির ভাগ সময় বিদেশে কাটিয়েছেন। কাজেই এক্সকিউজ করে দেওয়া যায়—কী বলেন?'

আমাদের কথার মাঝখানেই পাম এভিনিউ থেকে ফোন এল। অম্বুজ সেন। একটা বেনামি চিঠি এসেছে ভদ্রলোকের নামে। টেলিফোনে সেটা পড়ে শোনালেন ভদ্রলোক।

'আগামীকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ-টায় ১০০ টাকার নোটে ২০০০০ টাকা ব্যাগে পুরে প্রিনসেপঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের থামের ধারে রেখে যাবেন। অম্বর সেনকে অক্ষত অবস্থায় ফিরে পাবার এই একমাত্র উপায়। পুলিশ বা গোয়েন্দার সাহায্য নিলে ফল হবে মারাত্মক।'

ফেলুদা ফোনে বলল, 'এখনই কোনও সিদ্ধান্ত নেবার দরকার নেই, মি. সেন। আরও চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যে আমার কয়েকটা কাজ আছে। আপনাদের দিক থেকে কী করণীয় সেটা আমি কাল দুপুর দুটোর মধ্যে আপনাদের বাড়ি গিয়ে বলে আসব। তবে হ্যাঁ, টাকার ব্যবস্থাটা করে রাখবেন। ওটা খুবই জরুরি।'

'কিন্তু গোয়েন্দার ব্যাপারে শাসিয়ে রেখেছে যে মশাই,' ফেলুদা ফোন রাখার পর লালমোহনবাবু বললেন।

ফেলুদা উত্তরে শুধু বলল, 'জানি।'

রকেটের বেগে ঘটনা এগিয়ে চলেছে। এই টাকাটা না দিয়ে উপায় কী আছে সেটা আমিও ভেবে পেলাম না।

'লালমোহনবাবু, কাল আপনার গাড়িটা একটু পাওয়া যাবে কি?' প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করে থেকে অবশেষে প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'এনি টাইম,' বললেন জটায়ু। 'কখন চাই বলুন।'

'সকালে একবার বেরোব। সাড়ে ন'টা নাগাত পেলেই চলবে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমার কাজ হয়ে যাবে। তারপর বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনি যদি গাড়িটা নিয়ে চলে আসেন তো খুব ভাল হয়।'

'ভেরি গুড।'

এরপর ফেলুদা আর কোনও কথাই বলল না।

পরদিন লালমোহনবাবুর গাড়িতে করে ফেলুদা বেরোল। একাই বেরোল, কাজেই কোথায় গেল কী করল জানার উপায় নেই। বারোটা নাগাদ ফিরে আসার পর দেখলাম তার মুখের ভাব বদলে গেছে।

'কী ঠিক করলে ফেলুদা?' ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলাম।

'টাকাটা দিতেই হবে,' বলল ফেলুদা। 'তবে গোয়েন্দা সম্পর্কে হুমকিটা মানা চলবে না।'

'মানে? তুমি নিজেও থাকবে সেখানে?'

'ফেলু মিত্তির অত সহজে ঘাবড়াবার লোক নয় রে তোপসে।'

'আর আমরা?' আমরা কোথায় থাকব?'

'তোরাও থাকবি কাছাকাছির মধ্যে, কারণ হেল্প দরকার হতে পারে।'

আমি তো শুনে থ।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে আমরা গেলাম পাম এভিনিউ।

অনুজবাবু স্বভাবতই বাড়িতে ছিলেন, ফেলুদাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'কাল রাত্তিরে চোখের পাতা এক করতে পারিনি মশাই। দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল।'

ফেলুদা গম্ভীরভাবে বলল, 'টাকাটা আপনাদের খসবেই, মি. সেন। অক্রুরবাবুকে ফিরে পাবার আর কোনও রাস্তা নেই।'

'তুমি ধরতে পারোনি এখনও?' রুনা হঠাৎ ঘরের দরজা থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে উঠল।

'অনেকটা ধরে ফেলেছি, রুনা,' বলল ফেলুদা। 'খুব চেষ্টা করছি যাতে বাকিটা আজ বিকেলের মধ্যেই ধরতে পারি।'

'ব্যাস, ঠিক আছে।'

রুনাকে ভীষণ নিশ্চিন্ত বলে মনে হল। ফেলুদা ব্যর্থ হবে এটা যেন

তার কাছে ভয়ানক একটা দুঃখের ব্যাপার।

'তাহলে কী করা উচিত বলে মনে হয়?' জিগ্যেস করলেন অম্বুজবাবু।

'টাকার ব্যবস্থা হয়েছে?'

'সেটা করে ফেলেছি। বাড়িতে তো অত ক্যাশ থাকে না, তাই আজ সকালেই সমরেশকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে আনিয়ে নিয়েছি।'

'সেই টাকা, এবং যে ব্যাগে করে সেটা দেওয়া হবে—এই দুটো জিনিস আমি একবার দেখতে চাই।'

টাকা এবং ব্যাগ এসে গেল। এত টাকা এর আগে একসঙ্গে দেখেছি কি? মনে তো পড়ে না।

ফেলুদার সামনেই কুড়িটা করে একশো টাকার নোট রাবার ব্যান্ড দিয়ে গোছ করে দশ ভাগে ব্যাগের মধ্যে পুরে দেওয়া হল। তার ফলে ব্যাগের চেহারা হয়ে গেল কচ্ছপের পিঠের মতো।

'ভেরি গুড,' বলল ফেলুদা। 'তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ছি পৌনে ছ'টা নাগাদ।'

অম্বুজবাবু চমকে উঠলেন।

'সে কী, আপনি যাবেন?'

'অপরাধীকে ধরার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে, মি. সেন। আপনি টাকা রেখে আসবেন, আর সে লোক দিব্যি এসে সেটা তুলে নিয়ে চলে যাবে, এ তো হতে দেওয়া যায় না। অম্বরবাবুকে ফেরত পাওয়াটাই বড় কথা সেটা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে এই গুণ্ডাদেরও সাজা হওয়া উচিত নয় কি? না হলে তো তারা এই ধরনের কুকীর্তি করেই চলবে। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। সাবধানতা অবলম্বন না করে আমি কখনও কিছু করি না।'

'তাহলে—'

'আমি বলছি, আপনি মন দিয়ে শুনুন। আপনি আপনার গাড়িতে করে যাবেন টাকা নিয়ে। নিউ হাওড়া ব্রিজের দিকটা দিয়ে আসবেন। ওদিকটা মোটামুটি নিরিবিলি। গাড়ি প্রিনসেপঘাট থেকে অন্তত দুশো গজ আগে দাঁড় করিয়ে আপনার ড্রাইভারকে বলবেন টাকাটা যথাস্থানে রেখে আসতে। আমি কাছাকাছির মধ্যেই থাকব। কাজটা

ঠিকমত হচ্ছে কিনা সেটা আমি দেখতে পাব। আমরা মিট করব ঘটনার পর। গে রেস্টোরান্টের সামনে। আপনি টাকা রেখে সোজা ওখানে চলে আসবেন। আমিও তাই করব। অপরাধীকে যদি ধরতে পারি তাহলে তিনিও আমার সঙ্গেই থাকবেন, বলাই বাহুল্য।'

অম্বুজবাবুকে মনে হল যেন তিনি বেশ নার্ভাস বোধ করছেন। সেটা অস্বাভাবিক নয়। টাকার অঙ্কটা তো কম নয়। আর গুণ্ডারা কী করবে না-করবে কে জানে?

বিকেল সাড়ে চারটের সময় লালমোহনবাবু এলে পর ফেলুদার প্রথম কথা হল, 'মশাই, এমন অভিনব কেস আর আমি কোনওদিন পাইনি।'

অবিশ্যি আমাকে জিগ্যেস করলে পরে আমি এখনও বলতে পারব না এর বিশেষত্বটা কোথায়।

'তাহলে আমরা কী করছি?' জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'শুনে নিন মন দিয়ে,' বলল ফেলুদা। 'তুইও শোন, তোপসে। সাড়ে পাঁচটার সময় আপনার গাড়ি নিয়ে আপনি আর তোপসে চলে যাচ্ছেন গে রেস্টোরান্টে। সেখানে আপনাদের অভিরুচি অনুযায়ী পানাহার সেরে ঠিক সোয়া ছ-টায় রেস্টোরান্ট থেকে বেরিয়ে সটান চলে যাবেন দক্ষিণে প্রিনসেপঘাট লক্ষ করে। গাড়ি রেখে যাবেন রেস্টোরান্টের সামনে। থামওয়ালা ঘাটটার কাছে পৌঁছনোর কিছু আগেই দেখবেন ডানদিকে একটা গম্বুজওয়ালা বসার ঘর রয়েছে। দুজনে সেখানে ঢুকে বেঞ্চিতে বসে পড়বেন। ভাবটা এমন হওয়া চাই যেন সান্ধ্যভ্রমণ আর বায়ুসেবন ছাড়া আপনাদের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। ঘাটের দিকে আড়দৃষ্টি রাখবেন, তবে যেন মনে না হয় যে, ওটাই আপনাদের লক্ষ। তারপর সাড়ে ছ-টার দশ মিনিট পর ওখান থেকে উঠে পড়ে নিজের গাড়িতে ফিরে আসবেন। আমিও সেখানেই আপনাদের মিট করব।'

ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হতে চলল, কিন্তু এখনও দিব্যি ঠাণ্ডা। তবে শীতকালের মতো দিন আর অত ছোট নেই, ছ-টা পর্যন্ত বেশ আলো থাকে। আমি আর লালমোহনবাবু কফি আর মুরগির কাটলেট খেয়ে ঠিক সোয়া ছ-টায় রেস্টোরান্ট থেকে বেরিয়ে রওনা দিলাম প্রিনসেপঘাটের দিকে।

পথে লালমোহনবাবু মাঝে-মাঝে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আঃ উঃ শব্দ করে সান্ধ্যভ্রমণের অভিনয় করছেন, সেটা যে খুব কনভিনসিং হচ্ছে তা নয়। কিন্তু ক্রমেই আশপাশের লোকজন এত কমে আসছে, ফুচকাওয়ালা আর ভেলপুরিওয়ালার দল এত পিছিয়ে পড়ছে যে, এখন উনি যা খুশি করলেও আপত্তির কিছু নেই।

দশ মিনিট লাগল আমাদের গম্বুজওয়ালা বসার জায়গাটায় পৌঁছতে। বেঞ্চ দখল করার পর এদিক ওদিক চেয়ে লালমোহনবাবু চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তোমার দাদাকে দেখতে পাচ্ছ কি, তপেশ?'

দাদা কেন, কোনও মানুষকেই দেখতে পাচ্ছি না ঘাটের নৌকোর মাঝিদের ছাড়া। কোনখানে লুকিয়ে রয়েছে ফেলুদা কে জানে। ঘাটের দেড়শো বছরের পুরনো থামগুলো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে ফাঁকগুলো ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে। ওখানে গিয়ে কেউ টাকার ব্যাগ রাখলে, বা সে ব্যাগ নিতে এলে, কেউ দেখতেও পাবে না।

'ওই যে!' লালমোহন বাবু আমার হাত খামচে ধরেছেন।

হ্যাঁ—ঠিকই দেখেছেন ভদ্রলোক।

একজন সাদা প্যান্ট আর কালো কোট পরা লোক হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে প্রিনসেপঘাটের দিকে। অম্বরবাবুদের ড্রাইভার। বিলাসবাবু।

বিলাসবাবু এবার থামগুলোর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন।

মিনিটখানেক পরেই তাঁকে আবার দেখা গেল। এবার হাত খালি। বড়রাস্তায় পড়ে ডাইনে মোড় ঘুরে গাছের আড়াল হয়ে গেলেন

ভদ্রলোক।

সাড়ে ছ-টা বেজে গেছে। আলো আরও পড়ে এসেছে। এখন সামনের সারির থামগুলো ছাড়া আর কোনওটাই দেখা যাচ্ছে না। একবার মনে হল অন্ধকারের মধ্যে কে যেন নড়ল; কিন্তু সেটা চোখের ভুল হতে পারে।

এবার দেখলাম সেনদের গাড়ি আমাদের সামনে দিয়ে রেস্টোরান্টের দিকে চলে গেল। তারপর তিনজন জিনস-পরা ছেলে, আর তাদের পিছনে ঢোলা প্যান্টপরা হাতে লাঠিওয়ালা এক বৃদ্ধ ফিরিঙ্গিও সেই দিকেই চলে গেল।

আমরাও উঠে পড়লাম।

আবার ঠিক দশ মিনিটই লাগল আমাদের গাড়িতে পৌঁছোতে।

কিন্তু ফেলুদা কই?

এবার গাড়ির ভিতরে চোখ গেল।

নস্যিরঙের আলোয়ান জড়ানো এবং লুঙ্গি পরা এক বুড়ো বসে আছে ড্রাইভার হরিপদবাবুর পাশে। থুতনিতে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কিন্তু গোঁফ নেই।

'স্যালাম কর্তা।' লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বলল লোকটা।

এ আর বলতে হবে না। ওই মুসলমান মাঝি ফেলুদা ছাড়া আর কেউ না। এদিকে অম্বুজবাবুও এসে পড়েছেন রাস্তার ওদিক থেকে। তাঁর কাছে ফেলুদার নিজের পরিচয় দিতেই হল। 'নৌকো থেকে ঘাটটা সবচেয়ে ভাল দেখা যায়, তাই ওখানেই ওত পাতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

'কিন্তু কী হল সেইটে বলুন, মি. মিত্তির।'

ফেলুদা গম্ভীর।

'ভেরি সরি, মি. সেন।'

'মানে?'

'আমি ঘাটে ওঠার আগেই সে লোক টাকা নিয়ে হাওয়া।'

'বলেন কী! টাকা নেই? লোকটাকেও ধরা গেল না?'

'বলছি তো—আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

অম্বুজবাবু কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন ফেলুদার দিকে।

কথাটা যেন ভদ্রলোকের বিশ্বাসই হচ্ছে না। সত্যি বলতে কী, আমারও কেমন যেন মাথা ঝিমঝিম করছিল। ফেলুদাকে এভাবে হার মানতে এর আগে দেখিনি কখনও।

'আপনাদের পুলিশের সাহায্যই নিতে হবে, মি. সেন,' বলল ফেলুদা। 'আপনি বাড়ি চলে যান। এবার তো অম্বরবাবুর ফিরে আসা উচিত। আমরা একবার বাড়িতে ঢুঁ মেরে আপনার ওখানেই আসছি। এই বেশে তো আর পাম এভিনিউ-এর বৈঠকখানায় ঢোকা যাবে না।'

বাড়ি যাওয়ার একমাত্র কারণ ফেলুদার একটু ফিটফাট হয়ে নেওয়া। তা ছাড়া হাতেও রং লেগেছিল—জিগ্যেস করতে বলল আলকাতরা—সেটাও ধুয়ে নেওয়া দরকার। আলকাতরাটাও মেক-আপের অংশ কিনা জিগ্যেস করাতে কোনও উত্তর দিল না ফেলুদা।

আমরা যখন পাম এভিনিউ রওনা হলাম, তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। পথে লালমোহনবাবু একবার বলেছিলেন, 'আপনার অমন ব্রিলিয়ান্ট মেক-আপটা মাঠে মারা যাবে ভাবিনি মশাই—' কিন্তু তাতে ফেলুদা কোনও মন্তব্য করেনি।

পাম এভিনিউ পৌঁছানোর সঙ্গে-সঙ্গেই রুনার গলায় উচ্ছ্বসিত চিৎকার শোনা গেল, 'জেঠু এসে গেছে!'

অম্বরবাবু ফিরেছেন আমরা আসার মিনিট দশেক আগে। আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকতেই ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে ফেলুদার হাত দুটো ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন। ভাই, ভাইয়ের বউ, ভাইঝি, সমরেশবাবু, বিলাসবাবু, সকলেই ঘরে রয়েছেন।

'কোথায় আটক করে রেখেছিল আপনাকে?' একগাল হেসে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'ওঃ—সে আর বলবেন না—'

ফেলুদা হাত তুলে বাধা দিল ভদ্রলোককে।

'উনি তো বলবেনই না, আর আপনিও বলবেন না, মি. সেন। কারণ বললেই একরাশ কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে। মিথ্যে শব্দটা ব্যবহার করলাম না, কারণ সেটা ভাল শোনায় না।'

'হুররে হুররে হুররে!' চেঁচিয়ে উঠল রুনা। 'ফেলুদা ধরে ফেলেছে, ফেলুদা ধরে ফেলেছে!'

এবার ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনারা যে একটা বিরাট ফন্দি এঁটেছিলেন সেটা ধরে ফেলেছি, কিন্তু সেটার কারণটা এখনও ঠিক ধরতে পারছি না।'

'কারণ বলছি মি. মিত্তির,' হেসে বললেন অম্বর সেন। 'কারণ আমার ওই খুদে ভাইঝিটি। সে আপনাকে বলতে গেলে একরকম পুজোই করে। তার ধারণা আপনি ভুলভ্রান্তির উর্ধ্বে। তাই ওকে আমি সেদিন বললাম যে, তোর ফেলুদাকে আমি জব্দ করতে পারি। ব্যাস—ওই একটি উক্তি থেকেই সমস্ত ফন্দিটির উৎপত্তি। এতে আমাদের সকলেরই ভূমিকা আছে।'

'অর্থাৎ এও আপনাদের একটা ফ্যামিলি নাটক?'

'ঠিক তাই। সবাইকে সব কিছু আমিই শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলাম। আপনি কী জিগ্যেস করলে কী উত্তর দেবে, সব লিখে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলাম—এমনকী ড্রাইভার ও চাকরকে পর্যন্ত। প্রধান নারীচরিত্র অবশ্য বউমা, যাঁকে দিয়ে মনগড়া অ্যাকসিডেন্টের কথাটা বলানো হয়েছিল। আমি নিজে ভাবিনি যে, আপনি ব্যাপারটা ধরে ফেলবেন—ইন ফ্যাক্ট, এই নিয়ে আমার ভাইয়ের সঙ্গে একশো টাকা বাজিও ধরেছিলাম। এ ব্যাপারে রুনার উৎকণ্ঠাই ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ তার হিরো যদি ফেল করত, তাহলে তার দুঃখের সীমা থাকত না। এই ঝুঁকিটা অবশ্য আমাকে নিতেই হয়েছিল, কিন্তু এখন সে নিশ্চিন্ত। এবার বলুন তো আপনার সিসটেমটা কী। কীসে আপনার প্রথম সন্দেহ হল মি. মিত্তির?'

ফেলুদা বলল, 'প্রথমত এবং প্রধানত, দুটো ক্লু, দুটোই আপনার কাজের ঘরে পাওয়া। এক হল হিমালয়ান অপটিক্যালসের ক্যাশ মেমো। আমি সেখানে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, আপনি দিন সাতেক আগে একটি সোনালি ফ্রেমের নতুন চশমা করিয়েছেন। অথচ আপনার বাড়িতে সেটা সম্বন্ধে কেউ জানে না, বা কেউ সেটা আপনাকে পরতে দেখেনি। প্রশ্ন হল, এই চশমার দরকার পড়ছে কেন। এবং ঠিক এই সময় দরকার কেন।

'দুই হল—আপনার ডেট ক্যালেন্ডারে তিন দিনের পুরনো তারিখ। আপনার চাকর যখন তারিখ বদল করে না, তখন সেটা নিশ্চয় আপনিই করেন। তাহলে বদল হয়নি কেন?

'তখনই মনে হল যে, আপনাকে যদি কিডন্যাপ্‌ড হবার ভান করে গা ঢাকা দিতে হয়, তাহলে হয়তো একটা ডেরা স্থির করে দু দিন আগে গিয়েই সেখানে থাকা অভ্যাস করতে হবে। নতুন জায়গা ধাতস্থ হতে সময় লাগে বইকী। আর তাই যদি হয়, তাহলে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য আপনাকে হয়তো একটি ছদ্মবেশ ও একটি নতুন নাম নিতে হবে। সেই ক্ষেত্রে একটি নতুন চশমা নেওয়াও মোটেই অস্বাভাবিক নয়।'

'ধরে ফেলেছে, ফেলুদা সব ধরে ফেলেছে!' আবার চেঁচিয়ে উঠল রুনা।

এর মধ্যে লালমোহনবাবু যে হঠাৎ কেন খাঁচায়-বন্ধ সিংহের মতো পায়চারি করতে আরম্ভ করেছেন তা বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক যাতে কোনও বাড়াবাড়ি না করে ফেলেন তাই ওঁকে সামলাতে যাব, এমন সময় উনি হঠাৎ দুহাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—

'ইউরেকা!'

'চিনেছেন ভদ্রলোককে?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'চিনব না? মৃত্যুঞ্জয় সোম!'

অম্বরবাবু হোহো করে হেসে উঠলেন।

'আপনার সঙ্গে সেদিন পার্কে দেখা হওয়াটা সম্পূর্ণ অ্যাকসিডেন্ট, মশাই। আসলে গড়পারেই আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ছিলাম সাতদিন। আপনি যখন এগিয়ে এসে জটায়ু-টটায়ু বলে নিজের পরিচয় দিলেন, তখন ভাবলাম— বা রে, এ তো বেশ মজা! যাকে জব্দ করতে যাচ্ছি তারই সাকরেদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তাহলে এঁকে নিয়ে একটু রগড় করতে পারলে কেমন হয়? তারপর অবিশ্যি মিত্তির মশাইয়ের বাড়িতেও আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার আসল চেহারায়, কিন্তু আপনি চিনতে পারেননি।'

'কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?' বলল ফেলুদা, 'নাটকের তো এখানেই শেষ নয়, অম্বরবাবু। এখনও তো স্নুপাসিন খেলা চলবে না।'

ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে বদলে গেল, কারণ ফেলুদা কথাটা বলেছে গম্ভীর থমথমে ভাবে।

'হোয়্যার ইজ দ্য মানি?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

অম্বর সেন ফেলুদার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'মি. মিত্তির, আপনি আমাকেও কিন্তু একজন শখের গোয়েন্দা বলতে পারেন। আমি যদি বলি যে, টাকাটা আপনিই নিয়ে আমাদের সঙ্গে একটু রগড় করছেন, তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে? অপরাধী যখন নেই, কিডন্যাপার নেই, তখন টাকাটা সরে কোথায় যাবে মি. মিত্তির?'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'মি. সেন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আপনার শখের গোয়েন্দাগিরি এক্ষেত্রে খাটল না। প্রিনসেপঘাটের কাছে আজ সন্ধ্যায় আমি ছাড়াও আরেকজন ছদ্মবেশী ছিলেন।'

'বলেন কী।' বললেন অম্বর সেন, 'আপনি তাকে দেখেছেন?'

'দেখেছি, কিন্তু চিনিনি।'

'কিন্তু আপনি তখনই তাকে ধরলেন না কেন?'

'তখন ধরাটা আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট নাটকীয় হত না। আপনারা নাটক পছন্দ করেন তো? আমার মনে হয় আপনাদের সামনে ধরাটা আরও নাটকীয় হবে। আমার সন্দেহ তিনি এখানেই আছেন। এ সন্দেহ ঠিক কিনা সেটা আমি একবার পরখ করে দেখতে চাই।'

ঘরে যাকে বলে পিন-পড়া নিস্তব্ধতা। রুনার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলাম সেও ফ্যাকাসে মেরে গেছে।

'বিলাসবাবু, আপনার জুতোর তলাটা একবার দেখুন তো,' বলে উঠল ফেলুদা।

বিলাসবাবু ঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন, 'দেখব আর কী স্যার, জুতোর তলায় তো আলকাতরা লেগে রয়েছে। ব্যাগ রেখে ফেরবার সময় তো রাস্তায় পা আটকে যাচ্ছিল।'

'ওই আলকাতরা আমিই ছড়িয়ে রেখেছিলাম থামটার চারপাশে,' বলল ফেলুদা, 'কারণ একজনের সম্বন্ধে আমার মনে একটা সন্দেহের কারণ ঘটেছিল। আপনারা সকলেই বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেছিলেন। কিন্তু ইনি যে মিথ্যেটা বলেছিলেন সেটা একটু অন্যরকম। ইনি

বলেছিলেন...ও কী, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

কিন্তু পালাবার পথ নেই। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন বিলাসবাবু। এক ঝটকায় যাকে বগলদাবা করে ফেলেছেন ভদ্রলোক, তিনি হচ্ছেন সমরেশ মল্লিক।

'এবার আপনার স্যান্ডেলের তলাটা এঁদের দেখিয়ে দিন তো,' বলল ফেলুদা। 'বিলাসবাবু একটু হেল্প করলে ব্যাপারটা সহজে হয়ে যায়।'

বিলাসবাবু নিচু হয়ে সমরেশবাবুর পা থেকে স্যান্ডেলটা একটানে খুলে নিয়ে তার তলাটা সকলকে দেখিয়ে দিলেন। উনিই যে গিয়েছিলেন প্রিনসেপঘাটের থামের পাশে, তাতে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

'আপনার কোহিনুর কোম্পানি তো দু বছর হল লাটে উঠেছে সমরেশবাবু,' বলল ফেলুদা, 'তা সত্ত্বেও আপনি সেখানে চাকরি করছিলেন কী করে সেটা এঁদের একটু বুঝিয়ে বলবেন? আর যদি চাকরি না-ই করে থাকেন, তবে এই দু বছর কীভাবে রোজগার করেছেন সেটা বলবেন?'

সমরেশবাবু নিরুত্তর। বিলাসবাবু এখনও তাঁকে জাপটে ধরে আছেন; মনে হয় পুলিশ আসার আগে পর্যন্ত সেইভাবেই ধরে থাকবেন।

'অবিশ্যি এই ব্যক্তির খোলস খুলে ফেলার জন্য আপনাদের আমাকেই ধন্যবাদ দিতে হবে,' বলল ফেলুদা। 'আপনারা তো আর বিশ হাজার টাকা রাখতেন না থামের পাশে! নেহাত আমি যখন বললাম শাসানি কেয়ার করি না, আমি নিজে থাকব সেখানে, তখন আপনাদের বাধ্য হয়েই রাখতে হল, আর সেই টাকা হাত করার সুযোগ নিলেন সমরেশবাবু। যাকগে, এখন তো জানলেন টাকা কোথায় আছে। এবার সেটা আদায় করার রাস্তা আপনারা দেখুন। উনি যদি সে-টাকা অন্যত্র পাচার করে থাকেন, তাহলে পুলিশ তো আছেই; তারা এ সব আদায়ের অনেক রাস্তা জানে। আমার কাজ এখানেই শেষ।'

ফেলুদার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু জনও উঠে পড়েছিলাম, কিন্তু ওঠা আর হল না। মিসেস সেন বাধা দিলেন।

'শেষ বলছেন কী? এত সহজে শেষ হবে কী করে? আপনাকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথাগুলো বললাম, তার বুঝি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? আজ রাত্তিরে আপনাদের খেতে হবে আমাদের বাড়িতে।'

'আর ওই বিশ হাজারের অন্তত খানিকটা তো আপনার প্রাপ্য,' বললেন অম্বর সেন, 'সেটা না নিয়ে যাবেন কী করে?'

'আর তোমরা তিনজনে একসঙ্গে এসেছ,' বললেন শ্রীমতী রুনা, 'আমার অটোগ্রাফে সই দেবে না বুঝি?'

'এন্ডস ওয়েল দ্যাট অল্‌স ওয়েল,' বললেন লালমোহনবাবু।

সত্যজিত রায়
জাহাঙ্গীরের
স্বর্ণমুদ্রা

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা

॥ ১ ॥

'হ্যালো—প্রদোষ মিত্র আছেন?'

'কথা বলছি।'

'ধরুন—পানিহাটি থেকে কল আছে আপনার... হ্যাঁ, কথা বলুন।'

'হ্যালো—'

'কে, মি. প্রদোষ মিত্র?'

'বলছি—'

'আমার নাম শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী। আমি পানিহাটি থেকে বলছি। আমি অবিশ্যি আপনার অপরিচিত, কিন্তু একটা বিশেষ অনুরোধ জানাতে আপনাকে টেলিফোন করছি।'

'বলুন।'

'আমার ইচ্ছা আপনি একবার এখানে আসেন।'

'পানিহাটি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি এখানেই থাকি। গঙ্গার উপরে আমাদের একটা একশো বছরের পুরনো বাড়ি আছে। নাম অমরাবতী। এখানে সকলেই জানে। আপনার কাজের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, এবং আপনারা যে তিনজন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেন তাও আমি জানি। আমি আপনাদের তিনজনকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই শনিবার সকালে এসে—এই ধরুন দশটা নাগাদ—রাত্তিরটা থেকে আবার রবিবার ফিরে যাবেন।'

'কোনও অসুবিধায় পড়েছেন কি? মানে আমার পেশাটা তো জানেন; কোনও রহস্য—?'

'তা না হলে আপনাকে ডাকব কেন বলুন? তবে সে বিষয়ে আমি ফোনে বলব না, আপনি এলে বলব। আমার বাড়িটা আপনাদের ভালই লাগবে, ভাল ইলিশ মাছ খাওয়াব, যদি ভিডিও ক্যাসেটে ছবি দেখতে চান তাও দেখাব, আর তার উপরে আপনার মস্তিষ্ক খাটানোর খোরাকও জুটবে বলে মনে হয়।'

'আমার অবিশ্যি এখন এমনিতে কোনও এনগেজমেন্ট নেই—'

'তা হলে চলে আসুন—দ্বিধা করবেন না। তবে একটা কথা।'

'এখানে আমি ছাড়াও কয়েকজন থাকবেন। গোড়ায় আমি কাউকে আপনার আসল পরিচয়টা দিতে চাই না—একটা বিশেষ কারণে।'

'ছদ্মবেশ নিয়ে আসতে বলছেন?'

'সেটার হয়তো প্রয়োজন নেই। আপনি তো ফিল্মস্টার নন। যাঁরা এখানে থাকবেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা আপনার চেহারার সঙ্গে পরিচিত নন। আপনি শুধু আপনাদের তিনজনের জন্য ভূমিকা বেছে দেবেন। কী ভূমিকা সেটাও আমি সাজেস্ট করতে পারি।'

'কীরকম?'

'আমার প্রপিতামহ বনোয়ারিলাল চৌধুরী ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্র। তাঁর কথা পরে জানবেন, কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি যে তাঁর একটা জীবনী লেখা এমনিতেও বিশেষ দরকার। আপনি যদি ধরুন তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে আসেন।'

'ভেরি গুড। আর আমার বন্ধু—মি. গাঙ্গুলী।'

'আপনার বাইনোকুলার আছে?'

'তা আছে।'

'তা হলে ওঁকে পক্ষিবিদ করে দিন না। আমার বাগানে অনেক পাখি আসে; ওঁর একটা অকুপেশন হয়ে যাবে।'

'বেশ। আমার খুড়তুতো ভাইটি হবেন পক্ষিবিদের ভাইপো।'

'ব্যাস্, তা হলে তো হয়েই গেল।'

'তা হলে পরশু শনিবার সকাল দশটা?'

'দশটা।'

'অমরাবতী?'

'অমরাবতী। আর আমার নাম শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরী।'

ফেলুদাকে অবিশ্যি টেলিফোনের পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য রিপিট করতে হল। বলল, 'কিছু লোক আছে যাদের কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভরসা-জাগানো হৃদ্যতাপূর্ণ ভাব থাকে যে তাদের অনুরোধ এড়ানো খুব মুশকিল হয়।'

আমি বললাম, 'এড়াবে কেন? এঁকে তো একরকম মক্কেল বলেই মনে হচ্ছে। তোমার রোজগারের কথাটাও ভাবতে হবে তো।'

আসলে ফেলুদার একটা ব্যাপার আছে। পর পর গোটা দু'তিন কেসে ভাল রোজগার হলে কিছুদিনের জন্য গোয়েন্দাগিরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্য জিনিস নিয়ে পড়ে; সে জিনিসে অবিশ্যি রোজগার নেই, শুধু শখের ব্যাপার। এখন ওর সেই অবস্থা চলেছে। এখনকার নেশা হল আদিম মানুষ। সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকার জীবতত্ত্ববিদ্ রিচার্ড লীকির একটা সাক্ষাৎকার পড়ে ও জেনেছে যে লীকির কিছু আবিষ্কারের ফলে আদিম মানুষের উদ্ভবের সময়টা এক ধাক্কায় লাখ লাখ বছর পিছিয়ে গেছে। ফেলুদা এখন আদিম মানুষ ও তার বানর পূর্বাবস্থার ভাবনায়

দশগুণ। পাঁচবার গেছে মিউজিয়ামে, তিনবার ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর একবার চিড়িয়াখানা। একদিন বলল, 'একটা থিওরিতে কী বলে জানিস? বলে মানুষ এসেছে আফ্রিকার এক বিশেষ ধরনের খুনে বানর থেকে, যাকে বলে "কিলার এপ"। আর সেই কারণেই নাকি মানুষের মজ্জায় একটা হিংস্র প্রবৃত্তি রয়ে গেছে—যেটা প্রকাশ পায় যুদ্ধে, দাঙ্গায় আর খুন-খারাপিতে।'

পানিহাটিতে মানুষের এই হিংস্র প্রবৃত্তির কোনও নমুনা ও আশা করছে কি না জানি না, তবে এটা জানি যে মাঝে মাঝে ওর কলকাতা ছেড়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বাইরে ঘুরে আসতে ভালই লাগে। এইতো সেদিন আমরা লালমোহনবাবুর গাড়িতে গিয়ে বর্ধমানের রাস্তায় পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গম্বুজ আর হিন্দু মন্দিরের উপরে তৈরি ষোড়শ শতাব্দীর মুসলমান মসজিদ দেখে এলাম।

লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু দশ দিনের ছুটিতে দেশে গেছেন বলে ফেলুদাকেই তাঁর জায়গা নিতে হল। পথে যেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'দিলেন তো মশাই একটা দায়িত্ব আর একটা বাইনোকুলার আর দুখানা বই ঘাড়ে চাপিয়ে; এদিকে গড়পারে তো কাক-চড়ুই ছাড়া কোনও পাখি কোনওদিন দেখিছি বলে মনে পড়ে না।'

বই দুটো হল সেলিম আলীর ইন্ডিয়ান বার্ডস আর অজয় হোমের বাংলার পাখি।

ফেলুদা বলল, 'কুছ পরোয়া নেহী। মনে রাখবেন, কাক হল করভাস স্প্লেনডেন্‌স, চড়ুই হল পাসের ডোমেস্টিকাস। সব সময় ল্যাটিন নাম বলতে গেলে জিভ জড়িয়ে যাবে, তাই ইংরিজি নামও ব্যবহার করতে পারেন—যেমন ফিঙেকে ড্রঙ্গো, টুনটুনিকে টেলর বার্ড, ছাতারেকে জাঙ্গল ব্যাবলার। আর পাখি না দেখলেও, মাঝে মাঝে বাইনোকুলার চোখে লাগালেই অনেকটা কাজ দেবে।'

'আমার নামও তো একটা চাই' বললেন লালমোহনবাবু।

'আপনি হলেন ভবতোষ সিংহ, আপনার ভাইপো প্রবীর আর আমি সোমেশ্বর রায়।'

পৌনে নটায় রওনা হয়ে আমরা দশটা বেজে পাঁচে পানিহাটিতে শঙ্করপ্রসাদ চৌধুরীর বাড়ি অমরাবতীতে পৌঁছে গেলাম। আমাদের গাড়ি দেখেই বন্দুকধারী গুর্খা দারোয়ান এসে বিকট ক্যাঁ-চ শব্দে লোহার গেট খুলে দিল।

ফেলুদা বলে, 'গল্পের শুরুতেই একগাদা বর্ণনা হুড় হুড় করে ঢেলে দিলে পাঠক হাবুডুবু খায়; ওটা দিবি গল্পের ফাঁকে ফাঁকে।' তাই শুধু বলছি—বিশাল জমির ওপর লাল বাড়িটা পেল্লায়, থমথমে আর অনেকটা বিলিতি কাস্‌লের ধাঁচে তৈরি। বাড়ির দক্ষিণে ফুলবাগান, তার পরে গাছপালা রাখার কাচের ঘর, আর তারও পরে ফলবাগান। নুড়ি বিছানো প্যাঁচালো পথ দিয়ে আমরা সদর দরজায় পৌঁছলাম।

বাড়ির মালিক গাড়ির শব্দ পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমরা নামলে হেসে বললেন, 'ওয়েলকাম্ টু অমরাবতী।' এঁর বর্ণনা হল—মাঝারি হাইট, ফরসা রং, বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ। পরনে পায়জামা আর আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে শুঁড় তোলা লাল চটি, ডান হাতে চুরুট।

'আমার খুড়তুতো ভাই জয়ন্তও কাল এসেছে, তাকেও দলে টেনে নিয়েছি। অর্থাৎ সে আপনার আসল পরিচয় জানলেও অন্যদের সামনে প্রকাশ করবে না।

'অন্যরা কি এসে গেছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না। তাঁরা আসবেন বিকেলে। চলুন, একটু বসে জিরোবেন। আর সেই সুযোগে কিছু কথাও হবে।'

আমরা বাড়ির পশ্চিমদিকের বিরাট চওড়া বারান্দায় গিয়ে বসলাম। সামনে দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে, দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। অমরাবতীর প্রাইভেট ঘাটও দেখতে পাচ্ছি সামনে ডান দিকে। একটা তোরণের নীচ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে জল অবধি।

'ওই ঘাট কি ব্যবহার হয়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'হয় বইকী', বললেন শঙ্করবাবু। 'আমার খুড়িমা থাকেন তো এখানে। উনি রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করেন।'

'উনি একা থাকেন এ বাড়িতে?'

'একা কেন? আমিও তো দু বছর হল এখানেই থাকি। টিটাগড় আমার কাজের জায়গা। কলকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ির চেয়ে এ বাড়ি অনেক কাছে হয়।

'আপনার খুড়িমার বয়স কত?'

'সেভেনটি এইট। আমাদের পুরনো চাকর অনন্ত ওঁর দেখাশোনা করে। এমনিতে মোটামুটি শক্তই আছেন, তবে ছানি কাটাতে হয়েছে কিছুদিন হল, দাঁতও বেশি বাকি নেই, আর মাথায় সামান্য ছিট দেখা দিয়েছে। নাম ভুলে যান, খেতে ভুলে যান, মাঝরাত্তিরে পান ছেঁচতে বসেন—এই আর কী। ঘুম তো এমনিতে খুবই কম—রাত্তিরে ঘন্টা দুয়েকের বেশ নয়। আসলে চার বছর আগে কাকা মারা যাওয়ার পর উনি আর কলকাতায় থাকতে চাননি। এখানে থাকাটা ওঁর কাছে একরকম কাশীবাসের মতো।'

বেয়ারা ট্রেতে করে চা আর মিষ্টি নিয়ে এল।

'দুপুরে খেতে খেতে সেই একটা-দেড়টা হবে', বললেন শঙ্করবাবু, 'কাজেই আপনারা মিষ্টিটার সদ্ব্যবহার করুন। এ মিষ্টি কলকাতায় পাবেন না।'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আমাদের আসল আর নকল দুটো পরিচয়ই তো জানেন, এবার আপনাদের পরিচয়টা পেলে ভাল হত। আপনি কি করেন জিজ্ঞেস করাটা কি অভদ্রতা হবে?'

'মোটেই না', বললেন শঙ্করবাবু। 'আপনাকে ডেকেছি তো সব কথা খুলে

বলবার জন্যেই; না হলে আপনি কাজ করবেন কী করে?—সোজা কথায় আমি হলাম ব্যবসাদার। বুঝতেই পারছেন, এত বড় বাড়ি যখন মেনটেন করছি তখন ব্যবসা আমার মোটামুটি ভালই চলে।'

'আপনার কি বংশানুক্রমিক ব্যবসা?'

'না। এ বাড়ি তৈরি করেন আমার প্রপিতামহ—বনোয়ারিলাল চৌধুরী।'

'অর্থাৎ যাঁর জীবনী লিখতে যাচ্ছি আমি?'

'এগজ্যাক্টলি। তিনি ছিলেন রামপুরের ব্যারিস্টার। অগাধ পয়সা করে শেষ বয়সে কলকাতায় চলে আসেন; এসে এই বাড়িটা তৈরি করেন। উনি এখানেই থাকতেন, এখানেই মৃত্যু হয়। ঠাকুরদাদাও ব্যারিস্টার ছিলেন, তবে তাঁর পসার আমার প্রপিতামহের মতো ছিল না। তার দুটো কারণ—জুয়া আর মদ। তার ফলে চৌধুরী পরিবারের অবস্থা কিছুটা পড়ে যায়। বাড়িতে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল—সেগুলোর কথায় পরে আসছি—তার কিছু আমার ঠাকুরদাদা বিক্রি করে দেন। ব্যবসা শুরু করেন আমার বাবা, আর তার ফলে বংশের ভিত খানিকটা মজবুত হয়। তারপর আমি।'

'আর আপনার খুড়তুতো ভাই?'

'জয়ন্ত ব্যবসায় যায়নি। সে আছে এক এনজিনিয়ারিং ফার্মে। ভালই রোজগার করে, তবে ইদানীং শুনছি ক্লাবে গিয়ে পোকার খেলছে। ঠাকুরদাদার একটা গুণ পেয়েছে আর কী? জয়ন্ত আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।'

এই ফাঁকে ফেলুদা পকেট থেকে তার মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডারটা বার করে চালু করে দিয়েছে। এটা হংকং থেকে আনা। আজকাল মক্কেলের কথা খাতায় না লিখে রেকর্ডারে তুলে নেয়, তাতে অনেক বেশি সুবিধা হয়।

শঙ্করবাবু বললেন, 'আত্মীয়ের কথা তো হল, এবার অনাত্মীয়ের প্রসঙ্গে আসা যাক।'

'তার আগে একটা প্রশ্ন করে নিই', বলল ফেলুদা। 'যদিও প্রায় ধুয়ে উঠে গেছে, তবুও মনে হচ্ছে আপনার কপালে একটা চন্দনের ফোঁটা দেখতে পাচ্ছি। তার মানে—'

'তার মানে আর কিছুই না, আজ হল আমার জন্মতিথি। ফোঁটাটা দিয়েছেন খুড়িমা।'

'জন্মতিথি বলেই কি আজ এখানে অতিথি সমাগম হবে?'

'অতিথি বলতে মাত্র তিনজন। গত বছর ছিল ফিফ্‌টিয়েথ বার্থডে, সেবারও ডেকেছিলাম এই তিনজনকেই। ভেবেছিলাম ওই একটি বারই তিথি পালন করব। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে এবারও করছি। বুঝতেই পারছেন, এ বাড়িতে যাঁরা একবার এসেছেন, তাঁদের দ্বিতীয়বার আসতে কোনও আপত্তি হবে না।'

'এই দ্বিতীয়বারের কারণটা কী?'

শঙ্করবাবু একটু ভেবে বললেন, 'খুব ভাল হয় আপনারা যদি চা খেয়ে

একবারটি দোতলায় আসেন আমার সঙ্গে—আমার খুড়িমার ঘরে। তা হলে বাকি ঘটনাটা বুঝতে সহজ হবে। আর আমিও ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে পারব।'

আমরা মিনিটখানেকের মধ্যেই উঠে পড়লাম।

সিঁড়িতে পৌঁছাতে হলে বৈঠকখানা দিয়ে যেতে হয়। এখানে বলে রাখি—বাহারের আসবাব, কার্পেট, মখমলের পর্দা, ঝাড়লণ্ঠন, শ্বেতপাথরের মূর্তি ইত্যাদি মিলিয়ে এমন জমজমাট বৈঠকখানা আমি বেশি দেখিনি।

সিঁড়ি উঠতে উঠতে ফেলুদা বলল, 'আপনার খুড়িমা ছাড়া দোতলায় আর কে থাকেন?'

'খুড়িমা থাকেন উত্তর প্রান্তে', বললেন শঙ্করবাবু, 'আর দক্ষিণে থাকি আমি। জয়ন্ত এলেও দক্ষিণেরই একটা ঘরে থাকে।'

দোতলার ল্যান্ডিং পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম খুড়িমার ঘরে। বেশ বড় ঘর, কিন্তু এতে কোনও জাঁকজমক নেই। পশ্চিমে দরজার বাইরে আলো আর বাতাসের বহর দেখে বোঝা যায় ওদিকেই গঙ্গা। দরজার পাশেই বুড়ি মাদুরে বসে মালা জপছেন। তাঁর পাশে একটা হামানদিস্তা, একটা পানের বাটা আর একটা মোটা বই। নির্ঘাত রামায়ণ কি মহাভারত হবে। আসবাব বলতে একটা খাট আর একটা ছোট আলমারি।

আমরা ঘরে ঢুকতেই খুড়িমা মাথা তুলে পুরু চশমার ভিতর দিয়ে আমাদের দিকে চাইলেন।

'কজন অতিথি এসেছেন কলকাতা থেকে', বললেন শঙ্করবাবু।

'তাই এই ঘাটের মড়াকে দেখাতে আনলি?'

আমরা তিনজনে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বৃদ্ধা বললেন, 'তা বাপু তোমাদের পরিচয় জেনে আর কী হবে, নাম তো মনে থাকবে না। নিজের নামটাই ভুলে যাই মাঝে মাঝে। এখন তো বসে বসে দিন গোনা।'

'আসুন—'

শঙ্করবাবুর ডাকে আমরা ঘুরলাম। বৃদ্ধা আবার বিড়বিড় করে মালা জপতে শুরু করলেন।

এবার দেখলাম ঘরের উল্টোদিকে খাটের পাশে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক রয়েছে। শঙ্করবাবু পকেট থেকে চাবি বার করে সিন্দুকটা খুলতে খুলতে বললেন, 'এবারে আপনাদের যে জিনিস দেখাব সে হল আমার প্রপিতামহের সম্পত্তি। রামপুরে থাকতে বহু নবাব-তালুকদার তাঁর মক্কেল ছিলেন। এগুলো তাঁদের উপঢৌকন। এরই বেশ কিছু আমার ঠাকুরদাদা বিপাকে পড়ে বেচে দিয়েছিলেন। তবে তার পরেও কিছু আছে। যেমন এই যে দেখুন—'

শঙ্করবাবু একটা থলি বার করে তার মুখটা ফাঁক করে হাতের তেলোয় উপুড় করলেন। ঝনঝন করে কিছু গোল চাকতি তেলোয় পড়ল।

'জাহাঙ্গীরের আমলের স্বর্ণমুদ্রা', বললেন শঙ্করবাবু। 'দেখুন, প্রত্যেকটিতে একটি করে রাশির ছবি খোদাই করা। এই জিনিস একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।'

'রাশিচক্র হলে এগারোটা কেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। 'বারোটা হওয়া উচিত নয় কি?'

'একটি মিসিং।'

আমরা পরস্পরের দিকে চাইলাম।

'আরও জিনিস আছে', বললেন শঙ্করবাবু, 'সেগুলো এই আইভরির বাক্সটার মধ্যে। সোনার উপর চুনি বসানো ইটালিয়ান নস্যির কৌটো, জেড পাথরে চুনি আর পান্না বসানো মোগল সুরাপাত্র, আংটি, লকেট...কিন্তু সে সব আপনারা দেখবেন আজ সন্ধ্যাবেলা, সর্বসমক্ষে। এখন নয়।'

'এর চাবি তো আপনার কাছেই থাকে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আমার কাছেই। একটা ডুপলিকেট আছে, থাকে খুড়িমার আলমারিতে।'

'কিন্তু সিন্দুক আপনার ঘরে নয় কেন?'

'এ ঘরটা অতীতে ছিল আমার প্রপিতামহের ঘর। সিন্দুক ওঁরই আমলের। ওটা আর সরাইনি। আর কড়া পাহারা আছে গেটে, এ ঘরে খুড়িমা প্রায় সর্বক্ষণ থাকেন, তাই এক হিসেবে ওটা এখানে যথেষ্ট সেফ।'

আমরা আবার নীচের বারান্দায় ফিরে এলাম। চেয়ারে বসার পর ফেলুদা টেপরেকর্ডার চালু করে দিয়ে বলল, 'একটি মুদ্রা মিসিং হল কী করে?'

'সে কথাই তো বলছি,' বললেন শঙ্করবাবু। 'তিনজনকে উইক এন্ডে নেমন্তন্ন করেছিলাম গত জন্মতিথিতে। একজন হলেন আমার বিজনেস পার্টনার নরেশ কাঞ্জিলাল। আরেকজন এখানকারই ডাক্তার অর্ধেন্দু সরকার। আর তৃতীয় ব্যক্তি হলেন কালীনাথ রায়। ইনি ইস্কুলে আমার সহপাঠী ছিলেন; পঁয়ত্রিশ বছর পর আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমার প্রপিতামহের মহামূল্য সম্পত্তির কথা এঁরা সকলেই শুনেছিলেন, কিন্তু চোখে দেখেননি। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত্তিরে ডিনারের পর জয়ন্ত সিন্দুক থেকে স্বর্ণমুদ্রার থলিটা বার করে নীচে বৈঠকখানায় আনে। কয়েনগুলো টেবিলের উপর ছড়িয়ে রেখেছি, সকলে ঘিরে দেখছে, এমন সময় হল লোডশেডিং। ঘর অন্ধকার। এটা অবিশ্যি অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। চাকর দু'মিনিটের মধ্যে মোমবাতি নিয়ে আসল, আমি কয়েনগুলো তুলে নিয়ে আবার সিন্দুকে রেখে এলাম। একটা যে কমে গেছে সেটা তখন খেয়াল করিনি। এমন যে হতে পারে কল্পনাও করিনি। পরদিন সকলে চলে যাবার পর মনে একটা খটকা লাগাতে সিন্দুক খুলে দেখি কর্কট রাশির মুদ্রাটি নেই।'

'কয়েনগুলো আপনিই তুলে রেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমি। ব্যাপারটা বুঝুন মি. মিত্তির। তিনজন নিমন্ত্রিত। একজনকে পঁচিশ বছর চিনি—আমার বিজনেস পার্টনার। অর্ধেন্দু সরকার হলেন ডাক্তার এবং ভালই ডাক্তার। খড়দা টিটাগড় থেকে কল আসে ওঁর। আর কালীনাথ আমার বাল্যবন্ধু।'

'কিন্তু এঁদের সকলকেই কি অনেস্ট লোক বলে জানেন আপনি?'

'সেখানেই অবিশ্যি গণ্ডগোল। কাঞ্জিলালের কথা ধরুন। ব্যবসায় অনেকেই জেনেশুনে অসৎ পন্থা নেয়, কিন্তু কাঞ্জিলালের মতো এমন অম্লান বদনে নিতে আমি আর কাউকে দেখিনি। আমাকে ঠাট্টা করে বলে—তুমি ধর্মযাজক হয়ে যাও, তোমার দ্বারা ব্যবসা হবে না।'

'আর অন্য দুজন?'

'ডাক্তারের কথা আমি জানি না। খুড়িমা মাঝে মাঝে বাতে ভোগেন, ডাক্তার তাঁকে এসে দেখে যান। এর বেশি জানি না তবে কালীনাথ বোধহয় গভীর জলের মাছ। এক যুগ দেখা নেই, হঠাৎ একদিন টেলিফোন করে আমার কাছে এল। বলল—বয়স যত বাড়ছে ততই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। তাই একবার ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করি।'

'আপনি তাঁকে দেখেই চিনেছিলেন?'

'তা চিনেছিলাম। তা ছাড়া ইস্কুলের বহু পুরনো গল্প করল। সে যে আমার সহপাঠী তাতে সন্দেহ নেই। গোলমালটা হচ্ছে, সে যে এখন কী করে তা কিছুতেই ভেঙে বলে না। জিজ্ঞেস করলেই বলে, ধরে নাও তোমারই মতো ব্যবসা করে। এদিকে গুণ যে নেই তা নয়। খুব আমুদে রসিক লোক। ইস্কুলে

থাকতে ম্যাজিক দেখাত, এখনও সে অভ্যাসটা রেখেছে। হাত সাফাই রীতিমতো ভাল।'

'আপনার ভাইও তো অন্ধকারের মধ্যে ঘরে ছিলেন।'

'সে ছিল। তবে সে তো এ জিনিস আগে দেখেছে, তাই সে টেবিলের কাছে ছিল না। নিয়ে থাকলে ওই তিনজনের একজনই নিয়েছে।'

'তারপর আপনি কী করলেন?'

'কী আর করতে পারি বলুন। এমন লোক আছে যারা এই অবস্থায় সোজাসুজি পুলিশ ডেকে তিনজনের বাড়ি সার্চ করাত। কিন্তু আমি পারিনি। ওই তিনজনের সঙ্গে বসে কত ব্রিজ খেলেছি, আর তাদের একজনকে বলব চোর!'

'তার মানে স্রেফ হজম করে গেলেন ব্যাপারটা?'

'স্রেফ হজম করে গেলাম। ফলে এখনও কেউ জানেই না যে আমি ব্যাপারটা টের পেয়েছি। সেই ঘটনার পরেও তো এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে কতবার, কিন্তু কেউ তো কোনওরকম অসোয়াস্তি বা অপরাধ বোধ করছে বলে মনে হয়নি। অথচ আমি জানি যে এই তিনজনের মধ্যেই একজন দোষী। একজন চোর।'

আমরা তিনজনেই চুপ। ঘটনাটা অদ্ভুত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অবস্থায় কী করা যায়?

আমার মনের প্রশ্নটা ফেলুদাই করল। শঙ্করবাবু বললেন, 'এরা জানে যে আমি এদের সন্দেহ করি না। তাই এদের আবার ডেকেছি, এবং আজ রাত্রে আমি আবার এদের সামনে বনোয়ারিলালের কিছু মূল্যবান জিনিস বার করব। মাস্খানেক থেকে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যা সাতটায় লোডশেডিং হচ্ছে এখানে। তার ঠিক আগে আমি জিনিসগুলো টেবিলে সাজাব। ঘর আবার অন্ধকার হবে। আশা করছি সেই অন্ধকারে চোরের প্রবৃত্তি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে এই সম্পত্তির মূল্য চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখের কম নয়। হয়তো আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার বিশ্বাস চোর লোভ সামলাতে পারবে না। চুরির পর আপনি আপনার আসল ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তখন প্রদোষ মিত্তিরের কাজ হবে চোর ধরা এবং চোরাই মাল বার করা।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার ভাই এ সম্বন্ধে কী বলেন?'

'সেও তো কাল অবধি কিছুই জানত না', বললেন শঙ্করবাবু, 'কাল আপনাকে ইনভাইট করার পর ওকে বলি।'

'উনি কী বললেন?'

'খুব চোটপাট করল। বলল—তুমি এ্যাদ্দিন চেপে রেখেছ ব্যাপারটা—তখন তখনই পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এক বছর পরে কি মি. মিত্তির কিছু করতে পারবেন, ইত্যাদি।'

'একটা কথা বলব মি. চৌধুরী?'

'বলুন।'

'আপনি মানুষটা একটু নরম বলেই কিন্তু চোর তার সুযোগটা নিয়েছিল। অতিথিকে চুরির অপবাদ দিতে সবাই পেছপা হত না।'

'সেটা জানি। সেই জন্যই তো আপনাকে ডাকা। আমি যেটা পারিনি, সেটা আপনি পারবেন।'

॥ ২ ॥

সরষে বাটা দিয়ে চমৎকার গঙ্গার ইলিশ সমেত দুপুরের খাওয়াটা হল ফার্স্ট ক্লাস। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ হল খাবার টেবিলে। ইনি মাঝারি হাইটের চেয়েও কম, বেশ সুস্থ, সবল মানুষ। শঙ্করবাবুর পার্সোনালিটি এঁর নেই, কিন্তু বেশ হাসিখুশি চালাক চতুর লোক।

খাবার পর শঙ্করবাবু বললেন, 'আপনাদের এখন আর ডিসটার্ব করব না, যা মন চায় করুন। আমি একটু গড়িয়ে নিই। বিকেলে চায়ের সময় বারান্দায় আবার দেখা হবে।'

আমরা জয়ন্তবাবুর সঙ্গে বাড়ির আশপাশটা ঘুরে দেখব বলে বেরোলাম।

পশ্চিম দিকে একটানা একটা নিচু থামওয়ালা পাঁচিল চলে গেছে নদীর ধার দিয়ে। পাঁচিলের পরেই জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে জল অবধি। এই পাঁচিলই বাকি তিনদিকে হয়ে গেছে দেড় মানুষ উঁচু।

জয়ন্তবাবুর ফুলের শখ, তাই তিনি আমাদের বাগানে নিয়ে গিয়ে গোলাপ সম্বন্ধে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে দিলেন। গোলাপ যে তিনশো রকমের হয় তা এই প্রথম জানলাম।

বাড়ির উত্তরে গিয়ে দেখলাম সেদিকে আর একটা গেট রয়েছে। শহরে কোথাও যেতে হলে এই গেটটাই নাকি ব্যবহার করা হয়।

আরেকটা সিঁড়িও রয়েছে এদিকে। জয়ন্তবাবু বললেন খুড়িমা, মানে ওঁর মা, গঙ্গাস্নানে যেতে ওটাই ব্যবহার করেন। একতলায় নদীর দিকে আর গঙ্গার দিকে চওড়া বারান্দা, দুদিক দিয়েই সিঁড়ি রয়েছে নীচে নামার জন্য।

দেখা শেষ হলে পর আমরা ঘরে ফিরে এলাম। জয়ন্তবাবু কাচের ঘরে চলে গেলেন অর্কিড দেখার জন্য।

আমাদের থাকার জন্য একতলায় একটা প্যাসেজের এক দিকে পর পর দুটো ঘর দেওয়া হয়েছে। উল্টোদিকে আরও তিনটে পাশাপাশি ঘর দেখে মনে হল তাতেই বোধহয় তিনজন অতিথি থাকবেন। ঘরে ঢুকে বাহারে খাটে নরম বিছানা দেখে লালমোহনবাবু বোধহয় দিবানিদ্রার তাল করছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন, 'পাখির বইগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার।'

আমি একটা কথা ফেলুদাকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

'আচ্ছা, এক বছর আগে যে লোক চুরি করেছে, সে যদি এবার আর চুরি না করে, তা হলে তুমি চোর ধরবে কী করে?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা এই তিন ভদ্রলোককে স্টাডি না করে বলা শক্ত। যার মধ্যে চুরির প্রবৃত্তি রয়েছে, তার সঙ্গে আর পাঁচটা অনেস্ট লোকের একটা সূক্ষ্ম তফাত থাকা উচিত। চোখ-কান খোলা রাখলে সে তফাত ধরা পড়তে পারে। ভুলিস না, যে লোক চুরি করে তার বাইরেটা যতই পালিশ করা হোক না কেন তাকে আর ভদ্রলোক বলা চলে না। সত্যি বলতে কী, ভদ্রলোকে সাজার জন্য তাকে যথেষ্ট অভিনয় করতে হয়।'

বিকেলে পর পর দুটো গাড়ির আওয়াজ পেয়ে বুঝলাম অতিথিরা এসে গেছেন। বারান্দায় চায়ের আয়োজন হলে পর শঙ্করবাবুই আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন তিন গেস্টের সঙ্গে আলাপ করানোর জন্যে।

ডা. সরকার এক মাইলের মধ্যে থাকেন, ইনি হেঁটেই এসেছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স, চোখে চশমা, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, গোঁফটা কাঁচা হলেও কানের পাশের চুলে পাক ধরেছে।

নরেশ কাঞ্জিলাল বিরাট মানুষ, ইনি সুট-টাই পরে সাহেব সেজে এসেছেন ফেলুদার পরিচয় পেয়ে বললেন, 'বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার কথা আমি শঙ্করকে অনেকবার বলেছি। আপনি এ কাজের ভারটা নিয়েছেন শুনে খুশি হলাম। হি ওয়াজ এ রিমার্কেবল ম্যান।'

মজার লোক হলেন কালীনাথ রায়। এঁর কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে, তাতে হয়তো ম্যাজিকের সরঞ্জাম থাকতে পারে। লালমোহনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হতেই বললেন, 'পক্ষিবিদ্‌ যে মুরগির ডিম পকেটে নিয়ে ঘোরে তা তো জানতুম না মশাই।' কথাটা বলেই খপ্‌ করে লালমোহনবাবুর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মুরগির ডিমের সাইজের মসৃণ সাদা পাথর বার করে দিয়ে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'এ হে হে, এ যে দেখছি পাথর! আমি তো ফ্রাই করে খাবার মতলব করেছিলুম।'

কথা হল রাত্তিরে খাবার পর কালীনাথবাবু তাঁর হাতসাফাই দেখাবেন।

সূর্য হেলে পড়েছে, গঙ্গার জল চিক্‌ চিক্‌ করছে, ঝিরঝিরে হাওয়া, তাই বোধহয় নরেশবাবু আর কালীনাথবাবু নেমে গেলেন বাইরের শোভা উপভোগ করতে। লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উস্‌খুস্‌ করছিলেন, এবার বাইনোকুলার বার করে উঠে পড়ে বললেন, 'দুপুরে যেন একটা প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের ডাক শুনেছিলুম। দেখি তো পাখিটা আশেপাশে আছে কি না।'

ফেলুদার গম্ভীর মুখ দেখে আমিও হাসিটা কোনওমতে চেপে গেলাম।

ডাক্তার সরকার চায়ে চুমুক দিয়ে শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার ভ্রাতাটিকে দেখছি না—সে কি বাগানে ঘুরছে নাকি?'

'ওর ফুলের নেশার কথা তো আপনি জানেন।'

'ওঁকে তো বলেছি মাথায় টুপি না পরে যেন রোদে না ঘোরেন। সে আদেশ তিনি মেনেছেন কি?'

'জয়ন্ত কি ডাক্তারের আদেশ মানার লোক? আপনি তাকে চেনেন না?'

ফেলুদা যে চারমিনার হাতে আড়চোখে ডাক্তারের কথাবার্তা হাবভাব লক্ষ করে যাচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

'আপনার খুড়িমা কেমন আছেন?' শঙ্করবাবুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ডা. সরকার।

'এমনিতে তো ভালই', বললেন শঙ্করবাবু, 'তবে অরুচির কথা বলছিলেন যেন। আপনি একবার ঢুঁ মেরে আসুন না।'

'তাই যাই।'

ডা. সরকার চলে গেলেন খুড়িমাকে দেখতে। প্রায় একই সঙ্গে জয়ন্তবাবু ফিরে এলেন বাগান থেকে—ঠোঁটের কোণে হাসি।

'কী ব্যাপার? হাসির কী হল?' জিজ্ঞেস করলেন শঙ্করবাবু।

জয়ন্তবাবু টি পট থেকে কাপে চা ঢেলে নিয়ে ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার বন্ধু কিন্তু চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে বেদম অভিনয় করে যাচ্ছেন পক্ষিবিদের।'

ফেলুদাও হেসে বলল, 'অভিনয় তো আজ সকলকেই করতে হবে অল্পবিস্তর। আপনার দাদার পরিকল্পনাটাই তো নাটকীয়।'

জয়ন্তবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'আপনি কি দাদার পরিকল্পনা অ্যাপ্রুভ করেন?'

'আপনি করেন না বলে মনে হচ্ছে' বলল ফেলুদা।

'মোটেই না', বললেন জয়ন্তবাবু। 'আমার ধারণা চোর অত্যন্ত সেয়ানা লোক। সে কি আর বুঝবে না যে তার জন্য ফাঁদ পাতা হচ্ছে? সে কি জানে না যে দাদা অ্যাদ্দিনে টের পেয়েছে যে সিন্দুকের একটি মূল্যবান জিনিস গায়েব হয়ে গেছে?'

'সবই বুঝি', বললেন শঙ্করবাবু, 'কিন্তু তাও আমি ব্যাপারটা ট্রাই করে দেখতে চাই। ধরে নাও এটা আমার গোয়েন্দা কাহিনী প্রীতির ফল।'

'তুমি কি সিন্দুকের বাকি সব জিনিসই বার করতে চাও?'

'না। শুধু ইটালিয়ান নস্যির কৌটো আর মোগলাই সুরাপাত্র। ডা. সরকার খুড়িমাকে দেখতে গেছেন। উনি এলেই তুমি ওপরে গিয়ে জিনিস দুটো বার করে আনবে। আমি পকেটে রেখে দেব। এই নাও চাবি।'

জয়ন্তবাবু অনিচ্ছার ভাব করে চাবিটা নিলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ডা. সরকার ফিরে এলেন। ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'দিব্যি ভাল আছেন আপনার খুড়িমা। বারান্দায় বসে দুধভাত খাচ্ছেন। আপনাদের আরও অনেকদিন জ্বালাবেন।'

জয়ন্তবাবু চুপচাপ উঠে পড়লেন।

'কী বসে আছেন চেয়ারে?' ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন ডা. সরকার। 'চলুন একটু হাওয়া খাবেন। এ হাওয়া কলকাতায় পাবেন না।'

শঙ্করবাবু সমেত আমরা চারজনই সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। বাঁয়ে চেয়ে দেখি লালমোহনবাবু বাগানের মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে এদিক ওদিক দেখছেন। 'পেলেন আপনার প্যারাডাইজ ফ্লাইক্যাচারের দেখা?'

জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'না, তবে এইমাত্র একটা জাংগল ব্যাবলার দেখলুম মনে হল।'

'এখন পাখিদের বাসায় ফেরার সময়', বলল ফেলুদা। 'এর পরে প্যাঁচা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেন না।'

বাকি দুজনে গেলেন কোথায়? বাড়ির সামনের দিকে কি, না কাচের ঘরের পিছনে ফলবাগানে?

শঙ্করবাবুর বোধহয় একই প্রশ্ন মনে জেগেছিল, কারণ উনি হাঁক দিয়ে উঠলেন—'কই হে, নরেশ? কালীনাথ গেলে কোথায়?'

'একজনকে দেখলুম এদিকের সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতে', বললেন লালমোহনবাবু।

'কোন[illegible]?' প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'বোধহয় সেই ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক।'

কিন্তু লালমোহনবাবু ভুল দেখেছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন কাশীনাথবাবু নয়, নরেশ কাঞ্জিলাল।

'সন্ধের দিকে ঝপ করে টেম্পারেচারটা পড়ে', বললেন কাঞ্জিলাল, 'তাই অলোয়ানটা চাপিয়ে এলাম।'

'আর কাশীনাথ?' প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'সে তো বাগানে নেমেই আলাদা হয়ে গেল। বলছিল শুকনো ফুলকে টাটকা করে দেবার একটা ম্যাজিক দেখাবে, তাই—'

মি. কাঞ্জিলালের কথা আর শেষ হল না, কারণ সেই সময় বুড়ো চাকর অনন্তর চিৎকার শোনা গেল।

'দাদাবাবু!'

অনন্ত গঙ্গার দিকে বারান্দায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ছুটে এল আমাদের দিকে।

'কী হল অনন্ত?' শঙ্করবাবু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করে এগিয়ে গেলেন।

'ছোট দাদা বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন দোতলায়।'

॥ ৩ ॥

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ল্যান্ডিং পেরিয়েই খুড়িমার ঘর, সেটা আগেই বলেছি। জয়ন্তবাবু সেই ঘরের চৌকাঠের হাত তিনেক এদিকে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর মাথার পিছনের মেঝেতে খানিকটা রক্ত চুইয়ে পড়েছে।

ডাক্তার সরকার দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবচেয়ে আগে পৌঁছে জয়ন্তবাবুর নাড়ি টিপে ধরলেন। ফেলুদাও প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছে জয়ন্তবাবুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। তার মুখ গম্ভীর, কপালে খাঁজ।

'কী মনে হচ্ছে?' চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'পাল্‌স সামান্য দ্রুত', বললেন ডা. সরকার।

'মাথার জখমটা?'

'মনে হচ্ছে পড়ে গিয়ে হয়েছে। এই সময় খালি মাথায় রোদে ঘোরা ডেনজারাস সেটা অনেকবার বলেছি ওঁকে।'

'কনকাশন—?'

'সেটা তো পরীক্ষা না করে বলা সম্ভব না। আজ আবার আমি যন্ত্রপাতি কিছুই আনিনি সঙ্গে। একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত।'

'তাই করুন না। গাড়ি তো রয়েছে।'

ভদ্রলোক বেশ ভাল ভাবেই অজ্ঞান হয়েছে, কারণ ফেলুদা সমেত চারজন ধরাধরি করে গাড়িতে তোলার সময়ও তাঁর জ্ঞান হল না। সিঁড়ি দিয়ে নামার

সময় অবিশ্যি কালীনাথবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। বললেন, 'আমি জাস্ট ওষুধটা খাবার জন্য ঘরে গেছি—আর তার মধ্যে এই কাণ্ড!'

'আমি সঙ্গে আসব কি?' শঙ্করবাবু ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন।

'কোনও দরকার নেই', বললেন ডা. সরকার, 'আমি হাসপাতাল থেকে আপনাকে ফোন করব।'

গাড়ি চলে গেল। এই দুর্ঘটনার জন্য শঙ্করবাবুর প্ল্যান যে ভেস্তে গেল সেটা বুঝতে পারছি। বেচারি ভদ্রলোকের জন্মতিথিতে এমন একটা ঘটনা ঘটার জন্য আমারও খারাপ লাগছিল।

আমরা সবাই এসে বসবার ঘরে বসেছিলাম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা কেন যে, 'আমি আসছি' বলে বলে উঠে গেল তা জানি না। অবিশ্যি মিনিট দুয়েকের মধ্যে আবার ফিরে এল।

শঙ্করবাবু অতিথিদের সামনে যথাসম্ভব স্বাভাবিক হাসিখুশি ব্যবহার করছিলেন। এমনকী তাঁর আশ্চর্য প্রপিতামহ সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ঘটনাও বলছিলেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে সেটা করতে তাঁর বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে চলার পর হাসপাতাল থেকে ডা. সরকারের ফোন এল। জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়েছে। তিনি অনেকটা ভাল। মনে হচ্ছে কাল সকালেই আসতে পারবেন।

এই সুখবরের পর অবিশ্যি ঘরের আবহাওয়া খানিকটা হালকা হল, কিন্তু

আমি জানি যে শঙ্করবাবুর মোটেই ভাল লাগছে না, কারণ চোরের রহস্যই থেকে যাবে।

খাওয়া দাওয়ার পর, ভিডিও-ক্যাসেট ছবি দেখতে চাই কি না জিজ্ঞেস করাতে আমরা সকলেই না বললাম। এ অবস্থায় ফুর্তি চলে না। তাই ম্যাজিকও বাদ পড়ল।

সকলকে গুড নাইট জানিয়ে নিজেদের ঘরে আসতেই আমি যে প্রশ্নটা ফেলুদাকে করব ভাবছিলাম, সেটা লালমোহনবাবু করে ফেললেন।

'আপনি তখন ফস্‌ করে বেরিয়ে কোথায় গেলেন মশাই?'

'খুড়িমার ঘরে।'

'খুড়িমাকে দেখতে গেলেন?' অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্নটা করলেন লালমোহনবাবু।

'সেই সঙ্গে অবিশ্যি সিন্দুকের হাতল ধরে একটা টানও দিয়ে এলাম।'

'খোলা নাকি?'

'বন্ধ। সেটাই স্বাভাবিক। যে ভাবে ঘরের দরজার দিকে পা করে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, তাতে মনে হয় ঘরে ঢোকার আগেই পড়েছেন।'

'কিন্তু চাবিটা কোথায় ফেলুদা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। প্রশ্নটা কিছুক্ষণ থেকেই আমার মাথায় ঘুরছিল।

ফেলুদা বলল, 'শঙ্করবাবু হয়তো দুর্ঘটনায় ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।'

কথাটা বলতে বলতেই শঙ্করবাবু এসে ঢুকলেন আমাদের ঘরে। 'দেখুন তো কী বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল!' বললেন ভদ্রলোক। 'জয়ন্তর আর একবার এরকম হয়েছিল। ওর ব্লাড প্রেশারটা একটু বেশি নেমে যায় মাঝে মাঝে।'

'ফোনে আর কী বললেন ডা. সরকার?'

'সেটাই তো বলতে এলাম। তখন লোকজনের সামনে বলিনি। চাবির কথাটা তো গোলমালে ভুলেই গিয়েছিলাম; এখন কী হয়েছে জানেন তো? ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করতে বললেন জয়ন্তর কাছে চাবি ছিল না। হয়তো অজ্ঞান হবার সময় হাত থেকে পড়ে গেছে।'

'আপনি খুঁজেছেন চাবি?'

'তন্ন তন্ন করে। সিঁড়ি, ল্যান্ডিং, সদর দরজার বাইরে, কোথাও বাদ দিইনি। সে চাবি হাওয়া।'

'যাকগে, ডুপ্লিকেট আছে তো', বলল ফেলুদা। 'ও নিয়ে ভাববেন না।'

'তা না হয় ভাবব না', গম্ভীরভাবে বললেন শঙ্করবাবু, 'কিন্তু রহস্য তো দূর হল না। চোর তো অজ্ঞাতেই রয়ে গেল। আর আপনাকে একটা মাথা খেলানোর সুযোগ দেব ভেবেছিলাম, সেটাও হল না।'

'তাতে কী হল?' ফেলুদা বলল। 'এখানে এসে লাভ হয়েছে বিস্তর। একে এরকম বাড়ি, তার উপর আপনার আতিথেয়তা।'

শঙ্করবাবু যাবার আগে বলে গেলেন যে সকালে সাড়ে ছটায় চা দেবে, আর আটটায় ব্রেকফাস্ট।

'এটা অ্যাটেমটেড মার্ডার নয়তো মশাই?' লালমোহনবাবু ফিস্ ফিস্ করে প্রশ্ন করলেন। 'মি. কাঞ্জিলাল আর মি. ম্যাজিশিয়ান দুজনেই কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলেন।'

'মার্ডারের দরকার কী? কার্যসিদ্ধির জন্য তো শুধু অজ্ঞান করলেই চলে।'

'কার্যসিদ্ধি?'

'জয়ন্তবাবুকে অজ্ঞান করে তাঁর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে সিন্দুক খুলে যা বার করার বার করে আবার হাতে চাবি গুঁজে দিয়ে চলে আসা।'

সর্বনাশ! এটা তো খেয়াল হয়নি আমার। আমি বললাম 'তাই যদি হয়ে থাকে তা হলে তো এখন তিনজনের জায়গায় সাসপেক্ট মাত্র দুজন—কাঞ্জিলাল আর কালীনাথ।'

'নারে তোপ্‌সে', বলল ফেলুদা 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। জয়ন্তবাবুর মাথায় কেউ বাড়ি মারলে তো সেটা তিনি জ্ঞান হলে বলতেন; তা তো বলেননি। আর অজ্ঞান করে যে সিন্দুক খুলবে সেটাই বা কী করে সম্ভব—খুড়িমা তো ঘরে থাকতে পারেন। একজন বাইরের লোক সিন্দুক খুলচে দেখলে কি তিনি চুপ করে থাকতেন?'

একটা আশার আলো জ্বলতে না জ্বলতে নিভে গেল। আমি শুয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি আর ঘুমোনো হল না। হঠাৎ আমাদের ঘরে এসে নিচু গলায় বললেন, 'বারান্দায় গেসলুম। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, মশাই—উপ্‌চে পড়ে আলো!'

'উপ্‌চে নয়, উছলে', বলল ফেলুদা।

'সরি, উছলে। কিন্তু একবার বাইরে এসে দেখুন। এ দৃশ্য দেখবেন না কখনও।'

'আপনি একা কাব্যি করবেন, এটা হতে দেওয়া যায় না', বলল ফেলুদা। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

বাইরে গিয়ে মনে হল এ যেন দিনের বেলার দৃশ্যর চেয়েও ঢের বেশি সুন্দর। একটা পাতলা কুয়াশা নদীর ওপারটাকে প্রায় অদৃশ্য করে ফেলেছে। গঙ্গার আবছা গাঢ় জলের উপর ছড়ানো চাঁদির টুকরোগুলো ধীরে ধীরে দুলছে। তারই মধ্যে ঝিঁঝির ডাক, হাসনুহানার গন্ধ, ফুরফুরে বাতাস, সব মিলিয়ে সত্যিই অসাধারণ।

ফেলুদা ত্রয়োদশীর চাঁদটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'চাঁদের মাটিতে মানুষের পা পড়লেও এর মজা কোনওদিন নষ্ট করতে পারবে না।'

'একটা মারাত্মক পোয়েম আছে চাঁদ নিয়ে', বললেন লালমোহনবাবু।

'আপনার এথিনিয়াম ইনস্টিটিউশনের সেই বাংলার শিক্ষকের লেখা?

'ইয়েস। বৈকুণ্ঠ মল্লিক। এই পোড়া দেশে লোকটা রেকগনিশন পেলে না, কিন্তু আপনি শুনুন কবিতাটা। শোনো, তপেশ।'

এতক্ষণ আমরা নিচু গলায় কথা বলছিলাম। কিন্তু আবৃত্তির সময় লালমোহনবাবুর গলা আপনা থেকেই চড়ে গেল।

'আহা, দেখ চাঁদের মহিমা
কভু বা সুগোল রৌপ্যথালি
কভু আধা কভু সিকি কভু এককালি
যেন শন্য কাটা নখ পড়ে আছে নভে—
সেটুকুও নাহি থাকে, যবে
আসে অমাবস্যা—
সেই রাতে তুমি তাই
অচন্দ্রম্পশ্যা!

বুঝতেই পারছ, তপেশ, পদ্যটা একজন লেডিকে অ্যাড্রেস করে লেখা।

'একজন লেডিকে তো আপনি আবৃত্তির ঠেলায় ঘর থেকে টেনে বার করেছেন দেখছি।'

ফেলুদার দৃষ্টি দোতলার বারান্দার দিকে। এই যে খুড়িমার ঘর। বৃদ্ধা বারান্দার দরজার মুখটাতে এসে দাঁড়িয়েছেন। মিনিটখানেক এদিক ওদিক দেখে আবার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

এর পরে আমরা ঘাটের সিঁড়িতে গিয়ে বসেছিলাম আধ ঘণ্টা। মনমেজাজ তাজা, রাতের খাওয়া হজম। তারপর এক সময় ফেলুদা তার হাতঘড়ির রেডিয়াম ডায়াল চোখের সামনে ধরে বলল, 'পৌনে এক।'

আমরা তিনজনেই উঠে পড়লাম, আর তিনজনেই একসঙ্গে শুনলাম শব্দটা।

সেটা যেন আসছে বাড়ির দোতলা থেকেই।

খট্ খট্ খট্ খট্ ঠং খট্ খট্...

আমরা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম।

'সিঁদ কাটছে নাকি মশাই?' লালমোহনবাবু ফিশ্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন। আলো জ্বলছে। আওয়াজটা আসছে ওই ঘর থেকে।

খট্ খট্ খট্ খট্ ঠং ঠং...

কিন্তু এই ঘর ছাড়াও আরেকটা ঘরে আলো জ্বলছে। দক্ষিণ দিকের ঘরটা। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একজন লোক দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে।

এবার লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'মি. কাঞ্জিলাল', বলল ফেলুদা। 'ওটাই শঙ্করবাবুর ঘর।'

'এই মাঝরাত্তিরে কী আলোচনা মশাই?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'জানি না', বলল ফেলুদা। 'ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু হবে।'

'আপনাদেরও ঘুম আসছে না?'

নতুন গলা পেয়ে চমকে উঠে দেখি ম্যাজিশিয়ান কালীনাথবাবু।

ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। খট্ খট্ শব্দটা এখনও হয়ে চলেছে। কালীনাথবাবুর ঘাড় ঘুরে গেল সেই দিকে।

'কীসের শব্দ বুঝতে পারছেন তো?' প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

'হামানদিস্তা কি?' ফেলুদা বলল।

'ঠিক বলেছেন। এই মাঝরাত্তিরে বুড়ি পান ছেঁচতে বসেন। এ শব্দ আগেও পেয়েছি।'

কথাটা বলে হাতের তেলোর আড়ালে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফেলুদার দিকে একটা সেয়ানা দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'বনোয়ারিলালের জীবনী লেখার জন্য গোয়েন্দার দরকার হল কেন?'

আমি তো থ'! লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে। ফেলুদা একটু হালকা হেসে বলল, 'যাক্, অন্তত একজন আমার আসল পরিচয়টা জানে দেখে ভালই লাগল।'

'তা জানবে না কেন মি. মিত্তির? এ শর্মা অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। অনেক কিছু দেখে শুনে চোখ কান দুইই খুলে গেছে।'

ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে। তারপর বলল, 'আপনি কি রহস্যই করবেন, না খুলে বলবেন?'

'খুলে আর কজনে বলতে পারে মি. মিত্তির? স্পষ্টবক্তা আর কজনে হয়? বেশির ভাগই তো মুখচোরা। আর দুঃখের বিষয়, আমিও যে সেই দলেই পড়ি। আপনি গোয়েন্দা, খুলে বলার কাজ হল আপনার। তবে আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। এখানে এসে আপনার পেশাটাকে কাজে লাগানোর কথা ভুলে যান। অমরাবতীতে এসেছেন, দুদিন ফুর্তি করে গঙ্গার হাওয়া খেয়ে ফিরে যান। নইলে বিপদে পড়তে পারেন।'

'আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।'

কালীনাথবাবু নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

'লোকটা অনেক কিছু জানে বলে মনে হচ্ছে,' চাপা গলায় বললেন লালমোহনবাবু।

'একটা জিনিস তো জানতেই পারে', বলল ফেলুদা।

'কী?' আমরা দুজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

'চুরিটা কে করেছিল। যে করেছিল সে তো ওঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সেটা তো উনি নিজেও করে থাকতে পারেন। উনি তো হাত সাফাই জানেন।'

'এগজ্যাক্টলি', বলল ফেলুদা।

॥ ৪ ॥

সাড়ে ছ'টায় বেড টি না দিলে হয়তো ঘুম ভাঙতে আরও দেরি হত, কিন্তু ফেলুদাকে দেখে মনে হল সে অনেকক্ষণ আগেই উঠেছে। জিজ্ঞেস করাতে বলল, 'শুধু উঠেছি নয়, এর মধ্যে একটা চক্করও মেরে এসেছি।'

'কোথায়?'

'শহরের দিকে।'

'কী দেখলে?'

'কী দেখলাম না সেটাই বড় কথা।'

'কিছু বুঝতে পারলে?'

'পানিহাটিতে আসা বৃথা হয়নি এটা বুঝেছি।'

লালমোহনবাবু এসে বললেন এমন সলিড ঘুম নাকি ওঁর অনেকদিন হয়নি।

'খুড়িমার উঠতে দেরি দেখে তিনিও খুব সলিড ঘুমিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে', বলল ফেলুদা।

আমি বললাম, 'সেটা আবার কী করে জানলে?'

'অনন্তকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল মা-ঠাকরুণ এখনও গঙ্গাস্নানে যাননি। এমনিতে ছ'টার মধ্যে নাকি ওঁর স্নান সারা হয়ে যায়।'

আমরা তিনজন বারান্দায় গিয়ে বসেছিলাম, মিনিট দশেকের মধ্যে শঙ্করবাবু এসে পড়লেন। স্নান-টান সেরে ফিটফাট।

'আমি কিন্তু ধরা পড়ে গেছি, মি. চৌধুরী', বলল ফেলুদা। 'আপনার বাল্যবন্ধু আমায় চিনে ফেলেছেন।'

'সে কী!'

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। ভদ্রলোক গভীর জলের মাছ।'

'তা হলে কি বলছেন আপনার পরিচয়টা দিয়েই দেব?'

'তা হলে কিন্তু সেই সঙ্গে আপনার জানিয়ে দিতে হবে আপনি কেন আমাকে ডেকেছেন। অর্থাৎ এতদিন যে কথাটা চেপে রেখেছিলেন সেটা প্রকাশ করতে হবে।'

শঙ্করবাবুর কপালে আবার দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কান্তিলাল আর কালীনাথবাবু বারান্দায় এসে পড়লেন, আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। কান্তিলাল আর কালীনাথ বারান্দায় রয়ে গেলেন, আমরা চারজন সদর দরজায় গিয়ে হাজির হলাম।

লাল ক্রস-মারা একটা কালো অ্যাম্বাসাডর থেকে নামলেন জয়ন্তবাবু আর

ডা. সরকার। জয়ন্তবাবুর মাথার পিছনের চুল খানিকটা কামিয়ে সেখানে প্লাস্টার লাগানো হয়েছে।

জয়ন্তবাবু নেমেই তাঁর দাদার কাছে ক্ষমা চাইলেন।—'ভেরি সরি। তোমার জন্মতিথিতে এমন একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেললাম। আসলে প্রেশারটা...'

'কোনও চিন্তা নেই', বললেন ডা. সরকার। 'আমি ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। তবে রোদে বেশি ঘোরাঘুরি চলবে না।'

'আপনার চা খাবেন তো?' বললেন শঙ্করবাবু।

'তা হলে মন্দ হত। চা-পানের সময় পাইনি এখনও।'

'এরা সব কোথায়?' জয়ন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'বারান্দায়', বললেন শঙ্করবাবু।

জয়ন্তবাবু আর ডা. সরকার বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

'চলুন, সকলে একসঙ্গেই বসা যাক্', ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন শঙ্করবাবু।

'দাঁড়ান, আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া দরকার।'

ফেলুদা কথাটা বেশ জোরের সঙ্গেই বলল। কী কাজের কথা বলছে ও?

'কাজ?' শঙ্করবাবু একটু যেন অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার খুড়িমার কাছে সিন্দুকের যে ডুপ্লিকেট চাবিটা আছে সেটা চাইলে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।'

'তা নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু—'

'একবার সিন্দুকটা খুলে দেখতে চাই।'

খুড়িমার ঘরে গিয়ে দেখি বুড়ি গামছা নিয়ে স্নানে বেরোচ্ছেন।

'আজ তোমার এত দেরি?' শঙ্করবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আর বলিস না। চোখ মেলে দেখি খাঁ খাঁ রোদ। একেকদিন কী যে হয়!'

'তোমার চাবিগোছাটা একবার নিতে হবে খুড়িমা। সিন্দুকটা খুলব।'

'কিন্তু তোর কাছে যে—?'

'আমারটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

খুড়িমা আলমারি খুলে চাবির গোছা বার করে দিয়ে চলে গেলেন।

শঙ্করবাবু সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেলেন, আর সেই ফাঁকে কেন জানি ফেলুদা হামানদিস্তাটা হাতে নিয়ে একবার নেড়েচেড়ে দেখল।

'সর্বনাশ!'

শঙ্করবাবুর চিৎকারে চমকে লালমোহনবাবু সেলিম আলির বইটা তাঁর হাত থেকে ফেলেই দিলেন।

'খালি বাক্স কিছুই নেই', বলল ফেলুদা।

শঙ্করবাবুর ফ্যাকাশে মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছে না।

'ওটা বন্ধ করুন', বলল ফেলুদা। 'তারপর চলুন নীচে যাওয়া যাক।' সভা

উদ্ঘাটনের সময় এসেছে। আমার আসল পরিচয়টা সকলকে জানিয়ে দিন এবং কতকগুলো প্রশ্ন করব সেটাও জানিয়ে দিন।'

বুঝতে পারছি শঙ্করবাবুকে অনেকখানি মনের জোর প্রয়োগ করতে হচ্ছে, কিন্তু তিনি গত বছরের চুরির ব্যাপারটা আর আজ এইমাত্র সিন্দুক খুলে যা দেখলেন সেটা মোটামুটি গুছিয়ে সকলকে বলে বললেন, 'আমার বাড়িতে আমারই অতিথি হয়ে এসে আমার এত কাছের লোক যে এমন একটা কাজ করতে পারে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু ঘটনা যে ঘটেছে তাতে কোনও ভুল নেই, আর সেই কারণেই আমি কলকাতার স্বনামধন্য ইনভেসটিগেটর প্রদোষ মিত্রকে ডেকেছি এর কিনারা করার জন্য। ইনি তোমাদের কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। আশা করি তোমরা তার ঠিক জবাব দেবে।'

সকলে চুপ। কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দেখে বোঝার উপায় নেই।

ফেলুদা শুরু করল। প্রথম প্রশ্নটা ডা. সরকারকে, আর সেটা যাকে বলে অপ্রত্যাশিত।

'ডা. সরকার, আপনাদের এই পানিহাটিতে কটা হাসপাতাল আছে?'

'একটাই', বললেন ডা. সরকার।

'তার মানে সেখানেই আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন জয়ন্তবাবুকে, আর সেখান থেকেই কাল রাত্রে ফোন করেছিলেন?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন জানতে পারি কি?'

'কারণ আজ সকালে আমি সে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, জয়ন্তবাবু সেখানে যাননি।'

ডা. সরকার হাসলেন।

'কাল রাত্রে যে আমি হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিলাম সে কথা তো আমি শঙ্করবাবুকে বলিনি।'

'তবে কোত্থেকে করেছিলেন?'

'আমার বাড়ি থেকে। কাল যাবার পথেই জয়ন্তবাবুর জ্ঞান হয়। তখন বুঝতে পারি আঘাত গুরুতর নয়, কনকাশন হয়নি। তবু একবার দেখব বলে আমার বাড়িতেই নিয়ে যাই। তখনই ঠিক করি রাত্তিরটা ওখানে রেখে সকালে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

'এবার জয়ন্তবাবুকে একটা প্রশ্ন', বলল ফেলুদা। 'আপনি কাল যে সিন্দুক খোলার জন্য চাবিটা নিলেন, সেটা তো আপনার হাতেই ছিল?'

'হ্যাঁ, কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ার পর আর হাতে নাও থাকতে পারে।'

'হাতে না থাকলেও, কাছাকাছিও পড়ে থাকার কথা। কিন্তু তা তো ছিল না।'

'সেটার আমি কী জানি? চাবি আপনারা খুঁজে পেলেন কি না পেলেন তার আমি কী করতে পারি? আপনি কী বলতে চাইছেন সেটা সরাসরি বলুন না।'

'আর একটা প্রশ্ন আছে, সেটা ডাক্তারকে। তার পরেই সরাসরি বলছি : ডা. সরকার, হিমোগ্লোবিন বলে একটা পদার্থ আছে সেটা আপনি জানেন নিশ্চয়ই।'

'কেন জানব না?'

'সাধারণ লোকের চোখে সেটার রক্তের সঙ্গে রক্তের কোনও তফাত ধরা পড়ে না সেটাও নিশ্চয়ই জানেন।'

ডাক্তার সরকার গলা খাকরানি দিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানিয়ে দিলেন।

'আমার বিশ্বাসটা কী তা হলে এবার বলি?' বলল ফেলুদা। সকলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ফেলুদার দিকে। 'আমার বিশ্বাস জয়ন্তবাবু অজ্ঞান হননি, অজ্ঞান হবার ভান করেছিলেন—ডাক্তার সরকারের সঙ্গে একজোট হয়ে। কারণ তাঁদের দুজনের এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার দরকার ছিল।'

'ননসেন্স!' চেঁচিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু। 'কেন, চলে যাব কেন?'

'কারণ মাঝরাত্তিরে গোপনে আবার ফিরে আসবেন বলে।'

'ফিরে আসব?'

'হ্যাঁ। উত্তরের ফটক দিয়ে ঢুকে, পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আপনার মার ঘরে যাবেন বলে।'

'আপনি একটু বাড়াবাড়ি করছেন মি. মিত্তির। মাঝ রাত্তিরে মা-র ঘরে যাব, আর মা টের পাবেন না? মা রাত্তিরে তিনঘণ্টার বেশি ঘুমোন না সেটা আপনি জানেন?'

'এমনিতে ঘুমোন না—কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো? ধরুন যদি ডাক্তারবাবু গতকাল তাঁকে দেখার সময় তাঁর দুধভাতে কিছু মিশিয়ে দিয়ে থাকেন?'

জয়ন্তবাবু আর ডা. সরকার দুজনেরই ডোন্ট-কেয়ার ভাবটা মিনিটে মিনিটে কমে আসছে সেটা বুঝতে পারছি। ফেলুদা বলে চলল, 'আপনার ফিরে আসতে হয়েছিল কারণ এক বছর আগে যে কাঁচা কাজটা করেছিলেন, এবার আর সেরকম করলে চলত না। শঙ্করবাবুর পুরো প্ল্যানটাই ভেস্তে দিয়ে মাঝরাত্তিরে এসে চুরিটা সারার দরকার ছিল। সে চুরি ধরা পড়ত কবে তার কোনও ঠিক নেই। অবিশ্যি চাবি আপনার কাছে ছিল না, তাই আপনার মা-র আলমারি থেকে ডুপ্লিকেট বার করে নিতে হয়েছিল। সে সময় আমার এই বন্ধুর আবৃত্তি শুনে আপনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাই গায়ে একটা থান জড়িয়ে দরজার মুখে এসে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে আপনার মা জেগেই আছেন, এভরিথিং ইজ অল রাইট। তার পরে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করার জন্য হামানদিস্তা পিটতে শুরু করেন। এতেও আমার সন্দেহ হয়েছিল, কারণ হামানদিস্তায় পান থাকলে শব্দটা হয় একটু অন্যরকম; এটা ছিল ফাঁকা শব্দ।'

'সবই বুঝলাম, মি. মিত্তির', বললেন জয়ন্তবাবু, 'কিন্তু তারপর?'

'তারপর চাবি দিয়ে সিন্দুক খোলা।'

'আপনি কোন্ অপরাধে আমাদের অভিযুক্ত করছেন, মি. মিত্তির? অজ্ঞান হবার ভান করা? আমার মাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া? রাত্তিরে ফিরে এসে ডুপ্লিকেট চাবি বার করে সিন্দুক খোলা?'

'তার মানে এর সবগুলোই করেছেন স্বীকার করছেন তো?'

'এর কোনওটার জন্য শাস্তি হয় না সেটা আপনি জানেন? আসল ব্যাপারটায় আসছেন না কেন আপনি?'

'ঘটনা যে দুটো জয়ন্তবাবু, একটা তো নয়। আগে প্রথম ঘটনাটা সেরে নিই—এক বছর আগের চুরি।'

'সেটা আপনি সারবেন কী করে, মি. মিত্তির? আপনি কি অন্তর্যামী? আপনি তখন কোথায়?'

'আমি ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু অন্য লোক তো ছিল। যিনি চুরি করেছিলেন তাঁর ঠিক পাশেই লোক ছিল। তাদের মধ্যে অন্তত একজন কি টের পেয়ে থাকতে পারেন না?'

এবারে শঙ্করবাবু কথা বললেন। তিনি বেশ উত্তেজিত।

'এটা আপনি কী বলছেন, মি. মিত্তির? চুরি হয়েছে সেটা জানবে অথচ আমায় বলবে না, আমার এত কাছের লোক হয়ে?'

ফেলুদা এবার ম্যাজিশিয়ান কালীনাথবাবুর দিকে ঘুরল।

'আপনি কাল রাত্তিরে কী বিপদের কথা ভেবে আমাকে তদন্ত বন্ধ করতে বলছিলেন সেটা বলবেন, কালীনাথবাবু?'

কালীনাথবাবু হেসে বললেন, 'অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করায় বিপদ নেই? শঙ্করের মনের অবস্থাটা ভেবে দেখুন তো!'

'না, নেই বিপদ', দৃঢ়স্বরে বললেন শঙ্করবাবু। 'অনেকদিন ব্যাপারটা ধামা চাপা রয়েছে। এবার প্রকাশ হওয়াই ভাল। তুমি যদি কিছু জেনে থাক তো বলে ফেলো, কালীনাথ।'

'সেটা বোধহয় ওঁর পক্ষে সহজে নয়, মি. চৌধুরী', বলল ফেলুদা, 'কারণ তদন্তে চোর ধরা পড়লে যে ওঁরও বিপদ হত। এই একটা বছর যে উনি চোরকে নিংড়ে শেষ করেছেন!'

'ব্ল্যাকমেল!'

'ব্ল্যাকমেল, শঙ্করবাবু। সেটা উনিও স্বীকার করবেন না, চোরও স্বীকার করবেন না। অবিশ্যি চোরের যে দোসর আছে সেটা সম্ভবত কালীনাথবাবু জানতেন না, উনি একজনকেই লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা এই অনবরত ব্ল্যাকমেলিং-এর ঠেলায় দ্বিতীয় চুরিটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর তাই—'

'ভুল! ভুল!' তার স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন জয়ন্তবাবু। 'সিন্দুক থেকে যা নেবার তা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। বলোয়ারিলালের আর একটি জিনিসও তাতে নেই! সিন্দুক খালি!'

'তার মানে আমার বাকি অভিযোগ সবই সত্যি?'

'কিন্তু...কাল রাত্তিরে কুকীর্তিটা কে করছে সেটা বলছেন না কেন?'

'সেটাও বলছি, কিন্তু তার আগে আপনার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি চাই। আপনি বলুন জয়ন্তবাবু—ডা. সরকার আর আপনি মিলে গত বছর বারোটার মধ্যে থেকে একটি স্বর্ণমুদ্রা সরিয়েছিলেন কি না।'

জয়ন্তবাবুর মাথা হেঁট হয়ে গেছে; ডা. সরকার দুহাতে রগ টিপে বসে আছেন।

'আমি স্বীকার করছি', বললেন জয়ন্তবাবু। ফেলুদা পকেট থেকে টেপ রেকর্ডারটা বার করে চালু করে আমার হাতে দিয়ে দিল।

'আমি দাদার কাছে ক্ষমা চাইছি। সে স্বর্ণমুদ্রা ডা. সরকারের কাছেই আছে, সেটা ফেরত দেওয়া হবে। আমাদের দুজনেরই অর্থাভাব হয়েছিল। একটার জায়গায় বারোটার পুরো সেটটা বিক্রি করলে প্রায় একশো গুণ বেশি দাম পাওয়া যাচ্ছিল, তাই...'

'তাই বাকি এগারোটা নেবার কথা ভাবছিলেন।'

'স্বীকার করছি, কিন্তু চোর আরও আছে, মি. মিত্তির। যে লোক ব্ল্যাকমেল করতে
পারে—'

'—সে লোক চুরি করতে পারে' বলল ফেলুদা। 'কিন্তু তিনি চুরি করেননি।'

'তা হলে?' প্রশ্ন করলেন শঙ্করবাবু।

'ওগুলো সরিয়েছেন প্রদোষ মিত্র।'

ফেলুদা ঘর থেকে বাকি মাল এনে টেবিলের উপর রাখল। সকলের মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'এই হল বনোয়ারিলালের বাকি সম্পত্তি', বলল ফেলুদা, 'মেঝেতে চাবি না পেয়ে, এবং রক্তের বদলে হিমোগ্লোবিন দেখে মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই যখন আপনাকে ধরাধরি করে নীচে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন বাধ্য হয়েই আমাকে পিকপকেটের ভূমিকা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ভাগ্য ভাল যে চাবিটা ছিল আপনার প্যান্টের ডান পকেটে। বাঁ পকেটে থাকলে পেতাম না। আপনাকে নিয়ে যাবার পর বৈঠকখানায় এসে বসি। তখনই এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে আমি সিন্দুক খুলে জিনিসগুলো বার করে আমার ঘরে রেখে দিই। আমি জানতাম যে বিপদের আশঙ্কা আছে।—এই নিন আপনার চাবি, মি. চৌধুরী। এরপর কী করা হবে সেটা আপনিই স্থির করুন; আমার কাজ এখানেই শেষ।'

'অবাক প্রতিভা কিছু জন্মেছে এ ভবে
এদের মধ্যে কী যে ছিল তা কে কবে?
দ্য ভিঞ্চি আইনস্টাইন খনা লীলাবতী
সবারেই স্মরি আমি, সবারে প্রণতি।'

পাহাড়ে ফেলুদা

এবার কাণ্ড কেদারনাথে

১

'কী ভাবছেন, ফেলুবাবু ?'

প্রশ্নটা করলেন রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ু। আমরা তিনজনে রবিবারের সকালে আমাদের বালিগঞ্জের বৈঠকখানায় বসে আছি, লালমোহনবাবু যথারীতি তাঁর গড়পারের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন গল্পগুজবের জন্য। কিছুক্ষণ হল এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু এখন গনগনে রোদ। রবিবার লোডশেডিং নেই বলে আমাদের পাখাটা খুব দাপটের সঙ্গে ঘুরছে।

ফেলুদা বলল, 'ভাবছি আপনার সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসটার কথা।'

পয়লা বৈশাখ জটায়ুর 'অতলান্তিক আতঙ্ক' বেরিয়েছে, আর আজ পাঁচই বৈশাখের মধ্যেই নাকি সাড়ে চার হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে।

লালমোহনবাবু বললেন, 'ও বইতে যে আপনার মতো লোকের ভাবনার খোরাক ছিল, তা তো জানতুম না মশাই।'

'ঠিক সে রকম ভাবনা নয়।'

'তবে ?'

'ভাবছিলাম আপনার গল্প যতই গাঁজাখুরি হোক না কেন, স্রেফ মশলা আর পরিপাকের জোরে শুধু যে উতরে যায় তা নয়, রীতিমতো উপাদেয় হয়।'

লালমোহনবাবু গদগদ ভাব করে কিছু বলার আগেই ফেলুদা বলল, 'তাই ভাবছিলাম আপনার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কোনও গল্প লিখিয়ে-টিখিয়ে ছিলেন কি না।'

সত্যি বলতে কি, আমরা লালমোহনবাবুর পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে

প্রায় কিছুই জানি না। উনি বিয়ে করেননি এবং ওঁর বাপ-মা আগেই মারা গেছেন সেটা জানি, কিন্তু তার বেশি উনিও বলেননি, আর আমরাও কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

লালমোহনবাবু বললেন, 'পাঁচ-সাত পুরুষ আগের কথা তো আর বিশেষ জানা যায় না, তাঁদের মধ্যে হয়তো কোনও কথক ঠাকুর-টাকুর থেকে থাকতে পারেন। তবে গত দু-তিন জেনারেশনের মধ্যে ছিল না সেটা বলতে পারি।'

'আপনার বাবার আর ভাই ছিল না?'

'থ্রি ব্রাদার্স। উনি ছিলেন মিড্‌ল। জ্যাঠা মোহিনীমোহন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। ছেলেবেলায় আরনিকা রাসটকস বেলাডোনা পালসেটিলা যে কত খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার ললিতমোহন ছিলেন পেপার মার্চেন্ট। এল. এম. গাঙ্গুলী অ্যান্ড সন্‌সের দোকান এই সেদিন অবধি ছিল। ভাল ব্যবসা ছিল। গড়পারের বাড়িটা এল. এম-ই তৈরি করেন। ঠাকুরদাদা, বাবা দুজনেই ব্যবসায় যোগ দেন। বাবা যদ্দিন বেঁচে ছিলেন তদ্দিন ব্যবসা চালান। ফিফটি-টু তে চলে গেলেন। তার পর যা হয় আর কি। এল. এম. গাঙ্গুলী অ্যান্ড সন্স-এর নামটা ব্যবহার হয়েছিল কিছু দিন, কিন্তু মালিক বদল হয়ে গেছিল।'

'আপনার ছোটকাকা? তিনি ব্যবসায় যোগ দেননি?'

'নো স্যার। ছোটকাকা দুর্গামোহনকে দেখি আমার জন্মের অনেক পরে। আমার জন্ম থার্টি সিক্সে। দুর্গামোহন টোয়েন্টি নাইনে সন্ত্রাসবাদীদের দলে যোগ দিয়ে খুলনার অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার টার্নবুল সাহেবকে গুলি মেরে তাঁর থুতনি উড়িয়ে দেন।'

'তার পর?'

'তার পর হাওয়া। বেপাত্তা। পুলিশ ধরতে পারেনি ছোটকাকাকে। আমার ধারণা আমার অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতিটা ছোটকাকার কাছ থেকেই পাওয়া।'

'উনি আর আসেননি?'

'এসেছিলেন। একবার। স্বাধীনতার পর ফর্টি নাইনে। তখন আমি থার্ড ক্লাসে পড়ি। সেই প্রথম আর সেই শেষ দেখা

ছোটকাকার সঙ্গে। তবে যাঁকে দেখলাম, তিনি সেই অগ্নিযুগের ছোটকাকা দুর্গামোহন গাঙ্গুলী নন। কমপ্লিট চেঞ্জ। কোথায় সন্ত্রাস, কোথায় পিস্তল। একেবারে নিরীহ, সাত্ত্বিক পুরুষ। মাসখানেক ছিলেন, তার পর আবার চলে যান।'

'কোথায়?'

'যদ্দূর মনে পড়ে কোনও জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করতে যান।'

'বিয়ে করেননি?'

'নাঃ।'

'কিন্তু আপনার আপন বা জ্যাঠতুতো ভাই-বোন আছে নিশ্চয়ই।'

'আপন বোন একটি আছেন, দিদি। স্বামী রেলওয়েতে চাকরি করেন; ধানবাদে পোস্টেড। জ্যাঠার ছেলে নেই, তিন মেয়ে, তিনজনের স্বামীই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। বিজয়া দশমীতে একটি করে পোস্টকার্ড—ব্যস্। আসলে রক্তের সম্পর্কটা কিছুই নয়, ফেলুবাবু। এই যে আপনার আর তপেশের সঙ্গে আমার হয়ে, তার সঙ্গে কি ব্লাড রিলেশনের কোনও— ?'

লালমোহনবাবুর কথা থামাতে হল, কারণ দরজায় টোকা পড়েছে। এটা যাকে বলে প্রত্যাশিত, কারণ টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল সাড়ে ন'টার জন্য, এখন বেজেছে ন'টা তেত্রিশ।

ভদ্রলোকের নামটা জানা ছিল টেলিফোনে—উমাশঙ্কর পুরী—এবার চেহারাটা দেখা গেল। মাঝারি হাইট, দোহারা গড়ন, পরনে ঘি রঙের হ্যান্ডলুমের স্যুট। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথার চুল কাঁচা-পাকা মেশানো, ডান দিকে সিঁথি। এই শেষের ব্যাপারটা দেখলেই কেন যেন আমার অসোয়াস্তি হয়; মনে হয় মুখটা যেন আয়নায় দেখছি। পুরুষদের মধ্যে শতকরা একজনের বেশি ডান দিকে সিঁথি করে কিনা সন্দেহ, যদিও কারণটা জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।

'আপনাকে খুব তাড়াহুড়ো করে চলে আসতে হয়েছে বলে মনে

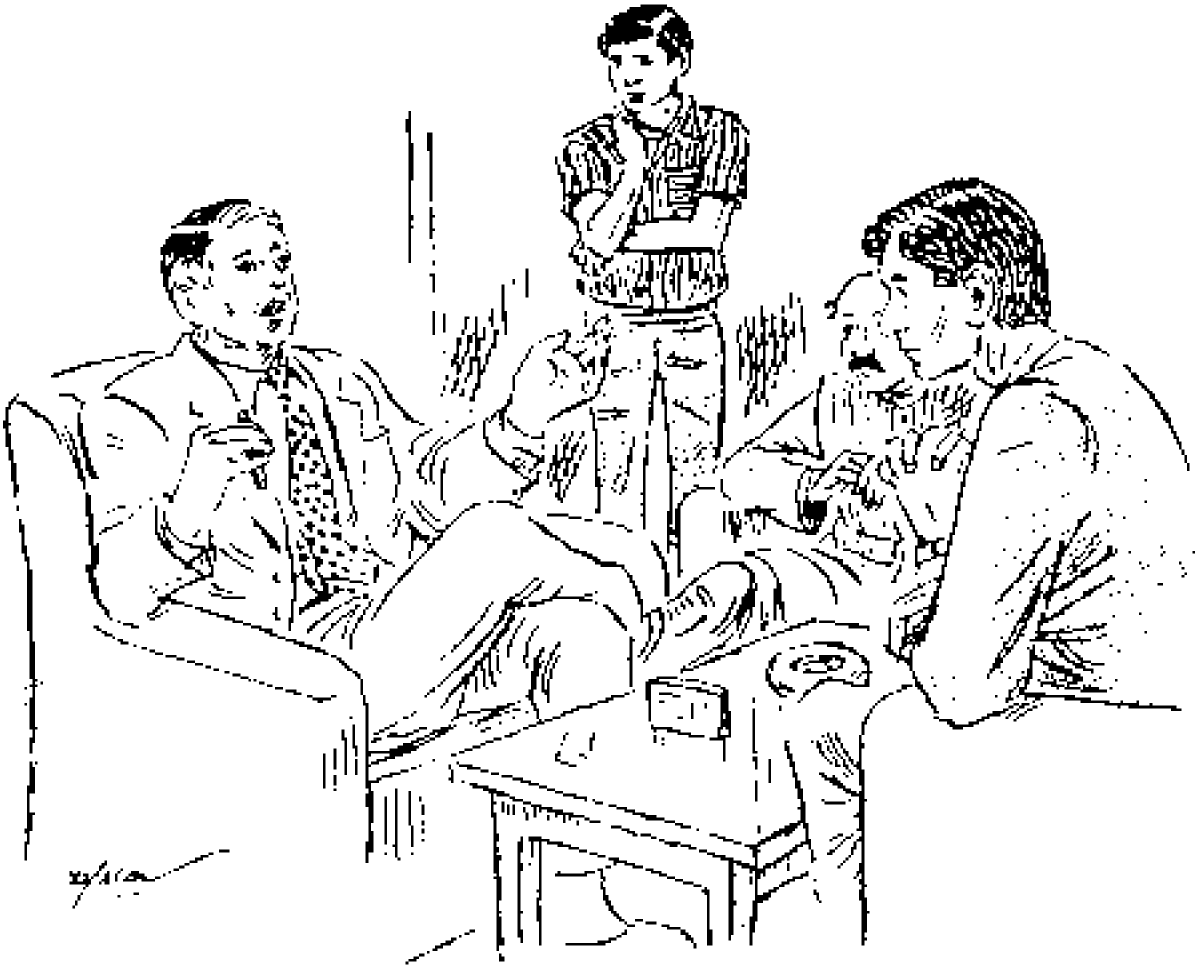

হচ্ছে ?' ফেলুদা মন্তব্য করল আলাপ পর্বের পর ভদ্রলোক চেয়ারে বসতেই।

'হ্যাঁ, তা—' উমাশঙ্করের ভুরু কপালে উঠে গেল—'কিন্তু সেটা আপনি জানলেন কী করে ?'

'আপনার বাঁ হাতের সব নখই পরিষ্কার করে ক্লিপ দিয়ে কাটা, তার একটি নখ এখনও কোটের পকেটের ধারে লেগে আছে, অথচ ডান হাতে দুটো নখের পরে আর বাকিগুলো...'

'আর বলবেন না !' বললেন মিঃ পুরী, 'ঠিক সেই সময় একটা ট্রাঙ্ক কল এসে গেল ; কথা শেষ হতে দেখি, আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় হয়ে গেছে।'

'যাক্ গে—এবার বলুন আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি।'

'মিঃ পুরী গম্ভীর হয়ে নিজেকে সংযত করে নিলেন। তার পর বললেন, 'মিঃ মিটার, আমি থাকি ভারতবর্ষের আর এক প্রান্তে :

আপনার নাম আমি শুনেছি ভগওয়ানগড়ের রাজার কাছ থেকে। শুধু নাম নয়, প্রশংসা। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'আমি তাতে গর্ব বোধ করছি।'

'এখন কথা হচ্ছে কি---' মিঃ পুরী থামলেন। তাঁর মধ্যে এক ইতস্তত ভাব লক্ষ করছিলাম। তিনি আবার বললেন, 'ব্যাপারটা হচ্ছে কি—একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ; সেইটে যাতে না ঘটে, তাই আমি আপনার সাহায্য চাইছি। সেটা পাওয়া যাবে কি ?'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কী ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা বলছেন, সেটা না জানা পর্যন্ত আমি মতামত দিতে পারছি না।'

শ্রীনাথ এই সময় চা-চানাচুর-বিস্কুট এনে রাখাতে কথায় একটু বিরতি পড়ল। তার পর মিঃ পুরী একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে বললেন, 'আপনি রূপনারায়ণগড় স্টেটের নাম শুনেছেন ?'

'নামটা চেনা-চেনা লাগছে', বলল ফেলুদা, 'উত্তর প্রদেশে কি ?'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন মিঃ পুরী। 'আলিগড় থেকে ৯০ কিলোমিটার পশ্চিমে। আমি যখনকার কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে। তখন রাজা ছিলেন চন্দ্রদেও সিং। আমি ছিলাম এস্টেটের ম্যানেজার। ভারত স্বাধীন হয়ে গেলেও তখনও এসব নেটিভ স্টেটের উপর তত চাপ পড়েনি ; রাজারা রাজাই ছিলেন। চন্দ্রদেও-এর বছর চুয়ান্ন বয়স, কিন্তু তখনও সিংহের মতো চেহারা। শিকার করেন, টেনিস খেলেন, পোলো খেলেন, প্রৌঢ়ত্বের কোনও লক্ষণ নেই। একটি ব্যারাম তাঁকে মাঝে মাঝে বিব্রত করত, কিন্তু সেটা যে হঠাৎ এমন আকার ধারণ করবে, সেটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। হাঁপানি। সে যে কী হাঁপানি, সে আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। একটা জলজ্যান্ত জোয়ান মানুষকে ছ' মাসের মধ্যে কঙ্কালে পরিণত হতে এই প্রথম দেখলাম। কোনও ওষুধে কোনও কাজ দিল না। হয়তো দু' দিন দেয়, আবার যেই কে সেই।

'সেই সময় খবর এল, হরিদ্বারে নাকি এক ভদ্রলোক থাকেন, নাম ভবানী উপাধ্যায়, তিনি নাকি হাঁপানির অব্যর্থ ওষুধ জানেন। বহু রুগী তাঁর ওষুধে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছে।

'আমি নিজেই চলে গেলাম হরিদ্বার। ঠিকানা জানা ছিল না ভদ্রলোকের, কিন্তু খোঁজ পেতে অসুবিধা হল না, কারণ ওঁকে অনেকেই চেনে। সাদাসিধা মানুষ, ছোট্ট একটা বাড়িতে থাকেন, আমাকে যথেষ্ট খাতির করে তাঁর তক্তপোশে বসালেন। তার পর সব শুনেটুনে বললেন—আমি যাব আপনার সঙ্গে, রাজাকে ওষুধ দেব ; সারবার হলে দশ দিনের মধ্যে সারবে, না হলে নয়। সেই দশ দিন আমি ওখানে থাকব। ওষুধে কাজ না দিলে আমি কোনও পয়সা নেবো না।

'বললে বিশ্বাস করবেন না মিঃ মিটার, দশ দিন নয়, সাত দিন নয়, তিন দিনের মধ্যে রাজার হাঁপানি উধাও। এমন যে ঘটতে পারে, সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। উপাধ্যায় বললেন তাঁর ওষুধের দাম পঞ্চাশ টাকা রাজাকে বলতে তিনি তো কথাটা কানেই তুললেন না। বললেন—আমি মরতে বসেছিলাম, উনি এসে আমাকে নতুন জীবন দান করলেন, আর তার দাম হল কিনা পঞ্চাশ টাকা ?

'এখানে বলে রাখি যে রাজা চন্দ্রদেও মানুষটা একটু খামখেয়ালি ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর শোক, তাঁর আনন্দ, তাঁর ক্রোধ, তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য—সবই সাধারণ মানুষের চেয়ে মাত্রায় অনেকটা বেশি ছিল। পঞ্চাশ টাকার বদলে উনি উপাধ্যায়কে যেটা দিলেন, সেটা একটা মণিমুক্তাখচিত সোনার বালগোপাল। জিনিসটা আসলে একটা পেনডেন্ট বা লকেট—লম্বায় ইঞ্চি তিনেক। তখনকার দিনে সেটার দাম পাঁচ-সাত লাখ টাকা।'

একটু ফাঁক পেয়ে ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'উপাধ্যায় নিলেন সেই লকেট ?'

'সেই কথাই তো বলছি', বললেন উমাশঙ্কর পুরী। 'উপাধ্যায় বললেন—আমি সাদাসিধে মানুষ, আমাকে এমন বিপাকে ফেলছেন কেন ? এত দামি একটা জিনিস আমার কাছে থাকবে, সেটা লোকে আমার বলে বিশ্বাস করবে কেন ? সবাই ভাববে আমি চুরি করেছি।

'রাজা বললেন—কারুর তো জানার দরকার নেই। আমরা তো আর খবরটা ঢাক পিটিয়ে জাহির করতে যাচ্ছি না। আর নেহাতই

যদি কেউ জেনে ফেলে, তার জন্য আমি আমার নিজের সিলমোহর দিয়ে লিখে দিচ্ছি যে, এটা আমি তোমাকে পারিতোষিক হিসেবে দিলাম। এর পরে তো আর কারুর কিছু বলার নেই।

'উপাধ্যায় বলল—তাই যদি হয়, তা হলে আমি মাথা পেতে নেব আপনার এ পারিতোষিক।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি, রাজা, এবং উপাধ্যায়—এই তিনজন ছাড়া আর কেউ কি ঘটনাটা জানত?'

'আমি সত্যি কথা বলব', বললেন উমাশঙ্কর পুরী, 'রাজা নিজে যদি খেয়ালবশে কাউকে বলে থাকেন তো সে আমি জানি না; ব্যাপারটা জানত রাজা, রানি এবং দুই রাজকুমার—সূরয ও পবন। বড় কুমার সূরয অতি চমৎকার ছেলে, রাজপরিবারে এমন দেখা যায় না। তার বয়স তখন বাইশ-তেইশ। ছোট কুমারের বয়স পনের। এ ছাড়া জানতাম আমি, আমার স্ত্রী আর আমার ছেলে দেবীশঙ্কর—তার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। বাস্, আর কেউ না। আর এটাও আপনি খেয়াল করে দেখুন মিঃ মিটার—এ খবর কিন্তু গত ত্রিশ বছরে কোনও কাগজে বেরোয়নি। আপনি তো সাংবাদিকদের জানেন; তারা এর গন্ধ পেলে কি ছেড়ে দিত?'

'সে কথা ঠিক', বলল ফেলুদা, 'ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষিত হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'যাই হোক, এবার আমি এগিয়ে আসছি বর্তমানের দিকে। রাজা চন্দ্রদেও সিং বেঁচেছিলেন আর বছর বারো। তার পর সূরযদেও রাজা হলেন। রাজা মানে, তখন তো আর রাজা কথাটা ব্যবহার করা চলে না; বলতে পারেন উনিই হলেন কর্তা।'

'আপনি তখনও ম্যানেজার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ; এবং আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি যাতে ব্যবসা ইত্যাদির সাহায্যে রূপনারায়ণগড়ের ভবিষ্যৎকে আরও মজবুত করা যায়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, সূরযদেওর এ সব দিকে কোনও উৎসাহ নেই। তার নেশা হচ্ছে বই। সে দিনের মধ্যে ষোল ঘণ্টা তার লাইব্রেরিতে পড়ে থাকে। সেখানে আমার একার চেষ্টায় আমি কী করতে পারি? ফলে আর্থিক দিক দিয়ে স্টেটের অবস্থা ক্রমেই

খারাপ হয়ে আসতে থাকে।'

'আপনার নিজের ছেলেও তো তত দিনে বড় হয়েছে?'

'হ্যাঁ। দেবীকে অবশ্য আমি আগেই আলিগড়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিই। সে আর রূপনারায়ণগড়ে ফেরেনি। দিল্লী গিয়ে নিজেই ব্যবসা শুরু করেছে।'

'আপনার কি ওই একই ছেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। যাই হোক, আমার নিজের অনেকবার মনে হয়েছে যে ম্যানেজারি ছেড়ে দিয়ে আমার নিজের দেশ মোরাদাবাদে গিয়ে একটা কিছু করি, কিন্তু মায়া কাটাতে পারছিলাম না।'

মিঃ পুরী এবার পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'এবার আমি আসল ঘটনায় আসছি; আপনার ধৈর্যচ্যুতি হয়ে থাকলে আমায় মাপ করবেন।

'সাত দিন আগে, অর্থাৎ উনত্রিশে এপ্রিল, শনিবার রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার পবনদেও সিং হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির হয়। তার প্রথম কথাই হল—আমার বাবার হাঁপানি যিনি সারিয়েছিলেন, তাঁর নাম ও তাঁর হরিদ্বারের ঠিকানাটা আমার চাই।

'স্বভাবতই আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, কারুর কোনও অসুখ করেছে কি না। পবন বলল, না, তা নয়; সে একটা টেলিভিশনের ছবি করছে, তার জন্য তার এই ভদ্রলোককে দরকার।

'পবন যে ক্যামেরা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সেটা আমি জানতাম, কিন্তু সে যে টেলিভিশন নিয়ে মেতে উঠেছে, সে খবর জানতাম না। আমি বললাম—তুমি কি তোমার ছবিতে সে ভদ্রলোককে দেখাতে চাও? সে বললে—অবশ্যই। শুধু তাই নয়। বাবা তাকে যে লকেটটা দিয়েছিলেন সেটাও দেখাব। একটা অসুখ সারিয়ে এ রকম বকশিস আর কেউ কোথাও পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

'তখন আমায় পবনকে বলতেই হল যে, উপাধ্যায় তাঁর এই পারিতোষিকের ব্যাপারটা একেবারেই প্রচার করতে চাননি। পবন বলল—ত্রিশ বছর আগে একটা লোক যে-কথা বলেছে, আজও যে সে তাই বলবে, এমন কোনও কথা নেই। সমস্ত পৃথিবীর কাছে

নানা রকম তথ্য পরিবেশন করা টেলিভিশনের একটা প্রধান কাজ। আপনি আমাকে নাম ঠিকানা দিন। ওঁকে রাজী করাবার ভার আমার।

'কী আর করি ; বাধ্য হয়ে উপাধ্যায়ের নাম ঠিকানা দিয়ে দিলাম ; সে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল।'

'উপাধ্যায়ের বয়স এখন আন্দাজ কত হবে ?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'তা সত্তর-বাহাত্তর তো হবেই। রূপনারায়ণগড়ে যখন এসেছিল, তখন তার যৌবন পেরিয়ে গেছে।'

ফেলুদা উমাশঙ্করের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, আপনি কি শুধু এই ব্যাপারটার গোপনীয়তা রক্ষা হবে না বলেই চিন্তিত হচ্ছেন ?'

মিঃ পুরী মাথা নাড়লেন।

'না মিঃ মিটার। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। শুধু যদি তাই হত, তা হলে আমি আপনার কাছে আসতাম না। আমার ভয় হচ্ছে ওই লকেটটাকে নিয়ে। পবনের নতুন শখ হয়েছে টেলিভিশনের ছবি তোলার। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, কাজটা খরচসাপেক্ষ। পবনের নিজের কোনও অর্থ সংগ্রহের রাস্তা আছে কিনা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে ওই একটি লকেট ওর সমস্ত অর্থসমস্যা দূর করে দিতে পারে।'

'কিন্তু ওই লকেটটি হাত করতে হলে তো তাকে অসদুপায় অবলম্বন করতে হতে পারে।'

'তা তো বটেই।'

'পবনদেও ছেলে কেমন ?'

'সে বাপের কিছু দোষ-গুণ দুটোই পেয়েছে। পবনের মধ্যেও একটা বেপরোয়া দিক আছে। ভাল খেলোয়াড়। ছবি ভাল তোলে। আবার জুয়ার নেশাও আছে। অথচ তার দরাজ মনের পরিচয় পেয়েছি। ওকে চেনা ভারি শক্ত। যেমন ছিল ওর বাপকে।'

'তা হলে আপনি আমার কাছে কী চাইছেন ?'

'আমি চাইছি, আপনি দেখুন যাতে এই অসদুপায়টি অবলম্বন না করা হয়।'

'পবনদেও কি হরিদ্বার যাচ্ছেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে তাঁর যেতে একটু দেরি হবে—অন্তত পাঁচ সাত দিন, কারণ এখন উনি প্যালেসের ছবি তুলছেন।'

'আমাদেরও যেতে গেলে সময় লাগবে, কারণ তার আগে তো ট্রেনে বুকিং পাওয়া যাবে না।'

'তা বটে।'

'কিন্তু ধরুন যদি আমি কেসটা নিই, আমি আপনাদের ছোট কুমারকে চিনছি কি করে ?'

'সে ব্যবস্থাও আমি করে এনেছি। দিল্লীর একটি সাপ্তাহিক কাগজে কুমারের এই রঙীন ছবিটা বেরিয়েছিল গত মাসে। একটা বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছিল। এটা আপনি রাখুন। আর ইয়ে, আপনাকে আগাম কিছু... ?'

'আমি হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিই', বলল ফেলুদা : 'কেস সফল না হলেও সেটা ফেরত দিই না, কারণ সফল না হওয়াটা অনেক সময় গোয়েন্দার অক্ষমতার উপর নির্ভর করে না। সফল হলে আমি আরও এক হাজার টাকা নিই।'

'বেশ। আপনাকে এখনই কিছু বলতে হবে না। আমি পার্ক হোটেলে আছি। আপনি কী স্থির করেন, বিকেল চারটে নাগাদ ফোন করে জানিয়ে দেবেন। হ্যাঁ হলে আমি নিজে এসে আপনাকে আগাম টাকা দিয়ে যাবো।'

২

ফেলুদা যে কেসটা নেবে, সেটা আমি আগে থেকেই জানতাম। আজকাল আমরা মক্কেলের কথাবার্তা হংকং থেকে কেনা একটা মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডারে তুলে রাখি। মিঃ পুরীর বেলাতে ওঁর অনুমতি নিয়ে তাই করেছিলাম। ফেলুদা দুপুরে সেই সব কথাবার্তা প্লে ব্যাক করে খুব মন দিয়ে শুনে বলল, 'কেসটা নেবার সপক্ষে

দুটো যুক্তি রয়েছে ; একটা হল এর অভিনবত্ব, আর দুই হল—গোয়েন্দাগিরির প্রথম যুগে দেখা হরিদ্বার-হৃষীকেশটা আর একবার দেখার লোভ।'

বাদশাহী আংটির ক্লাইম্যাক্স্-টা যে হরিদ্বারেই শুরু হয়েছিল, সেটা আমিও কোনও দিন ভুলব না।

পার্ক হোটেলে টেলিফোন করে কেসটা নিচ্ছে বলে ফেলুদা মিঃ পুরীকে জানিয়ে দিয়েছিল। আর মিঃ পুরীও আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে আগাম টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্পক ট্র্যাভেলসে ফোন করে ফেলুদা ডুন এক্সপ্রেসে আমাদের বুকিং-এর জন্য জানিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ দু' দিন পরে এক অদ্ভুত ব্যাপার। রূপনারায়ণগড় থেকে মিঃ পুরীর এক টেলিগ্রাম এসে হাজির—

'রিকোয়েস্ট ড্রপ কেস। লেটার ফলোজ।'

ড্রপ কেস! এ তো তাজ্জব ব্যাপার! এমন তো আমাদের অভিজ্ঞতায় কখনও হয়নি।

মিঃ পুরীর চিঠিও এসে গেল দু' দিন পরে। মোদ্দা কথা হচ্ছে—ছোটকুমার মত পালটেছে। সে হরিদ্বার হৃষীকেশ গিয়ে ছবি তুলবে, তাতে উপাধ্যায় থাকবেন, কিন্তু তাতে শুধু দেখানো হবে তিনি কিভাবে নিজের তৈরি ওষুধ দিয়ে স্থানীয় লোকের চিকিৎসা করেন। রূপনারায়ণগড়ের রাজার চিকিৎসাও যে উপাধ্যায় করেছিলেন, সেটা ছবিতে বলা হবে, কিন্তু মহামূল্য পারিতোষিকের কথাটা বলা হবে না।

ফেলুদা টেলিগ্রামে উত্তর দিল—'ড্রপিং কেস, বাট গোইং অ্যাজ পিলগ্রিমস।' অর্থাৎ কেস বাতিল করছি, কিন্তু তীর্থযাত্রী হিসেবে যাচ্ছি।

আমি জানি, ফেলুদা ও কথা লিখলেও ও নিজের গরজেই চোখ-কান খোলা রাখবে, আর তদন্তের কোনও কারণ দেখলে তদন্ত করবে। সত্যি বলতে কি, ভবানী উপাধ্যায় আর ছোটকুমার পবনদেও সিং—এই দুটি লোককেই আমার খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছিল।

আমরা তিনজন এখন ডুন এক্সপ্রেসের একটা থ্রি টিয়ার কম্পার্টমেন্টে বসে আছি। ফৈজাবাদ স্টেশনে মিনিট দু'-এক হল গাড়ি থেমেছে, আমরা ভাঁড়ের চা কিনে খাচ্ছি।

'আপনি যে বলছিলেন হরিদ্বার গেসলেন, সেটা কবে?' ফেলুদা তার সামনের সিটে বসা লালমোহনবাবুকে জিগ্যেস করল।

'আমার ঠাকুরদা একবার সপরিবারে তীর্থভ্রমণে যান', বললেন লালমোহনবাবু, 'ইনক্লুডিং হরিদ্বার। তখন আমার বয়স দেড়; কাজেই নো মেমারি।'

এবার অন্য দিক থেকে একটা প্রশ্ন এল।

'আপনারা কি শুধু হরিদ্বারই যাচ্ছেন, না ওখান থেকে এ দিকে ও দিকেও ঘুরবেন?'

এ-প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবুর পাশে বসা এক বৃদ্ধ। মাথায় সামান্য চুল যা আছে তা সবই পাকা, কিন্তু চামড়া টান, দাঁত সব ওরিজিন্যাল, আর চোখের দু' পাশে যে খাঁজগুলো রয়েছে, সেগুলো যেন হাসবার জন্য তৈরিই হয়ে আছে।

'হরিদ্বারে একটু কাজ ছিল', বলল ফেলুদা। 'সেটা হয়ে গেলে পর...দেখা যাক—'

'কী বলছেন মশাই!' বৃদ্ধের চোখ কপালে উঠে গেছে—'আদ্দূর এসে কেদার-বদ্রীটা দেখে যাবেন না? বদ্রীনাথ তো সোজা বাসে করেই যাওয়া যায়। কেদারের শেষের ক'টা মাইল অবিশ্যি এখনও বাস-রুট হয়নি। তবে এও ঠিক যে কেদারের কাছে বদ্রী কিছুই নয়। যদি পারেন তো একবার কেদারটা ঘুরে আসবেন। শেষের হাঁটা পথটুকু আর—' ফেলুদা আর আমার দিকে তাকিয়ে—'আপনাদের বয়স কী! আর' লালমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে— 'এনার জন্য তো ডাণ্ডি আর টাট্টু ঘোড়াই আছে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়েছেন কখনও?'

শেষের প্রশ্নটা অবিশ্যি লালমোহনবাবুকেই করা হল। লালমোহনবাবু হাতের ভাঁড়টায় একটা শেষ চুমুক দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে গম্ভীরভাবে অন্য দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ্ঞে না, তবে থর ডেজার্টে একবার উটের পিঠে চড়ে দৌড়ের

অভিজ্ঞতা হয়েছে ! সেটা আপনার হয়েছে কি ?'

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।—'তা হয়নি। আমার চরবার ক্ষেত্র হল হিমালয়ের এই বিশেষ অংশ। তেইশবার এসেছি কেদার-বদ্রী। ভক্তি-টক্তি আমার যে তেমন আছে তা নয়, তবে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকেই আমি সব আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করি। কোনও বিগ্রহের দরকার হয় না।'

ভদ্রলোকের নাম পরে জেনেছিলাম মাখনলাল মজুমদার। শুধু কেদার-বদ্রী নয়, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, পঞ্চকেদার, বাসুকিতাল—এ সবও এঁর দেখা আছে। নেহাত একটা সংসার আছে, না হলে হিমালয়েই থেকে যেতেন। অবিশ্যি এটাও বললেন যে, আজকের বাস-ট্যাক্সিতে করে যাওয়া আর আগেকার দিনের পায়ে হেঁটে যাওয়া এক জিনিস নয়। বললেন, 'আজকাল তো আর কেউ পিলগ্রিম নয়, সব পিকনিকারস। তবে হ্যাঁ, গাড়ির রাস্তা তৈরি করে তো আর হিমালয়ের দৃশ্য পালটানো যায় না। নয়নাভিরাম বলতে যা বোঝায়, সে রকম দৃশ্য এখনও অফুরন্ত আছে।'

ভোর ছ'টায় ডুন এক্সপ্রেস পৌঁছাল হরিদ্বার।

সেই বাদশাহী আংটির সময় যেমন দেখেছিলাম, পাণ্ডার উপদ্রবটা যেন তার চেয়ে একটু কম বলে মনে হল। স্টেশনেই একটা রেস্টোরান্টে চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। উপাধ্যায়ের নাম এখানে অনেকেই জানে আন্দাজ করেই বোধ হয় ফেলুদা রেস্টোরান্টের ম্যানেজারকে তাঁর হদিস জিগ্যেস করল।

উত্তর শুনে বেশ ভালরকম একটা হোঁচট খেলাম।

ভবানী উপাধ্যায় তিন-চার মাস হল হরিদ্বার ছেড়ে রুদ্রপ্রয়াগ চলে গেছেন।

'তাঁর বিষয়ে আরও খবর কে দিতে পারে, বলতে পারেন ?' জিগ্যেস করল ফেলুদা। উত্তর এল—'এখনকার খবর পেতে হলে রুদ্রপ্রয়াগ যেতে হবে, আর যদি আগেকার খবর চান তো কান্তিভাই পণ্ডিতের কাছে যান। উনি ছিলেন উপাধ্যায়জীর বাড়িওয়ালা। তিনি সব খবর জানবেন।'

'তিনিও কি লক্ষ্মণ মহল্লাতেই থাকেন ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন ওঁরা। সবাই ওঁকে চেনে ওখানে। জিগ্যেস করলেই বলে দেবে।'

আমরা আর সময় নষ্ট না করে বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কান্তিভাই পণ্ডিতের বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, বেঁটেখাটো চোখাচোখা ফরসা চেহারা, খোঁচা খোঁচা গোঁফ, কপালে চন্দনের ফোঁটা আর চোখে বাইফোকাল চশমা। আমরা ভবানী উপাধ্যায়ের খোঁজ করছি জেনে উনি রীতিমতো অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো? আর একজন তো ওঁর খোঁজ করে গেলেন এই তিন-চার দিন আগে।'

'তাঁর চেহারা মনে আছে আপনার?'

'তা আছে বইকি।'

'দেখুন তো এই চেহারার সঙ্গে মেলে কিনা।'

ফেলুদা পকেট থেকে ছোটকুমার পবনদেও-এর ছবিটা বার করে দেখাল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো সেই লোক', বললেন কান্তিভাই পণ্ডিত। 'আমি রুদ্রপ্রয়াগের ঠিকানা দিয়ে দিলাম তাঁকে।'

'সে ঠিকানা অবিশ্যি আমরাও চাই', বলে ফেলুদা তার একটা কার্ড বার করে দিল মিঃ পণ্ডিতের হাতে।

কার্ডটা পাওয়ামাত্র মিঃ পণ্ডিতের হাবভাব একদম বদলে গেল। এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার আমাদের সকলকে চেয়ার, মোড়া আর তক্তপোশে ভাগাভাগি করে বসতে দেওয়া হল।

'কেয়া, কুছ গড়বড় হুয়া মিঃ মিত্তর?'

'যত দূর জানি, এখনও হয়নি,' বলল ফেলুদা। 'তবে হবার একটা সম্ভাবনা আছে। এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, মিঃ পণ্ডিত; আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারলে খুব উপকার হবে।'

'আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।'

'মিঃ উপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কি কোনও একটা মূল্যবান

জিনিস ছিল ?'

মিঃ পণ্ডিত একটু হেসে বললেন, 'এ প্রশ্নটাও আমাকে দ্বিতীয়বার করা হচ্ছে। আমি মিঃ সিংকে যা বলেছি, আপনাকেও তাই বলছি। মিঃ উপাধ্যায়ের একটা থলি উনি আমার সিন্দুকে রাখতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে যে কী ছিল, সেটা আমি কোনও দিন দেখিনি বা জিগ্যেসও করিনি।'

'সেটা উনি রুদ্রপ্রয়াগ নিয়ে গেছেন ?'

'ইয়েস স্যার। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং—আপনি ডিটেকটিভ, তাই এ খবর আমি আপনাকে বলছি, আপনার হয়তো কাজে লাগতে পারে—পাঁচ-ছে মহিনে আগে দুজন লোক—তখনও মিঃ উপাধ্যায় ছিলেন এখানে—একজন সিন্ধী কি মাড়োয়ারি হবে—হি লুকড এ রিচ ম্যান—অ্যান্ড অ্যানাদার ম্যান—দুজন উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অনেক কথা হচ্ছিল সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম। এক ঘণ্টার উপর ছিল। তারা যাবার পর উপাধ্যায় একটা কথা আমাকে বলে—পণ্ডিতজী, আজ আমি একটি রিপুকে জয় করেছি। মিঃ সিংঘানিয়া আমাকে লোভের মধ্যে ফেলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি সে লোভ কাটিয়ে উঠেছি।'

'আপনি উপাধ্যায়ের এই সম্পত্তির কথা আর কাউকে বলেননি ?'

'দেখুন মিঃ মিত্তর, ওঁর যে একটা কিছু লুকোবার জিনিস আছে, সেটা অনেকেই জানত। আর সেই নিয়ে আড়ালে ঠাট্টাও করত। আমার আবার সন্ধ্যাবেলায় একটু নেশা করার অভ্যাস আছে, হয়তো কখনও কিছু বলে ফেলেছি। কিন্তু উপাধ্যায়জীকে সকলে এখানে এত ভক্তি করত যে, সিন্দুকে কী আছে সেই নিয়ে কেউ কোনও দিন মাথা ঘামায়নি।'

'এই যে রুদ্রপ্রয়াগ গেলেন তিনি, এর পিছনে কোনও কারণ আছে ?'

'আমাকে বলেছিলেন, গঙ্গার ঘাটে ওঁর একজন সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে উপাধ্যায়ের মধ্যে এক মানসিক চেঞ্জ আসে। আমার মনে হয়, চেঞ্জটা বেশ সিরিয়াস ছিল। কথা-টথা সব কমিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক সময় চুপচাপ বসে

ভাবতেন।'

'ওঁর ওষুধপত্তর কি উনি সঙ্গেই নিয়েছিলেন?'

'ওষুধ বলতে তো বেশি কিছু ছিল না : কয়েকটা বৈয়াম, কিছু শিকড়-বাকড়, কিছু মলম, কিছু বড়ি—এই আর কি। এগুলো সবই উনি নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে আমার নিজের ধারণা : উনি ক্রমে পুরোপুরি সন্ন্যাসের দিকে চলে যাবেন।'

'উনি বিয়ে করেননি?'

'না। সংসারের প্রতি ওঁর কোনও টান ছিল না। যাবার দিন আমাকে বলে গেলেন—ভোগের রাস্তা, ত্যাগের রাস্তা, দুটোই আমার সামনে ছিল। আমি ত্যাগটাই বেছে নিলাম।'

'ভাল কথা,' বলল ফেলুদা, 'আপনি যে বললেন, ওঁর রুদ্রপ্রয়াগের ঠিকানা আপনি দিয়ে দিয়েছেন ওই ভদ্রলোকটিকে—আপনি ঠিকানা পেলেন কি করে?'

'কেন, উপাধ্যায় আমাকে পোস্টকার্ড লিখেছে সেখান থেকে।'

'সে পোস্টকার্ড আছে?'

'আছে বইকি।'

মিঃ পণ্ডিত তাঁর পিছনের একটা তাকে রাখা বাক্সের ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা পোস্টকার্ড বার করে ফেলুদাকে দিলেন। হিন্দিতে লেখা আট-দশ লাইনের চিঠি। সেটা ফেলুদা বার বার পড়ল কেন, আর পড়ে বিড়বিড় করে দু' বার 'মোস্ট ইন্টারেস্টিং' বলল কেন, সেটা বলতে পারব না।

মিঃ পণ্ডিত আমাদের একটা ভাল ট্যাক্সির কথা বলে দিলেন। আপাতত রুদ্রপ্রয়াগ, তার পর যেখানেই যাওয়া দরকার—সেখানেই যাবে। গাড়োয়ালি ড্রাইভারের নাম যোগীন্দররাম। লোকটিকে দেখে আমাদের ভাল লাগল। আমরা বললাম, বারোটা নাগাদ খেয়েদেয়ে রওনা দেব হৃষীকেশ থেকে। হৃষীকেশ এখান থেকে মাইল পনের। হরিদ্বারে কিছুই দেখবার নেই, গঙ্গার ঘাটটা পর্যন্ত আগের বার যা দেখেছিলাম, তেমন আর নেই। বিশ্রী দেখতে সব নতুন বাড়ি উঠেছে আর তাদের দেওয়াল-জোড়া বিজ্ঞাপন। হৃষীকেশে যাওয়া দরকার, কারণ আমাদের রুদ্রপ্রয়াগে থাকার

বন্দোবস্ত করতে হবে। ইচ্ছে করলে ধরমশালায় থাকা যায় ; এখানে প্রায় সব শহরেই বহু দিনের পুরনো নাম-করা কালীকমলী ধরমশালা রয়েছে, কিন্তু ফেলুদা জানে যে রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার ও সব ধরমশালায় থাকবে না।

আমরা হৃষীকেশে গিয়ে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের রেস্ট হাউসে একটা ডবল-রুম পেয়ে গেলাম। ওরা বলল যে, তিনজন লোক হলে বাড়তি একটা খাটিয়া পেতে দেবে। বারোটা নাগাদ খেয়ে আমরা রওনা দিলাম রুদ্রপ্রয়াগ। কয়েক মাইল যাবার পর ডাইনে পড়ল লছমনঝুলা। এখানেও দু' দিকে বিশ্রী বিশ্রী নতুন বাড়ি আর হোটেল হয়ে জায়গাটার মজাই নষ্ট করে দিয়েছে। তাও বাদশাহী আংটির শেষ পর্বের ঘটনা মনে করে গা-টা বেশ ছমছম করছিল।

রুদ্রপ্রয়াগ জরুরী দুটো কারণে। এক হল জিম করবেট। 'দ্য ম্যান-ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ' যে পড়েছে, সে কোনও দিন ভুলতে পারবে না কী আশ্চর্য ধৈর্য, অধ্যবসায়, আর সাহসের সঙ্গে করবেট মেরেছিল এই মানুষখেকোকে আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে। আমাদের ড্রাইভার যোগীন্দর বলল, সে ছেলেবেলায় তার বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছে এই বাঘ মারার গল্প। করবেট যেমন ভালবাসত এই গাড়োয়ালিদের, গাড়োয়ালিরাও ঠিক তেমনই ভক্তি করত করবেটকে।

রুদ্রপ্রয়াগের আর একটা ব্যাপার হচ্ছে—এখান থেকে বদ্রী ও কেদার দু' জায়গাতেই যাওয়া যায়। দুটো নদী এসে মিশেছে রুদ্রপ্রয়াগে—মন্দাকিনী আর অলকনন্দা। অলকনন্দা ধরে গেলে বদ্রীনাথ আর মন্দাকিনী ধরে গেলে কেদারনাথ। বদ্রীনাথের শেষ পর্যন্ত বাস যায় ; কেদারনাথ যেতে বাস থেমে যায় ১৪ কিলোমিটার আগে গৌরীকুণ্ডে। সেখান থেকে হয় হেঁটে, নাহয় ডাণ্ডি বা টাট্টু ঘোড়া ভাড়া করে যাওয়া যায়।

হৃষীকেশ থেকে বেরিয়েই বনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের পথ আরম্ভ হয়ে গেল। পাশ দিয়ে বয়ে চলছে—স্থানীয় লোকেরা যাকে বলে গঙ্গা মাঈ। হৃষীকেশ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ১৪০ কিলোমিটার ;

পাহাড়ের রাস্তায় ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার করে গেলেও সেই সন্ধ্যার আগে পৌঁছানো যাবে না। তা ছাড়া পথে তিনটে জায়গা পড়ে—দেবপ্রয়াগ, কীর্তিনগর, আর শ্রীনগর। এই শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী নয়, গাড়ওয়াল জেলার রাজধানী।

পাহাড় ভেদ করে বনের মধ্য দিয়ে কেটে তৈরি-করা রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠছে, আবার ঘুরে ঘুরে নামছে। মাঝে মাঝে গাছপালা সরে গিয়ে খোলা সবুজ পাহাড় বেরিয়ে পড়ছে, তারই কোলে ছবির মতো ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

দৃশ্য সুন্দর ঠিকই, কিন্তু আমার মন কেবলই বলছে ভবানী উপাধ্যায়ের কাছে একটা মহামূল্য লকেট রয়েছে। একজন সন্ন্যাসীর কাছে এমন একটা জিনিস থাকবে, আর তাই নিয়ে কোনও গোলমাল হবে না, এটা যেন ভাবাই যায় না। তা ছাড়া মিঃ পুরীর একবার ফেলুদাকে কাজের ভার দিয়ে, তার পরই টেলিগ্রাম করে বারণ করাটাও কেমন যেন গণ্ডগোল লাগছে। অবশ্য তিনি চিঠিতে কারণ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এ জিনিস এর আগে কক্ষনো হয়নি বলেই বোধহয় একটা খট্‌কা মন থেকে যাচ্ছে না।

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন, এবার বললেন, 'আমি ভূ-গণ্ডগোল আর ইতিহাস-ফাঁসে চিরকালই কাঁচা ছিলাম ফেলুবাবু—সেটা তো আপনি আমার লেখা পড়েও অনেক বার বলেছেন। তাই, মানে, আমরা ভারতবর্ষের এখন ঠিক কোনখানে আছি, সেটা একটু বলে দিলে নিশ্চিন্ত বোধ করব।'

ফেলুদা তার বার্থোলোমিউ কোম্পানির বড় ম্যাপটা খুলে বুঝিয়ে দিল—'এই যে দেখুন হরিদ্বার। আমরা এখন যাচ্ছি এই দিকে। এই যে রুদ্রপ্রয়াগ। অর্থাৎ পুবে নেপাল, পশ্চিমে কাশ্মীর, আমরা তার মধ্যিখানে, বুঝেছেন?'

'হ্যাঁ। এই বারে ক্লিয়ার।'

পথে শ্রীনগরে থেমে চা খেয়ে রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল প্রায় পাঁচটা। ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল পোস্টাপিস থানা সব মিলিয়ে রুদ্রপ্রয়াগ বেশ বড় শহর করবেট যেখানে লেপার্ডটা মেরেছিল, সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত নাকি সাইনবোর্ড ছিল, কিন্তু যোগীন্দর বলল, সেটা নাকি কয়েক বছর হল ভেঙে গেছে।

আমরা সোজা চলে গেলাম গাড়ওয়াল নিগম রেস্ট হাউসে। শহরের একটু বাইরে সুন্দর নিরিবিলি জায়গায় তৈরি রেস্ট হাউসে গিয়ে যে খবরটা প্রথমেই শুনলাম, সেটা হল : কেদারনাথের রাস্তায় এক জায়গায় ধস নামাতে নাকি বাস চলাচল বেশ কয়েক দিন বন্ধ ছিল, আজই আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। এতে যে আমাদের একটা বড় রকম সুবিধে হয়েছিল, সেটা পরে বুঝেছিলাম।

ম্যানেজার মিঃ গিরিধারী ফেলুদাকে না চিনলেও আমাদের খুব খাতির করলেন। উনি নাকি হিন্দি অনুবাদে বহু বাংলা উপন্যাস পড়ে খুব বাঙালি-ভক্ত হয়ে পড়েছেন। ওঁর ফেভারিট অথরস হচ্ছেন বিমল মিত্র আর শংকর।

মিঃ গিরিধারী ছাড়াও আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন রেস্ট হাউসে, তিনি কেদারের পথ বন্ধ বলে আটকা পড়ে গিয়েছিলেন। ইনি কিন্তু ফেলুদাকে দেখে চিনে ফেললেন। বললেন, 'আমি একজন সাংবাদিক, আমি আপনার অনেক কেসের খবর জানি ; সেভেনটি নাইনে এলাহাবাদে সুখতঙ্কর মার্ডার কেসে আপনার ছবি বেরিয়েছিল নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকায়। সেই থেকেই আমি আপনাকে চিনেছি। আমার নাম কৃষ্ণকান্ত ভার্গব। আই অ্যাম ভেরি প্রাউড টু মিট ইউ, স্যার।'

ভদ্রলোকের বছর চল্লিশেক বয়স, চাপ-দাড়ি, মাঝারি গড়ন। মিঃ গিরিধারী স্বভাবতই ফেলুদার পরিচয় পেয়ে ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন—'দেয়ার ইজ নো ট্রাবল হিয়ার আই হোপ ?'

'ট্রাব্‌ল সর্বত্রই হতে পারে, মিঃ গিরিধারী। তবে আমরা এসেছি একটা অন্য ব্যাপারে। আপনাদের এখানে ভবানী উপাধ্যায় নামে

একজন ভদ্রলোক—'

'উপাধ্যায় তো এখানে নেই', বলে উঠলেন সাংবাদিক মিঃ ভার্গব। 'আমি তো ওঁকে নিয়েই একটা স্টোরি করব বলে এখানে এসেছি। হরিদ্বারে গিয়ে শুনলাম, উনি রুদ্রপ্রয়াগ গেছেন ; এখন এখানে এসে শুনছি তিনি খুব সম্ভবত কেদারনাথ গেছেন। আমি তাই কাল সকালে কেদার যাচ্ছি ওঁর খোঁজে। হি ইজ এ মোস্ট ইন্টারেস্টিং ক্যারাক্টার, মিঃ মিটার।'

'আমি অবিশ্যি ওঁর অসুখ সারানোর কথা শুনেছি', বলল ফেলুদা। তার পর লালমোহনবাবুর দিকে দেখিয়ে চাপা গলায় বলল, 'আমার এই বন্ধুটির মাঝে মাঝে একটা মস্তিকের ব্যারামের মতো হয়। ভুল বকেন, সামান্য ভায়োলেন্সও প্রকাশ পায়। তাই একবার ওঁকে দেখাব ভাবছিলাম। কলকাতার অ্যালোপাথি হোমিওপ্যাথিতে কোনও কাজ দেয়নি।'

লালমোহনবাবু প্রথমে কেমন থতমত খেয়ে, তার পর ফেলুদার কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্য মুখে একটা হিংস্র ভাব আনার চেষ্টা করলেন, যেটা আমাদের একটা নেপালি মুখোশ আছে, সেটার মতো দেখাল।

'তা হলে আপনাদের এই কেদার-বদ্রী যাওয়া ছাড়া গতি নেই', বললেন মিঃ ভার্গব। 'আমি বদ্রী গিয়ে ওঁকে পাইনি। অবিশ্যি উনি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, তাই নামও হয়তো বদলে নিয়েছেন।'

এই সময় রেস্ট হাউসের গেটের বাইরে একটা আমেরিকান গাড়ি থামল, আর তার থেকে তিনজন ভদ্রলোক নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। এদের যিনি দলপতি, তাঁকে চিনতে মোটেই অসুবিধা হল না, কারণ তাঁরই রঙিন ছবি রয়েছে ফেলুদার কাছে। ইনি হলেন রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন পবনদেও সিং। অন্য দু'জন নির্ঘাত এঁর চামচা।

আমরা পাঁচজন এতক্ষণ বাংলোর সামনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, এবার আরও তিনজন লোক বাড়ল। পবনদেও একটা বেতের চেয়ার দখল করে বললেন, 'আমরা বদ্রীনাথ থেকে আসছি। নো লাক। উপাধ্যায় ওখানে নেই।'

মিঃ গিরিধারী বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, আমার এখানে যতজন অতিথি এসেছেন, সকলেই উপাধ্যায়ের খোঁজ করছেন, এবং প্রত্যেকে বিভিন্ন কারণে। আপনি ওঁর ছবি তুলবেন, মিঃ ভার্গব ওঁকে ইন্টারভিউ করবেন, আর মিঃ মিটার তাঁর বন্ধুর চিকিৎসা করাবেন।'

পবনদেওর দলের সঙ্গে টেলিভিশনের যন্ত্রপাতি রয়েছে। ক্যামেরাটা পবনদেওর নিজের হাতে, আর তাতে লাগানো একটা পেল্লায় লেন্স।

'ওটা তো আপনার টেলি-লেন্স দেখছি', ফেলুদা মন্তব্য করল।

পবনদেও ক্যামেরাটা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'হ্যাঁ। সকালের রোদে বদ্রীনাথের চুড়ো থেকে বরফ গলে গলে পড়তে দেখা যায়। অ্যাকচুয়েলি আমার পুরো সরঞ্জাম একজনেই হ্যান্ডল করতে পারে। ক্যামেরা, সাউন্ড, সব কিছু। আমার এই দুই বন্ধু থাকবেন গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত। বাকিটা আমি একাই তুলব।'

'তার মানে আপনিও কেদারনাথ যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ছি।'

'আপনি ভবানী উপাধ্যায়কে নিয়ে ফিল্ম তুলছেন?'

'হ্যাঁ। অস্ট্রেলিয়ান টেলিভিশনের জন্য। উপাধ্যায়—মানে, তার সঙ্গে হরিদ্বার-হৃষীকেশ-কেদার-বদ্রীও কিছু থাকবে। তবে সেন্ট্রাল ক্যারেকটার হবেন ভবানী উপাধ্যায়। আশ্চর্য চরিত্র। উনি আমার বাবার হাঁপানি যেভাবে সারিয়েছিলেন, সেটা একটা মিরাক্‌ল।'

আমি আড়চোখে পবনদেওকে লক্ষ করে যাচ্ছিলাম। মিঃ উমাশঙ্কর পুরী যে চরিত্র বর্ণনা করেছিলেন, তার সঙ্গে কোনও মিল পাচ্ছিলাম না। ফেলুদা দেখলাম উমাশঙ্কর পুরীর কোনও উল্লেখ করল না।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছানোর সময় একটা হোটেল দেখে রেখেছিলাম, সেইখানেই আমরা তিনজন গিয়ে ডিনার সারলাম। বয় যখন অর্ডার নিতে এল, তখন লালমোহনবাবু হঠাৎ ভীষণ তেজের সঙ্গে টেবিলের উপর একটা ঘুঁষি মেরে একটা গোলমরিচদান উল্টে দিয়ে বললেন, তিনি আরমাডিলোর ডিমের ডালনা খাবেন। তখন

ফেলুদার তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হল যে, যাদের কাছে ওঁর অসুখের কথাটা বলা হয়েছে, শুধু তাদের সামনেই এই ধরনের ব্যবহার চলতে পারে, অন্য সময় নয়। বিশেষ করে ভায়োলেন্সটা যার-তার সামনে দেখাতে গেলে হয়তো লালমোহনবাবুকেই প্যাদানি খেতে হবে।

'তা বটে' ; বললেন লালমোহনবাবু। 'তবে অপরচুনিটি পেলে কিন্তু ছাড়ব না।'

পরদিন ভোরে উঠতে হবে বলে আমরা খাওয়ার পর্ব শেষ করেই রেস্ট হাউসে চলে এলাম। কেউ কোনও হুমকি চিঠি দিয়ে যায়নি তো এই ফাঁকে? আমাদের আবার এই জিনিসটার একটা ট্র্যাডিশন আছে। কিন্তু না ; এদিক ওদিক দেখেও তেমন কিছু পেলাম না।

আমাদের দুটো ঘর পরেই যে পবনদেও তার দুই বন্ধু আর মিঃ গিরিধারীকে নিয়ে পানীয়ের সদ্ব্যবহার করছেন, সেটা গেলাসের টুং টাং আর দমকে দমকে হাসি থেকেই বুঝতে পারছিলাম।

লালমোহনবাবু তাঁর বালিশে মাথা দিয়ে বললেন, 'একটা কথা কিন্তু বলতেই হবে ফেলুবাবু—সে দিন আপনার ঘরে বসে পুরী সাহেব ছোটকুমার সম্বন্ধে যাই বলে থাকুন না কেন, আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ মাই ডিয়ার বলেই মনে হচ্ছে।'

ফেলুদা বলল, 'প্রকৃতি কিন্তু অনেক হিংস্র প্রাণীকেই সুন্দর করে সৃষ্টি করেছে। বাংলার বাঘের চেয়ে সুন্দর কোনও প্রাণী আছে কি? ময়ূরের ঠোকরানিতে যে কী তেজ আছে, তা তো আপনি জানেন। জানেন না?'

লালমোহনবাবু তাঁর অ্যালার্ম ক্লকের চাবিটায় একটা মোচড় দিয়ে, চোখে একটা হিংস্র উন্মাদ ভাব এনে বললেন—'পোপোক্যাটাপেটাপোটোপুলটিশ।'

৪

আমরা ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় ট্যাক্সির সামনে গিয়ে হাজির হলাম। যোগীন্দররাম তার আগেই রেডি। আমাদের গাড়ির কাছেই পবনদেওর আমেরিকান গাড়িতে মাল তোলা হচ্ছে। ও

গাড়ি আধ ঘণ্টার আগে বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে এও ঠিক যে, মাঝপথে ও আমাদের ছাড়িয়ে যাবে।

ট্যাক্সিতে যখন উঠতে যাব, তখন ছোটকুমার হঠাৎ আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বোঝাই যাচ্ছে কিছু বলার আছে।

ভদ্রলোক ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'কাল রাত্রে মিঃ গিরিধারী নেশার ঝোঁকে আপনার আসল পরিচয়টা আমাদের দিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনাকে একটা সোজা প্রশ্ন করতে চাই।'

'বলুন।'

'উমাশঙ্কর কাকা কি আমার উপর চোখ রাখার জন্য আপনাকে এ কাজে বহাল করেছেন?'

'তিনি যদি সেটা করেও থাকতেন,' বলল ফেলুদা, 'সেটা আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে প্রকাশ করতাম না, কারণ সেটা নীতিবিরুদ্ধ এবং বোকামি হত। তবে আমি আপনাকে বলেই দিচ্ছি—আসলে আমি মিঃ পুরীর হয়ে কিছু করছি না। আমাদের এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ভ্রমণ। তবে যদি কোনও গণ্ডগোল দেখি, তা হলে গোয়েন্দা হয়ে আমার নিজেকে সংযত রাখা খুবই মুশকিল হবে। ভবানী উপাধ্যায় সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা প্রবল কৌতূহল জেগে উঠেছে। তার একটা বিশেষ কারণ আছে, যদিও এখনও সেটা প্রকাশ করতে পারছি না।'

'আই সি।'

'এবার আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'করুন।'

'আপনি কি আপনার ফিল্মে সেই বিখ্যাত লকেটটি দেখাতে চান?'

'নিশ্চয়ই। অবিশ্যি সেটা যদি এখনও উপাধ্যায়ের কাছে থেকে থাকে।'

'কিন্তু উপাধ্যায়ের কাছে যে ও-রকম একটা জিনিস আছে, সেটা জানাজানি হয়ে গেলে তো ওঁর জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে। এত দিন যে-ব্যাপারটা গোপন ছিল, সেটা আপনি প্রচার করে দেবেন?'

'মিঃ মিত্তির, তিনি যদি সত্যিই সন্ন্যাসী হয়ে থাকেন, তা হলে

তো তাঁর আর ও জিনিসের কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না। আমি ওঁকে বলব, একটা কোনও বড় মিউজিয়ামে ওটা দান করে দিতে। জিনিসটা চারশো বছর আগে ত্রিবাঙ্কুরের রাজার ছিল। কারিগরির দিক দিয়ে অতুলনীয়। উনি ওটা ডোনেট করলে চিরকাল ওঁর নাম ওই লকেটের সঙ্গে জড়িত থাকবে। মোট-কথা, ওই লকেট আমি ছবিতে দেখছি, এবং সেখানে আপনি আশা করি কোনও বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না।'

শেষের কথাটা বেশ দাপটের সঙ্গেই বলে ছোটকুমার তাঁর গাড়িতে ফিরে গেলেন। এবার তাঁর জায়গায় সাংবাদিক মিঃ ভার্গব এসে বললেন, 'আপনারা তিনজন আছেন জানলে তো আপনাদের সঙ্গেই যাওয়া যেত। উপাধ্যায় সম্বন্ধে আমি যে-সব তথ্য আবিষ্কার করেছি, সেগুলো আপনাকে বলতে পারতাম।'

'আপনার এই তথ্যের সোর্স কী?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'কিছু দিয়েছেন রূপনারায়ণগড়ের বড় কুমার সূর্যদেও, কিন্তু আসল তথ্য দিয়েছে রাজবাড়ির এক আশি বছরের বুড়ো বেয়ারা। আপনি কি জানেন যে, রূপনারায়ণগড়ের রাজা চন্দ্রদেও সিং-এর হাঁপানি উপাধ্যায় সারিয়ে দিয়েছিলেন?'

'তাই বুঝি?'

'আর তার জন্য রাজা তাঁকে ইনাম দিয়েছিলেন ওয়ান অফ হিজ মোস্ট প্রেশাস অর্নামেন্টস। এ খবর এত দিন ওদের ফ্যামিলির বাইরে কেউ জানত না। আপনি ভাবতে পারেন, খবরের কাগজের কাছে এই ঘটনার কী দাম!'

'আপনি তো তা হলে রাজা হয়ে যাবেন, মিঃ ভার্গব!'

'আমি আপনাকে বলছি মিঃ মিত্তির, এই লকেট উপাধ্যায়ের কাছে বেশি দিন থাকবে না। আপনি কি ছোটকুমারের কথায় বিশ্বাস করেন যে, ও শুধু টি. ভি-র ছবি তুলতে এসেছে? আমি বলছি আপনাকে, এখানে শিগগিরই আপনার নিজের পেশার আশ্রয় নিতে হবে।'

'তার জন্য আমি সদা প্রস্তুত', বলল ফেলুদা।

মিঃ ভার্গব চলে গেলেন।

'লোকটা তো ঘোড়েল আছে, মশাই', বললেন লালমোহনবাবু।

'সাংবাদিক মাত্রেই ঘোড়েল', বলল ফেলুদা। 'গোয়েন্দাগিরিতে ওরাও কম যায় না। রাজবাড়ির পুরনো বেয়ারাকে জেরা করায় ও খুব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। পরিচারকেরা অনেক সময় এমন খবর রাখে, যা মনিবেরা জানতেই পারে না। কিন্তু তাও---'

'তাও কী?' আমি জিগ্যেস করলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, ফেলুদার মনটা খচখচ করছে।

'তাও যে কেন লোকটাকে দেখে অসোয়াস্তি লাগছে, তা বুঝতে পারছি না।'

আমাদের গাড়ি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রওনা হয়ে অলকানন্দার পাশ দিয়ে কিছু দূর গিয়ে হঠাৎ একটা টানেলে ঢুকে পড়ল। সেই টানেল থেকে যখন আবার আলোয় বেরোলাম, তখন নদী পালটে গিয়ে হয়ে গেছে 'মন্দাকিনী'। এটাই এখন চলবে আমাদের সঙ্গে কেদার পর্যন্ত। কেদার থেকেই নাকি মন্দাকিনীর উৎপত্তি।

ফেলুদার ভ্রূকুটি থেকেই বুঝতে পারছিলাম, কোনও একটা কারণে ওর বিরক্ত লাগছে। এবারে ওর কথায় সেটা বুঝতে পারলাম—

'আমার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ছে ওই গিরিধারী লোকটার উপর। ও যে এত ইরেসপনসিব্‌ল তা ভাবতে পারিনি। ছোটকুমার এখন যে কথাগুলো বললেন, সেগুলো অবিশ্যি ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে আশ্চর্য লাগছে জেনে যে, মিঃ পুরীর সঙ্গে ওঁর আর দ্বিতীয়বার কোনও কথাই হয়নি। সেক্ষেত্রে মিঃ পুরীর চিঠি, টেলিগ্রাম দুটোই রহস্যজনক হয়ে উঠছে। অবিশ্যি সবই নির্ভর করছে, কে সত্যি বলছে কে মিথ্যে বলছে তার উপর। মোট-কথা, কেস ড্রপ করলেও, এখানে আসার সিদ্ধান্ত যে ড্রপ করিনি, সেটা খুব ভাগ্যের কথা।'

গৌরীকুণ্ড রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আশি কিলোমিটার হলেও এত চড়াই-উৎরাই আর এত ঘোরপ্যাঁচের রাস্তা, যেতে বেশ সময় লাগে। পথে তিনটে শহর পড়ে। ৩০ কিলোমিটারের মাথায় অগস্ত্যমুনি, হাইট আন্দাজ ৯০০ মিটার; সেখান থেকে ৯

কিলোমিটার দূরে গুপ্তকাশী—যদিও হাইট এইটুকুর মধ্যে বেড়ে যাচ্ছে ডবল। গুপ্তকাশী থেকে শোনপ্রয়াগ, যেখানে শোনগঙ্গা মন্দাকিনীর সঙ্গে এসে মিশেছে। এই শোনপ্রয়াগ থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে হল গৌরীকুণ্ড—যদিও সেখানে গিয়ে হাইট হয়ে যাচ্ছে সোয়া দু' হাজার মিটার।

আমাদের গরম জামা যাতে প্রয়োজন হলে সহজেই বার করে নেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা আমরা করে নিয়েছিলাম। বড় সুটকেস জাতীয় মাল আমাদের সঙ্গে যা ছিল, তা সবই গাড়ওয়াল নিগম রেস্ট হাউসের লকারে রেখে দিয়ে এসেছি, ফেরার সময় আবার নিয়ে যাব। লালমোহনবাবুর টাকের জন্য উনি এর মধ্যেই টুপি পরে নিয়েছেন, যদিও আমাদের বাঙালি মাঙ্কি ক্যাপ না ; রাজস্থান থেকে কেনা কান-ঢাকা পশমের লাইনিং দেওয়া স্মার্ট চামড়ার টুপি।

অগস্ত্যমুনি পৌঁছে গাড়ি থামিয়ে যখন আমরা গরম জামা পরছি, তখন আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল পবনদেওর আমেরিকান ট্যুরার। ছোটকুমার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওয়েভ করাতে ফেলুদাকে হাত নাড়াতে হল।

আমরা শীতের সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরি হয়ে আবার রওনা দিলাম। বাঁয়ে মন্দাকিনী একবার আমাদের পাশে চলে আসছে, আবার পরক্ষণেই নেমে যাচ্ছে সেই খাদের একেবারে নীচে। নদীর শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে লালমোহনবাবুর সুর করে বলা, 'ওরে তোরা কি জানিস কেউ, জলে কেন এত ওঠে ঢেউ'। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি পুরো কবিতাটার কেবলমাত্র ওই দুটো লাইনই জানেন।

শেষে ফেলুদা আর থাকতে না পেরে লাইন যোগ করতে শুরু করে দিল—ওরে তোরা কি জানিস কেউ, কেন বাঘ এলে ডাকে ফেউ...ওরে তোরা কি শুনিস কেউ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, খোকা কাঁদে ভেউ ভেউ...

গুপ্তকাশী যখন পৌঁছলাম, তখন বেজেছে দশটা। এখানে একটা চায়ের দোকান দেখে থামতে হল। যাকে ব্রেকফাস্ট বলে

সেটা সকালে হয়নি, কাজেই খিদেটা ভালই হয়েছিল। গরম জিলিপি, কচুরি আর চা দিয়ে দিব্যি ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল।

যোগীন্দরের এক ভাই কাছেই থাকে, সে বলল তার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা করে আসছে। সেই ফাঁকে লালমোহনবাবু চন্দ্রশেখর মহাদেব আর অর্ধনারীশ্বরের মন্দিরগুলো দেখতে গেলেন।

গুপ্তকাশী থেকে পাহাড়ের উপর দেখা যায় উখীমঠ। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কেদারের পথ যখন বরফের জন্য বন্ধ থাকে, তখন কেদারেশ্বরের পুজো এই উখীমঠেই হয়ে থাকে।

লালমোহনবাবু মন্দির দেখে ফিরে এলেন, কিন্তু যোগীন্দরের ফেরার নাম নেই। ফেলুদা আর আমি ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক দেখছি। এমন সময় দেখি, ছোটকুমারের গাড়ি আসছে। ওরা আমাদের পেরিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে পড়ল কেন?

আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে কুমার নেমে এলেন। বললেন, গুপ্তকাশী থেকে নাকি কেদার ও বদ্রী দুটো চুড়োরই ভিউ পাওয়া যায়, তাই ওঁরা এখানে কিছুটা সময় দিলেন। তবে আর দেরি করলে চলবে না, কারণ তা হলে যাত্রীদের রওনা দেবার দৃশ্য তোলার জন্য আর আলো থাকবে না।

কিন্তু তাও যোগীন্দরের দেখা নেই। তার বদলে দেখা দিলেন সাংবাদিক মিঃ ভার্গব। তাঁর গাড়িটা আগে দেখেছিলাম, আর ভাবছিলাম তিনি এখানে এতক্ষণ কী করছেন। ভদ্রলোক বললেন যে, কেদারনাথের সেবায়েতের একজন নাকি এখানে রয়েছেন। এরা সকলেই রাওয়াল পরিবারের লোক; এই বিশেষ রাওয়ালটির সঙ্গে নাকি একটা ইন্টারভিউ নিতে গিয়েছিলেন মিঃ ভার্গব। এখনই আবার তাঁকে ছুটতে হবে শোনপ্রয়াগ হয়ে গৌরীকুণ্ড।

মিঃ ভার্গব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বছর পনেরোর ছেলে এসে হঠাৎ 'ফোর-থার্টি-ফোর ট্যাক্সি কি কোই পাসিঞ্জর হ্যায় ইহা?' বলে হাঁক দিতেই ফেলুদা ব্যস্তভাবে তার দিকে এগিয়ে গেল।

'ফোর-থ্রি-জিরো-ফোর কি পাসিঞ্জর?'

'হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে?'

ব্যাপার আর কিছুই না, আমাদের গাড়ির ড্রাইভার জখম হয়ে পড়ে আছে কিছু দূরে। ছেলেটি তাকে চেনে বলে সে খবর দিতে এসেছে।

লালমোহনবাবুকে আমাদের জিনিসপত্র পাহারা দেবার জন্য রেখে, আমরা দুজন ছেলেটাকে অনুসরণ করে গেলাম।

পাঁচ-সাতটা বাড়ি নিয়ে একটা নিরিবিলি পাড়ায় একটা কলাগাছের ধারে যোগীন্দররাম মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে; তার মাথার পিছন দিকের ঘন কালো চুলে রক্তের ছোপ। শরীরের ওঠা-নামা থেকে বোঝা যাচ্ছে সে মরেনি, কিন্তু ফেলুদা তাও দৌড়ে গিয়ে তার নাড়ি পরীক্ষা করল।

কে এই কুকীর্তি করেছে, এ নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই; এখন দরকার ওর চিকিৎসা। ছোকরাটি বলল, এখানে হাসপাতাল দাওয়াখানা দুই-ই আছে। সে আবার গাড়িও চালাতে জানে। শেষ পর্যন্ত সে-ই নিজে ট্যাক্সি চালিয়ে যোগীন্দরকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

সব মিলিয়ে ঘণ্টা দেড়েক দেরি হয়ে গেল। যোগীন্দরের মাথায় ব্যান্ডেজ, ব্যথাও আছে; তাকে বলা হল যে এখান থেকে অন্য ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দিলে, আমরা তাতেই যাব। কিন্তু সে রাজী হল না। সে নিজেই যাবে আমাদের নিয়ে।

'কে মেরেছিল, কিছু বুঝতে পেরেছিলে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'নেহি', বলল যোগীন্দর, 'পিছে সে আ কর মারা।'

'এখানে তোমার কোনও দুশমন আছে?'

'কোই ভি নেহী।'

ফেলুদা কী ভাবছে সেটা আমি জানি। দুশমন যদি থাকে তো সে আমাদের দুশমন। আমাদের দেরি করিয়ে দেবার জন্য ব্যাপারটা করা হয়েছে। শত্রু কে আমরা বুঝতে না পারলেও, শত্রু যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

আমরা রওনা হবার পর আমি ফেলুদাকে বললাম, 'আচ্ছা, মিঃ পুরী যে তোমার কাছে এসেছিলেন, সেটা জানতে পেরে ছোটকুমার

তাঁকে দিয়ে টেলিগ্রামটা করিয়ে চিঠিটা লেখায়নি তো?—যাতে তার কাজে ফেলু মিত্তির কোনও বাধার সৃষ্টি না করতে পারে?'

'এটা তুই খুব ভাল ভেবেছিস তোপ্‌সে। কথাটা আমারও মনে হয়েছে। অবিশ্যি তার মানে এটাও বোঝা যায় যে, মিঃ পুরীর উপর এতটা কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা ছোটকুমারের আছে।'

'তা থাকবে না কেন', বললেন লালমোহনবাবু, 'ছোটকুমার ইজ এ প্রিন্স, অ্যান্ড পুরী ইজ ওনলি এ কর্মচারী।'

'ঠিক বলেছেন আপনি', বলল ফেলুদা, 'এখানে বয়সের তফাতটা কিছু ম্যাটার করে না। তবে হ্যাঁ—এটাও ঠিক যে টেলিগ্রাম আর চিঠি সত্ত্বেও আমি যে চলে আসব, সেটা বোধহয় ছোটকুমার ভাবতেই পারেনি।'

'তার মানে যোগীন্দরকে জখম ওরাই করিয়েছে?'

'যোগীন্দর যখন বলছে এখানে ওর কোনও শত্রু নেই, তখন আর কী হতে পারে?'

'এক্সকিউজ মি স্যার', বললেন লালমোহনবাবু, 'আমার কিন্তু ওই সাংবাদিক লোকটিকেও বিশেষ সুবিধের লাগছে না।'

'কেন বলুন তো? আমার নিজেরও যে ভদ্রলোককে একেবারে আদর্শ চরিত্র বলে মনে হচ্ছে তা নয়। কিন্তু আপনার ভাল না-লাগার কারণটা জানার কৌতূহল হচ্ছে।'

'সাংবাদিক হলে পকেটে কলম থাকবে না?' বললেন লালমোহনবাবু। 'বাইরের পকেটে তো নেই-ই, কাল যখন কোট পরছিল তখন দেখলাম বুক পকেটেও নেই, শার্টের পকেটেও নেই।'

'আমার মতো যদি একটা মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার থাকে?'

'লালমোহনবাবু যেন কথাটা শুনে একটু দমে গেলেন। বললেন, 'তা যদি হয়, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। আসলে আমার চাপ-দাড়ি দেখলেই কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়।'

'যাকগে—এবার একটু কাজের কথায় আসা যাক।'

'কী?'

আপনি কোনটা প্রেফার করবেন—ঘোড়া না ডান্ডি?'

'ন্যাচারেলি আপনারা যেটা প্রেফার করবেন, সেটাই। এক যাত্রায় তো আর পৃথক ফল হতে পারে না।'

'কেদারের পথ সম্বন্ধে আপনার কিঞ্চিৎ ধারণা আছে, আশা করি?'

'হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!'

'হাসছেন কেন?'

'আমার ধারণাটা বোধ হয় আপনার চেয়েও ভিভিড, কারণ কেদার-যাত্রা সম্বন্ধে এথিনিয়ামের বাংলা শিক্ষক বৈকুণ্ঠ মল্লিক যা লিখে গেছেন, তার তুলনা লিটারেচরে বেশি পাবেন না। তপেশ, জানো পোয়েমটা?'

'না তো!'

'শুনুন ফেলুবাবু।'

'দাঁড়ান, সামনে দুটো ইউ-টার্ন আসছে, সেগুলো পেরিয়ে যাক। সোজা রাস্তা না পেলে আবৃত্তি করাও যায় না, শোনাও যায় না।'

মিনিট দশেক পরে একটা সোজা রাস্তা পেয়ে লালমোহনবাবু তাঁর আবৃত্তি আরম্ভ করলেন—

"শহরের যত ক্লেদ, যত কোলাহল
ফেলি পিছে সহস্র যোজন
দেখ চলে কত ভক্তজন
হিমগিরি বেষ্টিত এই তীর্থপথে
শুধু আজ নয়, সেই পুরাকাল হতে—
সাথে চলে মন্দাকিনী
অটল গাম্ভীর্য মাঝে ক্ষিপ্রা প্রবাহিনী"—

এইবার হচ্ছে আসল ব্যাপার। শুনুন, যাত্রীদের কিভাবে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন ভদ্রলোক—

"তবে শুন এবে অভিজ্ঞের বাণী—
দেবদর্শন হয় জেনো বহু কষ্ট মানি'
গিরিগাত্রে শীর্ণপথে যাত্রী অগণন
প্রাণ যায় যদি হয় পদস্খলন,
তাও চলে অশ্বারোহী, চলে ডাণ্ডিবাহী,

যষ্টিধারী বৃদ্ধ দেখ তাঁরও ক্লান্তি নাহি
আছে শুধু অটল বিশ্বাস
সব ক্লান্তি হবে দূর, পূর্ণ হবে আশ
যাত্রা অন্তে বিরাজেন কেদারেশ্বর
সর্বগুণ সর্বশক্তিধর
মহাতীর্থে মহাপুণ্য হবে নিশ্চয়
উচ্চকণ্ঠে বল সবে—কেদারের জয় !"

'হুঁ,' বলল ফেলুদা, 'বোঝাই যাচ্ছে, মল্লিক মশাই এ কবিতা লিখেছিলেন বাস-ট্যাক্সির যুগের অনেক আগে।'

'সার্টেনলি,' বললেন লালমোহনবাবু, 'তাঁকে তীর্থযাত্রীর পুরো ধকল ভোগ করতে হয়েছিল।'

'কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে—আপনি কি অশ্বারোহী হতে চান, না ডাণ্ডির দ্বারা বাহিত হতে চান, না পয়দল যেতে চান।'

'সেটা সব ডিপেন্ড করছে আপনাদের উপর। দলচ্যুত হবার প্রশ্ন তো আর উঠতে পারে না।'

'আমি আর তোপ্‌সে তো হেঁটেই যাব স্থির করেছি। আপনার পক্ষে ডাণ্ডিটা সবচেয়ে নিরাপদ, কারণ ঘোড়াগুলোর টেন্ডেন্সি হচ্ছে পথের যে দিকটায় খাদ, তার কানা ধরে চলা। সে টেনশন আপনার সহ্য হবে না।'

লালমোহনবাবু ভয়ঙ্কর রকম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শুনুন ফেলুবাবু, আপনি কিন্তু আমার ক্ষমতাকে ক্রমান্বয়ে আন্ডার এস্টিমেট করে চলেছেন। আমি গেলে হেঁটে যাব, আর নয়তো যাব না। এই আমার সোজা কথা।'

'যাক্, তা হলে এটা সেট্‌ল্‌ড', বলল ফেলুদা।

'একটা প্রশ্ন আমি করতে পারি কি?' বললেন লালমোহনবাবু—'অবিশ্যি এটা জার্নি সম্বন্ধে নয়।'

'নিশ্চয় পারেন।'

'এরা তো মশাই আমাদের চিনে ফেলেছে; এখন কেদার গিয়ে আমরা করছিটা কী?'

'সেটা সব নির্ভর করছে—কে আগে উপাধ্যায়ের সন্ধান পায় তার উপর।'

'ধরুন যদি আমরাই পাই।'

'তা হলে তাঁকে সবিস্তারে ব্যাপারটা বলতে হবে। সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর মনোভাব যদি বদলে গিয়ে থাকে, তা হলে হয়তো লকেটটা উনি আর নিজের কাছে রাখতে চাইবেন না। আমাদের কর্তব্য হবে—তিনি সেটা কাকে দিয়ে যেতে চান, তাঁর অনুসন্ধান করা—অবশ্য সে রকম লোক যদি কেউ থেকে থাকে। এর মধ্যে যদি ছোটকুমারও উপাধ্যায়ের সন্ধান পেয়ে যান, তা হলে তিনি হয়তো লকেটটার ছবি তুলতে চাইবেন। চন্দ্রদেওর ছেলে বলে উপাধ্যায় হয়তো স্নেহবশত তাতে রাজিও হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু উপাধ্যায়ের অমতে পবনদেওকে কোনও মতেই লকেটটা হস্তগত করতে দেওয়া যায় না। অবিশ্যি সে যে সেটা হাত করতে চাইছে, এমন বিশ্বাস করার কোনও কারণ এখনও ঘটেনি। আমরা শুধু অনুমান করছি যে, সে-ই হুমকি দিয়ে মিঃ পুরীকে চিঠি ও টেলিগ্রামটা পাঠাতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তারও এখনও কোনও প্রমাণ নেই। টেলিভিশনের ছবি তোলা ছাড়া তার আর কোনও উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু সাংবাদিক মিঃ ভার্গবও যে উপাধ্যায়ের খোঁজ করছেন।'

ফেলুদা বলল, 'আমার বিশ্বাস ভার্গব যখন আসল ঘটনা জেনে গেছে, তখন তার শুধু দুটো ছবি পেলেই কাজ হয়ে যাবে—একটি উপাধ্যায়ের, একটি লকেটের। কারণ এই কাহিনী খবরের কাগজে প্রকাশিত হলে ভার্গবের অন্তত কিছু দিন আর অন্নচিন্তা থাকবে না।'

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়িটা কিন্তু অত্যন্ত বেয়াড়া রকম চড়াই উঠে দশ হাজার ফুট বা সাড়ে তিন হাজার মিটারের উপরে পৌঁছে গেল। অন্তত যোগীন্দর তাই বলল, আর সেই সঙ্গে বাইরের কনকনে শীতেও তার প্রমাণ পেলাম। এখন মাঝে মাঝে বরফের পাহাড়ের চূড়ো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোনটা যে কোন শৃঙ্গ তা বুঝতে

পারছি না। মিনিট পনেরোর মধ্যেই গৌরীকুণ্ড পৌঁছে যাওয়া উচিত। ঘড়ি বলছে পাঁচটা পনেরো। দূরে পাহাড়ের চূড়োয় উজ্জ্বল রোদ থাকলেও আশেপাশের পাহাড়ে পাইন আর রডোডেনড্রনের বনে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

একটা মোড় ঘুরে সামনে ঘর বাড়ি গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি দেখে বুঝলাম যে, আমরা গৌরীকুণ্ডে এসে গেছি। এটাও বুঝলাম যে, আজ রাতটা এখানেই থাকতে হবে। আমাদের কেদার-যাত্রা শুরু হবে কাল ভোরে। আর ভোরে রওনা হলেও চোদ্দ কিলোমিটার চড়াই পথ যেতে সন্ধে হয়ে যাবে। অর্থাৎ আসল ঘটনা যা ঘটবার, তা পরশুর আগে নয়।

বাস টারমিনাস হবার ফলে ছোট জায়গা হওয়া সত্ত্বেও গৌরীকুণ্ডে ব্যস্ততার শেষ নেই। ঘোড়া, ডাণ্ডি, কাণ্ডি, কুলি—এদের সঙ্গে দর-দস্তুরি চলছে। কাণ্ডি জিনিসটা ঝুড়ি টাইপের। এতে করেও মানুষ যায়, যদিও দেখে মোটেই ভরসা হয় না।

এখানে রাতে থাকতে হবে জেনেও আগে কোনও বন্দোবস্ত করিনি। কারণ, জানি অন্তত একটা ধরমশালা কি চটি পেয়ে যাব। সত্যিই দেখা গেল, জায়গার কোনও অভাব নেই। এখানে পাণ্ডারা ঘর ভাড়া দেয়। বিছানা বালিশ লেপ কম্বল সবই দেয়। পাণ্ডারা বাঙালি না হলেও বাঙালি যাত্রী এত আসে যে, এরা দিব্যি বাংলা শিখে গেছে। এদের থাকার ঘরগুলো হয় দোতলায়। বেঁটে বেঁটে ঘর, যার সিলিং-এ ফেলুদার প্রায় মাথা ঠেকে যায়। এই ঘরের নীচে সেই রকমই বেঁটে বেঁটে সার বাঁধা দোকান। সস্তার ব্যাপার, তবে আমাদের কথা হচ্ছে, রাত্তিরে ঘুমোনো। সেই কাজটায় কোনও ব্যাঘাত হবে বলে মনে হল না।

আমরা এখানে এসেই ছোটকুমারের হলদে আমেরিকান গাড়িটা দেখেছিলাম। ওরা আমাদের চেয়ে ঘণ্টা চারেক আগে পৌঁছেছে নিশ্চয়। অর্থাৎ দুপুরে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে রাত্তিরের মধ্যে পৌঁছে যাবে। তার মানে কেদারে একটা পুরো দিনেরও বেশি সময় পাচ্ছে ছোটকুমার।

আমার ধারণা, মিঃ ভার্গবও আজ রাত্তিরের মধ্যে পৌঁছে যাবেন।

আশ্চর্য এই যে, সকলেরই উদ্দেশ্য এক—উপাধ্যায় মশাইয়ের সন্ধান করা।

৫

পাণ্ডাদের ঘরে গভীর ঘুমে রাত কাটিয়ে ভোর পাঁচটার মধ্যে অ্যালার্ম বাজিয়ে উঠে আমরা তিনজনে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এত ভোরে বিভিন্ন দেশীয় এত যাত্রীর ভিড় এখানে জমায়েত হয়েছে, সেটা ভাবতেই পারিনি। এদের মধ্যে বাঙালি আছে প্রচুর, আর তাদের প্রায় সবাই দলে এসেছে। দল বলতে অবিশ্যি পরিবারও বোঝায়। সত্তর বছরের দাদু থেকে নিয়ে পাঁচ বছরের নাতনি পর্যন্ত, তার মধ্যে মাসি-পিসিও যে নেই, তা নয়।

ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ক্যামেরা হাতে পবনদেওকে দেখে বেশ অবাক হলাম। তিনি ঘোড়া ভাড়া করেছেন দুটো—একটা নিজের জন্য, আর একটার পিঠে থাকবে সরঞ্জাম। আমাদের দেখে বললেন, শোনপ্রয়াগে নাকি অনেক ইন্টারেস্টিং ছবি তোলার ছিল, তাই কাল এসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেশ রাত হয়েছে। আমাদের সঙ্গেই অবিশ্যি রওনা হচ্ছেন, তবে উনি থেমে থেমে ছবি তুলতে তুলতে যাবেন ; ক্যামেরা ও সাউন্ডের সরঞ্জাম থাকবে নিজের সঙ্গে—ফিল্ম, অর্থাৎ কাঁচামাল থাকবে অন্য ঘোড়ার পিঠে।

ফেলুদা ছোটকুমারের কাছ থেকে সরে এসে বলল, 'রহস্যের শেষ নেই। উনি কি তা হলে কেদারে লোক লাগিয়েছেন উপাধ্যায়কে খুঁজে বার করার জন্য ?'

যাই হোক, এ সব ভাববার সময় এখন নয়, কারণ আমাদের রওনা দেবার সময় এসে গেছে।

'আপনি তা হলে দৃঢ়সংকল্প যে হেঁটেই যাবেন ?' ফেলুদা লালমোহনবাবুকে আবার জিজ্ঞেস করল।

'ইয়েস স্যার', বললেন জটায়ু, 'তবে হ্যাঁ, আপনাদের সঙ্গে তাল

রেখে হাঁটতে পারব কিনা সে বিষয়ে—'

'সে বিষয়ে আপনি আদৌ চিন্তা করবেন না। আপনি আপনার নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী হাঁটবেন। গন্তব্য যখন এক, রাস্তা যখন এক, তখন পিছিয়ে পড়লেও চিন্তার কারণ কিছু নেই। এই নিন, এইটে হাতে নিন।'

আমরা তিনজনের জন্য তিনটে লাঠি কিনে নিয়েছি, যার নিচের অংশটা ছুঁচোলো লোহা লাগানো। এ লাঠি এখন প্রত্যেক পদযাত্রীর হাতে। এর দাম দু' টাকা, ফিরে এসে আবার ফেরত দিলে এক টাকা ফেরত পাওয়া যায়। তারই একটা ফেলুদা লালমোহনবাবুকে দিয়ে দিল।

আমরা ঘড়ি ধরে ছ'টায় রওনা দিলাম। লালমোহনবাবু যে রকম হাঁক দিয়ে 'জয় কেদার' বলে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ নিলেন—আমার তো মনে হল, তাতেই তাঁর অর্ধেক এনার্জি চলে গেল।

পাহাড়ের গা দিয়ে পাথরে বাঁধানো রাস্তা। শুধু যে শীর্ণ তা নয়, এক-এক জায়গায় একজনের বেশি একসঙ্গে পাশাপাশি যেতে পারে না। এক দিকে পাহাড়, এক দিকে খাদ, খাদের নিচ দিয়ে বেগে বয়ে চলেছে মন্দাকিনী। দু' দিকেই মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ থাকার ফলে যাত্রীদের মাথার উপর একটা চাঁদোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে বেশির ভাগ অংশেই গাছপালা নেই, খালি শুকনো ঘাস আর পাথর। যারা পায়ে হাঁটছে, তাদের মুশকিল হচ্ছে, অশ্বারোহী আর ডাণ্ডিবাহীদের জন্য প্রায়ই তাদের পাশ দিতে হচ্ছে। এখানে নিয়মটা হচ্ছে কি, সব সময়ই পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাশ দেওয়া। খাদের দিকটায় গিয়ে পাশ দিতে গেলে পদস্খলনের সমূহ সম্ভাবনা।

যোগব্যায়াম করি বলে বোধ হয় আমাদের দুজনের খুব একটা কষ্ট হচ্ছিল না। লালমোহনবাবুর পক্ষে ব্যাপারটা খুব শ্রমসাপেক্ষ হলেও উনি প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন সেটা যেন বাইরে প্রকাশ না পায়। চড়াই ওঠার সময় তো কথা বলা যায় না ; এর পর খানিকটা সমতল রাস্তায় আমাদের কাছাকাছি পেয়ে বললেন, 'তেনজিং নোরকের মাহাত্ম্যটা কোথায়, সেটা এখন বুঝতে পারছি।'

মিনিট কুড়ি চলার পর একটা ঘটনা ঘটল, যেটা আমাদের কেদার পৌঁছানোটা আরও আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দিল।

একটা বেশ বড় পাথরের খণ্ড পাহাড়ের গা দিয়ে হঠাৎ গড়িয়ে এল সোজা ফেলুদার দিকে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সচেতন হতে যে কয়েকটা মুহূর্ত গেল, তাতেই কিছুটা ড্যামেজ হয়ে গেল। পাথরের ঘষা খেয়ে ফেলুদার হাতের এইচ এম টি ঘড়িটা চুরমার হয়ে গেল, আর আমাদের পাশের এক প্রৌঢ় যাত্রীর লাঠিটা হস্তচ্যুত হয়ে পাশের খাদ দিয়ে পাথরের সঙ্গে ঝড়ের বেগে গড়িয়ে নেমে গেল মন্দাকিনী লক্ষ্য করে।

ফেলুদা একটু হকচকিয়ে গেলেও সেটা মুহূর্তের জন্য। ওর শরীর যে কত মজবুত আর স্ট্যামিনা যে কী সাংঘাতিক, সেটা বুঝলাম এই এতখানি খাড়াই পথ হাঁটার পর সোজা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে গেল। আমিও ওর পিছন পিছন গিয়েছিলাম, কিন্তু যতক্ষণে ওর কাছে পৌঁছলাম, তার মধ্যেই ও একটা লোকের কলার চেপে তাকে একটা গাছে ঠেসে ধরেছে। লোকটার বয়স বছর পঁচিশের বেশি না। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং সে স্বীকার করেছে যে, পাথর ফেলার ব্যাপারে সে আর একজনের আদেশ পালন করছিল। পকেট থেকে দশখানা কড়কড়ে দশ টাকার নোট বার করে সে দেখিয়ে দিল, কেন তাকে এমন একটা কাজ করতে রাজী হতে হয়েছে।

কে তাকে এই টাকা দিয়েছে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, তারই এক অচেনা জাতভাই। বোঝা গেল আসল লোক সে নয়, সে শুধু দালালের কাজ করেছে।

আপাতত ফেলুদা লোকটার গা থেকে একটা পশমের চাদর খুলে, সেটা দিয়ে তাকে দু' হাত সমেত পিছমোড়া করে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। বলল, যাত্রীদের ফাঁকে ফাঁকে কনস্টেবল থাকে, তাদের একজনকে পেলে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

লালমোহনবাবুর ভাষায় পাথর ফেলার অন্তর্নিহিত মানেটা সত্যি করে ভাবিয়ে তোলে। ভদ্রলোক বললেন, 'বোঝাই যাচ্ছে, কেউ বা কাহারা কেদারে আপনার উপস্থিতিটা প্রিভেণ্ট করার জন্য উঠে-পড়ে

লেগেছে।'

গৌরীকুণ্ড আর কেদারের মাঝামাঝি একটা জায়গা আছে, যেটার নাম রামওয়াড়া। সকলেই এখানে থামে বিশ্রামের জন্য। চটি আছে, ধরমশালা আছে, চায়ের দোকান আছে। লালমোহনবাবুকে আমরা এখানে আধঘণ্টা বিশ্রাম দেওয়া স্থির করলাম। এখানকার এলিভেশনে আড়াই হাজার মিটার, অর্থাৎ প্রায় আট হাজার ফুট। চারিদিকের দৃশ্য ক্রমেই ফ্যানট্যাস্টিক হয়ে আসছে। লালমোহনবাবু একেবারে মহাভারতের মুডে চলে গেছেন ; এমন কি এও বলছেন যে যাত্রাপথে যদি তাঁর পতনও হয়, তা হলেও কোনও আক্ষেপ নেই, কারণ এমন গ্লোরিয়াস ডেথ নাকি হয় না।

ফেলুদা বলল, 'আপনি কিন্তু পাবলিকের উপর যে পরিমাণে গাঁজাখুরি মাল চাপিয়েছেন, আপনার নরকভোগ না হয়ে যায় না।'

'হেঃ', বললেন লালমোহনবাবু, 'যুধিষ্ঠির পার পাননি মশাই নরকভোগের হাত থেকে, আর লালমোহন গাঙ্গুলী !'

বাকি সাড়ে তিন মাইলের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। একটা জায়গা থেকে হঠাৎ কেদারের মন্দিরের চুড়ো দেখতে পেয়ে সব যাত্রীরা 'জয় কেদার !' বলে কেউ মাথা নত করে, কেউ হাত জোড় করে, কেউ বা সাষ্টাঙ্গ হয়ে তাদের ভক্তি জানালেন। কিন্তু আবার হাঁটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের চুড়ো লুকিয়ে গেল পাহাড়ের পিছনে, আর বেরোল একেবারে কেদার পৌঁছানোর পর। পরে জানলাম যে, এই বিশেষ জায়গা থেকেই এই বিশেষ দর্শনটাকে এরা বলে 'দেও-দেখ্‌নী'।

৬

কেদার পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের হয়ে গেল বিকেল সাড়ে পাঁচটা। তখনও যথেষ্ট আলো রয়েছে, চার দিকের পাহাড়ের চুড়োগুলোয় রোদ ঝলমল করছে।

এতক্ষণ চড়াই-এর পর হঠাৎ সামনে সমতল জমি দেখতে পেলে যে কেমন লাগে, তা লিখে বোঝাতে পারব না। এটুকু বলতে পারি

যে, অবিশ্বাস আশ্বাস আনন্দ—সব যেন এক সঙ্গে মনের মধ্যে জেগে ওঠে, আর তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা মেশানো একটা অদ্ভুত শান্ত ভাব। সেটাই বোধ হয় যাত্রীদের মনে আরও বেশি ভক্তি জাগিয়ে তোলে।

চারিদিকে সবাই পাথর-বাঁধানো জমিতে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে 'জয় কেদার' 'জয় কেদার' করছে, মন্দিরটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন দিকে ঘেরা বরফের পাহাড়ের মধ্যে, আমরা তিনজন তারই মধ্যে এগিয়ে গেলাম একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে।

এখানে হোটেল আছে—হোটেল হিমলোক—কিন্তু তাতে জায়গা নেই, বিড়লা রেস্ট হাউসেও জায়গা নেই। এক রাত্রের ব্যাপার যখন, মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হলেই হল। তাই শেষ পর্যন্ত কালীকমলীওয়ালির ধরমশালায় উঠলাম আমরা। সামান্য ভাড়ায় গরম লেপ তোশক কম্বল সবই পাওয়া যায়।

কেদারনাথের মন্দির এই কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যা ছ'টায় বন্ধ হয়ে গেছে, আবার খুলবে সেই কাল সকাল আটটায়। তাই লালমোহনবাবুর পুজো দেবার কাজটা আজ স্থগিত থাকবে। আপাতত ঠিক এই মুহূর্তে যেটা দরকার, সেটা হল গরম চা। আমাদের থাকার ঘর থেকে নীচে নেমেই চায়ের দোকান পেয়ে গেলাম। এটা হল কাশীর বিশ্বনাথের গলির মতোই কেদারনাথের গলি। দোকানগুলো সবই অস্থায়ী, কারণ নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বরফের জন্য কেদারনাথে জনপ্রাণী থাকবে না।

আমি ভেবেছিলাম, এই ধকলের পর লালমোহনবাবু হয়তো একটু বিশ্রাম নিতে চাইবেন। কিন্তু তিনি বললেন যে, তাঁর দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নাকি নতুন এনার্জি পাচ্ছেন—'তপেশ, এই হল কেদারের মহিমা!'

বিশ্বনাথের মতোই এখানেও কেদারের গলির দোকানগুলোতে বেশির ভাগই পুজোর সামগ্রী বিক্রি হয়। এমন কি, বেনারসের সেই অতি-চেনা গন্ধটাও যেন এখানে পাওয়া যায়।

আমরা তিনজনে এলাচ-দেওয়া গরম চা খাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ চেনা গলায় প্রশ্ন এল—'উপাধ্যায়ের সন্ধান পেলেন?'

ছোটকুমার পবনদেও সিং। এখনও তার হাতে ক্যামেরা আর বেল্টের সঙ্গে লাগানো সাউন্ড রেকর্ডিং যন্ত্র।

'আমরা তো এই মিনিট কুড়ি হল এলাম', বলল ফেলুদা।

'আমি এসেছি আড়াইটেয়,' বলল পবনদেও। 'যেটুকু জেনেছি, তিনি এখন পুরোপুরি সাধুই হয়ে গেছেন। চেহারাও সাধুরই মতো। বুঝে দেখুন, এখানে এত সাধুর মধ্যে তাকে খুঁজে বার করা কত কঠিন। একটা ব্যাপার সম্বন্ধে আমি শিওর। তিনি নাম বদলেছেন। উপাধ্যায় বলে কাউকে এখানে কেউ চেনে না।'

'দেখুন চেষ্টা করে', বলল ফেলুদা, 'আমরাও খুঁজছি।'

পবনদেও চলে গেলেন। লোকটা আমার কাছে এখনও রহস্য রয়ে গেল।

আমরা চা শেষ করে উঠে কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় আর-একটা চেনা কণ্ঠে বাংলায় একটা প্রশ্ন এল।

'এই যে—এসে পড়েছেন? কেমন, আসা সার্থক কিনা বলুন।'

আমাদের ট্রেনের আলাপী মাখনলাল মজুমদার।

'ষোল আনা সার্থক', বলল ফেলুদা, 'আমাদের ঘোর এখনও কাটেনি।'

'হরিদ্বারের কাজ হল?'

'হয়নি বলেই তো এখানে এলাম। একজনের সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। আগে ছিলেন হরিদ্বারে। সেখানে গিয়ে শুনি, তিনি চলে গেছেন রুদ্রপ্রয়াগ। আবার রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে শুনি কেদারনাথ।'

'কার কথা বলছেন, বলুন তো?'

'ভবানী উপাধ্যায় বলে এক ভদ্রলোক।'

মাখনবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল।

'ভবানী? ভবানীর খোঁজ করছেন আপনারা? আর সে কথা অ্যাদ্দিন আমাকে বলেননি?'

'আপনি তাঁকে চেনেন নাকি?'

'চিনি মানে? সাত বচ্ছর থেকে চিনি। আমার পেটের আলসার সারিয়ে দিয়েছিল এক বড়িতে। তার পর হরিদ্বার ছাড়ার কিছু দিন

আগেও আমার সঙ্গে দেখা করেছে। একটা বৈরাগ্য লক্ষ করেছিলাম ওর মধ্যে। বললে, রুদ্রপ্রয়াগে যাবে। আমি বললাম, বাসরুট হয়ে প্রয়াগ আর এখন সে জিনিস নেই। তুমি জপতপ করতে চাও তো সোজা কেদার চলে যাও। বোধ হয় একটা দোটানার মধ্যে পড়েছিল, তাই কিছু দিন রুদ্রপ্রয়াগে থেকে যায়। কিন্তু এখন সে এখানেই।'

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু কোথায়?'

'শহরের মধ্যে তাকে পাবেন না ভাই। সে এখন গুহাবাসী। চোরাবালিতাল নাম শুনেছেন? যাকে এখন গান্ধী সরোবর বলা হয়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বটে।'

'ওই চোরাবালিতাল থেকে মন্দাকিনী নদীর উৎপত্তি। কেদারনাথের পিছন দিকে পাথর আর বরফের উপর দিয়ে মাইল তিনেক যেতে হবে। হ্রদের ধারে একটা গুহায় বাস করে ভবানী। উপাধ্যায় অংশটা তার নাম থেকে উবে গেছে; এখন সে ভবানীবাবা। একা থাকে, কাছেপিঠে আর কেউ থাকে না। কাল সকালে আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'আপনার সঙ্গে এবার দেখা হয়েছে?'

'না, তবে স্থানীয় লোকের কাছে খবর পেয়েছি। ফলমূলের জন্য তাকে বাজারে আসতে হয় মাঝে মাঝে।'

'আপনি আমাদের অশেষ উপকার করলেন, মিঃ মজুমদার। কিন্তু তাঁর অতীতের ইতিহাস কি এখানে কেউ জানে?'

'তা তো জানতেই পারে,' বললেন মাখনবাবু, 'কারণ সে তো চিকিৎসা এখনও সম্পূর্ণ ছাড়েনি। এই কেদারনাথের মোহান্তই তো বলছিলেন যে, ভবানী সম্প্রতি নাকি একটি ছেলের পোলিও সারিয়ে দিয়েছে। তবে আমার ধারণা, সে কিছু দিনের মধ্যে আর চিকিৎসা করবে না—পুরোপুরি সন্ন্যাসী বনে যাবে।'

'একটা শেষ প্রশ্ন', বলল ফেলুদা, 'ভদ্রলোক কোন্ দেশী তা আপনি জানেন?'

'এ বিষয় তো তাকে কোনও দিন জিগ্যেস করিনি। তবে সে

আমার সঙ্গে সব সময় হিন্দিতেই কথা বলেছে। ভাল হিন্দি। তাতে অন্য কোনও প্রদেশের ছাপ পাইনি কখনও।'

মাখনবাবু চলে গেলেন।

লালমোহনবাবু ইতিমধ্যে আমাদের দল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। এবার এগিয়ে এসে বললেন, 'বিড়লা গেস্ট হাউস থেকে আমাদের তলব পড়েছে।'

'কে ডাকছে?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

একজন বেঁটে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, 'মিঃ সিংঘানিয়া।'

ফেলুদার ভুরুটা কুঁচকে গেল। আমাদের দিকে ফিরে চাপা গলায় বলল, 'মনে হচ্ছে এই সিংঘানিয়াই এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে হরিদ্বার গিয়েছিলেন উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আমার মনে হয়, এঁকে খানিকটা সময় দেওয়া যেতে পারে। চলিয়ে।'

যদিও চারিদিকে অনেকগুলো বরফের পাহাড়ের চুড়োতে এখনও রোদ রয়েছে—তার কোনওটা সোনালি, কোনওটা লাল, কোনওটা গোলাপি—কেদার শহরের উপর অন্ধকার নেমে এসেছে।

বিড়লা গেস্ট হাউস কেদারনাথের মন্দিরের পাশেই, কাজেই আমরা তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম। দেখে মনে হল, এখানে হয়তো এটাই থাকবার সবচেয়ে ভাল জায়গা। অন্তত পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে তো বটেই; খাবারের কথা জানি না। খাবারের ব্যাপারে এমনিতেও শুনছি, এখানে আলু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না।

বেঁটে লোকটা আমাদের আগে আগে পথ দেখিয়ে বিড়লা গেস্ট হাউসের দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। বেশ বড় ঘর, চারিদিকে চারটে গদি পাতা। মাথার উপর একটা ঝুলন্ত লোহার ডাণ্ডা থেকে বেরোনো তিনটি হুকে টিমটিম করে তিনটে বাল্‌ব জ্বলছে। কেদারনাথে ইলেকট্রিসিটি আছে বটে, কিন্তু আলোর কোনও তেজ নেই।

আমরা মিনিটখানেক অপেক্ষা করতেই, যিনি আমাদের আহ্বান করেছিলেন, তাঁর আবির্ভাব হল।

যা ভাবা যায়, সেটা যখন না হয়—তখন মনের অবস্থাটা আবার স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সিংঘানিয়ার নামটার সঙ্গে সিংহের মিল আছে বলে বোধ হয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কাউকে আশা করেছিলাম। যিনি এলেন তাঁর মাঝারি গড়ন, মেজাজে মাঝারি গাম্ভীর্য, গলার স্বর সরুও নয় মোটাও নয়। শুধু একটা মোটা পাকানো গোঁফে বলা যায় কিছুটা ভারিক্কি ভাব এসেছে।

'মাই নেম ইজ সিংঘানিয়া' বললেন ভদ্রলোক—'প্লিজ সিট ডাউন।'

'আমরা তিনজনে দুটো গদিতে ভাগাভাগি করে বসলাম, সিংঘানিয়া বসলেন তৃতীয় গদিতে সোজা আমাদের দিকে মুখ করে। কথা হল ইংরেজি-হিন্দি মিশিয়ে।

সিংঘানিয়া বললেন, 'আপনার খ্যাতির সঙ্গে আমি পরিচিত মিঃ মিটার, কিন্তু আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়নি।'

ফেলুদা বলল, 'বিপদে না পড়লে তো আর আমার ডাক পড়ে না, তাই আলাপ হবার সুযোগও হয় না।'

'আমি অবিশ্যি আপনাকে বিপদে পড়ে ডাকিনি।'

'তা জানি', বলল ফেলুদা। 'আপনার নামও কিন্তু আমি শুনেছি। অবিশ্যি সিংঘানিয়া তো অনেক আছে, কাজেই যাঁর নাম শুনেছি, তিনিই আপনি কিনা বলতে পারব না।'

'আই অ্যাম ভেরি ইন্টারেস্টেড টু নো, আপনি কী ভাবে আমার নাম শুনলেন।'

'আপনি হরিদ্বার গিয়েছিলেন কখনও ?'

'সার্টেনলি।'

'সেখানে ভবানী উপাধ্যায় বলে একজনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?'

'করেছিলাম বইকি ; কিন্তু আপনি সেটা জানলেন কী করে ?'

'উপাধ্যায়ের বাড়িওয়ালা আমাকে বলেছিলেন যে, মিঃ সিংঘানিয়া এবং আর একজন ভদ্রলোক উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা

করতে এসেছিলেন।'

'আর কিছু বলেননি?'

'বলেছিলেন যে উপাধ্যায়কে নাকি আপনি লোভে ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু উপাধ্যায় সেটা কাটিয়ে ওঠে।'

'হোয়াট এ স্ট্রেঞ্জ ম্যান, দিস উপাধ্যায়! আমি এমন লোক আর দ্বিতীয় দেখিনি। ভেবে দেখুন মিঃ মিটার—লোকটার রোজগার মাসে পাঁচশো টাকার বেশি নয়, কারণ গরীবদের সে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে। সেই লোককে আমি পাঁচ লাখ টাকা অফার করলাম। আপনি জানেন বোধ হয় যে, ওঁর কাছে একটা অত্যন্ত ভ্যালুয়েব্‌ল লকেট আছে—খুব সম্ভবত এককালে সেটা ট্র্যাভাঙ্কোরের মহারাজার ছিল।

'সে তো জানি, কিন্তু আমার জানার কৌতূহল হচ্ছে, আপনি এই লকেটের খবরটা জানলেন কি করে? ওটা তো রাজার পাঁচ-ছ' জন খুব কাছের লোক ছাড়া আর কারও কাছে প্রচার হয়নি।'

'আমি খবরটা জেনেছিলাম সেই কাছের লোকেদের একজনের কাছ থেকেই। আমার জুয়েলারির ব্যবসা আছে দিল্লীতে। আমার কাছে এই লকেটের খবর আনে রূপনারায়ণগড়ের ম্যানেজার মিঃ পুরীর ছেলে দেবীশঙ্কর পুরী। সে আমাকে লকেটটা কিনতে বলে। ন্যাচারেলি হি এক্সপেক্টেড এ পারসেনটেজ। আমরা গেলাম হরিদ্বার। উপাধ্যায় রিফিউজ করলেন। পুরীর উৎসাহ চলে গেল। কিন্তু আমি ওটা কেনার লোভ ছাড়তে পারছি না। আমার মনে হয়, এখনও চেষ্টা করলে হয়তো পাওয়া যাবে। তখন তিনি ডাক্তারি করছিলেন, লোকের সেবা করছিলেন, এখন হি ইজ এ সন্ন্যাসী। একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর ওই রকম একটা পার্থিব সম্পদের উপর কোনও আসক্তি থাকবে, এটা ভাবতে একটু অদ্ভুত লাগছে না? আমি চাই, ওঁকে আর একবার অ্যাপ্রোচ করতে।'

'বেশ তো, করুন না।'

'দ্যাট ইজ ইমপসিব্‌ল, মিঃ মিটার।'

'কেন?'

'উনি এমন জায়গায় থাকেন, সেখানে আমার পক্ষে যাওয়া

অসম্ভব। আমি আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি?'

'করুন।'

'হোয়াই আর ইউ হিয়ার?'

'প্রধানত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। তবে উপাধ্যায় লোকটার উপর আমার একটা শ্রদ্ধা রয়েছে। তার যদি কোনও অনিষ্ট হচ্ছে দেখি, তা হলে কিন্তু আমি বাধা দেব।'

'ইউ আর অ্যাকটিং অ্যাজ এ ফ্রি এজেন্ট? আপনাকে কেউ এমপ্লয় করেনি?'

'না।'

'আপনি আমার হয়ে কাজ করবেন?'

'কী কাজ?'

'আপনি উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়ে বলে লকেটটা এনে দিন। আমি আপনাকে পাঁচ লাখের টেন পার্সেন্ট দেব। উনি যদি নিজে টাকা না নেন, তা হলে ওঁর যদি কোনও উত্তরাধিকারী থাকে, তাকে আমি টাকাটা দেব।'

'কিন্তু এই লকেট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড আরও কয়েকজন এখানে রয়েছে, আপনি জানেন সেটা?'

'রূপনারায়ণগড়ের ছোটকুমার তো?'

'আপনি জানেন?'

'জানতাম না। আজ বিকেলেই ভার্গব বলে এক সাংবাদিক এসেছিল। কেদারে এসেও যে সাংবাদিকদের উৎপাত সহ্য করতে হবে, সেটা ভাবিনি। যাই হোক, সে-ই খবরটা দিল। কিন্তু ছোটকুমার তো ফিল্ম তুলতে এসেছে।'

'জানি। কিন্তু তাতে উপাধ্যায় আর লকেটের একটা বড় ভূমিকা আছে।'

সিংঘানিয়ার চেহারাটা এবার একটা ইঁদুরের মতো হয়ে গেল। সে হাতজোড় করে বলল—

'দোহাই মিঃ মিটার—প্লিজ হেল্প মি।'

'আপনি ভার্গবকে এ সব নিয়ে কিছু বলেননি তো?'

'পাগল! আমি বলেছি তীর্থ করতে এসেছি। কেদারে আমার

আর কোনও কারণ থাকার দরকার আছে কি ?'

'ভার্গব লোকটাও উপাধ্যায় সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড। তবে খবরের কাগজের খোরাক হিসেবে।'

'আপনি কিন্তু এখনও আমার কথার উত্তর দেননি।'

'মিঃ সিংঘানিয়া—আমি এইটুকু বলতে পারি যে, আপনার প্রস্তাব আমি উপাধ্যায়কে জানাব। তবে আমার ধারণা : তিনি যদি লকেটটা নিজে না রাখেন, তবে সেটা হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে যেতে চাইবেন কাজেই এখন কোনও পাকাপাকি কথা বলার দরকার নেই তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে, কেমন ?'

'ভেরি গুড।'

বাইরে রাত। কেদার শহর ঝিমিয়ে পড়েছে। বাড়ির বাতি, রাস্তার বাতি, দোকানের বাতি—সবই যেন ধুঁকছে। তারই মধ্যে এক জায়গায় বেশ একটা উজ্জ্বল আলো দেখে অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, ছোটকুমার পবনদেও একটা ব্যাটারির আলো জ্বালিয়ে কেদারের গলির ফিল্ম তুলছে। আমাদের দেখে শুটিং থামিয়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, 'উপাধ্যায়ের কোনও খবর পেলেন ?'

ফেলুদা উত্তর না দিয়ে একটা পাল্টা প্রশ্ন করল—

'আপনি উঠেছেন কোথায় ?'

'এখানে পাণ্ডারা ঘর ভাড়া দেয়, জানেন তো ? তারই একটাতে রয়েছি—এই বাঁয়ের রাস্তা দিয়ে দুটো বাড়ির পরে ডান দিকের বাড়ি।'

'ঠিক আছে- আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি', বলল ফেলুদা। আমরা এগিয়ে গেলাম আমাদের ধরমশালার দিকে।

লালমোহনবাবু হঠাৎ মন্তব্য করলেন, 'ছোটকুমার কেমন লোক জানি না মশাই, কিন্তু সিংঘানিয়া লোকটা ধড়িবাজ আছে।'

'কী করে জানলেন ?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'আপনি যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে বোধ হয় দেখতে পাননি, কিন্তু আমি দেখলাম, লোকটার কোটের বাঁ পকেটে একটা

ক্যাসেট রেকর্ডার। কথা শুরু হবার আগে সেটা টুক করে চালু করে দিল।'

'ধড়িবাজের উপর আবার ধড়িবাজতর হয় জানেন তো?'

ফেলুদাও তার পকেট থেকে মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডারটা বার করে দেখিয়ে দিল।

'আপনি কি ভাবছেন যে, এটা আমি—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না, কারণ কাঁধে একটা ঘা খেয়ে ততক্ষণে সে মাটিতে পড়ে গেছে। গলির এই অংশটা নিরিবিলি, সেই সুযোগে পাশের কোনও গলি থেকে একটা লোক আচমকা বেরিয়ে এসে ওই কাণ্ডটি করেছে।

মুহূর্তের মধ্যে একটা তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল।

লোকটা মেরেই পালাচ্ছিল; আমি তার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তার কোমরটা দু' হাতে জাপটে ধরে তাকে দেয়ালে চেপে ধরলাম সেও পালটা চাপ দিয়ে আমাকে ঠেলে সরিয়ে পালাতে যাচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু তার হাতের অস্ত্রটা দিয়ে তাকে এক ঘায়ে ধরাশায়ী করে দিলেন।

অস্ত্রটা আর কিছুই না, গৌরীকুণ্ডে দু' টাকা দিয়ে কেনা সেই লোহা-লাগানো লাঠি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, লোকটার মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু সেই অবস্থাতেই সে আবার উঠে, এক দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এদিকে ফেলুদা উঠে বসেছে। বোঝাই যাচ্ছে সে বেশ কাবু। আমরা দু' জন দু' দিক থেকে তাকে ধরে তুললাম। আমাদের ধরমশালায় প্রায় পৌঁছে গেছি। শেষ পথটুকু ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল, 'কেদারেও তাহলে গুণ্ডা এসে পৌঁছে গেছে।'

কপাল-জোরে আমাদের পাশের ঘরেই একজন বাঙালি ডাক্তার পাওয়া গেল, নাম অধীর সেন। অধীরবাবু আবার ফেলুদাকে চিনে ফেললেন, কাজেই যত না জখম, তার তুলনায় শুশ্রূষাটা একটু বেশিই হল। ডান কাঁধে একটা জায়গায় কেটে গিয়েছিল, সেখানে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ড-এড দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফ্র্যাকচার হয়েছে কি না, সেটা তো এক্স-রে না করলে বোঝা যাবে না।'

ফেলুদা বলল, 'ফ্র্যাকচারই হোক আর যাই হোক, আমাকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে পারবেন না, এটা আগে থেকেই বলে দিলাম।'

ফি-এর কথা জিগ্যেস করাতে ভদ্রলোক জিভ-টিভ কেটে একাক্কার—'তবে ব্যাপারটা কী জানেন, মিঃ মিত্তির। এই নিয়ে আমার তিনবার হল কেদার। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু ক্রমে অ্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেন্টস ঢুকে পড়ছে শহরে। এর জন্য দায়ী কী জানেন তো? আমাদের যানবাহনের সুব্যবস্থা। এক দিকে ভাল করেন তো অন্য দিক দিয়ে খারাপ ঢুকে পড়ে—এই তো দেখে আসছি জগতের নিয়ম।'

কালীকমলীর ম্যানেজার নিজের বুদ্ধি খাটিয়েই এখানকার পুলিশকে খবর দিয়ে আনিয়ে নিয়েছিলেন। ফেলুদা তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলল। বুঝতে পারলাম যে, নানা রকম নির্দেশ দেওয়া হল, এবং সবই দারোগা সাহেব অতি মনোযোগের সঙ্গে শুনে নিলেন।

পুলিশ চলে যাবার পর সাংবাদিক মিঃ ভার্গব এসে হাজির—'শুনলাম আপনার লাইফের উপর একটা অ্যাটেম্পট হয়ে গেছে?'

'গোয়েন্দার জীবনে এ তো দৈনন্দিন ঘটনা, মিঃ ভার্গব। এখানকারই কোনও গুণ্ডা হয়তো পকেট মারতে চেয়েছিল, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।'

'আপনি বলতে চান, আপনার কোনও তদন্তের সঙ্গে এর কোনও কানেকশন নেই?'

'তদন্ত আবার কোথায়? আমি তো এখানে এসেছি উপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

'ভাল কথা, তিনি কোথায় থাকেন সে খবর পেয়েছেন?

'আপনি পেয়েছেন?'

'উপাধ্যায় বলে এখানে কেউ কাউকে চেনে না।'

'তা হলে ভদ্রলোক হয়তো নাম বদলেছেন।'

'তাই হবে।'

ফেলুদা আসল ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেল। ভার্গব কিছুটা নিরাশ হয়েই যেন চলে গেলেন।

কাল সকাল সকাল উঠতে হবে বলে আমরা সাড়ে আটটার মধ্যে পুরি-তরকারি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ার আয়োজন করতে লাগলাম। এই সময় ফেলুদা যে ব্যাপারটা করল, সেটা কিন্তু আমি আর লালমোহনবাবু মোটেই অ্যাপ্রুভ করতে পারলাম না। ও বলল, 'তোরা দুজনে শুয়ে পড়, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'ঘুরে আসছ মানে?' আমি অবাক এবং কিছুটা বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম। আমি জানি, ওর কাঁধে এখনও বেশ ব্যথা। 'কোত্থেকে ঘুরে আসছ?'

'একবার ছোটকুমারের সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

'সে কি, তুমি সোজা এনিমি ক্যাম্পে চলে যাবে?'

'আমার এ রকম অনেক বার হয়েছে রে তোপ্‌সে। একটা চোট খেলেই বুদ্ধি খুলে যায়। এবারও তাই। পবনদেও আমাদের শত্রু না।'

'তবে?'

'আসল শত্রু কে, সেটা জানতে পারবি খুব শিগ্‌গিরই।'

'কিন্তু তুমি বেরোবে, আর শত্রু যদি এখন ওঁত পেতে থাকে?'

'আমার সঙ্গে অস্ত্র আছে। তোরা শুয়ে পড়। আমি যখনই ফিরি না কেন, কালকের প্রোগ্রামে কোনও চেঞ্জ নেই। গান্ধী সরোবর। ভোর সাড়ে চারটায় রওনা হচ্ছি।'

সঙ্গে রিভলভার আর একটা বড় টর্চ নিয়ে ফেলুদা চলে গেল।

'তোমার দাদার সাহসের জবাব নেই', বললেন জটায়ু।

৮

ফেলুদা কাল রাত্তিরে কখন ফিরেছে, জানি না। সেটা ওকে আর জিগ্যেস করলাম না, কারণ ও দেখলাম, সাড়ে চারটার মধ্যে রেডি হয়ে আছে।

আমরা দুজনও দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নেওয়ার পর

তিনজনে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এখন ফিকে ভোরের আলো, রাস্তার বাতিগুলো এখনও টিমটিম করে জ্বলছে।

কেদারনাথের মন্দির ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় পড়ে ফেলুদা হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'তুই যে জিভ আর দাঁতের ফাঁক দিয়ে খুব জোরে শিস দিতিস, সেটা এখনও পারিস?'

আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, 'হ্যাঁ, তা পারি বইকি।'

ফেলুদা বলল, 'আমি যখন বলব, তখন দিবি।'

আমরা তিনজনেই সঙ্গে লোহার স্পাইক-দেওয়া লাঠি এনেছিলাম, তা না হলে মাঝে মাঝে বরফে ঢাকা এই পাথুরে পথ দিয়ে হাঁটা অসম্ভব হত। গোড়াতেই মন্দাকিনীর উপর দিয়ে একটা তক্তা-ফেলা সেতু পার হতে হয়েছে আমাদের। নদী এখানে সরু নালার মতো। তিন দিকে ঘিরে যে সব তুষার-শৃঙ্গ রয়েছে, তার কোনওটার নাম এখনও জানা হয়নি। তাদের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উঁচু, সেগুলোর চুড়োয় গোলাপি আভা লক্ষ করা যাচ্ছে। শীত প্রচণ্ড, তারই মধ্যে কাঁপা গলায় লালমোহনবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'তো-হে-হোপ্‌সে তো শি-হিস দেবে; আমার ভূ-হু-হুমিকাটা—?'

ফেলুদা বলল, 'আপনি আপনার ওই হাতের লাঠিটা প্রয়োজনে পাগ্‌লা জগাই-এর মতো মাথার ওপর ঘোরাবেন, তাতে আপনার বীরত্ব আর ব্যারাম দুটোই একসঙ্গে প্রমাণ হবে।'

বু-হু-ঝেছি।'

আরও আধঘণ্টা চলার পরে দেখতে পেলাম, দূরে একটা ছাই রঙের মসৃণ সমতল প্রান্তর রয়েছে। চারিদিকের পাথরের মধ্যে সেটাই যে চোরাবালিতাল বা গান্ধী সরোবর, সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না। তবু আমি ফেলুদার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ওটাই কি—?' ফেলুদা ঘাড় নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল, হ্যাঁ।

হ্রদের পশ্চিম ধারে একটা পাথরের ঢিবি রয়েছে, সেটার মধ্যে অনায়াসে একটা গুহা থাকতে পারে। পুরো ব্যাপারটা এখনও আমাদের থেকে অন্তত আড়াইশো গজ দূরে।

আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি সেখানে জমিতে আলগা পাথর

ছাড়াও বেশ বড় বড় শিলাখণ্ড রয়েছে। তা ছাড়া বরফ জমে রয়েছে চতুর্দিকে।

কিছুক্ষণ থেকেই লক্ষ করছি যে ফেলুদার দৃষ্টিটা এদিক ওদিক ঘুরছে, ও যেন কিছু একটা খুঁজছে। এবারে দৃষ্টিটা এক জায়গায় স্থির হল।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম আমাদের ডান দিকে একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে ক্যামেরার তেপায়ার একটা ঠ্যাং।

ফেলুদা প্রায় নিঃশব্দে সেই দিকে এগিয়ে গেল, আমরা তার পিছনে।

পাথরটা পেরোতেই দেখা গেল ছোটকুমার পবনদেও ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লেন্সটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সেটা টেলি-ফোটো, অর্থাৎ—টেলিস্কোপের কাজ করবে।

ছোটকুমারের পাশে পৌঁছতেই তিনি বললেন, 'স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গুহাটা, কিন্তু এখনও উনি বেরোননি।'

এবার পর পর ফেলুদা আর আমি দুজনেই চোখ লাগালাম।

লেকের জলটা স্থির, তাতে আকাশের আবছা গোলাপি রঙ প্রতিফলিত হয়েছে। তার পর বাঁ দিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখা গেল গুহাটা। পাথরের ফাঁকে গোঁজা একটা গৈরিক পতাকা রয়েছে গুহাটার ঠিক পাশে।

আমাদের চারপাশের যে শৃঙ্গগুলো সবচেয়ে উঁচু, তাতে এখনই গোলাপি রোদ লেগেছে। পুবে একটা উঁচু শৃঙ্গ, তার পিছনে আকাশের লাল রঙ দেখে মনে হচ্ছে সূর্যটা ওখান দিয়েই উঠবে।

মিনিটখানেকের মধ্যেই পুবের পাহাড়ের চুড়োর পিছন দিয়ে চোখ-ঝলসানো সূর্যটা উঁকি দিতেই গান্ধী সরোবরটা রোদে ধুয়ে গেল।

সেই সঙ্গে লক্ষ করলাম, গুহার গায়ে রোদ পড়েছে আর এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক পরিবেশে এক আশ্চর্য নাটক হচ্ছে এইভাবে এক সন্ন্যাসী বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। তাঁর দৃষ্টি সোজা পুব দিকে। যেন নতুন-ওঠা সূর্যকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

'তোপ্‌সে, এগিয়ে চল !' ফিস্‌ফিসিয়ে আদেশ এল ফেলুদার কাছ থেকে।

'আমি ক্যামেরায় আছি', বললেন ছোটকুমার।

আমরা তিনজন দ্রুত এগিয়ে গেলাম গুহার দিকে এ-পাথর ও-পাথরের আড়াল দিয়ে।

আলো পড়ছে, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। প্রকৃতি যেন রুদ্ধশ্বাসে কোনও একটা বিশেষ ঘটনার জন্য অপেক্ষা করছে।

এবার গুহা, সন্ন্যাসী, পতাকা সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমরা উত্তর-মুখে এগিয়ে চলেছি। সন্ন্যাসী আমাদের দিকে পাশ করে পুব দিকে চেয়ে আছেন, তাঁর গেরুয়া বসনের উপর একটা খয়েরি রঙের পট্টুর চাদর।

এবার একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম। গুহার পুব দিকের পাথরের ঢিবির গায়ে একটা আলো নড়া চড়া করছে। সেটা যে কোনও ধাতব জিনিস থেকে প্রতিফলিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এবার গুহার ঢিবির পিছন দিয়ে একটা লোক বেরিয়ে এল। তার ওভারকোটের কলার তোলা, তাই মুখটা বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার মাথায় একটা পশমের টুপি, আর হাতে যে জিনিসটা রোদ পড়ে চকচক্ করছে, সেটা রিভলভার ছাড়া আর কিছুই না।

সন্ন্যাসী সেই একই ভাবে সামনের দিকে চেয়ে আছে, সূর্যের আলো পড়ছে তার মুখে।

ফেলুদা এবার চাপা গলায় বলল, 'আমি এগোচ্ছি। তোরা এই পাথরের আড়াল থেকে দ্যাখ। রিভলভারের আওয়াজ শুনলেই তোর সেই শিসটা দিবি।'

ফেলুদা নিঃশব্দে এগিয়ে গেল গুহাটার দিকে। খানিক দূর গিয়ে সে একটা পাথরের পাশে এমনভাবে দাঁড়াল যে সমস্ত ঘটনাটা দেখতে পায়। আমরা আছি তার বিশ গজ পিছনে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নাটকের সব চরিত্রকে।

ফেলুদার পকেট থেকেও এবার রিভলভার বেরিয়ে এল।

এবার সন্ন্যাসী তাঁর দৃষ্টি ঘুরিয়েছেন বাঁ দিকে, অর্থাৎ ওভারকোটে

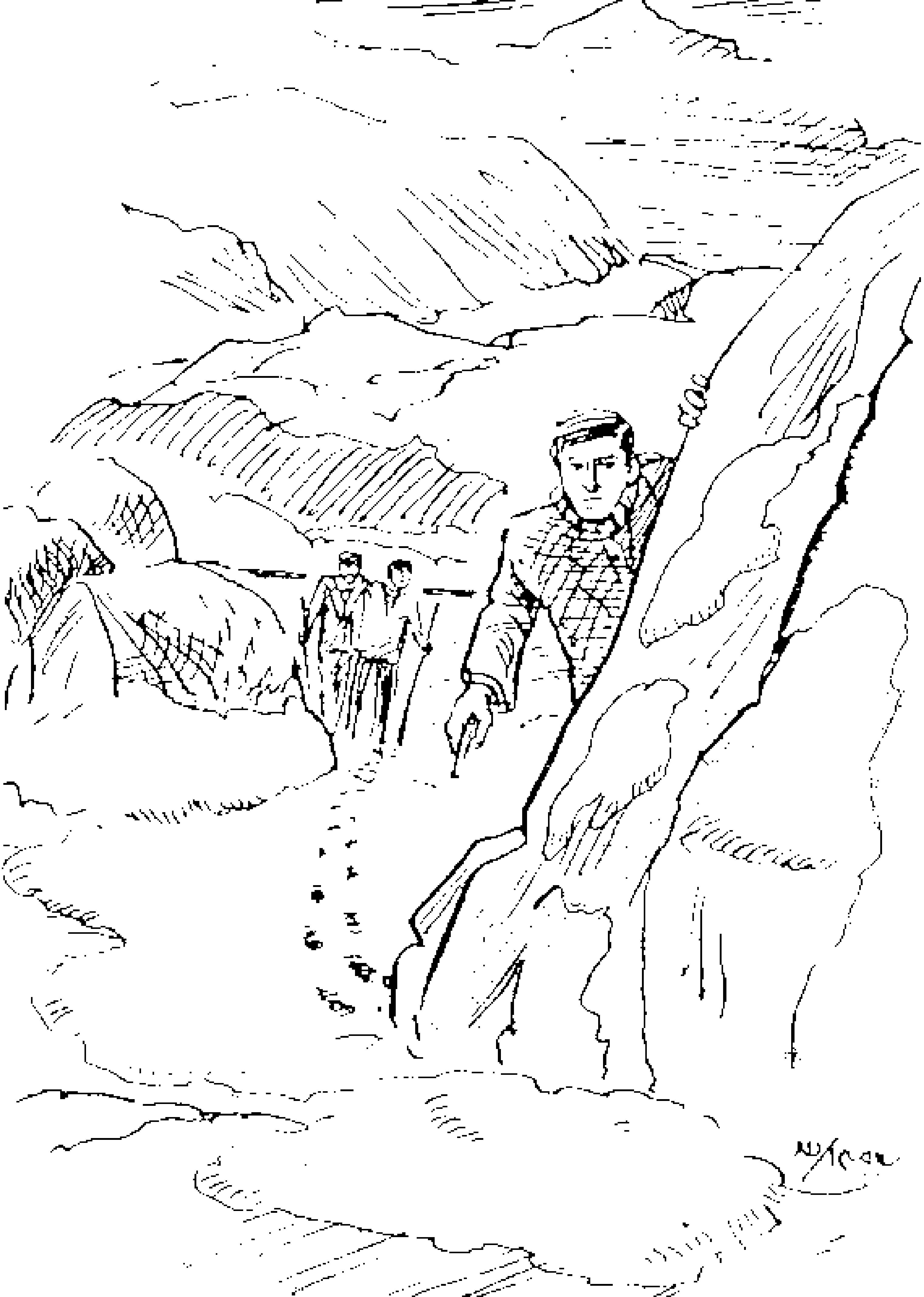

মুখ-ঢাকা লোকটার দিকে।

পরমুহূর্তেই এই অপার্থিব নৈঃশব্দ্য চুরমার করে একটা রিভলভারের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওভারকোট পরা লোকটা বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কবজি টিপে বরফের উপর বসে পড়ল, আর তার হাতের রিভলভারটাও ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল বরফের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল ফেলুদার নির্দেশ।

শিসের শব্দ হওয়া মাত্র এ-পাথর সে-পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পুলিশ।

'তোপ্‌সে, তোরা আয়!'

আমরা দুজনে দৌড়ে এগিয়ে গেলাম ঘটনাস্থলের দিকে।

এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সাধুর গুহার সামনে।

সৌম্যমূর্তি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী এখনও যেন পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারেননি। আমাদের সকলের দিকেই ঘুরে ঘুরে অবাক হয়ে দেখছেন।

আর যিনি মাটিতে বসে আছেন তাঁর কবজি টিপে? এবারে তো তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে।

সে কি, ইনি যে সাংবাদিক মিঃ ভার্গব!

একজন কনস্টেবল যেন ফেলুদারই কাছ থেকে নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। ফেলুদা বলল, 'আগে ওঁর দাড়িটা টেনে খুলুন তো!'

ভার্গবের দাড়িটা টেনে খুলতে যে মুখটা বেরোল, সেই মুখটাই ম্যাজিকের মতো আশ্চর্য রকম চেনা চেনা হয়ে গেল-- যখন ফেলুদা নিজেই গিয়ে এক টানে মাথার টুপিটা খুলে ফেলল।

'আশ্চর্য জিনিস রে হেরেডিটি', বলল ফেলুদা—'শুধু যে এর কানের লতি এর বাপের মতো, তা নয়, ইনি সিঁথিও করেন ডান দিকে—আর তাই এঁকে দেখে আমার এত অসোয়াস্তি হত।'

তার মানে কী দাঁড়াল?

ইনি উমাশঙ্কর পুরীর ছেলে দেবীশঙ্কর পুরী।

এবার আমাদের সকলের দৃষ্টি গেল সন্ন্যাসীর দিকে। তাঁর এখনও কেমন যেন মুহ্যমান ভাব। হিন্দিতে বললেন, 'পিস্তলের শব্দ শুনে মনটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল—কিছু মনে করবেন না।'

ফেলুদাও হিন্দিতে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কাছে যে থলিটি আছে, সেটি একবার বার করা দরকার। আমরা আপনার বন্ধু, সেটা বোধ হয় বুঝতেই পারছেন। ওটা আপনার গুহার মধ্যেই আছে তো?'

'আর কোথায় থাকবে? ওই তো আমার একমাত্র সম্পত্তি!'

একজন কনস্টেবল গিয়ে গুহার ভিতর থেকে একটা লাল থলি বার করে নিয়ে এল। সেটা খুলতে প্রথমে বেরোল একটা পাকানো কাগজ। এটা রাজা চন্দ্রদেও সিং-এর সিলমোহর সমেত ভবানী উপাধ্যায়কে লকেট-দানের স্বীকৃতি।

তার পর বেরোল আর একটা ছোট থলি থেকে সেই বিখ্যাত সোনার লকেট—বালগোপাল—যার অপরূপ সৌন্দর্য এই পরিবেশে, এই সকালের রোদে আরও শতগুণ বেড়ে গেছে।

এইবার ফেলুদা মুখ খুলল। তার বেস্ট হিন্দিতে সে বলল, 'এবার আপনার আসল পরিচয়টা দিলে কিন্তু আমাদের সকলের খুব সুবিধে হত।'

'আমার আসল পরিচয়?'

'আপনার নিজের নামটা বাংলাতেই বলুন না। অ্যাদ্দিন পরে বাংলা বলতে আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।'

উপাধ্যায় ফেলুদার দিকে অবাক হয়ে গিয়ে বাংলায় বললেন, 'আপনি বুঝে ফেলেছেন আমি বাঙালি?'

'কেন বুঝব না?' বলল ফেলুদা, 'আপনি দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দিতে চিঠি লিখেছেন, কিন্তু আপনার "ল" আর বর্গীয় "জ" বাংলার মতো। তা ছাড়া আপনার হরিদ্বারের ঘরের তাকে একটা বইয়ের পাতার টুকরো পেয়েছি, সেটাও বাংলা।'

'আপনার বুদ্ধি তো আশ্চর্য তীক্ষ্ণ।'

'এবার আর একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?'

'কী?'

'উপাধ্যায় কি সত্যিই আপনার পদবি, আর ভবানী কি সত্যিই আপনার নাম?'

'আপনি কী বলছেন আমি—'

'উপাধ্যায় কি গঙ্গোপাধ্যায়ের অংশ নয়, আর ভবানী কি দুর্গারি আর-একটা নাম নয়? আমি যদি বলি, আপনার আসল নাম দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায়—তা হলে কি খুব মিথ্যে বলা হবে?'

'ছো—ছো—ছো—ছো—'

'আপনি কাকে ধিক্কার দিচ্ছেন লালমোহনবাবু?' ফেলুদা বলে উঠল।

'ছো-ছোটকাকা!'

দুর্গামোহন গঙ্গোপাধ্যায় অবাক হয়ে চাইলেন লালমোহনবাবুর দিকে।

'আমি যে লালু!' বললেন জটায়ু।

লালমোহনবাবু গিয়ে দুর্গামোহনকে ঢিপ করে প্রণাম করায় সাধুবাবা তাঁর ভাইপোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তা হলে তো আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এই লকেট তো তোরই প্রাপ্য। ও জিনিস আমার কাছে রাখা এক বিষম বিড়ম্বনা।'

'তা তো বটেই। তা, আমাকে দিলে আমি একটা ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দিতে পারি। আপনি তো জানেন না ছোটকাকা, আজকাল আমি ছোটদের উপন্যাস লিখে বেশ দু পাইস করছি; তবে রুজির তো কিছু বলা যায় না, একদিন দেখব ঝপ্‌ করে সেল পড়ে গেছে। তখন লকেটটা থাকলে তবু একটা...'

নিজের ছেলে লকেটটা হাত করার তাল করছে জেনে উমাশঙ্করকে বাধ্য হয়ে ফেলুদাকে টেলিগ্রাম ও চিঠি পাঠাতে হয়েছিল। বাপকে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখার ক্ষমতা দেবীশঙ্করের নিশ্চয়ই আছে। দুর্গামোহন খুন হলে লকেট বেহাত হয়ে যেত

এটাও ঠিক, কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছিল ওই ধস্। দেবীশঙ্কর আটকা পড়ে গিয়েছিল রুদ্রপ্রয়াগে। সিংঘানিয়া যে এসেছিল কেদারে, সে একেবারে নিজের গরজে, লকেটটাকে কেনার জন্য।

দেবীশঙ্করই লোক লাগিয়ে ফেলুদার দিকে পাথর গড়িয়ে দিয়েছিল, সে-ই আবার কেদারে রাত্তিরবেলা গুণ্ডা লাগিয়ে ফেলুদাকে জখম করার চেষ্টা করেছিল।

ছোটকুমার পবনদেও সিং অবিশ্যি তার ক্যামেরা দিয়ে পুরো ঘটনাই টেলি-ফোটো লেন্স-এর জোরে বেশ কাছ থেকেই তুলে রেখেছিল। দেবীশঙ্কর যে রিভলভার বার করে দুর্গামোহনের দিকে তাগ করেছিল, সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবার কথা। আপাতত ছোটকুমারের আর ফিল্ম নেই, কিন্তু দিল্লী থেকে স্টক এলে পরে দুর্গামোহনের একটা সাক্ষাৎকার নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। দুর্গামোহন আপত্তি করলেন না; বরং বললেন, 'একজন রাজার আশ্চর্য দরাজ মনের কথাটা বিশ্বের লোকের কাছে গোপন থাকে কেন? আমি টেলিভিশন ক্যামেরায় নিশ্চয়ই বলব আমার সোনার বালগোপাল পাবার কথা।'

পবনদেও বললেন, 'কিন্তু বালগোপাল তো আর আপনার কাছে থাকছে না।'

'না', বললেন দুর্গামোহন। 'সেটার ছবি যদি তুলতে চাও তো আমার ভাইপোকে বলো।'

পবনদেও লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, 'আপনার বাড়ি গিয়ে আমি লকেটটার ছবি তুলে আনতে পারি কি?'

জটায়ু তাঁর সবচেয়ে বেশি সাহেবি উচ্চারণে বললেন, 'ইউ আর মোউস্ট ওয়েলখাম!'

বোসপুকুরে
খুনখারাপি
সত্যজিৎ রায়

ঘোসপুকুরে খুনখারাপি

॥ ১ ॥

আমাদের বন্ধু রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুর পাল্লায় পড়ে শেষটায় যাত্রা দেখতে হল। এখনকার সবচেয়ে নামকরা যাত্রার দল ভারত অপেরার হিট নাটক সূর্যতোরণ। এটা বলতেই হবে যে যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ জমে যেতে হয়। কোথাও কোনও ঢিলেঢালা ব্যাপার নেই; অ্যাকটিং একটু রং চড়া হলেও কাউকেই কাঁচা বলা যায় না। লালমোহনবাবু ফেরার পথে বললেন, 'আমার গপ্পের যা গুণ, এরও তাই। মনকে টানবার শক্তি আছে পুরোপুরি। অথচ তলিয়ে দেখুন, দেখবেন অনেক ফাঁক, অনেক ফাঁকি।'

কথাটা বড়াই-এর মতো শোনালেও, অস্বীকার করা যায় না। লালমোহনবাবুর লেখাও তলিয়ে দেখলে তাতে তেমন কিছু পাওয়া যাবে না। অথচ ভদ্রলোকের পপুলারিটি কিন্তু একটা চমক লাগার মতো ব্যাপার। নতুন বই বেরোনোর পরদিন থেকে একটানা তিন মাস বেস্ট সেলার লিস্টে নাম থাকে। অথচ উনি বেশি লেখেন না; বছরে দুটো উপন্যাস—একটা বৈশাখে, একটা পুজোয়। আজকাল তথ্যের ভুল আগের চেয়ে অনেক কম থাকে। কারণ শুধু যে ফেলুদাকে পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে নেন তা নয়, সম্প্রতি নিজেও অনেক রকম এনসাইক্লোপিডিয়া ইত্যাদি কিনেছেন। সেগুলোর যে সদ্ব্যবহার হচ্ছে সেটা বইগুলো পড়লেই বোঝা যায়।

সূর্যতোরণ যাত্রা নামটা প্রথমেই করার কারণ হল, এই যাত্রার সঙ্গে

যুক্ত এক ভদ্রলোককে নিয়েই আমাদের এবারের তদন্ত। ভদ্রলোকের নাম ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য। এঁরই লেখা নাটক, গানও এঁর লেখা, অর্থাৎ নিজেই গীতিকার—আর ইনি নিজেই অর্কেস্ট্রায় বেহালা বাজান। মোট কথা গুণী লোক। তাঁকে নিয়ে যে গোলমালটা হল সেটা অবিশ্যি খুবই প্যাঁচালো ব্যাপার, আর ফেলুদাকে তার বুদ্ধির শেষ কণাটুকু খরচ করে এই রহস্যের সমাধান করতে হয়েছিল।

আমরা যাত্রার দেখবার দিন দশেক পরেই একদিন টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ইন্দ্রনারায়ণবাবু নিজেই আমাদের বাড়িতে এলেন তাঁর সমস্যাটা নিয়ে। দিনটা রবিবার। লালমোহনবাবু যথারীতি ন-টার মধ্যেই আড্ডা মারতে চলে এসেছেন, দশটা নাগাত ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। যাকে বলে ক্লিন শেভ্‌ন চেহারা, বয়স আন্দাজ চল্লিশ-বেয়াল্লিশ, রং ফরসা। হাইট মাঝারির চেয়ে একটু বেশি, মাথার চুল প্রায় সবই কাঁচা। ফেলুদা প্রথমেই সূর্যতোরণের প্রশংসা করে বলল, 'আপনি তো মশাই ম্যান অফ মেনি পার্টস; এত রকম শিখলেন কী করে?'

ভদ্রলোক হালকা হেসে বললেন, 'আমার লাইফ হিস্ট্রিটা একটু বেয়াড়া ধরনের। আমার ফ্যামিলির কথা জানলে পরে বুঝবেন যে আমার যাত্রার সঙ্গে কানেকশনটা কত অস্বাভাবিক। আপনি কি ঘোসপুকুরের আচার্য পরিবারের কথা জানেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' ফেলুদা বলল, 'সে তো অতি নামকরা ফ্যামিলি মশাই। আপনাদেরই এক পূর্বপুরুষ ছিলেন না কন্দর্পনারায়ণ আচার্য? যিনি বিলেতে গিয়ে প্রিন্স দ্বারকানাথের মতো নবাবি মেজাজে থাকতেন?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বললেন ইন্দ্রনারায়ণবাবু। 'কন্দর্পনারায়ণ ছিলেন আমার ঠাকুরদার বাবা। আঠারো শো পঁচাত্তরে বিলেত যান। অত্যন্ত সৌখিন লোক ছিলেন। গান-বাজনার শখ ছিল। তাঁর কিনে আনা বেহালাই আমি বাজাই। আমাদের পরিবারে এক আমার মেজো দাদা হরিনারায়ণ ছাড়া গান-বাজনার দিকে আর কেউ যায়নি। সে অবিশ্যি কিছু বাজায়-টাজায় না; তার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শখ। সে রেকর্ড আর ক্যাসেট শোনে। যাই হোক, পরিবার যে খানদানি সে তো বুঝতেই পারছেন। আমরা তিন ভাই—আমি, হরিনারায়ণ আর দেবনারায়ণ। আমি ছোট, দেবনারায়ণ বড়। দেব ব্যবসায়ী আর হরি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমাদের বাবা বেঁচে আছেন। নাম কীর্তিনারায়ণ, বয়স ঊনআশি। উনি ব্যারিস্টার, যদিও এখন আর কোর্ট-কাছারি করার সামর্থ্য নেই। বুঝতেই পারছেন, এই অবস্থায় আমার যাত্রার সঙ্গে যোগটা কত অস্বাভাবিক। কিন্তু আমার ছেলেবেলা থেকেই ওই দিকে শখ। আই. এ. পাশ করে আর পড়িনি। বেহালা শিখেছি মাস্টার রেখে, গান করতাম, গান শিখতাম খুব কম বয়স থেকেই। বাবাকে সোজাসুজি বলি যে আমি যাত্রায় জয়েন করব। বাবার আবার কেন জানি আমার উপর একটা দুর্বলতা ছিল, তাই আমার আবদারটা মেনে নিলেন। এখন অবিশ্যি আমি আমার অন্য দু ভাইয়ের চেয়ে কম কিছু রোজগার করি না। যাত্রার আর্থিক সচ্ছলতার কথাটা জানেন তো?'

'তা আর জানি না,' বললেন লালমোহনবাবু। 'হিরো-হিরোইন মাইনে পায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা করে।'

'আমার নিজের কথাটা নিজেই বলছি বলে কিছু মনে করবেন না,' বললেন ইন্দ্রনারায়ণবাবু, 'কিন্তু আজ ভারত অপেরার যে এই

নাম-ডাক সেটা প্রায় অনেকটাই আমার জন্য। আমার নাটক, আমার গান, আমার বাজনা—এগুলো ভারত অপেরার বড় অ্যাট্রাকশন, এবং আমার গোলমালটাও এর থেকেই।'

কথাটা বলে ভদ্রলোক থামলেন। তার একটা কারণ অবিশ্যি শ্রীনাথ চা এনেছে সেই। ফেলুদা বলল, 'আপনি কি অন্য দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন। আমাকে বেশি টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা তো অনেক দিন থেকেই চলছে। টাকা জিনিসটাকে তো আর অগ্রাহ্য করা চলে না, তবে ভারত অপেরার সঙ্গে আমি আছি আজ সতেরো বছর ধরে। এরা আমাকে যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করে, আমার গুণের মর্যাদা দেয়। কাজেই এ দল ছেড়ে অন্য দলে যাবার আগে অনেকবার ভাবতে হয়। আমি তাই এদের সবাইকে ঠেকিয়ে রেখেছি। কিন্তু সেদিন যেটা হল এবং যেটার জন্য আমি আপনার কাছে আসতে বাধ্য হলাম—সেটা হল আমাকে হটিয়ে ভারত অপেরাকে পঙ্গু করার চেষ্টা।'

'হটিয়ে মানে?'

'সোজা কথায় খুন করে।'

'এটার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ একেবারে শারীরিক আক্রমণ। তিন দিন আগের ঘটনা। এখনও কাঁধে ব্যথা রয়েছে।

'কোথায় হল আক্রমণটা?'

'বিডন স্ট্রিট থেকে বেরিয়েছে মহম্মদ শফি লেন। সেখানে একটা বাড়িতে আমাদের আপিস আর রিহার্সালের ঘর। গলিটা অন্ধকার এবং নিরিবিলি। সেদিন আবার ছিল লোডশেডিং। তিনি অফ। আমি যাচ্ছি আপিসে, এমন সময় পিছন থেকে এসে মারল রড জাতীয় একটা কিছু দিয়ে। মাথায় এমন মারতে চেয়েছিল বোধহয়; অল্পের জন্য পারেনি। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় আমাদের দলের দু জন অভিনেতা আসছিল গলি দিয়ে আপিসেই। আমি তখন মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি। তারা আমাকে তুলে আপিসে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে। আমার হাতে বাক্সে বেহালা ছিল, সেটা পড়ে যায় রাস্তায়। আমার

সবচেয়ে ভয় ছিল সেটার বুঝি কোনও ক্ষতি হয়েছে—কিন্তু দেখলাম তা হয়নি। এখন, আমি আপনার কাছে এসেছি আমার কী করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ নিতে।'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'এই অবস্থায় তো আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। আর যে লোক আপনাকে আক্রমণ করেছে সে যে বিরুদ্ধ পার্টির লোক এমনও ভাবার কোনও কারণ দেখছি না। সে সাধারণ চোর-ছ্যাঁচোড় হতে পারে—হয়তো আপনার মানিব্যাগ হাতানোর তালে ছিল। আপনি বরং পুলিশে খবর দিতে পারেন। এর বেশি আর আমার দিক থেকে কিছু বলা সম্ভব নয়, মি. আচার্য। তবে আর যদি কোনও ঘটনা ঘটে তাহলে আপনি আমাকে জানাবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশ আপনাকে আরও বেশি সাহায্য করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এটুকু বলতে পারি যে আপনার পারিবারিক ইতিহাস আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগল। এ রকম পরিবার থেকে কেউ কোনওদিন যাত্রায় যোগ দিয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

'আমাকে বলা হত আচার্য ফ্যামিলির ব্ল্যাক শিপ', বললেন ইন্দ্রনারায়ণবাবু, 'অন্তত আমার ভাইরা তাই বলতেন।'

ইন্দ্রনারায়ণবাবু আর বসলেন না। উনি চলে যাবার পর ফেলুদা দুটো ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলল, 'ভাবতে অবাক লাগে যে মাত্র একশো বছর আগে এই আচার্য ফ্যামিলির কন্দর্পনারায়ণ বিলেত গিয়ে চুটিয়ে নবাবি করেছে, আর আজ সেই ফ্যামিলিরই ছেলে মহম্মদ শফি সেজে যাত্রার রিহার্সাল দিতে গিয়ে গুণ্ডার হাতে রদ্দার বাড়ি খাচ্ছে। মাত্র তিন জেনারেশনে এই পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না।'

'অবিশ্যি পরিবর্তনটা হয়েছে শুধু এঁরই ক্ষেত্রে,' বললেন লালমোহনবাবু। 'অন্য ভাইদের কথা যা শুনলুম তাতে তো মনে হয় তাঁরা দিব্যি আচার্য ফ্যামিলির ট্র্যাডিশন চালিয়ে যাচ্ছেন।'

'যাই হোক', বলল ফেলুদা, 'ফ্যামিলিটাকে ইন্টারেস্টিং লাগছে। বোসপুকুরে একবার গিয়ে পড়তে পারলে মন্দ হত না।'

সেই বোসপুকুরের আচার্য বাড়িতে যাবার সুযোগ যে কয়েকদিনের মধ্যেই এসে পড়বে তা কে জানত?

॥ ২ ॥

ইন্দ্রনারায়ণের কথা

'সম্রাট অশোক' আর দু দিনে শেষ হয়ে যাবে। সে দিক দিয়ে ইন্দ্রনারায়ণের চিন্তা করার কিছু নেই। সত্যি বলতে কি, নাটক আরও চারখানা আগেই তৈরি হয়ে আছে, যদিও সে কথা ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর যাত্রা দলের মালিককে এখনও বলেননি। সব নাটক সব সময় চলে না; দর্শকের রুচি আশ্চর্য রকম বদলায় বছরে বছরে। হাওয়া বুঝে নাটক লিখতে হয়, না হলে ভাল নাটকও অনেক সময় মার খেয়ে যায়। সে বিচারে সম্রাট অশোক এখন খুবই যুগোপযোগী নাটক।

আসলে দুশ্চিন্তার কারণ অন্য। এখন বেজেছে রাত দশটা। আর কিছুক্ষণ পরেই বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার অশ্বিনী ভড় আসবেন ইন্দ্রনারায়ণের কাছে। এই নিয়ে পাঁচবার হবে তাঁর আসা। এ ছাড়া নব নট্ট কোম্পানির লোকও এসেছে তাঁর কাছে; কিন্তু বীণাপাণির মতো জোর তাদের নেই। আসার কারণ একটাই; ভারত অপেরা থেকে ভাঙিয়ে নিতে চায় তারা ইন্দ্রনারায়ণকে। সতেরো বছর যাত্রার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ইন্দ্রনারায়ণ। এখন তাঁর বয়স বেয়াল্লিশ। এই যাওয়া-যাওয়ির ব্যাপারটা সম্পর্কে এতদিন তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না; এখন হয়েছেন। অবিশ্যি এর জন্য তাঁর খ্যাতিই দায়ী। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ। তাই আজ সব দল তাঁকে হাত করতে চায়। বিশেষ করে বীণাপাণি অপেরা।

সেদিনের আক্রমণটা অবিশ্যি এই রেষারেষির সঙ্গে যুক্ত নাও হতে পারে। প্রদোষবাবু ঠিকই বলেছিলেন। এটা খুব সম্ভবত চোর-ছ্যাঁচড়ের ব্যাপার। মাথায় বাড়ি মারতে চাইলে কি মারতে পারত না? আসলে সে উদ্দেশ্য ছিল না; ছিল অজ্ঞান করে পকেট থেকে মানিব্যাগটি নিয়ে পালানো। সেদিন সঙ্গে টাকাও ছিল দেড়শোর উপর। ভাগ্যিস মলয় আর ইন্দ্রজিৎ এসে পড়ল! খুব বাঁচন বেঁচেছেন ইন্দ্রনারায়ণ।

সন্তোষ বেয়ারা এসে স্লিপ দিল। অশ্বিনী ভড়।

'যাও, ডেকে আন', বললেন ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য।

অশ্বিনী ভড় এসে চেয়ার টেনে নিয়ে পাশেই বসে বললেন, 'বলুন।'

'আপনি বলুন', বললেন ইন্দ্রনারায়ণ।

'আমি আর নতুন কথা কী বলব ইন্দ্রবাবু। আমি তো এই নিয়ে পাঁচবার এলুম। এবার তো একটা এসপার ওসপার না করলেই নয়।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু আমি যে মনস্থির করে উঠতে পারছি না অশ্বিনীবাবু। এত দিনের একটা সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়া তো মুখের কথা নয়।'

'সবই বুঝলুম, কিন্তু আর্টিস্টরা তো ঘর বদল করছে। নিউ অপেরায় দশ বছর থাকার পর ভারতে চলে গেলেন সঞ্জয়কুমার। এ তো হামেশাই হচ্ছে। আর টাকার অঙ্কটা অগ্রাহ্য করছেন কি করে? আপনি কত পাচ্ছেন ভারত অপেরায় সে তো আমরা জানি। পনেরো হাজার। আমরা সেখানে বলছি বিশ। এক বছরে আপনার ইনকাম হবে আড়াই লাখ। আর খাতির যত্ন আপনাকে আমরা ওদের চেয়ে কিছু কম করব না। গুণের কদর আমরাও করি। বিজ্ঞাপনে আপনার নাম থাকবে মোটা হরফে। আপনি যা বলবেন তাই আমরা মেনে নেব—নেহাত যদি সাধ্যের বাইরে না হয়।'

'শুনুন অশ্বিনীবাবু। আমার আর দু-তিন দিন লাগবে এই নাটকটা শেষ করতে। আমি এখন আর কিছু ভাবতে পারছি না। আপনি সামনের সপ্তাহে আর একটিবার আসুন।'

'ভরসা দিচ্ছেন কিছুটা?'

'একেবারে নিরাশ করার ইচ্ছে থাকলে আর আপনাকে আসতে বলব কেন? তবে আমার দিকটাও আপনার চিন্তা করে দেখতে হবে। টাকাটাই যে সব সময় সব থেকে বড় জিনিস তা তো নয়। ভারত অপেরা যদি জানে যে আপনারা আমাকে বিশ অফার করছেন, তাহলে আমার বিশ্বাস তারাও আমাকে ওই টাকাই দিতে চাইবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—এত বছরের সম্পর্ক কি চট করে ভোলা যায়?'

'ঠিক আছে। তাহলে তো এখন আর কথা বলে লাভ নেই। দিন সাতেক পরে এলে আশা করি ফল হবে। এভাবে ঝুলিয়ে রাখাটাও কোনও কাজের কথা নয়, ইন্দ্রবাবু। আসি। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

ইন্দ্রনারায়ণ ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের দরজার দিকে কিছু দূর এগিয়ে দিলেন অশ্বিনীবাবুকে। তারপর নিজের কাজের ঘরে ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসলেন। শেষ দৃশ্যটা ভালই যাচ্ছে। এভাবে একেবারে শেষ পর্যন্ত গেলে এ নাটককে কেউ রুখতে পারবে না। এটা হবে ইন্দ্রনারায়ণ আচার্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।

ইন্দ্রনারায়ণ এক মনে কাজ করে চলেছেন। মাঝে মাঝে দু-একটা শ্যামা পোকা আসছে। সামনে পুজো। এই পোকাই তাঁর কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে। আর লোডশেডিং। তবে আজ কদিন থেকে লোডশেডিং হচ্ছে না। আশা করি সামনের দুটো দিনও হবে না।

ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর পুরো মনোযোগটা লেখায় দিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ নাটক। সম্রাট অশোক।

কিন্তু কাজ বেশি দূর এগোতে পারল না। ইন্দ্রনারায়ণ টেরও পেলেন না যে একটি লোক ঘরে ঢুকে অতি সন্তর্পণে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তারপর হামানদিস্তার একটি মোক্ষম বাড়ি। আর ইন্দ্রনারায়ণের চোখের সামনে সব কিছু চিরতরে অন্ধকার হয়ে গেল।

॥ ৩ ॥

খবরের কাগজ খুলে চমকে উঠলাম।

ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য তাঁর বাড়িতে খুন হয়েছেন। গত পরশু রাত্রে হয়েছে ঘটনাটা। খবরে যাত্রায় ইন্দ্রনারায়ণের ভূমিকা সম্বন্ধেও কয়েক লাইন লিখেছে। আশ্চর্য দশ দিনও হয়নি ভদ্রলোক আমাদের বাড়ি এসেছিলেন ফেলুদার সঙ্গে দেখা করতে।

ফেলুদা অবিশ্যি আমার আগেই খবরটা পড়েছে। আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'লোকটা এল আমার কাছে, অথচ কিছু করতে পারলাম না ওর জন্য। অবিশ্যি করার কোনও উপায়ও ছিল না।'

আমার একটা ব্যাপারে খটকা লাগছিল। বললাম, 'প্রথমবার

ভদ্রলোককে গলিতে অ্যাটাক করেছিল, আর এবার একেবারে বাড়ির ভিতর এসে খুন করল। খুব ডেয়ারিং খুনী বলতে হবে।'

ফেলুদা বলল, 'সেটা ওঁর বাড়ির প্ল্যান, ভদ্রলোক কোন ঘরে থাকতেন, ইত্যাদি না দেখে বলা যাবে না। আর খুন করার তেমন তাগিদ থাকলে বাড়িতে এসে করবে না কেন?'

'কিন্তু এবার তো আর তোমাকে তদন্তের জন্য ডাকল না।'

'এবারে পুলিশকেই ডেকেছে বোঝা যাচ্ছে। তবে ও পাড়ার থানার দারোগা মণিলাল পোদ্দারকে তো বেশ ভাল করে চিনি। এক যদি তিনি যদি কোনও খবর দেন।'

মণিলাল পোদ্দারকে আমিও একবার দেখেছি। মোটাসোটা হুঁকো ভদ্রলোক, ফেলুদাকে যেমন ঠাট্টাও করেন তেমনি শ্রদ্ধাও করেন।

তবে শেষ পর্যন্ত খবরটা এল দারোগার কাছ থেকে নয়; স্বয়ং আচার্য বাড়ির কর্তা ঊনআশি বছরের বুড়ো কীর্তিনারায়ণ ফেলুদাকে ডেকে পাঠালেন। খুনটা হবার তিন দিন পরে সকালে নটা নাগাত এক ভদ্রলোক এলেন আমাদের বাড়িতে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বেশ শার্প চেহারা, চোখে সোনার চশমা। অক্টোবর মাস হলেও বেশ গরম, ভদ্রলোক সোফায় বসে রুমাল বার করে ঘাম মুছে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মি. মিত্তির; বহুবার চেষ্টা করেও আপনার লাইন পেলাম না। আমি আসছি বোসপুকুরের আচার্য বাড়ি থেকে। আমায় পাঠিয়েছেন বাড়ির কর্তা কীর্তিনারায়ণবাবু। আমাদের বাড়িতে একটা খুন হয়েছে জানেন বোধহয়। সেই ব্যাপারে যদি আপনার সাহায্য পাওয়া যায়।'

'আপনার পরিচয়টা...?'

'এই দেখুন, আসল কথাটাই বলা হয়নি। আমার নাম প্রদ্যুম্ন মল্লিক। আমি ও বাড়িতে থেকে বংশের আদিপুরুষ কন্দর্পনারায়ণের একটা জীবনী লিখছি। লেখাই আমার পেশা। একটা খবরের কাগজে চাকরি করতাম, এখন ছেড়ে দিয়েছি। আপাতত জীবনীর জন্য তথ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তিনারায়ণের সেক্রেটারির কাজ করছি। উনি ব্যারিস্টার ছিলেন; রিটায়ার করেছেন বছর চারেক হল। ওঁর শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।'

'আমাকে ডাকতে এসেছেন—পুলিশে খবর দেওয়া হয়নি?'

'পুলিশ যা করার করছে, কিন্তু কীর্তিনারায়ণের পছন্দ-অপছন্দ একটু গতানুগতিকের বাইরে। পুলিশকে ডেকেছে ওঁর ছেলেরা। উনি নিজে আপনার কথা বললেন। বললেন পুলিশের চেয়ে একজন ভাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করলে কাজ হবে বেশি। উনি আবার গোয়েন্দা কাহিনীর বিশেষ ভক্ত। আপনার যা পারিশ্রমিক তাও উনি দিতে রাজি আছেন অবশ্যই।'

'ইতিমধ্যে খুন সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য পাওয়া গেছে?'

'বিশেষ কিছুই না। খুনটা মাথার পিছন দিকে বাড়ি মেরে করা হয়। ইন্দ্রনারায়ণ তখন টেবিলে বসে কাজ করছিলেন। পুলিশের ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন যে খুনটা হয় রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে। ইন্দ্রনারায়ণের ঘর ছিল বাড়ির এক তলায়। একটা শোবার ঘর আর তার পাশে একটা কাজের ঘর। উনি অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। উনি যে যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে খবর জানেন বোধহয়?'

ফেলুদা এবার মি. মল্লিককে বলে দিল যে ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য তার কাছে এসেছিলেন, তাই আচার্য পরিবার সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সে জানে।

'তাহলে তো ভালই হল,' বললেন প্রদ্যুম্ন মল্লিক। 'খুনের রাত্রে দশটার সময় ইন্দ্রনারায়ণের কাছে বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার আসেন দেখা করতে। পুলিশ অবিশ্যি তাঁকে জেরা করছে, কারণ বাড়ির চাকর সন্তোষ বেয়ারা তার জবানিতে বলে যে, ইন্দ্রনারায়ণ আর ওই ভদ্রলোকের মধ্যে বচসা হচ্ছিল সেটা সে শুনতে পায়। কিন্তু বীণাপাণি অপেরার ভদ্রলোক—নাম বোধহয় অশ্বিনীবাবু—এগারোটার মধ্যে চলে যান। তারপর আবার আসেন কিনা জানা যায়নি, কারণ বাড়ির পিছন দিকে একটা দরজা আছে সেটা চাকররা বন্ধ করে অনেক রাত্রে। রাতের কাজের পর চাকরগুলো পাড়ায় আড্ডা দিতে বেরোয়, ফেরে একটার কাছাকাছি। কাজেই বারোটা নাগাত যদি অশ্বিনীবাবু আবার ফিরে এসে থাকেন তাহলে সে খবর কেউ নাও জানতে পারে। যাই হোক, সে তো আপনি গিয়ে তদন্ত করবেনই।

অবিশ্যি যদি আপনি তদন্তের ভার নিতে রাজি থাকেন। যদি তাই হয় তাহলে আজ সকালেই এগারোটা নাগাত আপনি আসতে পারেন। তখন কীর্তিনারায়ণ ফ্রি থাকেন।'

ফেলুদা রাজি হবে জানতাম, কারণ আচার্য পরিবার সম্বন্ধে ওর একটা কৌতূহল আগে থেকেই ছিল। তা ছাড়া ইন্দ্রনারায়ণবাবুর সঙ্গে কথা বলেও ওর বেশ ভাল লেগেছিল। ঠিক হল আমরা এগারোটার সময় বোসপুকুরে গিয়ে হাজির হব। প্রদ্যুম্নবাবু আরেকবার ঘাম মুছে বিদায় নিলেন।

'ওই কাজগটা কী বেরিয়ে পড়ল দেখ তো,' ফেলুদা বলল ভদ্রলোক চলে যাবার পর।

একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ সোফার কোণে পড়ে আছে, আমি সেটা তুলে ফেলুদাকে দিলাম। ভাঁজ খুলতে দেখা গেল ডট পেনে দু লাইন ইংরিজি লেখা—

HAPPY BIRTHDAY
HUKUM CHAND

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখে বলল, 'হুকুম চাঁদ নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কথাটা বোধহয় জন্মদিনের কেকের উপর লেখা হবে। হুকুম চাঁদ সম্ভবত কীর্তিনারায়ণের বন্ধু। কিম্বা হয়তো টেলিগ্রাম পাঠানো হবে; মল্লিকের উপর ভার ছিল কাজটা করবার।'

ফেলুদা কাগজটাকে আবার ভাঁজ করে নিজের শার্টের বুক পকেটে রেখে দিল।

'এবার কর্তব্য হচ্ছে তৃতীয় মাস্কেটিয়ারকে ফোন করা। তাঁর যান ছাড়া তো আমাদের গতি নেই, এবং তাঁকে বাদ দিলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন বলে মনে হয় না।'

লালমোহনবাবুকে ফোন করার এক ঘণ্টার মধ্যেই ভদ্রলোক স্নান করে ফিটফাট হয়ে নিজের সবুজ অ্যাম্বাসাডর নিয়ে চলে এলেন। সব শুনেটুনে বললেন, 'এবারে পুজোটা তার মানে রহস্যের জট ছাড়াতেই কেটে যাবে। তা এক হিসেবে ভাল। উপন্যাসটা লেখা হয়ে গেলে পর হাতটা বড্ড খালি খালি লাগে। এতে সময়টা দিব্যি কেটে যাবে। ভাল

কথা, আমার পড়শি রোহিণীবাবু সে দিন বলছিলেন ওঁর নাকি ঘোসপুকুরে আচার্যদের সঙ্গে চেনাশুনা আছে। বললেন, "এমন পরিবার দেখবেন না মশাই; বাপ-ছেলেয় মিল নেই, ভাইয়ে-ভাইয়ে মিল নেই, তাও একান্নবর্তী হয়ে বসে আছে। সে বাড়িতে যে খুন হবে সেটা আশ্চর্যের কিছুই নয়।"'

আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু যে গাড়িটার যত্ন নেন সেটা গাড়ির কন্ডিশন দেখলেই বোঝা যায়। ভদ্রলোক ফেলুদার ভীষণ ভক্ত।

এগারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে ঘোসপুকুর রোডে আচার্যদের বাড়ির পোর্টিকোর নীচে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল আমাদের অ্যাম্বাসাডর। কলিং বেল টিপতে চাকর এসে দরজা খুলে দিতেই দেখি পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন প্রদ্যুম্ন মল্লিক। বললেন, 'গাড়ির আওয়াজ শুনেই বুঝেছি আপনি এসেছেন। আমিও থাকি একতলাতেই। আসুন দোতলায় একেবারে বড় কর্তার কাছে।'

পেল্লায় বাড়ি, নিশ্চয়ই সেই কন্দর্পনারায়ণের তৈরি, কিম্বা তারও আগে হতে পারে, কারণ দেখে মনে হয় বয়স হবে অন্তত দেড়শো বছর। চওড়া কাঠের সিঁড়িতে শব্দ তুলে আমরা দোতলায় গিয়ে পৌঁছলাম। সিঁড়ির পাশের দেয়ালে আচার্যদের পূর্বপুরুষদের বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং; সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে একটা প্রকাণ্ড শ্বেতপাথরের মূর্তি, এদিকে ওদিকে ছড়ানো নানান সাইজের ফুলদানি তার বেশির ভাগই চীনে বলে মনে হল। একটা বিশাল দাঁড়ানো ঘড়িও রয়েছে সিঁড়ির সামনের বারান্দায়। বারান্দার এক পাশে দাঁড়ালে নীচে নাটমন্দির দেখা যায়, অন্য পাশে সারবাঁধা ঘর। এরই একটা ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে ঢোকালেন প্রদ্যুম্ন মল্লিক। দেখলাম এটা একটা মাঝারি সাইজের বৈঠকখানা; চারিদিকে সোফা বিছানো, মাটিতে কার্পেট, মাথার উপর দু দিকে দুটো ঝাড় লণ্ঠন। আমি আর লালমোহনবাবু একটা সোফায় বসলাম। ফেলুদা কিছুক্ষণ পায়চারি করে জিনিসপত্র দেখে আর একটা ছোট সোফায় বসল। মল্লিক মশাই গেছেন কীর্তিনারায়ণকে ডাকতে।

দু মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লেন বাড়ির কর্তা কীর্তিনারায়ণ

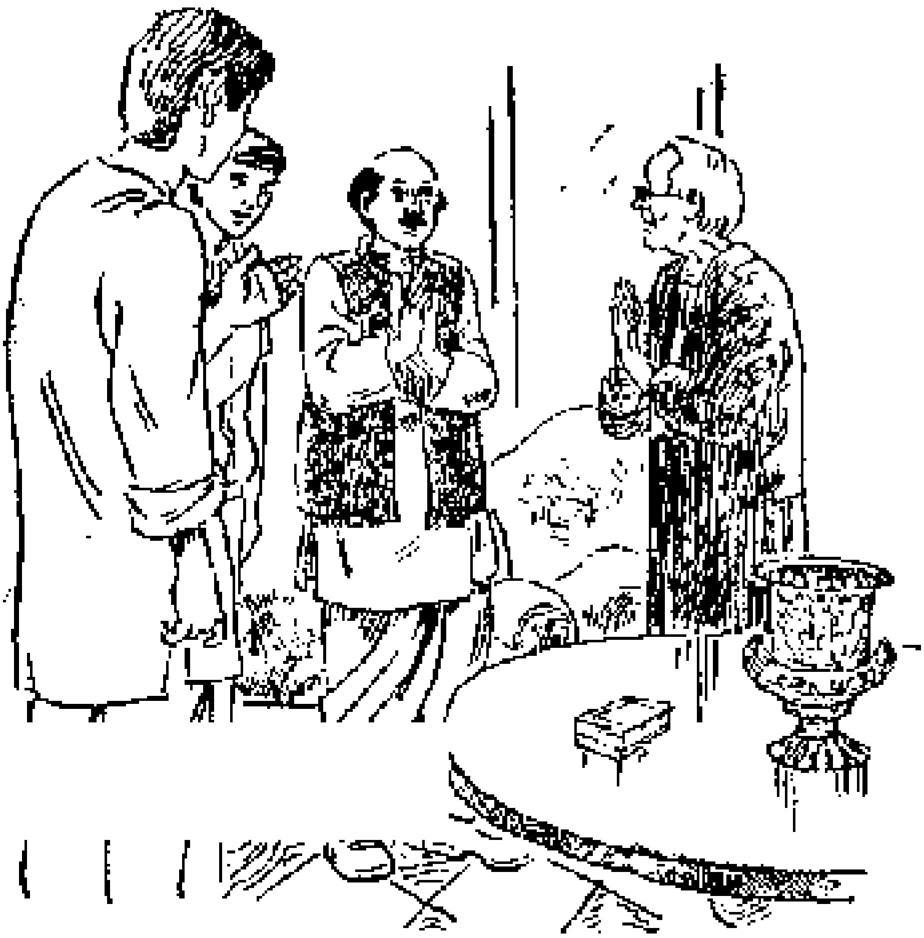

আচার্য। ধপধপে ফরসা রং, দাড়ি গোঁফ কামানো, চুল অধিকাংশই পাকা। তবে উনআশিতেও যে কিছু কাঁচা অবশিষ্ট রয়েছে সেটাই আশ্চর্য। ছোটখাটো মানুষ কিন্তু এমন একটা পার্সোন্যালিটি আছে যে তাঁর দিকে চোখ যাবেই, এবং গিয়ে থেমে থাকবে। দেখে মনে হয় ব্যারিস্টার হিসেবে ইনি নিশ্চয়ই খুব পাকা ছিলেন। ভদ্রলোকের পরনে সিল্কের পায়জামা, পাঞ্জাবি আর বেগুনি রঙের ড্রেসিং গাউন। চোখে যে চশমাটা রয়েছে সেটা হল যাকে বলে হাফ গ্লাস, অর্থাৎ নীচের দিকে পড়ার জন্য অর্ধেক লেন্স আর উপর দিকটা ফাঁকা।

'কই, কিনি গোয়েন্দা মশাই?'

ফেলুদা নিজের, এবং সেই সঙ্গে আমাদের দু জনের পরিচয় দিয়ে দিল। লালমোহনবাবুর পরিচয় পেয়ে কীর্তিনারায়ণ চোখ কপালে তুললেন। 'কই, আপনার লেখা কোনও রহস্য গল্প তো কোনওদিন পড়িনি।'

লালমোহনবাবু ভীষণ বিনয় করে বললেন, 'আজ্ঞে সে সব আপনার পড়ার মতো কিছুই না।'

'তবু, রহস্য গল্প যখন লেখেন তখন আপনার মধ্যেও একটি গোয়েন্দা নিশ্চয়ই বর্তমান। দেখুন, আপনারা দু জনে মিলে এই রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারেন কিনা। ইন্দ্র ছিল আমার ছোট ছেলে। যা হয়, কনিষ্ঠ সন্তান অনেক সময়ই একটু নেগ্‌লেক্‌টেড হয়। ওর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল, কিন্তু তার জন্য ও কোনওদিন অভিযোগ করেনি বা কুপথে যায়নি। গান-বাজনা ভালবাসত, পড়াশুনা যখন হল না তখন ভাবলুম ওদিকেই যাক। ছোট বয়স থেকেই গান লিখত, নাটক লিখত, বেহালা বাজাত। বাড়িতে বেহালা ছিল ঠাকুরদাদার আনা বিলেত থেকে, "আম আঁটির ভেঁপু"—'

'আম আঁটির ভেঁপু?' ফেলুদা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

'ওই রকমই রসিকতা ছিল ঠাকুরদার,' বললেন কীর্তিনারায়ণ, 'বেহালাকে বলতেন আম আঁটির ভেঁপু, প্রথম প্যাকার্ড মোটর গাড়ি যখন কিনলেন তখন সেটাকে বলতেন পুষ্পক রথ, গ্রামোফোন রেকর্ডকে বলতেন সুদর্শন চক্র—এই আর কি। ঠাকুরদাদার কথা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে কি, ইন্দ্রর এই ভাবে জীবন শেষ হয়ে যাওয়াতে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছি। যাত্রায় যোগ দেওয়াটা আচার্য বাড়ির ছেলের পক্ষে কিছু গৌরবের নয় ঠিকই, কিন্তু শেষের দিকে সে মাইনে পেত পনেরো হাজার টাকা; এটাও তো দেখতে হবে। তার মধ্যে গুণ না থাকলে এটা কি হয়? আমি নিজে যাত্রা থিয়েটারের খুব ভক্ত ছিলাম। এক রকম নেশা ছিল বলতে পার। সেখানে আমার নিজের ছেলে সে লাইনে গেলে নাক সিঁটকোলে চলবে কেন? না, ইন্দ্রকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলাম। আর সে সেটার সদ্ব্যবহার করে পুরোপুরি। যাত্রার কাজ করেও তার মধ্যে কোনও বদ খেয়াল দেখা দেয়নি। কাজ-পাগলা মানুষ ছিল সে। বেহালায় হাত ছিল চমৎকার, গান লিখত রীতিমত ভাল। আমার মতে আচার্য বংশের সে কোনও রকম অসম্মান করেনি; বরং একদিক দিয়ে দেখলে মুখ উজ্জ্বলই করেছে।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কি জানেন যে দিন পনেরো আগে মহম্মদ

শক্তি লেনে তাঁকে একজন এসে পিছন থেকে আঘাত করে, এবং সে আঘাত কাঁধে না পড়ে মাথায় পড়লে তিনি হয়তো তখনই মারা যেতেন?'

'তা জানি বইকী,' বললেন কীর্তিনারায়ণ। 'আমিই তো তাকে তোমার পরামর্শ নিতে বলি।'

'এবার যে ঘটনাটা ঘটল, আপনার মতে কি তার জন্যও এই যাত্রার দলগুলির মধ্যে রেষারেষিই দায়ী?'

'সে তো আমি বলতে পারব না। সেটা বার করার দায়িত্ব তোমার। তবে এটা বলতে পারি যে ইন্দ্রর শত্রু যদি থেকে থাকে তো সে যাত্রার দলেই হয়তো থাকবে। এমনিতে সে বিশেষ কারুর সঙ্গে মিশত না, আর সম্পূর্ণ নির্বিবাদী লোক ছিল। বললাম না, সে যে জিনিসটা জানত সেটা হল কাজ। কাজের বাইরে তার আর কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না।'

'পুলিশ তো বোধ হয় বাড়ির সকলকে জেরা করেছে?'

'তা তো করবেই। সেটা তো তাদের রুটিনের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু তারা করেছে বলে তুমি করতে পারবে না এমন কোনও কথা নেই। এখন অবিশ্যি তুমি আমার অন্য ছেলেদের পাবে না। সন্ধ্যায় এলে পাবে। প্রদ্যুম্ন এখন আছে, তাকে কিছু জিগ্যেস করতে চাইলে করতে পারো। চাকর-বেয়ারারা আছে। আমার এক বউমা আছেন, হরিনারায়ণের স্ত্রী। বড় ছেলে দেবনারায়ণ বিপত্নীক। হরিনারায়ণের মেয়ে লীনা আছে। সে খুব চালাক-চতুর। ইন্দ্রর খুব ন্যাওটা ছিল। ভাল কথা, তোমার ফি কত?'

'আমি আগাম হাজার টাকা নিই; তারপর তদন্ত ঠিক মতো শেষ হলে পর আরও হাজার নিই।'

'রহস্যের সমাধান না হলে আগামটা ফেরত দেওয়া হয়?'

'আজ্ঞে না, তা হয় না।'

'ভেরি গুড। আমি তোমাকে হাজার টাকার চেক লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দোহাই বাপু—আমি কোন দিন ফস করে চলে যাব—একে ডায়াবেটিস, তার উপর একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে—যাবার আগে ইন্দ্রের খুনির শাস্তি হয় এটা আমি দেখে যেতে চাই।'

'শুধু একটা প্রশ্ন করার বাকি আছে।'

'বলো।'

'হুকুম চাঁদ বলে কি আপনার বন্ধুস্থানীয় কেউ আছে?'

'হুকুম সিং বলে একজনকে চিনতাম, তা সে অনেকদিন আগে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ফেলুদা প্রদ্যুম্নবাবুর সঙ্গেই আগে কথা বলা স্থির করল। কীর্তিনারায়ণবাবু উঠে চলে যেতেই প্রদ্যুম্নবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোক প্রথম কথাই বললেন, 'দারোগা সাহেব একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'কে, মিস্টার পোদ্দার?'

'হ্যাঁ, উনি নীচে আছেন।'

আমরা তিনজন নীচে রওনা দিলাম। লালমোহনবাবু এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন, তবে বুঝতে পারছিলাম যে উনি সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। বিভিন্ন লোকে কী ভাবে কথা বলে সে দিকে নাকি লেখকদের দৃষ্টি রাখতে হয়, তা না হলে গল্পে ভাল ডায়ালগ লেখা যায় না। তা ছাড়া কিছুদিন আগেই লালমোহনবাবু একদিন আমাদের বাড়িতে আড্ডা মারতে মারতে বলেছিলেন, 'শোন ভাই তপেশ, তোমার দাদাকে কিন্তু আমরা তদন্তের ব্যাপারে যতটা সাহায্য করতে পারি ততটা করি না। এবার থেকে আমরাও চোখ-কান খোলা রাখব। শুধু দর্শকের ভূমিকা নেওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়—বিশেষ করে আমি নিজেই যখন গোয়েন্দা কাহিনী লিখি।'

মণিলাল পোদ্দার ফেলুদাকে দেখে একগাল হেসে বললেন, 'গন্ধে গন্ধে ঠিক এসে হাজির হয়েছেন দেখছি।'

ফেলুদা বলল, 'আমি তো ভাবলাম এসে দেখব আপনি বুঝি কেস খতম করে ফেলেছেন।'

'ব্যাপারটা তো মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছে', বললেন মণিলালবাবু, 'যাত্রা পার্টিদের মধ্যে রেষারেষি। ভিকটিম ভারত অপেরার স্তম্ভ বিশেষ, ওঁর জোরেই প্রায় নাটক চলত, অন্য দল তাঁকে ভাঙিয়ে নিতে চেষ্টা করছিল, পারেনি, তাই তাঁকে খুন করে ভারত অপেরাকে খোঁড়া করে দিয়েছে। অবিশ্যি চুরিরও একটা মোটিভ ছিল, কারণ ঘরে কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছিল। হয়তো ওঁর লেখা কোনও নতুন

নাটক খুঁজছিল।'

'আপনি ভারত অপেরার মালিকের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'শুধু ভারত অপেরা কেন? যে দিন খুনটা হয় সে দিন রাইভ্যাল কোম্পানি বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার এসেছিলেন ভিকটিমের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোকের নাম অশ্বিনী ভড়। অনেক প্রলোভন দেখান। বিশ হাজার টাকা মাইনে অফার করেন; কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ কোনও কমিট করেননি। ভারত অপেরার প্রতি ন্যাচারেলি ওঁর একটা লয়্যেলটি ছিল। অশ্বিনী ভড় চলে যান পৌনে এগারোটায়। খুনটা হয় বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে। বাড়ির পিছনের দরজা খোলা ছিল। চাকর বলে ইন্দ্রনারায়ণ তখনও কাজ করছিলেন, আর মাঝে মাঝে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। হয়তো গান লিখছিলেন। সেই সময় মার্ডারটা হয়। পিছন দিক থেকে এসে কোনও ভোঁতা ভারি অস্ত্র দিয়ে মাথায় মারে। তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। টেবিলে ঝুঁকে কাজ করছিলেন, এমনিতেই মারার সুবিধে।'

'অস্ত্রটা পাওয়া গেছে?'

'না। যে দিকটা ইন্দ্রনারায়ণ থাকতেন সে দিকটা নিরিবিলি। এক তলার ঘর। চাকর-বাকর খেয়ে দেয়ে আড্ডা মারতে গিয়েছিল। খাস বেয়ারা সন্তোষের আবার মদের নেশা, সে খাবার পরে মাল খেতে যায়, সাড়ে বারোটা একটায় এসে পিছনের দরজা বন্ধ করে। সদর দরজা অবিশ্যি সব সময়ই বন্ধ থাকে, আর বাইরে দারোয়ান আছে। বারোটার পর যদি কেউ পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকে তাহলে কেউ টের পাবে না। কারণ বাড়ির পিছনে গলি—যদু নস্কর লেন।'

'আমি যদি একবার ইন্দ্রনারায়ণের শোবার ঘর আর কাজের ঘরটা দেখি তাহলে আপনাদের আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তবে আমি যেমন আপনাকে ইনফরমেশন দিলাম, সেটা আপনার তরফ থেকেও পেলে দু পক্ষেরই সুবিধা—বুঝতেই তো পারছেন, হেঁ হেঁ।

॥ ৪ ॥

মণিলালবাবুর সঙ্গে কথা সেরে আমরা প্রদ্যুম্নবাবুর সঙ্গে গেলাম ইন্দ্রনারায়ণ আচার্যের ঘরে। ঘরটা এক তলার উত্তর-পশ্চিম কোণে। বাড়ির উত্তর দিকটা হচ্ছে সামনের দিক। মাঝখানে নাটমন্দির আর তাকে ঘিরে তিন দিকে বারান্দা আর সারি সারি ঘর। বাড়ির পিছনের দরজাটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, পশ্চিমের বারান্দার শেষ মাথায়। তার মানে কেউ দরজা দিয়ে ঢুকে বারান্দা পেরোলেই ইন্দ্রনারায়ণবাবুর শোবার ঘর পাবে সামনে। তারপর উত্তরের বারান্দা ধরে দশ পা গেলে ডাইনে পাবে ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাজের ঘরের দরজা। অর্থাৎ বাইরে থেকে একজন লোক এসে খুন করাটা খুবই সহজ ব্যাপার।

শোবার ঘরে খাট, একটা আলমারি, দুটো তাক আর কিছু ট্রাঙ্ক সুটকেস ছাড়া জিনিস বেশি নেই। আমরা কাজের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

এখানে বড় বড় দুটো তাক বোঝাই কাগজপত্র খাতা ইত্যাদিতে। বুঝলাম এগুলোতে নাটক আর গানের খসড়া রয়েছে। সতেরো বছরের যত কাগজ সবই মনে হল এই দুটো তাকে রয়েছে। বারান্দার দিকে যে দরজাটা রয়েছে সেটার ঠিক ডান পাশে একটা টেবিল আর চেয়ার। বোঝাই গেল এইখানেই খুনটা হয়েছিল। টেবিলের উপর ফাউন্টেন পেন, ডট পেন, পেনসিল, পেপার ওয়েট, কালি, টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি রয়েছে। আর যেটা রয়েছে সেটা হল একটা বেহালার কেস। ফেলুদা বলল, 'একবার আমাতির ভেঁপুর চেহারাটা দেখা যাক।'

বাক্স খুলে বেহালাটা দেখে বুঝলাম ইন্দ্রনারায়ণবাবু সেটার খুব যত্ন নিতেন। একশো বছরের পুরনো বেহালা এখনও প্রায় নতুনের মতো রয়েছে।

ফেলুদা কেসটা বন্ধ করে দিল।

এ ছাড়া ঘরে রয়েছে এক পাশে একটা সোফা, একটা চেয়ার আর শ্বেত পাথরের একটা ছোট তেপায়া টেবিল। দেয়ালে ছবির মধ্যে

রয়েছে দুটো বাঁধানো মানপত্র—ইন্দ্রনারায়ণের পাওয়া—একটা বিলিতি ল্যান্ডস্কেপ আর একটা রামকৃষ্ণ পরমহংসের মার্কামারা ছবি।

ঘর দেখা হলে সোফা আর চেয়ারে ভাগাভাগি করে বসলাম আমরা চারজন। প্রদ্যুম্নবাবু ইতিমধ্যে ঘোলের সরবতের জন্য বলেছিলেন, সেটা এনে চাকর শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর রাখল। সরবত খেতে খেতে কথা হল।

'আপনার ঘরটা কোথায়?' ফেলুদা প্রশ্ন করল প্রদ্যুম্নবাবুকে।

'টেরচা ভাবে এই ঘরের বিপরীত দিকে,' বললেন প্রদ্যুম্নবাবু, 'অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। একেবারে কোণের ঘরটা হল লাইব্রেরি, আর আমারটা হল তার পাশেই।'

'আপনি রাত্রে ঘুমোন কখন?'

'তা বেশ রাত হয়। এক-আধ দিন তো একটা দেড়টাও হয়ে যায়। আমার কাজটা—অর্থাৎ কন্দর্পনারায়ণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটা—আমি সাধারণত রাত্রেই করি। প্রথম দিকে আমার কাজ ছিল কীর্তিনারায়ণকে ইন্টারভিউ করা। তিনি বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর ঠাকুরদাদাকে দেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে সব তথ্য নেওয়া হলে পর আমি চিঠিপত্র দলিল ডায়রি ইত্যাদি স্টাডি করা শুরু করি।'

'তাহলে সে দিন যখন খুনটা হয় তখন আপনি জেগে ছিলেন?'

'তা তো বটেই। তবে নাটমন্দিরটা এত বড় যে আমার কাজের ঘর থেকে এ ঘরটা দেখাও যায় না, এখানকার কোনও শব্দ শোনাও যায় না।'

'বীণাপাণি অপেরা থেকে লোক এসেছিল ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাছে সে খবর জানা গেল কী ভাবে?'

'সেটা বলেছে সন্তোষ বেয়ারা। অশ্বিনী ভড় যে স্লিপটা পাঠিয়েছিলেন সেটাও টেবিলের উপর পাওয়া যায়। ভদ্রলোক কখন যান সে খবরও বেয়ারাই দেয়।'

'আপনি বেহালা শুনতে পাননি?'

'তা হয়তো এক-আধবার শুনেছি, কিন্তু সেটা প্রায় রোজই শুনতাম বলে বিশেষ করে সেই দিন শুনেছিলাম কিনা বলতে পারব না।'

'কন্দর্পনারায়ণ কি নিয়মিত ডায়রি লিখতেন?'

'পরের দিকে লেখেননি, কিন্তু পঁচিশ বছর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত লিখেছিলেন।'

'তার মানে বিলেত ভ্রমণের ডায়রিও আছে?'

'আছে বইকী, আর সে এক আশ্চর্য জিনিস। কত লর্ড আর ডিউক আর ব্যারনের সঙ্গে যে তিনি খানাপিনা করেছেন তা পড়লে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। লন্ডন থেকে কন্দর্পনারায়ণ ফ্রান্সে যান। সেখানে প্যারিসে কিছুদিন কাটিয়ে তিনি চলে যান ভূমধ্যসাগরের উপকূলে দক্ষিণ ফ্রান্সের রিভিয়েরাতে। আপনি তো জানেন এই অঞ্চলের কয়েকটি শহরের ক্যাসিনো হল জুয়াড়িদের তীর্থস্থান। কন্দর্পনারায়ণ মন্টি কার্লোর ক্যাসিনোতে রুলেট থেকে লাখ লাখ টাকা জেতেন। খুব কম বাঙালিই সে যুগে বিলেত গিয়ে এ রকম কীর্তি রেখে এসেছেন।'

'আচার্যদের জমিদারি কোথায় ছিল?'

'পূর্ববঙ্গে কান্তিপুরে। বিরাট জমিদারি।'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল। দুটো টান দিয়ে তারপর বলল, 'মৃতদেহ আবিষ্কার করে কে?'

'সেও সন্তোষ বেয়ারা। সে নিজে ফেরে প্রায় পৌনে একটায়। তারপর ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাজের ঘরে বাতি জ্বলছে দেখে একবার উঁকি দিতে এসে দেখে এই ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেয়। তারপর আমি দোতলায় গিয়ে অন্যদের জানাই।'

'পুলিশে খবর দেবার সিদ্ধান্ত কার?'

'দেবনারায়ণবাবুর। বড় কর্তা না করেছিলেন, কিন্তু দেবনারায়ণবাবু বাপের কথায় কান দেননি।'

'আপনার সঙ্গে ইন্দ্রনারায়ণবাবুর সম্পর্ক কী রকম ছিল?'

'দিব্যি ভাল। আমি ভদ্রলোককেও কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। বিশেষ করে তাঁর বেহালা সম্পর্কে। উনি বলেন যন্ত্রটা খুব ভাল এবং আওয়াজ অতি মিষ্টি। প্রায় সত্তর বছর ওটা না বাজানো অবস্থায় পড়েছিল, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ ওটা বার করে বাজাতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওটার আওয়াজ খুলে যায়।'

'ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

একেবারে কাজ-পাগলা মানুষ ছিলেন। কাজে ডুবে থাকতেন

যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন। লাইব্রেরি থেকে বই নিতে আসতেন মাঝে মাঝে। বিশেষ করে ঐতিহাসিক নাটক লেখার সময় বই দেখার দরকার হতই। কন্দর্পনারায়ণের ছেলে, কীর্তিনারায়ণের বাবা দর্পনারায়ণ ইতিহাসে এম. এ. ছিলেন। তাই লাইব্রেরিতে ইতিহাসের বই খুব ভালই আছে।'

'এবার অন্য দু ভাই সম্বন্ধে একটু জানতে চাই।'

'বেশ তো।'

'সবচেয়ে বড় তো দেবনারায়ণ। তারপর হরিনারায়ণ, তারপর ইন্দ্রনারায়ণ।'

'হ্যাঁ।'

'ইন্দ্রনারায়ণ তো বিয়েই করেননি। আর দেবনারায়ণ শুনলাম বিপত্নীক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বছর সাতেক আগে ওঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়।'

'ওঁর ছেলেপিলে নেই?'

'একটি মেয়ে আছে, তার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী পুনায় কাজ করে। ছেলে একটি আছে সে আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে।'

'আপনার মতে দেবনারায়ণ লোক কেমন?'

'অত্যন্ত চাপা, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।'

'উনি কি চাকরি করেন?'

'উনি স্টকওয়েল টি কোম্পানিতে উঁচু পোস্টে আছেন।'

'অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন কখন?'

'তা রাত সাড়ে নটার আগে তো নয়ই, কারণ অফিস থেকে ক্লাবে যান। সন্ধ্যাটা সেখানেই কাটান।'

'ভাইয়ের মৃত্যুতে কি উনি খুব শোক পেয়েছিলেন বলে মনে হয়?'

'তিন ভাইয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। বিশেষ করে ইন্দ্রনারায়ণ যাত্রার কাজ করেন বলে আমার ধারণা অন্য দু ভাই ওঁকে বেশ হেয় জ্ঞান করতেন।'

'কিন্তু কীর্তিনারায়ণ তো ছোট ছেলেকে বেশ ভালই বাসতেন।'

'শুধু ভালবাসতেন না, তিন ছেলের মধ্যে ছোটকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। এ-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই, কারণ অনেক

কথাতেই এই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেত।'

'কীর্তিনারায়ণ কি উইল করেছেন?'

'করেছেন বলেই তো আমার ধারণা।'

'সেই উইলেও তো এই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে।'

'তা তো পারেই।'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাল। লালমোহনবাবু তাঁর ছোট্ট লাল খাতাটা বার করে কী যে নোট লিখছেন তা উনি জানেন। হয়তো ভবিষ্যতের একটা গল্পের প্লট ওঁর মাথায় আসছে।

'এবার দ্বিতীয় ভাই সম্বন্ধে একটু জানা দরকার।'

'কী জানতে চান বলুন,' বললেন প্রদ্যুম্নবাবু।

'উনি তো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট?'

'হ্যাঁ। স্কিনার অ্যান্ড হার্ডউইক কোম্পানিতে আছেন।'

'কেমন লোক?'

'ওঁর তো ফ্যামিলি আছে, কাজেই সেখানেই বড় ভাইয়ের সঙ্গে একটা তফাত হয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক মোটামুটি ফুর্তিবাজ, বিলিতি গান বাজনার খুব ভক্ত।'

'রেকর্ড আর ক্যাসেট শোনেন?'

'হ্যাঁ, তবে সেটা রবিবারে। অন্যদিন সন্ধ্যায় ইনিও ক্লাবে যান, ফেরেন সেই সাড়ে নটা দশটায়।'

'কোন ক্লাব?'

'স্যাটারডে ক্লাব।'

'বড় ভাইও কি একই ক্লাবের মেম্বার নাকি?'

'না, উনি বেঙ্গল ক্লাবে।'

'হরিনারায়ণের তো একটি মেয়ে আছে।'

'হ্যাঁ—লীনা। বুদ্ধিমতী। বছর চোদ্দো বয়স, পিয়ানো শিখছে। ক্যালকাটা গার্লস স্কুলে পড়ে। সে বেচারি কাকার মৃত্যুতে খুব আঘাত পেয়েছে, কারণ সে কাকার খুব ভক্ত ছিল।'

'আর হরিনারায়ণবাবু? তিনি আঘাত পাননি?'

'বড় দু ভাইয়ের কেউই ছোটকে বিশেষ আমল দিতেন না।'

'আর হয়তো ইন্দ্রনারায়ণ যাত্রা থেকে এত রোজগার করছে সেটাও

তারা বিশেষ সুনজরে দেখত না।'

'তাও হতে পারে।'

'আমার অবিশ্যি এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সেটা বোধহয় শনি কি রবিবার করলে ভাল হয়, তাই না?'

'শনিবার সকালে এলে দু ভাইকেই পাবেন।'

'আপনি যে কন্দর্পনারায়ণের জীবনীর উপর কাজ করছেন, সেটা কতদিন থেকে?'

'তা প্রায় ছ-মাস হল।'

'হঠাৎ এই মতি হল কেন?'

'আমি উনবিংশ শতাব্দী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব বলে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনা করছিলাম। সেই সময় কন্দর্পনারায়ণের নাম পাই। খোঁজখবর নিয়ে জানি তাঁর বংশধরেরা এখনও আছেন ঘোসপুকুরে। সোজা এসে কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে দেখা করি। কীর্তিনারায়ণ বললেন—তুমি আমার বাড়িতে থেকে রিসার্চ করতে পার, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার কিছু কাজও করে দিতে হবে। তার জন্য আমি তোমাকে পারিশ্রমিক দেব। আমি তখন খবরের কাগজের কাজ ছেড়ে এখানে চলে আসি। এখানে অনেক ঘর খালি পড়ে আছে, তারই একটা ঘরে আমাকে এক তলায় থাকতে দেন কীর্তিনারায়ণ। গত ছ-মাসে আমি এ বাড়ির সঙ্গে বেশ মিশে গেছি। আমার কারবার অবিশ্যি শুধু কীর্তিনারায়ণকে নিয়েই, তবে অন্যরাও আমার ব্যাপারে কোনও আপত্তি করছেন বলে শুনিনি।'

'ভাল কথা—'

ফেলুদা তার পার্স থেকে এক টুকরো সাদা কাগজ বার করল।

'এটা বোধহয় সে দিন আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল—আপনি যখন ঘাম মুছতে রুমাল বার করেন। জন্মদিনের জন্য কেকের অর্ডার কি, নাকি টেলিগ্রাম?'

ফেলুদা 'হ্যাপি বার্থডে হুকুম চাঁদ' লেখা কাগজটা প্রদ্যুম্নবাবুর হাতে দিল। প্রদ্যুম্নবাবু ভুরু কপালে তুলে বললেন, 'কই, এমন তো কোনও কাগজ আমার পকেটে ছিল না। আর এই হুকুম চাঁদ যে কে সে তো আমি বুঝতেই পারছি না।'

'আপনি সে দিন কিসে করে আমার বাড়িতে এসেছিলেন?'

'বাস।'

'বাসে ভিড় ছিল? তার মধ্যে কেউ এটা পকেটে ফেলে দিতে পারে?'

'তা পারে, কিন্তু এটার তো কোনও মানেই আমি বুঝতে পারছি না।'

'এটা যদি আপনার না হয় তো আমার কাছেই থাকুক।'

ফেলুদা কাগজটা আবার পার্সে রেখে দিল। এই কাগজ যে একটা রহস্যের মধ্যে পড়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

॥ ৫ ॥

আমরা বোসপুকুর গিয়েছিলাম বিষ্যুদবার, আবার যেতে হবে শনিবার, কাজেই মাঝে শুক্কুরবারটা ফাঁক। সেই ফাঁকে দেখি লালমোহনবাবু আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। আসলে একটা তদন্ত যখন শুরু হয়ে যায় তখন আর নিয়ম মানা যায় না।

ভদ্রলোক এসেই ধপ করে সোফায় বসে বললেন, 'আপনার তো শুধু বোসপুকুর গেলে চলবে না মশাই—যাত্রা পার্টিগুলোতেও তো একবার যাওয়া দরকার।'

'সে আর বলতে,' বলল ফেলুদা। 'মৃত ব্যক্তির সমস্ত জীবনটাই তো যাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। আপনি যখন এসেই পড়েছেন তখন বাড়িতে বসে না গেঁজিয়ে চলুন মহম্মদ শফি লেনটা ঘুরে আসা যাক।'

'তারপর বীণাবাণি অপেরার ম্যানেজার সেই ঈশানবাবু না কী—'

'অশ্বিনীবাবু।'

'হ্যাঁ। অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে তো কথা বলতে হবে। তাই না?'

'নিশ্চয়ই। তোপ্‌সে, একবার ডিরেক্টরিতে দ্যাখ তো বীণাপাণি অপেরার ঠিকানাটা কী।'

ডিরেক্টরি দেখতে বেরোল বীণাপাণি অপেরা সুরেশ মল্লিক স্ট্রিটে। লালমোহনবাবু বললেন যে রাস্তাটা ওঁর জনা আছে। ওখানের একটা ব্যায়ামাগারে নাকি উনি কলেজে থাকতে রেগুলারলি যেতেন।

'বলেন কি!' বলল ফেলুদা।

'বিশ্বাস করুন। ডন বৈঠক বারবেল চেস্ট-এক্সপ্যান্ডার বাদ দিইনি। বডির ডেভেলপমেন্টও হয়েছিল ভালই; আমার হাইটে বেয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতি নেহাত নিন্দের নয়।'

'তা সে সব মাংসপেশী গেল কোথায়?'

'আর মশাই, লেখক হলে কি আর মাস্‌ল থাকে শরীরে? তখন সব মাস্‌ল গিয়ে জমা হয় ব্রেনে। তবে ভোরে হাঁটার অভ্যেসটা রেখেছি। ডেইলি টু মাইলস্‌। তাই তো আপনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারি।'

চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবুর খুব উৎসাহ। খুনের ব্যাপারটা কাগজে পড়েছেন, তা ছাড়া ভারত অপেরার অনেক যাত্রা ওঁর দেখা। আমরা সেই খুনেরই তদন্ত করছি জেনে বললেন, 'ইন্দ্র আচায্যি একা ভারত অপেরাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর খুনিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারলে একটা কাজের কাজ হবে।'

শুক্রবার ট্রাফিক প্রচুর, তাই ভারত অপেরার আপিসে পৌঁছতে লাগল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। নম্বরটা ডিরেক্টরিতে দেখে নিয়েছিলাম, তা ছাড়া দরজার উপরে সাইন বোর্ডে লেখাই রয়েছে কোম্পানির নাম।

দরজা দিয়ে ঢুকে একটা টেবিলের পিছনে একজন কালো মতন মাঝবয়সী লোক বসে আছেন; বললেন, 'কাকে চাই?'

ফেলুদা তার কার্ডটা বার করে দেখাতে ভদ্রলোকের চোখের অলস চাহনিতে কিছুটা জৌলুস এল। বললেন, 'আপনারা কি শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন—আমাদের প্রোপাইটার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা।

'একটু বসুন।'

একটা বেঞ্চি আর আরও একটা চেয়ার ছিল ঘরটায়, আমরা তাতেই ভাগাভাগি করে বসলাম। ভদ্রলোক উঠে পিছনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, 'এই কোম্পানির যে এত রমরমা সেটা কিন্তু এ ঘর থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে। শরৎবাবু দোতলায় বসেন।'

একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময় হারমোনিয়ামের শব্দ পেলাম। রিহার্সালের তোড়জোড় চলছে নাকি? খুঁটি চলে গেলেও যাত্রা তো চালিয়েই যেতে হবে।

প্রোপাইটার শরৎ ভট্টাচার্যির আপিস দেখে কিন্তু ধারণা পালটে গেল। বেশ বড় ঘর, বড় টেবিল, চারপাশে মজবুত চেয়ার, দেয়ালে একটা বিরাট বারোমেসে ক্যালেন্ডার, আর্টিস্টদের বাঁধানো ছবি, দুটো আলমারিতে মোটা মোটা খাতাপত্র ছাড়া একটা গোদরেজের আলমারি রয়েছে, মাথার উপর বাঁই বাঁই করে ঘুরছে পাখা।

টেবিলের পিছনে যিনি বসা তিনিই অবশ্য শরৎবাবু। তাঁর মাথায় টাক, কানের পাশে পাকা চুল, ঘন কালো ভুরু, মুখের চামড়া টান। বয়স বোঝা যায় না, শুধু বলা যায় পঞ্চান্ন থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে।

'আপনিই প্রদোষ মিত্তির?' ফেলুদার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

'আর ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী,' বলল ফেলুদা।

'ওরে বাবা, আপনি তো স্বনামধন্য ব্যক্তি মশাই। আমার বাড়িতে আপনার অনেক ভক্ত আছে।'

লালমোহনবাবু বার চারেক হেঁ হেঁ করলেন, তারপর ভদ্রলোক বলাতে আমরা চেয়ারে বসলাম। ফেলুদাই কথা শুরু করল।

'ইন্দ্রনারায়ণবাবুর বাবা আমাকে তাঁর ছেলের খুনের তদন্ত করতে বলেছেন, সেই জন্যেই আসা।'

শরৎবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি আর কী বলতে পারি বলুন, শুধু এইটুকুই জানি যে আমাদের একেবারে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। নাটক লিখিয়ে হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু অমন গান কেউ লিখতে না, আর কেউ লিখবেও না। আহা—আকাশে হাসিছে চাঁদ, তুমি কেন আনমনা- কী গান! শুধু গান শুনতেই লোকে বার বার ফিরে ফিরে আসে।'

'আমরা শুনেছি অন্য দল থেকে তাঁকে প্রলোভন দেখানো হচ্ছিল।'

'সে তো বটেই। তবে প্রলোভনে কোনও কাজ হয়নি। আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে আমাকে ছাড়বার কথা সে কল্পনাও

করতে পারত না। যখন প্রথম এল তখন তার বয়স পঁচিশ। আমিই যে তাকে প্রথম সুযোগ দিয়েছিলাম সেটা সে কোনওদিন ভুলতে পারেনি। শেষটায় তার জীবননাশ করে আমায় খোঁড়া করে দিল।'

শরৎবাবু ধুতির খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছলেন। তারপর বললেন, 'আগে একবার ওর মাথায় বাড়ি মারার চেষ্টা করেছিল রাস্তায়। অবিশ্যি সেটা খুনের চেষ্টা কিনা, আর সেটার সঙ্গে আসল খুনের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, সেটা বলতে পারব না। এই গলিটায় গুণ্ডা বদমায়েশের অভাব নেই। সে দিন তো দু জন এসে না পড়লে অন্তত ওর মানিব্যাগটি হাওয়া হয়ে যেত বলে আমার বিশ্বাস। সেটা আর হয়নি। তবে আসল খুনটা যে আমাকেও এক রকম খুন করা সে বিষয় আমার কোনও সন্দেহ নেই। আপনি তদন্ত করতে চান তো বীণাপাণি অপেরায় গিয়ে করুন; আমার নিজের আর কিছু বলার নেই।'

আমরা উঠে পড়লাম। ইতিমধ্যে চা খাওয়া হয়ে গেছে সেটা বলে নিই। এর পরের স্টপ হল সুরেশ মল্লিক স্ট্রিট।

আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে উত্তরে যেতে গিয়ে বাঁয়ে একটা মোড় নিয়ে তার পরের ডাইনের রাস্তাটাই হল সুরেশ মল্লিক স্ট্রিট। চোদ্দ নম্বরে বীণাপাণির আপিস খুঁজে বার করতে কোনও অসুবিধা হল না।

এখানে বাড়িতে ঢুকেই যাকে বলে উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বুঝলাম পুরোদমে মহড়া চলছে। ম্যানেজার অশ্বিনীবাবুকে বার করতে সময় লাগল না। বলিষ্ঠ রাজ্জী চেহারা, টুথ ব্রাশ গোঁফ, বছর পঞ্চাশেক বয়স। বাইরের একটা ঘরে আমাদের বসতে দেওয়া হয়েছিল, ভদ্রলোক ঢুকে এসে ফেলুদার কার্ড দেখেই খাপ্পা হয়ে উঠলেন।

'একি ঘোসপুকুরের খুনের ব্যাপার নাকি?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার উপর তদন্তের ভার পড়েছে। আপনি ইন্দ্রনারায়ণবাবুর সঙ্গে খুনের রাত্রে দেখা করেছিলেন, তাই আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করার ছিল।'

'পুলিশ তো এক দফা জেরা করে গেছে, আবার আপনি কেন? তা যাই হোক, আমি বলেই দিচ্ছি, আমি খুনের বিষয় কিছুই জানি না! আমি গেসলুম ওঁকে একটা অফার দিতে আমাদের তরফ থেকে। এর আগেও কয়েকবার গেছি। ওঁকে নিমরাজি করিয়ে এনেছিলাম, কারণ

ভারত অপেরা ওঁকে যে টাকা দিত আমরা তার চেয়ে ঢের বেশি অফার করি। আমাদের সে জোর আছে বলেই করি। কাজেই এ অবস্থায় আমরা যেটা চেয়েছিলাম সেটা হল উনি যাতে আমাদের দলে যোগ দেন। উনি যদি মরেই যান তাহলে আমাদের লাভটা হচ্ছে কোথেকে?'

'অন্য দলের ক্ষতি হলে তাতেও তো আপনাদের লাভ।'

'না। ওসব ছ্যাঁচড়ামোর মধ্যে আমরা নেই। এ দল সে দল থেকে আর্টিস্ট ভাঙিয়ে নেবার চেষ্টা আমরা সব সময়ই করি, কিন্তু তাতে সফল না হলে কি আমরা সে আর্টিস্টকে প্রাণে মেরে অন্য দলের ক্ষতি করব?'

'আপনি বলছিলেন উনি নিমরাজি হয়েছিলেন। তার কোনও প্রমাণ আছে কি?'

'গোড়ায় যখন চিঠি লিখে অফার দিই, তার একটা পোস্টকার্ডের উত্তর আছে, দেখতে চান দেখাতে পারি।'

ফেলুদা বলতে ভদ্রলোক ফাইল থেকে পোস্টকার্ডটা বার করে দেখালেন। তাতে দেখলাম ইন্দ্রনারায়ণবাবু সত্যিই বলেছেন,

'আপনাদের প্রস্তাব আমি ভেবে দেখছি। আপনি মাস খানেক বাদে অনুগ্রহ করে আর একবার অনুসন্ধান করবেন।' অর্থাৎ ইন্দ্রনারায়ণবাবু বীণাপাণি অপেরার প্রস্তাবে পুরোপুরি না করেননি। তাঁর মনে একটা দ্বিধার ভাব এসেছিল।

ফেলুদা বলল, 'সে দিন রাত্রে যে আপনি গেলেন, তখন আপনাদের মধ্যে কোনও কথা কাটাকাটি হয়েছিল?'

'আমি ওঁকে নানান ভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম সেটা ঠিক আর তাতে হয়তো গলা এক-আধবার চড়ে যেতে পারে। কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণবাবু মাথাঠাণ্ডা লোক ছিলেন; সেই কারণেই তাঁর কাজটা এত ভাল হত। উনি বললেন, "ভারত অপেরার সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক। সেটা ভাঙা তো সহজ কথা নয়। কিন্তু তাও বলছি আপনারা পারলে আমাকে আর কিছুটা সময় দিন। একটা নতুন নাটক আমি লিখছি ভারত অপেরার জন্য। সেটা দেব বলে কথা দিয়েছি; সে কথার তো আর নড়চড় করতে পারি না। এই বছরের শেষে আমি আবার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব"—এই হল শেষ কথা। তারপর আমি চলে আসি। তখন পৌনে এগারোটা।'...

'গোলমেলে ব্যাপার', ফেলুদা মন্তব্য করল চৌরঙ্গিতে একটা রেস্টোরেন্টে বসে কফি খেতে খেতে।

'বীণাপাণি অপেরাই যে গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করেছে সেটা এখন আর মনে হচ্ছে না—তাই না?' বললেন লালমোহনবাবু।

'তা হচ্ছে না', বলল ফেলুদা, 'তবে প্রশ্ন হচ্ছে শত্রুবিহীন এই ব্যক্তিটির উপর কার এত আক্রোশ ছিল? ভাড়াটে গুণ্ডাই যদি মেরে থাকে তাহলে ফেলু মিত্তিরের বিশেষ কিছু করবার নেই। সেখানে পোদ্দারমশাই টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবেন।'

'কিন্তু অশ্বিনীবাবুর কথা শুনে—'

'অশ্বিনীবাবু যে সত্যি কথা বলছেন সেটাই বা মেনে নিই কি করে? সেদিন ওঁর কথায় যে ইন্দ্রনারায়ণ সরাসরি না করে দেননি সেটাই বা কে বলতে পারে? সাক্ষী কই?'

'আচ্ছা, বাড়ির লোক যদি খুন করে থাকে?'

'সেটার সম্ভাবনা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। কীর্তিনারায়ণ তাঁর

ছোট ছেলেকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তিনি যদি তাঁর উইলে ইন্দ্রনারায়ণকে বেশি টাকা দিয়ে থাকেন, তাতে বড় ভাইদের কি মনে হতে পারে না ছোটভাইকে হটিয়ে তাদের শেয়ার কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া?'

'এটা আপনি মোক্ষম বলেছেন', বললেন লালমোহনবাবু।

'কিন্তু ব্যাপার কী জানেন? খুন জিনিসটা করা অত্যন্ত কঠিন। প্রচণ্ড তাগিদ না থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুনের সাহস সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। আগে অন্য ভাই দুটোকে একটু বাজিয়ে নিই, তারপর তেমন বুঝলে ওটা নিয়ে ভাবা যাবে।'

ফেলুদার কপালে ভ্রূকুটি তাও যাচ্ছে না দেখে জিগ্যেস করলাম সে কী ভাবছে। ফেলুদা বলল, 'সেকেণ্ড দাদার হরিনারায়ণের কথা।'

'কেন?'

'লোকটা আবার ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ভক্ত—ক্লাসিক্যাল মিউজিক। এই নিয়ে যে দুটো প্রশ্ন করব তারও জো নেই। কারণ ফেলু মিত্তির ও ব্যাপারে একেবারেই কাঁচা।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমার কাছে একটা পাশ্চাত্য সংগীতের এনসাইক্লোপিডিয়া আছে—এক ভল্যুম, সাড়ে সাতশো পাতা। তাতে আপনি যা জানতে চান সব পাবেন।'

'আপনি ও বই নিয়ে কী করছেন?'

'ওটা একটা সেটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল—তাতে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, মেডিসিন, সায়েন্স, অ্যানিম্যালস—সবই আছে। আমি নিজে উলটে পালটে দেখেছি মিউজিকের বইটা। হেডন, মোজার্ট, বিথোভেন সব বড় বড় সুরকারদের জীবনী রয়েছে।'

'আমি এ সব সুরকারদের রচনা শুনিনি বটে, কিন্তু এদের নামের উচ্চারণগুলো অন্তত আমার জানা আছে, কিন্তু আপনার নেই।'

'কি রকম?'

'হাইড্‌ন, মোৎসার্ট, বেটোফেন—এই হল আসল উচ্চারণ।'

'হাইড্‌ন, মোৎসার্ট, বেটোফেন—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, আর ভুল হবে না।'

'এখনই দিতে পারেন বইটা?'

'আলবৎ! আপনার জন্য এনি টাইম।'

আমরা রেস্টোর্যান্ট থেকে গড়পার গিয়ে লালমোহনবাবুর বইটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোককে বাড়িতে রেখে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

বাকি দিনটা ফেলুদার সঙ্গে আর কথা বলা সম্ভব হয়নি, কারণ সে ঘর বন্ধ করে এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়েস্টার্ন মিউজিক পড়ল।

॥ ৬ ॥

শনিবার সকাল দশটায় ঘোসপুকুর গিয়ে প্রথমেই যার সঙ্গে কথা হল, সে হল হরিনারায়ণবাবুর মেয়ে লীনা। লীনার আজ ইস্কুল ছুটি, সে কদিন থেকেই শুনেছে বাড়িতে ডিটেকটিভ এসেছে। তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। ফেলুদার ভক্ত হওয়াতে তার সঙ্গে কথা বলতে আরও সুবিধা হল।

'তোমার ছোটকাকা তোমাকে খুব ভালবাসতেন, তাই না?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'শুধু ভালবাসতেন না', বলল লীনা, 'আমরা দু জনে বন্ধু ছিলাম। কাকার সব লেখা আগে আমাকে পড়ে শোনাতেন। আমার যদি কোনও জায়গা গোলমাল লাগত তাহলে কাকা সেটা বদলে দিতেন।'

'আর গান?'

'আমাকে প্রথম শোনাতেন।'

'তুমি নিজে গান ভালবাস?'

'আমি পিয়ানো শিখছি।'

'তার মানে তো বিলিতি বাজনা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার রবীন্দ্রসংগীতও ভাল লাগে, আর কাকার গানও ভাল লাগত। আমি নিজেও গান করি একটু একটু।'

'তোমার কাকা কোনওদিন ভারত অপেরা ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলেন তোমাকে?'

'বীণাপাণি অপেরা কাকাকে অনেক টাকা দিতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু আমার মনে হয় না কাকা কোনওদিন ভারত অপেরা ছাড়তেন। আমায়

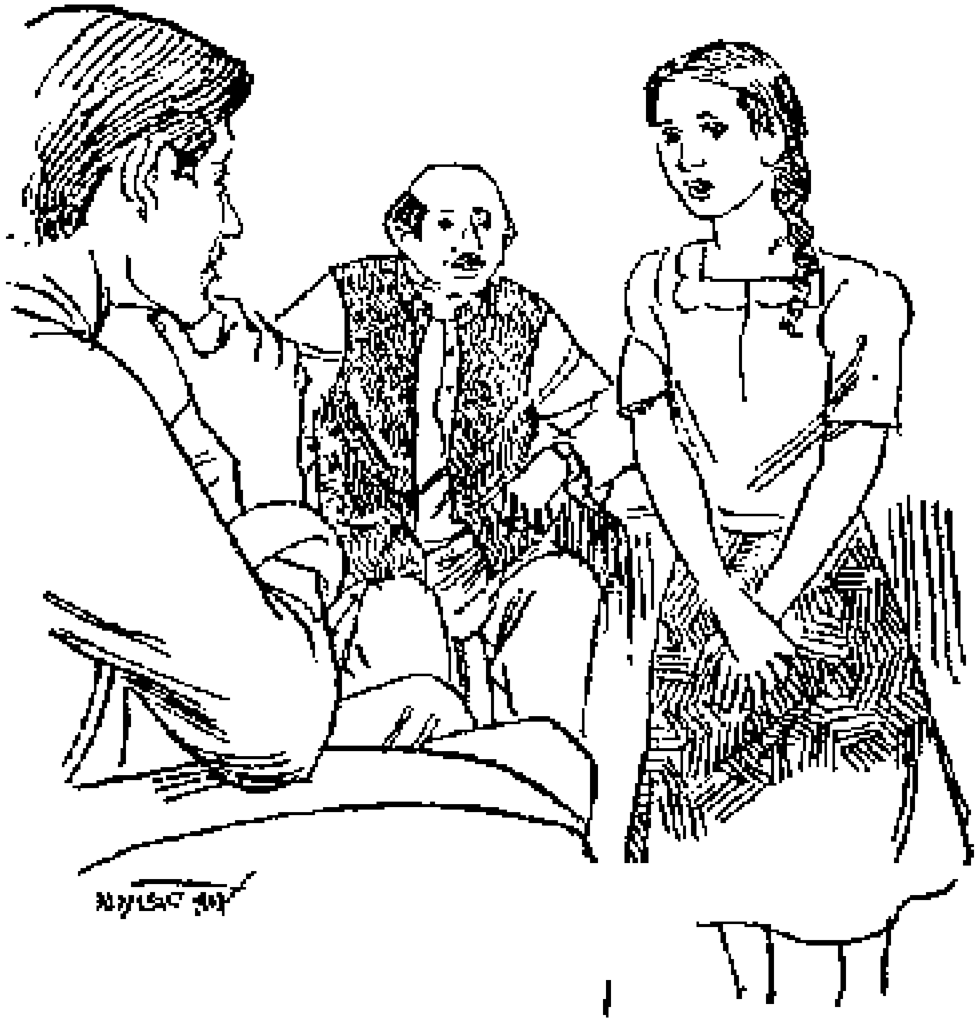

বলতেন, আমার শেকড় ভারত অপেরায়, শেকড় তুলে অন্য জায়গায় গেলে কি আর আমি বাঁচব?'

'কাকা একটা নতুন নাটক লিখছিলেন সেটা তুমি জান?'

'একটা কেন; সম্রাট অশোক তো শেষ হয়নি। তাছাড়া কাকার চারটে নাটক লেখা ছিল। এ ছাড়া ওঁর প্রায় পনের কুড়িটা খুব ভাল ভাল গান লেখা ছিল যেগুলো এখনও যাত্রায় ব্যবহার হয়নি। আর নাটকের খসড়া যেগুলো ছিল—সেও প্রায় আট-দশটা হবে—সেগুলো তো খসড়াই রয়ে গেল!'

নীনার সঙ্গে কথা বললাম প্রদ্যুম্নবাবুর ঘরে। খুব সাদাসিধে ঘর,

লাইব্রেরির ঠিক পাশেই। ভদ্রলোক বললেন যে ওঁর রিসার্চের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, এর পর কাগজপত্র সব নিয়ে উনি বইটা লেখার জন্য শ্রীরামপুরে ওঁর বাড়িতে চলে যাবেন। ওঁর আন্দাজ এক বছর লাগবে বইটা লিখতে।

'অবিশ্যি রহস্যের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে এখানে থাকতেই হবে সেটা বোধ হয় বুঝতেই পারছেন।'

'সে কথা পুলিশ আগেই বলে দিয়েছে।'

'আপনি চলে গেলে কীর্তিনারায়ণবাবুর সেক্রেটারির কী হবে?'

'সে আমি অন্য একটি ছেলেকে বদলি দিয়ে যাব। জীবনী একবার লিখতে আরম্ভ করলে অন্য কোনও দিকে মন দিতে পারব না।'

ফেলুদা ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছিল, আর ঘরের দরজা দিয়ে বাইরের কী অংশ দেখা যায় সেটাও দেখছিল। দেখলাম প্রদ্যুম্নবাবুর শোবার ঘর থেকে ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাজের ঘরের দরজাটা দেখা যায়, কিন্তু লাইব্রেরি থেকে দুটোর একটা ঘরও দেখা যায় না। ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে গলি দেখা যায়—যদু নস্কর লেন। বোসপুকুর রোডটা হল বাড়ির সামনে, অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের বাগানের পরে।

নীনা ইতিমধ্যে তার বাবা হরিনারায়ণবাবুকে আমাদের কথা বলে রেখেছে; আমরা দোতলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দার পাশে একটা বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। বেশ সুন্দর সাজানো ঘর, তাতে কিছু দামি পুরনো জিনিসও রয়েছে বলে মনে হল। যে সব জিনিস মানুষ কিউরিওর দোকান থেকে কেনে। ঘরের এক পাশে একটা বড় তাকে হাই-ফাই যন্ত্র রেকর্ড আর ক্যাসেট চালাবার জন্য, আর তাকের উপরে দু দিকে দুটো স্টিরিও স্পিকার।

হরিনারায়ণবাবুকে দেখেই নীনার বাবা বলে বোঝা যায়। বেশ সুপুরুষ চেহারা, রং এ বাড়ির আর সকলের মতোই ফরসা, খালি শরীরে মাংসটা একটু বেশি।

ভদ্রলোক ফেলুদা আর লালমোহনবাবুকে বললেন, 'আপনাদের দু জনের নামই শোনা বলে মনে হচ্ছে। এখন বলুন কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।'

ফেলুদা প্রথমেই কাজের কথায় গেল না। বলল, 'আপনার ...

দেখছি বিরাট গান বাজনার কালেকশন।'

'হ্যাঁ, তা বিশ বছর হল শুনছি ওয়েস্টার্ন মিউজিক। ওটাতেই কান বসে গেছে, দিশি আর ভাল লাগে না।'

'আপনার কোনও ফেভারিট কম্পোজার আছে নাকি?'

' চাইকোভস্কি খুব ভালো লাগে; সুমান, ব্রাম্‌স, শোপাঁ।'

'অর্থাৎ রোমান্টিক যুগটাই আপনার বেশি প্রিয়?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ছোট ভাই বেহালা বাজালেও বিলিতি সংগীতের দিকে ঝোঁকেননি বোধ হয়।'

'না। ওর ব্যাপারটা ছিল একেবারে উলটো। শুনেছি ওর নাকি ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু যাত্রা দেখার কোনও তাগিদ কোনওদিন অনুভব করিনি। আমার স্ত্রী আর মেয়ে গেছে কয়েকবার।'

'ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার নিজের কোনও থিওরি আছে?'

'ব্যাপার কি জানেন, ও যে ক্লাসের লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করত তাদের তো আর ঠিক ভদ্রলোক বলা চলে না। যাত্রার পরিবেশটাই খারাপ। কোথায় কার সঙ্গে কী গোলমাল পাকিয়ে রেখেছিল কে জানে? তারই একজন এসে বদলা নিয়েছে—এ ছাড়া আর কী? জিনিসপত্র যখন কিছুই চুরি যায়নি তখন আর কী কারণ থাকতে পারে তা তো আমি জানি না। ওর সঙ্গই ওর কাল হয়েছিল। আপনি এনকোয়ারি করতে চাইলে ওই যাত্রা পার্টিগুলোতে গিয়েই করুন। এখানে বিশেষ সুবিধে করতে পারবেন না।'

'পুলিশে খবর কি আপনার দাদা দেন?'

'আমি, দাদা দু জনেই দিই। বাড়িতে খুন হলে সেটাই তো স্বাভাবিক। চট্ করে কেউ প্রাইভেট ডিটেকটিভ ডাকে কি? বাবার তাই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবা চিরকালই ছিটগ্রস্ত। কি করে যে ব্যারিস্টারি করেছেন এত দিন তা জানি না!'

'আপনার বাবা বোধহয় আপনার ছোট ভাইকে খুব ভালবাসতেন।'

'সেটাও ওই ছিটেরই উদাহরণ। বাবা গতানুগতিকতা পছন্দ করেন না। এই ব্যাপারে বাবার সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষ কন্দর্পনারায়ণের মিল

আছে।'

ফেলুদা উঠে পড়ল। আমিও বুঝতে পারছিলাম যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আর কথা বলে কোনও ফল হবে না।

বড় ভাই দেবনারায়ণ ছিলেন বাড়ির পশ্চিম দিকের বারান্দায়, বেতের চেয়ারে বসে। সামনে বেতের টেবিল, তার উপর কোল্ড বিয়ার রাখা। আমাদের অভিবাদন জানিয়ে ভদ্রলোক বিয়ার অফার করলেন, আমরা স্বভাবতই মাথা নেড়ে না জানালাম।

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ এমপ্লয় করা বুঝি বাবার প্ল্যান?'

ফেলুদা হেসে বলল, 'বোধহয় তাই, কারণ আর কারুরই শখের গোয়েন্দার উপর আস্থা নেই।'

'এ জিনিস উপন্যাসে চলে, রিয়েল লাইফে চলে না।'

ভদ্রলোক কথাগুলো বলছেন একেবারে শুকনো মুখে। সত্যি বলতে কি, এত গম্ভীর লোক কমই দেখেছি।

দেবনারায়ণবাবু বললেন, 'আমার ভাইয়ের সম্বন্ধে জিগ্যেস করবেন তো? সেটা অনুমান করেই বলছি, ইন্দ্রনারায়ণ ছিল আমাদের পরিবারের কলঙ্ক। আমাকে ক্লাবে অনেক সময়ই লোকে তার কথা জিগ্যেস করেছে; তার যাত্রা কেমন চলছে, গান পপুলার হচ্ছে কিনা, সে বেহালা কেমন বাজায়—ইত্যাদি। আমি মাথা হেঁট না করে কোনও কথার জবাব দিতে পারিনি। আমাদের আপন ভাই-এর এই দশা হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তার মৃত্যুর জন্যেও সে নিজেই দায়ী। তার উপর আমার কোনও সহানুভূতি নেই। আর আপনিও যে তদন্তের ভার নিয়েছেন, আপনার ওপরেও আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। ওকে খুন করেছে যাত্রা দলের গুণ্ডা। সে আর অল পোটেনশিয়াল ক্রিমিন্যালস। আপনি কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন?'

দেবনারায়ণবাবুর সঙ্গে কথাও এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

নীচে আসার সময় ফেলুদা প্রদ্যুম্নবাবুকে বলল, 'একটা জিনিস দেখার বড় কৌতূহল হচ্ছে আমার; কন্দর্পনারায়ণের বিলেতের ডায়রি। কটা খণ্ড আছে সবশুদ্ধ?'

'দুটো। উনি বিলেতে ছিলেন এক বছরের কিছু বেশি।'

'ওটা দিন-তিনেকের জন্য ধার পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

ফেলুদা তার থলিতে বই দুটো নিয়ে নিল, আমরা আবার বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

॥ ৭ ॥

'কী রকম মনে হচ্ছে বলুন তো?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন এক মুঠো ডালমুট মুখে পুরে।

আমরা বোসপুকুর থেকে ফিরেছি মিনিট পনেরো হল, শ্রীনাথ সবেমাত্র চা-ডালমুট দিয়ে গেছে।

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'শুধু অপেরা-অপেরায় খাওয়া-খাওয়ি হলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না। বাড়ির লোকদের একেবারে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। অবিশ্যি দু ভাইয়ের মেজাজ ছাড়া এখনও তাদের বিষয় আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি। দু জনের মধ্যে কারুর যদি টাকার টানাটানি দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে ছোট ভাই যাতে বাপের টাকা না পায় সে দিকে সে দৃষ্টি দিতে পারে। কীর্তিনারায়ণ যদি তাঁর ছোট ছেলেকে বেশি টাকা দিয়ে থাকেন তাহলে তো তাঁকে সে উইল চেঞ্জ করতে হবে। তার ফলে অবশিষ্ট দু ভাইয়ের ভাগে নিশ্চয়ই বেশি করে পড়বে।'

'আমার কিন্তু মশাই দেবনারায়ণকে ভাল লাগল না। ও রকম একটা গঁযোট্টা লোক সচরাচর দেখা যায় না।'

'বাড়িতে দেখে এদের পুরোপুরি বিচার করা যাবে না। আমার জানার ইচ্ছে সন্ধেবেলা ওঁরা ক্লাবে গিয়ে কী করেন।'

'সেটা জানছেন কী করে?'

'দুই ক্লাবেই আমার চেনা লোক মেম্বার আছে', বলল ফেলুদা। 'দু জনেই আমার সহপাঠী ছিল। বেঙ্গল ক্লাবে অনিমেষ সোম, আর স্যাটারডে ক্লাবে ভাস্কর দেব। দু জনেই বড় চাকুরে। তাদের জিগ্যেস করলেই বলে দেবে।'

'এই ক্লাবগুলির খালি নামই শুনেছি; ভেতরে যে কী হয় জানিও না।'

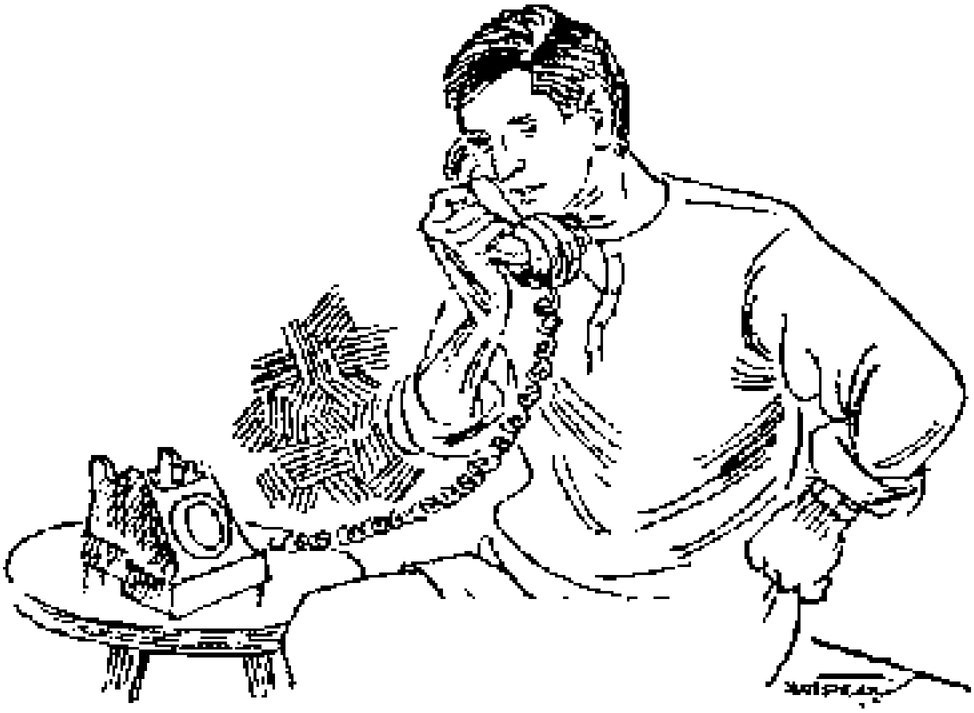

'আপনার ফূর্তি হবার মতো তেমন কিছুই নেই। আপনি মদ্য পান করেন না, তাস খেলেন না, বিলিয়ার্ড খেলেন না—আপনি ক্লাবে গিয়ে কী করবেন?'

'তা বটে।'

ফেলুদা আর সময় নষ্ট করল না। প্রথমে বেঙ্গল ক্লাবের মেম্বর অনিমেষ সোমকে ফোন করল। অবিশ্যি সাতবার ডায়াল করার পর নম্বর পাওয়া গেল। এক তরফা কথা শুনে পুরো ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলাম না; তাই ফেলুদা খুলে বলে দিল।

'দেবনারায়ণবাবু ক্লাবে যান নিয়মিত এবং অধিকাংশ সময় মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকেন। খেলাধুলার মধ্যে নেই, লোকজনের সঙ্গে আড্ডা প্রায় মারেন না বললেই চলে, লন্ডনের খবরের কাগজ নিয়মিত পড়েন। আরেকটা ব্যাপার, ভদ্রলোকের আপিসে গণ্ডগোল যাচ্ছে, স্ট্রাইক হবার সম্ভাবনা আছে।'

এরপর ফেলুদা ভাস্কর দেবকে ফোন করে একবারে পেয়ে গেল। এখানে শুধু ফেলুদার দিকটা শুনেই মোটামুটি পুরো ব্যাপারটা আঁ

করে নিলাম।

'কে, ভাস্কর কথা বলছিস? আমি ফেলু, প্রদোষ মিত্তির।'

'—'

'তুই তো স্যাটারডে ক্লাবের মেম্বার, তাই না?'

'—'

'তোদের একজন মেম্বার সম্বন্ধে একটু ইনফরমেশন দরকার ছিল। হরিনারায়ণ আচার্য।'

'—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যার ভাই খুন হয়েছে। এ লোকটা মানুষ কেমন? তোর সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়ই?'

'—'

'ও বাবা, জুয়াড়ি? হেভি স্টেকসে পোকার খেলে? তার মানে গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের বাতিকটা পেয়েছে আর কি?'

'—'

'তুইও খেলেছিস ওর সঙ্গে?'

'—'

'দেনা বেড়ে যাচ্ছে তাও খেলা থামায়নি? তার মানে তো খুবই নেশা বলতে হবে!'

'—'

'এনিওয়ে, অনেক থ্যাংকস ভাই। আমার উপর আবার তদন্তের ভার পড়েছে, তাই এদিক সেদিক থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি। ঠিক আছে—আসি।'

ফেলুদা ফোন রেখে বলল, 'বোঝো। লোকটা খুন করবে কি; বরং তহবিল তছরুপ করলে বুঝতে পারতাম। দেদার দেনা হয়ে গেছে তাসের জুয়াতে, অথচ দেখে বোঝবার কোনও উপায় নেই!'

লালমোহনবাবু হঠাৎ ভীষণ একসাইটেড হয়ে পড়লেন।

'ও মশাই—এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার! বাপ না মরলে তো আর উইল থেকে কোনও টাকা আসছে না। টাকার যদি দরকারই হয় ছেলের তাহলে তো এবার কীর্তিনারায়ণের খুন হওয়া উচিত!'

'আপনার গোয়েন্দাগিরিতে মাথা খুলে যাচ্ছে, লালমোহনবাবু।

আপনি খুব ভুল বলেননি।'

'তাহলে তো এ-ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।'

'শুনুন।' ফেলুদা চায়ের কাপটা নামিয়ে চেয়ারে একটু এগিয়ে বসে বলল, 'আপনাকে আগেও বলেছি, খুন জিনিসটা অত সহজ নয়। ও বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন আছে। একটা খুন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। ছোট ভাই যে বাবার প্রিয় ছিল এ কথাও অজানা নেই। সেখানে ছোট ভাই খুন হবার পর যদি বাবাও খুন হন, তাতে দু ভাইয়ের উপর যে পরিমাণ সন্দেহ বর্তাবে, তাতে তারা কোনওমতেই পার পাবে না। এক তো পুলিশ, তার উপর ফেলু মিত্তির। তাদের নিজেদের কি প্রাণের ভয় নেই? উইলের জন্য যদি ইন্দ্রনারায়ণকে খুনও করা হয়ে থাকে, বাপকে মারার কোনও তাড়া নেই, কারণ ভদ্রলোকের উনআশি বছর বয়স, ডায়াবেটিসের রুগী, একটা স্ট্রোক ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। ওঁর আর কদিন? তবে হ্যাঁ—হরিনারায়ণের সম্বন্ধে ওটা জরুরি তথ্য। বাড়িতে মানুষটাকে চেনা যায়নি। আমি জানতাম যারা গান-বাজনার ভক্ত তারা সাধারণত কোমল প্রবৃত্তির লোক হয়। এ দেখছি একেবারে অদ্ভুত কম্বিনেশন।'

'ওই পুরো ফ্যামিলিটাই তো তাই মশাই!'

কথাটা বলে সামনে পড়ে থাকা শনিবারের স্টেটসম্যানটা হাতে তুলে নিলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদাও চোখ ঘুরিয়েছিল কাগজটার দিকে, হঠাৎ কী জানি দেখে সে কাগজটা লালমোহনবাবুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর মিনিট খানেক ধরে পিছনের পাতায় চোখ বুলাল। তারপর কাগজটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বলল, 'আই সি।'

মিনিট খানেক পর আবার বলল, 'বুঝলাম।'

তারপর আরও আধ মিনিট পরে বলল, 'এই ব্যাপার!'

লালমোহনবাবু আর থাকতে না পেরে বললেন, 'কী বুঝলেন মশাই?'

তাতে ফেলুদা বলল, 'বুঝলাম গোয়েন্দা হলেও আমার জ্ঞান কত সীমিত। বুঝলাম এখনো আমার অনেক কিছু শেখার আছে।'

ফেলুদা যখন রহস্য করতে চায় তার জাল ভেদ করে এমন সাধ্য কারুর নেই। কাজেই ও যখন মিনিট খানেক পরে বলল, 'আজ একটা

নতুন অভিজ্ঞতা হবে', তখন বুঝলাম এটাও রহস্যেরই একটা অঙ্গ।

'কী ব্যাপার?' লালমোহনবাবু যথারীতি জিগ্যেস করলেন।

'আজ আমরা তিন জনেই রেসের মাঠে যাচ্ছি।'

'সে কি? রেসের মাঠে? কেন মশাই?'

'এটা আমার অনেক দিনের একটা শখ। আজ বিকেলটা আমরা ফ্রি আছি। কলকাতায় এমন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতি শনিবার সেই কত কাল থেকে, কিন্তু আমরা তার ধারে-পাশেও যাব না এটা মোটেই ঠিক নয়। অন্তত একবারের জন্য সব রকম অভিজ্ঞতা হয়ে থাকা ভাল।'

'এ কথাটা আমারও অনেক দিন মনে হয়েছে মশাই', চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বললেন লালমোহনবাবু। 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন, চেনা কেউ যদি দেখে ফেলে জুয়াড়ি ভাবে, এইখানেই আমাদের সঙ্কোচ।'

'এবারে সেটার কোনও সম্ভাবনা নেই।'

'কেন?'

'কারণ আমরা তিনজনেই যাব ছদ্মবেশে।'

লালমোহনবাবু লাফিয়ে উঠলেন।

'ওঃ, দুর্দান্ত ব্যাপার মশাই! আমাকে একটা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দিতে পারবেন?'

'আমি মনে মনে তাই ভাবছিলাম।'

'গ্রেট!'

মেক-আপে ফেলুদার জুড়ি নেই সেটা আগেও বলেছি, কিন্তু এত দিন শুধু ওর নিজের মেক-আপই দেখেছি, এবার ও আমাকে আর লালমোহনবাবুকে যেভাবে মেক-আপ করল তাতে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেরাই হকচকিয়ে গেলাম। লালমোহনবাবুকে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি আর ঢেউ খেলানো চুল, আর আমার গোঁফ দাড়ি আর পার্ক স্ট্রিট-মার্কা ঝাঁকড়া চুলের কোনও তুলনা নেই।

ফেলুদা নিজে একটা চাড়া দেওয়া মিলিটারি গোঁফ লাগিয়েছে, আর একটা পরচুলা পরেছে যাতে মনে হয় চুলটা ছোট করে ছাঁটা। এই সামান্য ব্যাপারেই ওর চেহারায় আকাশ পাতাল তফাত হয়ে গেছে।

রেসের মাঠে যে কোনওদিন যাব সেটা ভাবতে পারিনি। রাস্তার ভিখিরি থেকে রাজা মহারাজা অবধি সবাই যদি কোথাও একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই জায়গায় জমায়েত হয় তো সেটা হল রেসের মাঠ। এমন দৃশ্য কলকাতা শহরে আর কোথাও দেখা যায় না, কোথাও দেখার সম্ভাবনাও নেই। একমাত্র রেসের মাঠেই মুড়ি মিছরি এক দর।

ঘোড় দৌড় এখনও শুরু হয়নি, আমরা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। এক জায়গায় একটা বেড়ায় ঘেরা মাঠের মধ্যে যে সব ঘোড়া রেসে দৌড়বে তাদের ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে।ফেলুদা বলল জায়গাটাকে বলে প্যাডক। আরেকটা জায়গা—যেখানে একটা একতলা বাড়ির গায়ে সার সার জানালা, সেখানে বেটিং প্লেস করা হচ্ছে। সকলের মতো আমরাও একটা করে রেসের বই কিনে নিয়েছি। অভিনয় ভাল হবে বলে লালমোহনবাবু সেটা ভয়ংকর মনোযোগের সঙ্গে পাতা উলটে দেখছেন।

আমরা ছিলাম সব শুদ্ধ আধ ঘণ্টা। প্রথম রেসটা দেখলাম, লোকদের মরিয়া হয়ে ঘোড়ার নাম ধরে চিৎকার করা শুনলাম, তারপর ফেলুদা হঠাৎ এক সময় বলল, 'যে প্রয়োজনে আসা সেটা যখন মিটে গেছে তখন আর বৃথা মেক-আপের বোঝা বয়ে কী লাভ?'

কী প্রয়োজনের কথা বলছে জানি না, জিগ্যেস করলেও উত্তর পাব এমন ভরসা নেই, তাই আমরা তিন জন বাইরে বেরিয়ে এসে লালমোহনবাবুর গাড়ি খুঁজে বার করে তাতে চেপে বসলাম।

॥ ৮ ॥

রবিবার সকালে দারোগা মণিলাল পোদ্দারের ফোন এল। বললেন, 'কিছু এগোলেন?' ফেলুদা বলল, 'আগে মানুষগুলোকে চেনার চেষ্টা করছি, নইলে এগোতে পারব না। বেশ জটিল কেস বলে মনে হচ্ছে।'

মণিলালবাবুর কথা থেকে জানা গেল যে আর একবার আচার্যি বাড়িতে ডাকাত পড়লে উনি আশ্চর্য হবেন না। প্রথমবার তো খুনই করেছে, কোনও জিনিস তো নেয়নি; ওঁর ধারণা যাত্রার যে দলটা খুন

করিয়েছে তারা ইন্দ্রনারায়ণবাবুর অন্য নাটক আর গানগুলোও হাতাবার চেষ্টা করবে। বোসপুকুরের কাছেই একটা গলি আছে, রাম পরামানিক লেন, সেটা নাকি নটোরিয়াস গুণ্ডাদের আড্ডা। তা ছাড়া এটাও মণিলালবাবু সন্দেহ করছেন যে আচার্য বাড়ির বেয়ারা সন্তোষের সঙ্গে হয়তো এই গুণ্ডাদলের যোগসাজশ আছে।

ফেলুদা প্রশ্ন করল, 'আপনারা কি বাড়ির পিছনের যদু নস্করের গলিতে পুলিশ পাহারা রাখছেন?'

'তা রাখা হচ্ছে বৈকি,' বললেন পোদ্দারমশাই।

'তেমন দরকার হলে এক বার অন্তত এক রাতের জন্য তুলে নেওয়া যেতে পারে কি?'

'আপনি কি গুণ্ডাদের প্রলোভন দেখাতে চান?'

'ঠিক তাই।'

'তা বেশ। আপনার প্রয়োজন হলে বলবেন, আমরা পাহারা সরিয়ে নেব।'

পোদ্দার মশাই-এর ফোনটা এসেছিল সাড়ে সাতটার সময়। তার পরেরো মিনিট পরেই ফোন করলেন প্রদ্যুম্নবাবু, বললেন আধ ঘন্টা থেকে নাকি চেষ্টা করছেন। ব্যাপার গুরুতর। গতকাল রাত্রে বারোটার সময় নাকি চোর এসেছিল আচার্য বাড়িতে। ইন্দ্রনারায়ণবাবুর ঘরে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই কোনও চাকরের সাহায্যে, কারণ পিছনের গলিতে পুলিশ পাহারা আছে। একটা শব্দ পেয়ে প্রদ্যুম্নবাবু নাকি তাঁর কাজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বারান্দায়। তাতে চোরটা পালায়। প্রদ্যুম্নবাবু দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে ধাক্কা দিয়ে প্রদ্যুম্নবাবুকে মাটিতে ফেলে দেয়। ফলে ভদ্রলোকের হাঁটুতে চোট লেগেছে, উনি নাকি খুঁড়িয়ে হাঁটছেন।

ফোন রাখার পর ফেলুদা বলল, 'এখন সত্যিই মনে হচ্ছে ওঁর কাগজপত্র সরাবার উদ্দেশ্যেই ইন্দ্রনারায়ণবাবুকে খুন করা হয়েছিল। যে লেখকের নাটক আর গানের এত চাহিদা, সে পাঁচ-পাঁচ খানা নাটক আর পনের-বিশ খানা গান লিখে রেখে যাবে, আর তার উপরে চোখ পড়বে না অন্য যাত্রা দলের? অবিশ্যি নিয়ম মতো এই সব গান আর নাটক ভারত অপেরারই প্রাপ্য। তারা যাতে না পায় সেই জন্যেই

এগুলো হাতাবার এত উদ্যোগ।'

আমি বললাম, 'অন্য যাত্রার দল যদি ইন্দ্রনারায়ণের এই সব গান আর নাটকের কথা জেনে থাকে, তাহলে সে কথা নিশ্চয়ই ইন্দ্রনারায়ণ নিজেই বলেছেন। তার মানে তিনি ভারত অপেরার প্রতি যতটা লয়েল ছিলেন ভাবছিলাম, আসলে হয়তো ততটা ছিলেন না। সত্যিই হয়তো তিনি অন্য দলে যাবার কথা ভাবছিলেন।'

'কিন্তু তাহলে খুনটা করল কে এবং কেন?'

'হয়তো বীণাপাণি অপেরাকে ইন্দ্রনারায়ণ কথা দিয়েছিলেন, তাই অন্য একটা দল সে পথ বন্ধ করেছে।'

ফেলুদা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে আমার কথায় সায় দিল। সত্যি, এখনও পর্যন্ত রহস্যের কোনওই কিনারা হল না।

ফেলুদা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে আমার কথায় সায় দিল। সত্যি, এখনও পর্যন্ত রহস্যের কোনওই কিনারা হল না।

ফেলুদা তার বিখ্যাত সবুজ খাতা খুলে কি যেন লিখতে শুরু করল। আজ সকাল থেকেই তাকে ভীষণ সিরিয়াস দেখছি। কী যেন একটা নতুন চিন্তা তার মাথায় এসেছে সেটা বুঝতে পারছি না।

ন-টার সময় যথারীতি লালমোহনবাবু এসে হাজির হলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনার মিউজিক এনসাইক্লোপিডিয়াটা আরও দু-চার দিন রাখছি।'

'দু-চার দিন কেন, দু-চার মাস রাখলেও কোনও আপত্তি নেই।'

'অনেক কিছু নতুন জ্ঞান অর্জন করছি বইটা থেকে। মেলডি, হারমনি, পলিফনি, কাউন্টার-পয়েন্ট—অনেক কিছু জানা গেল। মিউজিকের ইতিহাসেও দেখছি রহস্য রয়েছে—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কম্পোজার মোৎসার্টকে নাকি আর এক কম্পোজার সালিয়েরি বিষ খাইয়ে হত্যা করেন। অথচ এই ক্রাইমের কোনও কিনারা হয়নি।'

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু আজ আমাদের প্ল্যানটা কী?'

'আচার্য বাড়িতে নাকি কাল আবার ডাকাত পড়েছিল, কিন্তু প্রদ্যুম্নবাবুর তৎপরতার জন্য সে কিছু করতে পারেনি। আমার বিশ্বাস রাত্তিরে ও বাড়িটাকে একটু চোখে চোখে রাখা ভাল।'

'রাত্তিরে?'

'হ্যাঁ। এই ধরুন সাড়ে এগারোটা থেকে শুরু করে একটা দেড়টা পর্যন্ত।'

'সেটা কি করে সম্ভব হচ্ছে?'

'বাড়ির উত্তর দিকের গা ঘেঁষে গলি গেছে। উত্তর দিকেই পিছনের দরজা। ধরুন যদি সেই গলির ফুটপাথে বসে থাকা যায় বাড়ির দিকে চোখ রেখে।'

'ফুটপাথে বসে থাকা? তিনজন ভদ্রলোক ফুটপাথে বসে থাকবেন আর রাস্তার লোক সন্দেহ করবে না?'

'তা করবে না যদি তাদের আর ভদ্দরলোক বলে না মনে হয়।'

ফেলুদার প্ল্যানটা শুনে মাথা ঘুরে গেল। বোঝাই যাচ্ছে ও আবার ছদ্মবেশের কথা বলছে। কিন্তু কী ছদ্মবেশ? উত্তরটা ফেলুদাই দিল।

'আপনি কি তাস একেবারেই খেলেননি?' লালমোহনবাবুকে জিগ্যেস করল ফেলুদা।

'স্কুলে খেলতুম এক কালে, আর গোলাম চোর...।'

'যাই হোক, তাস চেনেন তো? গোলাম দেখলে সাহেব বলে ভুল হবে না তো, আর চিড়িতন দেখলে ইস্কাপন?'

'পাগল।'

'তাহলে তিনজন প্লাস হরিপদবাবু মিলে টোয়েন্টি-নাইন খেলব। উৎকলবাসী চারজন চাকর হয়ে যাব আমরা। মেক-আপের ভার অবিশ্যি আমার উপর। নেহাতই কথা বলার দরকার হলে বলা হবে, আর তখন অকারান্ত শব্দ হসন্ত দিয়ে শেষ করা চলবে না। অর্থাৎ তাস হবে 'তাসঅ', সাহেব হবে 'সাহেবঅ'। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি মিস্টারঅ মিত্তিরঅ।'

লালমোহনবাবুর চোখে একটা ভাসা ভাসা চাহনি দেখে বুঝতে পারলাম তিনি বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছেন। আমি অবাক ভাবটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি, তবে এটা বুঝেছি যে তদন্তটা বেশ জমে উঠেছে।

লালমোহনবাবু বারোটা নাগাদ যাবার সময় বলে গেলেন আবার সন্ধ্যা সাতটায় আসবেন, আমাদের বাড়িতেই খাবেন। তারপর আমরা এখান থেকেই মেক-আপ নিয়ে এগারোটা নাগাত চলে যাব যদু নস্কর

জেনে। গলিটা দেখে নিরিবিলি বলেই মনে হয়েছে, একটা ল্যাম্প পোস্ট দেখে তার নীচে চাদর বিছিয়ে বসে খেললেই চলবে। হরিপদবাবু তাঁর বাড়ি থেকে এক প্যাকেট পুরনো তাস এনে দেবেন বলেছেন। খেলাটা সন্ধ্যাবেলাই লালমোহনবাবুকে মোটামুটি শিখিয়ে নেওয়া হবে।

ফেলুদার উত্তেজনা থাকলেও বোঝার উপায় নেই; সে সারাদিন মিউজিক এনসাইক্লোপিডিয়া পড়েছে। আর আমি পত্রিকার পাতা উলটেছি।

এই মেক-আপটা সহজ ছিল, তাই আমরা অনায়াসেই সাড়ে দশটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। ধুতিগুলোকে চায়ের জলে ভিজিয়ে একটু ময়লা করে নিয়েছিলাম, চাদর আর তাস—দুটোই যোগাড় এনেছিলেন হরিপদবাবু। লালমোহনবাবুকে টোয়েন্টি-নাইন শিখিয়ে দু হাত খেলে নেওয়া হয়েছে, ভদ্রলোক খালি মনে মনে বিড়বিড় করে চলেছেন—গোলাম নহলা টেক্কা দশ সাহেব বিবি আট সাত।

গাড়িটাকে বড় রাস্তায় অন্ধকারে একটা জায়গায় পার্ক করে আমরা চারজন চাদর বগলে নিয়ে যদু নস্করের লেনে গিয়ে হাজির হলাম। অন্যদিন এ রাস্তায় পুলিশ থাকে, আজ ফেলুদার অনুরোধে নেই। রাস্তার এক পাশে একটা বিরাট জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে আচার্যদের বাড়ি। উত্তর দিকের ঘরগুলোর পিছন দিকটা রাস্তার উপর পড়েছে, তার মধ্যে বাঁ দিকে, অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব কোণে, প্রথম হল লাইব্রেরি, আর তার পরেই হল প্রদ্যুম্নবাবুর শোবার ঘর। ঘরের সারির শেষে হল বাড়ির পিছনের দরজা, সেটা এখন বন্ধ। লাইব্রেরি আর প্রদ্যুম্নবাবুর ঘর দুটোতেই বাতি জ্বলছে, তবে ভদ্রলোক যে কোন ঘরে রয়েছেন সেটা রাস্তা থেকে বোঝার কোনও উপায় নেই।

আমরা চার জনে ল্যাম্প পোস্টের তলায় চাদর পেতে বসে গেলাম। ফেলুদা তার গায়ের চাদরের তলা থেকে একটা পানের ডিবে বার করে তার থেকে চার জনকে চারটে পান দিয়ে লালমোহনবাবুকে বলল, 'গালে গুঁজে রেখে দিন; আর বার বার পিক ফেলবেন না।'

আচার্য বাড়ি থেকে বোধ হয় গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে এগারোটা বাজতে শোনা গেল।

'উনিশত্র।'

লালমোহনবাবু ফেলুদার পার্টনার হয়েছেন, এখন ডাকাডাকি চলছে। ফেলুদা সঙ্গে এক প্যাকেট বিড়ি এনেছে। তার থেকে একটা হরিপদবাবুকে দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে নিল। বিশ ফুটের বেশি চওড়া গলি নয়, আর তাতে লোক চলাচল প্রায় নেই বললেই চলে। ও পাশে কিছু দূরে একটা রিকশা দাঁড় করানো রয়েছে, তার চালকটা ঘুমিয়ে কাদা। আজ বোধ হয় অমাবস্যা, কারণ আকাশে মেঘ না থাকলেও বেশ ঘুটঘুটে। মাথার উপর কালপুরুষ দেখা যাচ্ছে।

'তুরুপত্র মারুচি কাঁই?'

লালমোহনবাবু উড়িয়া ভাষা বলতে চেষ্টা করে একটু বাড়াবাড়ি করছেন, তাই ফেলুদা একটা 'উঃ' শব্দ করে ওঁকে সতর্ক করে দিল। আশ্চর্য এই যে যদিও আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সময় কাটানো, টোয়েন্টি-নাইন খেলাটা এমনই যে এরই মধ্যে বেশ জমে উঠেছে। সময় কোথা দিয়ে চলে যাচ্ছে টেরই পাচ্ছি না। আচার্য বাড়িতে একটা ঢং শব্দ পেয়ে সাড়ে এগারোটা বেজেছে বুঝে বেশ অবাক লাগল। ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু একবার একটা বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করে বিশেষ যুৎ করতে না পেরে সেটা আবার ফেলে দিয়েছেন।

একটা কুকুরের ডাকে আর একটা সাড়া দিয়েছে এমন সময় ফেলুদা হঠাৎ আমার হাঁটুতে একটা হাত রাখল।

একটা লোক আসছে গলির পশ্চিম দিক থেকে। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, তার উপর একটা ছেয়ে রঙের চাদর জড়ানো। চাদর আমাদের গায়েও আছে, কারণ অক্টোবর মাসের রাত্তিরে বেশ চিনচিনে ঠাণ্ডা।

লোকটা আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল অন্য ফুটপাথ দিয়ে। সে হাঁটছে আচার্য বাড়ির গা ঘেঁষে।

এবার সে দরজার কাছাকাছি পৌঁছে হাঁটার গতি কমাল।

তারপর দরজার সামনে এসে থামল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্...

তিনটে মৃদু টোকা দরজার উপর। কান পেতেছিলাম বলে শব্দটা শুনতে পেলাম। দরজা খুলে গেল। অল্প ফাঁক, ঠিক যাতে একটা মানুষ

ঢুকতে পারে। মানুষটা ঢুকে গেল। যে ঢুকল তাকে আমরা তিন জনেই চিনি।

ইনি হলেন বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার অশ্বিনী ভড়।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

অর্থাৎ অশ্বিনীবাবু ঢোকার পর পনেরো মিনিট হয়ে গেছে।

এবার ভদ্রলোক বেরোলেন। তাঁর সঙ্গে যদি কিছু থেকে থাকে তো সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই, কারণ হাত দুটো চাদরের নীচে।

ভদ্রলোক যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেদিক দিয়েই আবার চলে গেলেন।

আমাদের পাহারা সার্থক এবং শেষ। 'এই দানটা খেলে উঠব', ফেলুদা ফিস ফিস করে বলল।

॥ ৯ ॥

পরদিন সকালে ফেলুদা বোসপুকুরে ফোন করল প্রদ্যুম্নবাবুকে। আমি বসবার ঘরে এক্সটেনশন টেলিফোনে কান লাগিয়ে কথা শুনলাম।

'কে, মিস্টার মল্লিক?'

'হ্যাঁ, কী খবর?'

'কাল রাত্রে কিছু হয়নি তো?'

'কই, না তো।'

'এক কাজ করুন; আমি ফোনটা ধরছি, আপনি একবার ইন্দ্রনারায়ণবাবুর কাজের ঘরে গিয়ে দেখে আসুন তো সব ঠিক আছে কিনা।'

আধ মিনিটের বেশি ধরতে হল না। এবারে প্রদ্যুম্নবাবুর গলার স্বর একেবারে বদলে গেছে।

'ও মশাই, সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'কী হল?'

'সব নতুন নাটক আর গান হাওয়া!'

'আমি আন্দাজ করেছিলাম বলেই ফোন করলাম।'

'এর মানেটা কী?'

'অন্য রহস্যগুলোর সঙ্গে আর একটা যোগ হল।'

'আপনি কি আজ একবার আসছেন?'

'প্রয়োজন হলে যাব। তার আগে দারোগা সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলতে হবে।'

ফোনটা রেখে ফেলুদা মণিলাল পোদ্দারের নম্বর ডায়াল করল।

'শুনুন মি. পোদ্দার, গলি থেকে আপনার লোক সরিয়ে নেবার জন্য ধন্যবাদ। কাল সত্যিই কাজ হয়েছে। আপনি অশ্বিনীবাবুর দিকে দৃষ্টি রাখছেন তো? উনি কিন্তু কাল রাত বারোটায় আচার্য বাড়িতে গিয়ে ইন্দ্রনারায়ণবাবুর বহুমূল্য সব কাগজপত্র সরিয়ে নিয়ে গেছেন।'

'লোকটা খুব গোলমেলে', বললেন মি. পোদ্দার। 'খুনের টাইমের জন্য ওর কোনও অ্যালিবাই নেই। সেদিন রাত্রে আচার্য বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফেরেনি। বলছে পথে ট্যাক্সি বিগড়ে যায় বলে আটকে পড়েছিল, কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপনার প্রোগ্রেস কেমন?'

'মোটামুটি ভালোই। অবিশ্যি আমরা তো ঠিক এক রাস্তায় চলছি না, তাই আমার সিদ্ধান্তগুলো আপনার সঙ্গে মিলবে না।'

'তা না মিলুক। যে কোনও রকমে রহস্যের সমাধান হলেই হল।'

ফেলুদা কোন রাস্তায় চলছে সেটা জানতে চাইলে উত্তর পাওয়া যাবে না, তাই আর আমি ওদিকে গেলাম না। ফেলুদা ফোন রেখে বলল, 'আমি একটু বেরোচ্ছি। স্টেটসম্যানের পার্সোনাল কলামে একটা জরুরি বিজ্ঞাপন দিতে হবে। একটা ভাল বেহালার দরকার।'

স্টেটস্‌ম্যানে পরদিনই বেরোল যে একটা উৎকৃষ্ট বিদেশী বেহালার প্রয়োজন, অমুক বক্স নাম্বারে লিখে খবর জানানো হোক।

এই বিজ্ঞাপনের উত্তর এসে গেল দু দিনের মধ্যে। চিঠিটা পড়ে ফেলুদা বলল, 'আমাকে একটু লাউডন স্ট্রিটে যেতে হচ্ছে, বিশেষ দরকার।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এসে ফেলুদা বলল, 'বেজায় দাম চাইছে।'

আমি বললাম, 'এনসাইক্লোপিডিয়া পড়ে তোমার কি এই বয়সে বেহালা শেখার সখ হল?'

ফেলুদা গম্ভীরভাবে বলল, 'ইট ইজ নেভার টু লেট টু লার্ন।'

অর্থাৎ আরও রহস্য।

এদিকে লালমোহনবাবুও ঘন ঘন আসছেন আর ছটফট করছেন। একবার আমায় একা পেয়ে বললেন, 'তোমার দাদার সব ভাল শুধু এক এক সময় চুপ মেরে যাওয়ার ব্যাপারটা মোটেই বরদাস্ত করা যায় না।'

বুধবার পার্সোনাল কলামে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, শুক্রবার উত্তর পেয়ে ফেলুদা লাউডন স্ট্রিটে গিয়েছিল, শনিবার সকালে দেখি ওর চেহারা একদম পালটে গেছে। গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে বলল, 'আজ আচার্য বাড়ি যেতে হবে, কীর্তিনারায়ণকে এখুনি ফোন করা দরকার।'

কীর্তিনারায়ণ ফোন পেয়ে বললেন, 'আপনার কাজ কি মিটে গেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে', বলল ফেলুদা, 'তবে সেটা সম্পূর্ণ মিটবে একটা মিটিং করে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বললে পরে। আর সেই বলাটা বলতে হবে সকলের সামনে। অন্তত আপনি, আপনার দুই ছেলে, আর প্রদ্যুম্নবাবুকে সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে।'

'সেটা আর এমন কঠিন কী? এরা তো সবাই বাড়িতেই আছে। সে ব্যবস্থা আমি করছি; আপনি চিন্তা করবেন না। কটায় আসছেন?'

'এই ধরুন দশটা।'

কীর্তিনারায়ণের পর মণিলাল পোদ্দারকে ফোন করে ফেলুদা দশটায় বোসপুকুরে আসতে বলল।

লালমোহনবাবু এলেন নটায়, আমরা সাড়ে নটায় চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আচার্য বাড়িতে পৌঁছে দেখি দারোগা সাহেব এসে গেছেন। ফেলুদা বলল, 'আজই ঘটনার ক্লাইম্যাক্স, অতএব আপনার থাকার প্রয়োজন।'

দোতলায় যে বৈঠকখানায় প্রথম দিন কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে কথা হয়েছিল, আজও সেখানেই ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কীর্তিনারায়ণ এসে গেলেন।

'কই, এদের সব ডাকো, প্রদ্যুম্ন।'

প্রদ্যুম্নবাবু বেরিয়ে গেলেন দুই ছেলেকে ডাকতে।

প্রথমে এলেন দেবনারায়ণবাবু, ঘরে এসেই বললেন, 'পুলিশ তো অনেক দূর এগিয়েছে বলে শুনেছি, তাহলে আবার এই ডেকে [illegible]

বক্তৃতা শুনতে হচ্ছে কেন?'

ফেলুদা বলল, 'পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে আমিও এগিয়েছি, কিন্তু সেটা একটু অন্য পথে। আর মার্ডার ইজ নট দা ওনলি ক্রাইম কমিটেড ইন দিস কেস—সেটাও আপনাকে জানানো দরকার। আমি পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার করে বলতে চেষ্টা করব।'

ইংরেজিতে যাকে বলে 'গ্রান্ট', সেই রকম একটা শব্দ করে দেবনারায়ণবাবু চুপ করে গেলেন। আসলে ভদ্রলোকের মুখে অষ্টপ্রহর পাইপ থাকে, বাপের সামনে সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে বোধ হয় উনি আরও খাপ্পা হয়েছেন।

হরিনারায়ণবাবু এখনও কোনও তম্বি করলেন না, কিন্তু তাঁর ভ্রূকুটি দেখে বুঝলাম যে তিনিও ব্যাপারটা পছন্দ করছেন না।

সকলে উপস্থিত দেখে ফেলুদা আরম্ভ করল।

'সাতই অক্টোবর রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য খুন হন। তাঁকে খুন করে কী লাভ হতে পারে এইটে বিচার করার সময় আমরা জানতে পারি যে তিনি ছিলেন তাঁর বাপের প্রিয় পুত্র। অনুমান করা যায় যে কীর্তিনারায়ণের উইলে তাঁর ছেলের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাবে, এবং সেই ছেলে না থাকায় সে উইল বদল হবে। এই বদলানো উইলে তাঁর অন্য দুই ছেলের প্রাপ্তি বেড়ে গেলেও, যতদিন কীর্তিনারায়ণ বেঁচে আছেন ততদিন তাঁরা এই টাকা পাচ্ছেন না। অর্থাৎ ভাইকে খুন করে তাঁদের ইমিডিয়েট কোনও লাভ নেই।

'আর একটা তথ্য আমরা জানতে পারি সেটা এই, যে বীণাপাণি অপেরা ইন্দ্রনারায়ণকে ভারত অপেরা ছেড়ে তাদের দলে যোগ দেবার জন্য প্রলোভন দেখাচ্ছিল, কিন্তু ইন্দ্রনারায়ণ তাতে রাজি হন নি। এই অবস্থায় ভারত অপেরাকে পঙ্গু করার জন্য ইন্দ্রনারায়ণকে খুন করার একটা কারণ থাকতে পারে। এ কাজটা বীণাপাণি অপেরা গুণ্ডা লাগিয়ে করতে পারে। খুনের দিন রাত এগারোটা পর্যন্ত ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কথা বলেন বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার অশ্বিনী ভড়। তিনি চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে খুনটা হয়।

'এখানে আর একটা তথ্য আমাদের খুব কাজে লাগে। আমরা

লীনার কাছ থেকে জানতে পারি যে, ইন্দ্রনারায়ণের কাছে তাঁর লেখা পাঁচটি নতুন নাটক ও খান কুড়ি গান ছিল। যাত্রার বাজারে যে এ জিনিসের দাম অনেক সেটা আর বলে দিতে হবে না। আমরা জানি যিনি ইন্দ্রনারায়ণকে খুন করেছিলেন তিনি ইন্দ্রনারায়ণের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলেন, কিন্তু সময়ের অভাবেই হোক বা অন্য কারণেই হোক, তার কিছুই সরাতে পারেননি। গত কাল রাত্রে বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার এসে নাটক আর গানগুলো নিয়ে গেছেন।

'তাহলে অনুমান করা যায় যে খুনের একটা উদ্দেশ্য হতে পারে এই নাটক আর গানগুলি হাত করা। এ কাজ কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে সহজ নয়। কারণ ইন্দ্রনারায়ণের কাগজপত্রের সঙ্গে তাদের পরিচয় থাকার সম্ভাবনা কম। ঘরের লোকের পক্ষে এ খবর জানা অনেক বেশি স্বাভাবিক। ঘরের লোক যদি খুনের সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলো নাও নিতে পারেন, তার জন্য পরে সময় পেতে কোনও অসুবিধা নেই, কারণ কাগজগুলো থেকেই যাচ্ছে। এখানে আমাদের দেখা দরকার বাড়ির কোনও লোকের টাকার টানাটানি যাচ্ছিল কিনা।

'এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে হরিনারায়ণবাবু সম্প্রতি তাঁর ক্লাবে বেশি টাকায় জুয়া খেলে অনেক লোকসান দিয়েছেন। কিন্তু তাহলেও হরিনারায়ণবাবুর পক্ষে ইন্দ্রনারায়ণের নাটক আর গান চুরি করে সেগুলো অন্য যাত্রা দলে বিক্রি করাটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। তাহলে আর কে অভাবী ব্যক্তি আছেন বাড়িতে?

'এখানে অকস্মাৎ একটি তথ্য আবিষ্কার করার ঘটনা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই।

'প্রদ্যুম্নবাবু যে দিন আমার বাড়িতে আসেন সে দিন তাঁর পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ আমাদের সোফাতে পড়ে যায়। এই কাগজে ডট পেন দিয়ে দু লাইন কথা লেখা ছিল—"হ্যাপি বার্থডে" আর "হুকুম চাঁদ"। প্রদ্যুম্নবাবুকে জিগ্যেস করাতে উনি বলেন কাগজটা ওঁর না। এর কিছু দিন পরে হঠাৎ শনিবারের কাগজের শেষ পাতায় একটি নামের তালিকা থেকে জানতে পারি যে হ্যাপি বার্থডে আর হুকুম চাঁদ দুটোই হল রেসের ঘোড়ার নাম। তখন আমার ধারণা হয় যে, প্রদ্যুম্নবাবু রেস খেলেন, কিন্তু সে তথ্য আমাদের কাছে গোপন রাখতে চান।

আমরা সে দিনই রেসের মাঠে যাই। সেখানে আমি প্রদ্যুম্নবাবুকে দেখি ভিড়ের মধ্যে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বেটিং করতে। অর্থাৎ প্রদ্যুম্নবাবু যে জুয়াড়ি সেটা প্রমাণ হয়ে যায়। আমার ধারণা যারা নিয়মিত রেস খেলে এবং যাদের রোজগার খুব বেশি নয়, তাদের সব সময়ই টাকার টানাটানি হয়। সুতরাং রেসে যদি বড় রকম হার হয়ে থাকে তাহলে খুনের মোটিভ প্রদ্যুম্নবাবুর ছিল, এবং সেই সঙ্গে সুযোগও ছিল। সত্যি বলতে কি, তার চেয়ে বেশি সুযোগ এ বাড়ির কারুর ছিল না। খুনের সময় প্রদ্যুম্নবাবু কাজ করছিলেন, তাঁর পক্ষে নাটমন্দিরের বারান্দা দিয়ে এসে ইন্দ্রনারায়ণের মাথায় বাড়ি মেরে কাজটা করা ছিল অত্যন্ত সহজ ব্যাপার।

'প্রদ্যুম্ন মল্লিকের অবস্থাটা আরও ঢিলে হয়ে যায় এই কারণেই যে তিনি হলেন মিথ্যেবাদী। তিনি শুধু রেসের ব্যাপারেই মিথ্যে বলেন নি; তাঁর মতে কদিন আগে এ বাড়িতে আবার চোর আসে এবং সে চোরকে বাধা দিতে গিয়ে তিনি ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে হাঁটুতে চোট পান—যার ফলে তাঁকে নাকি খোঁড়াতে হচ্ছে। কিন্তু আজ সকালে তিনি অন্তত দু বার হাঁটার সময় খোঁড়াতে ভুলে গেছেন সেটা বোধহয় তিনি নিজে খেয়াল করেননি।

'গত রবিবার রাত্তিরে ইন্দ্রনারায়ণের ঘর থেকে নাটক ও গানগুলি চুরি যায়। সেগুলো কার হাতে গেছে আমরা জানি, কারণ আমরা তখন বাড়ির পিছনের গলিতে ল্যাম্প পোস্টের আলোয় বসে তাস খেলছিলাম। বীণাপাণি অপেরার ম্যানেজার আসেন পৌনে বারোটায়। তাঁকে বাড়ির পিছনের দরজা খুলে দেওয়া হয়। প্রদ্যুম্নবাবুর ঘরের বাতি জ্বলছিল। আমাদের ধারণা তাঁর সঙ্গেই হয় লেনদেনটা। অশ্বিনী গুড় টাকা দেন, প্রদ্যুম্নবাবু তার বিনিময়ে তাঁকে নাটক ও গানগুলো দেন। যদি আমি ভুল বলে থাকি তাহলে প্রদ্যুম্নবাবু আমাকে শুধরে দিতে পারেন।'

প্রদ্যুম্নবাবুর মুখ ফ্যাকাশে, মাথা হেঁট, শরীরে কাঁপুনি। দারোগা সাহেব এগিয়ে গিয়ে তাঁর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়েছেন, ঘরে রয়েছে আরও দু জন কনস্টেবল।

'এই হল ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য খুনের ইতিহাস', বলল ফেলুদা। 'কিন্তু

এখানেই অপরাধের শেষ নয়। এবার আমি দ্বিতীয় অপরাধে আসছি।

'আমি প্রথম দিন যখন এ বাড়িতে আসি তখন একটা ব্যাপার দেখে আমার একটু খটকা লেগেছিল। সেটা হল ইন্দ্রনারায়ণবাবুর বেহালা। একশো বছরের পুরোনো বেহালা এত ঝকঝকে হয় কী করে? অবিশ্যি আমার বেহালার অভিজ্ঞতা কম, কত বছরে তার কী রকম চেহারা হয় সেটা আমার জানা নেই, তাই ব্যাপারটা নিয়ে তখন আর মাথা ঘামাইনি। সে দিনই অবিশ্যি শুনেছিলাম যে কন্দর্পনারায়ণ রসিকতা করে তাঁর বেহালাকে বলতেন 'আম আঁটির ভেঁপু'। সম্প্রতি দুটো জিনিস পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। এক হল পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে এক এনসাইক্লোপিডিয়া আর দুই হল কন্দর্পনারায়ণের বিলেতের ডায়রি। প্রথম বই থেকে আমি জেনেছি যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বেহালা বা যন্ত্রের সংস্কার হয় ইতালিতে। তখন থেকে বেহালার চেহারা এবং আওয়াজ পালটে আরও সুন্দর ও আরও জোরালো হয়। ইতালির বেহালা প্রস্তুতকারকদের মধ্যে তিন জনের নাম সবচেয়ে বিখ্যাত। এরা তিন জনেই সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। প্রথম হল আনটন স্ট্রাডিভারি, দ্বিতীয় আন্দ্রেয়াস গুয়ারনেরি, আর তৃতীয় নিকোলো আমাটি। এর মধ্যে আমাটিই প্রথম বেহালার সংস্কার করেন ইতালির ক্রেমোনা শহরে।

'তখনও আমার মাথায় আসেনি যে এই আমাটি আর কন্দর্পনারায়ণের "আম আঁটি" একই জিনিস। এটা পরিষ্কার হয় কন্দর্পনারায়ণের ডায়রি পড়ে। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন', ফেলুদা পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে পড়ল—"আই বট অ্যান আমাটি টুডে ফ্রম এ মিউজিশিয়ান হু ওয়জ সাঙ্ক ইন ডেট অ্যান্ড হু সোল্ড ইট টু মি ফর টু থাউজ্যান্ড পাউন্ডস। ইট হ্যাজ এ গ্লোরিয়াস টোন।" অর্থাৎ আমি আজ একটি দেনায় জর্জরিত বাজিয়ের কাছ থেকে একটি আমাটি বেহালা কিনলাম দু হাজার পাউণ্ডে। যন্ত্রটির আওয়াজ আশ্চর্য সুন্দর।—তখনকার দিনে দু হাজার পাউণ্ড মানে বিশ হাজার টাকা। আজকে একটি আমাটি বেহালার দাম দেড়-দু লাখ টাকা।

'এমন একটি বেহালা এই বাড়িতে এতকাল পড়েছিল, আর এই

বেহালা বাজার কনসার্টে বাজাতেন ইন্দ্রনারায়ণ আচার্য। বেহালার আসল খবর কেউ জানতেন কি? আমার মনে হয় না কীর্তিনারায়ণবাবু বা দেবনারায়ণবাবু জানতেন, কিন্তু দু জনের জানার কথা। এক হল প্রদ্যুম্ন মল্লিক, যিনি চন্দ্রনারায়ণের ডায়রি পড়েছিলেন, আর এক হল হরিনারায়ণবাবু। তিনি বিদেশী সংগীত সম্বন্ধে জানেন, ভাল বেহালার দাম জানেন, এবং এটাও নিশ্চয়ই জানেন যে বেহালার গায়ে দু দিকে যে ইংরিজি এস-এর মতো ফাঁক থাকে, তার একটায় চোখ লাগালে ভিতরে বেহালা প্রস্তুতকারকের নাম সমেত লেবেল দেখা যায়।

'এই আমাটির কথা জানার পরেই আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হয় যে ইন্দ্রনারায়ণের খুনের পর তাঁর বেহালাটি সরানো হয়েছে এবং তার জায়গায় একটি সস্তা নতুন বেহালা কিনে এনে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই বেহালা সরিয়েছে কে, এবং যে সরিয়েছে সে তো টাকার জন্যই সরিয়েছে?

'আমার সন্দেহটা স্বভাবতই হরিনারায়ণবাবুর উপর পড়ে এবং এটাও বুঝতে পারি যে বেহালা পাচার হয়ে ঘরে টাকা এসে গেছে। তখন আমি ভাল বিদেশী বেহালা কিনতে চাই বলে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই। তার উত্তরে আমায় চিঠি লেখেন জনৈক মি. রেবেলো। এই রেবেলোর বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি একজন বিরাট প্রাচীন দ্রব্য বিক্রেতা—যাকে বলে অ্যানটিক ডিলার। তিনি বলেন তাঁর কাছে একটি আমাটি বেহালা আছে যেটা তিনি দেড় লাখ টাকায় বিক্রি করতে রাজি আছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি বেহালাটা তিনি মি. আচার্যর কাছ থেকে কিনেছেন কিনা। তাতে তিনি হ্যাঁ বলেন এবং বলেন "ইট ইজ দ্য ওনলি আমাটি ইন ইন্ডিয়া।"

'এই হল হরিনারায়ণবাবুর অপরাধের কাহিনী, এবং আমার বক্তৃতারও এখানেই শেষ।'

আশ্চর্য এই যে ফেলুদার একটা কথাতেও কোনও প্রতিবাদ শোনা গেল না। প্রদ্যুম্নবাবু এখন মি. পোদ্দারের জিম্মায়। হরিনারায়ণবাবু রাম টিপে বসে আছেন মাথা হেঁট করে। দেবনারায়ণবাবু লজ্জায় লাল হয়ে ঘর থেকে চলে গেছেন। কীর্তিনারায়ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হরি যদি আমায় বলত তাহলে আমি ওকে জুয়োর দেনা শোধ করার টাকা

দিয়ে দিতাম। মিছিমিছি আমাদের পরিবারের একটা আশ্চর্য সম্পত্তি সে বেহাত করল। কিন্তু প্রদ্যুম্ন যে এত অসৎ তা আমি ভাবতে পারিনি। তাকে এইটুকুই বলতে পারি যে সে আমার পূর্বপুরুষের জীবনী লেখার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। তার উপযুক্ত শাস্তি হলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।'

* * *

কীর্তিনারায়ণের বোধ হয় খুবই শখ ছিল যে কন্দর্পনারায়ণের একটা জীবনী লেখা হোক। না হলে আর লালমোহনবাবুকে তিনি অফারটা করেন?

'আপনি তো লিখিয়ে মানুষ—রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক—তা কন্দর্পনারায়ণের চেয়ে বড় রহস্য আর রোমাঞ্চ একই লোকের জীবনে কিন্তু আর পাবেন না।'

লালমোহনবাবু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ঘাড় কাৎ করে বললেন, 'আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি, আমার লেখার কোনও মূল্যই নেই।'

পরে অবিশ্যি উনি ফেলুদাকে বলেছিলেন, 'রক্ষে করুন মশাই—ওই খুন হওয়া বাড়িতে বসে আমি কন্দর্পনারায়ণের জীবনী নিয়ে রিসার্চ করব!—বেঁচে থাকুক আমার রহস্য-রোমাঞ্চ, বেঁচে থাকুক প্রখর রুদ্র—অ্যান্ড লং লিভ দ্য থ্রি মাস্কেটিয়ারস!'

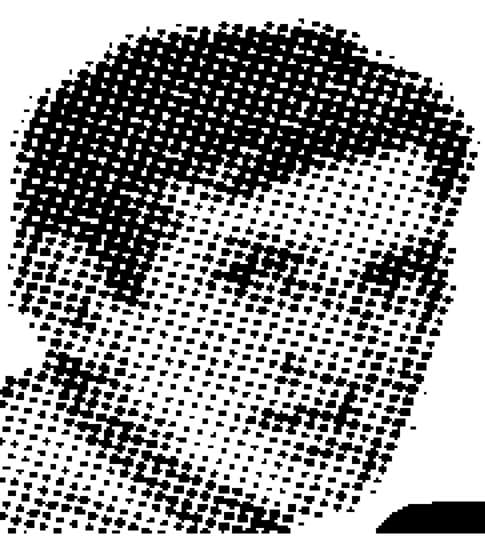

অপ্সরা থিয়েটারের মামলা

Pradosh C. Mitter

Private Investigator

অপ্সরা থিয়েটারের মামলা

॥ ১ ॥

টিভি-তে শার্লক হোম্‌স দেখে ফেলুদা মুগ্ধ। বলল, 'একেবারে বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে হোম্‌স আর ওয়াটসন। জানিস তোপ্‌সে—আমাদের যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা ওই শার্লক হোম্‌সের কাছে। সব প্রাইভেট ডিটেকটিভের গুরু হচ্ছে হোম্‌স। তাঁর স্রষ্টিকর্তা কন্যান ডয়েলের জবাব নেই।'

জটায়ু সায় দিয়ে বললেন, 'লোকটা কত গল্প লিখেছে ভাবুন তো! এত প্লট কি করে যে মাথায় আসে সেটা ভেবে পাই না। সাধে কি আমার টাক পড়েছে? প্লট খুঁজতে গিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ে!'

বাইরে বৃষ্টি পড়েছে, তার মধ্যে চা আর ডালমুটটা জমেছে ভাল। আসলে লালমোহনবাবুও একচল্লিশটা রহস্য উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু তার বেশির ভাগই ফেলুদার ভাষায় থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। তবে প্লটের জন্য মাথা খুঁড়লেও ভদ্রলোকের উৎসাহের অভাব নেই। আর সত্যি বলতে কি, ফেলুদার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর থেকে ওঁর গল্পও অনেক ইমপ্রুভ করে গেছে।

'শ্রীনাথকে একটু বল না ভাই তপেশ,' বললেন লালমোহনবাবু, 'আর এক কাপ চা হলে মন্দ হত না।'

আমি শ্রীনাথকে চায়ের ফরমাশ দিয়ে আসতেই দরজায় টোকা পড়ল। তার আগে অবশ্য ট্যাক্সি থামার শব্দ পেয়েছি।

দরজা খুলে দেখি ছাতা মাথায় এক ভদ্রলোক, মাঝারি হাইট, ফরসা রং, দাড়ি গোঁফ কামানো, বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ।

বললাম, 'কাকে চাই?' অবিশ্যি এ প্রশ্নটা না করলেও চলত, কারণ

দেখেই বুঝেছি মক্কেল।

'এটা কি প্রদোষ মিত্রের বাড়ি?' প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

এবারে ফেলুদাই বলে উঠল, 'আপনি আসুন ভিতরে।'

ভদ্রলোক ছাতাটা বন্ধ করে ঢুকলেন।

'ওটাকে দরজার পাশে রেখে দিন,' বলল ফেলুদা।

ভদ্রলোক তাই করলেন, তারপর সোফার এক পাশে এসে বসলেন। ফেলুদা বলল, 'আমার নাম প্রদোষ মিত্র; আর ইনি আমার বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলী।'

'যাক, তবু আপনাকে বাড়ি পাওয়া গেল,' বললেন ভদ্রলোক, 'টেলিফোন করে কানেকশন পাইনি। আজকাল যা হয় আর কি।'

'কী ব্যাপার বলুন।'

'বলছি। আগে আমার পরিচয়টা দিই। আমার নাম মহীতোষ রায়। নাম শুনে চিনবেন ততটা আশা করি না, যদিও থিয়েটার লাইনে আমার কিছুটা খ্যাতি আছে।'

'আপনি তো অপ্সরা থিয়েটারে আছেন, তাই না?'

'ঠিকই ধরেছেন। এখন প্রফুল্লতে অভিনয় করছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি।'

'আপনার কাছে এসেছি একটা সংকটে পড়ে।'

'কী সংকট?'

'কদিন থেকে আমি হুমকি চিঠি পাচ্ছি। কার কাছ থেকে তা বলতে পারব না।'

'হুমকি চিঠি?'

'তার কিছু নমুনা আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এই দেখুন।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে চারটে কাগজ বার করলেন, তারপর সেগুলো টেবিলের উপর রাখলেন। আমি দেখলাম একটায় লেখা 'সাবধান!' আর একটায় 'তোমার দিন ফুরিয়ে এল', আরেকটায় 'তোমার দুষ্কৃতির ফল ভোগ কর', আর চার নম্বরটায় 'আর সময় নেই। এবার ইষ্টনাম জপ কর!' গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লেখা, আর সবই যে এক লোকের লেখা তা বোঝবার উপায় নেই।

'এ সব কি ডাকে এসেছে?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এগুলো কদিনের মধ্যে পেয়েছেন?'

'সাতদিন।'

'কে লিখেছে কিছু অনুমান করতে পেরেছেন?'

'একেবারেই না।'

'আপনার প্রতি বিরূপ এমন কোনও লোকের কথা মনে করতে পারছেন না?'

'দেখুন, আমি থিয়েটারে কাজ করি। আমাদের মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়া, মনোমালিন্য—এ লেগেই আছে। আমি দু বছর হল অপ্সরায় আছি, তার আগে রূপমঞ্চে ছিলাম। আমাকে নেওয়া হয় একটি অভিনেতার জায়গায়। স্বভাবতই সে অভিনেতা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। সে নিশ্চয়ই ঈর্ষায় ভুগছে।'

'এই অভিনেতার নাম কী?'

'জগন্ময় ভট্টাচার্য। ভয়ানক ড্রিঙ্ক করতে শুরু করেছিল। তাই তাকে আর রাখা যায়নি। তিনি এখন কী করছেন কোথায় আছেন তা জানি না।'

'এই জগন্ময় ভট্টাচার্য ছাড়া আর কারুর কথা মনে পড়ছে?'

'আমার একটি ছোট ভাই আছে, তার সঙ্গে আমার বনে না। সে অবিশ্যি আলাদা থাকে। আমার বাবার মৃত্যুতে সম্পত্তি সব আমি পাই। আমার ছোট ভাই অসৎ সঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। বাবা তাই তাকে উইল থেকে বাদ দেন। ছোট ভাই স্বভাবতই খুব অসন্তুষ্ট হয়। এছাড়া শত্রু বলতে আর কাউকে মনে পড়ে না।'

'আপনি সাবধানে আছেন তো?'

'তা তো আছি, কিন্তু আপনি যদি একটু পথ বাতলে দেন।'

'এ-ব্যাপারে সাবধানে থাকতে বলা ছাড়া তো আর কিছু বাতলাবার নেই। আপনি থাকেন কোথায়?'

'বালিগঞ্জে। পাঁচ নম্বর পণ্ডিতিয়া প্লেস।'

'একাই থাকেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একটি চাকর আর একটি রান্নার লোক আছে। আমি এখনও বিয়ে করিনি।'

'সত্যি বলতে কি, এ অবস্থায় আমার আর কিছুই করার নেই। এ রকম হুমকি কেস আমার কাছে আগেও এসেছে। চিঠিগুলো থেকে কিছু ধরা যায় না। এখানে চারটে চিঠিতে দেখছি চার রকম পোস্টমার্ক, কাজেই কোত্থেকে এসেছে তাও বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছি শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। তবে আপনাকে কেউ উৎকণ্ঠায় ফেলতে চাচ্ছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি বলি কি আপনি পুলিশে যান। তারা এ সব ব্যাপারে আরও ভাল ব্যবস্থা করতে পারে।'

ভদ্রলোক যেন একটু মুষড়ে পড়লেন, বললেন, 'পুলিশ?'

'কেন, পুলিশের বিরুদ্ধে আপনার কোনও অভিযোগ আছে নাকি?'

'না, তা নেই।'

'তবে আর কি। আপনি সোজা থানায় গিয়ে রিপোর্ট করুন। আমায় যা বললেন তাই বলুন।'

ভদ্রলোক অগত্যা উঠে পড়লেন। ফেলুদা তাঁকে দরজা অবধি পৌঁছে দিল। তারপর ফিরে এসে বসে পড়ে বলল, 'ভদ্রলোকের ডান হাতের আঙুলে একটা আংটির দাগ দেখলাম। সেই আংটিটা কোথায় গেছে কে জানে।'

'বেচে দিয়েছেন বলছেন?' জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

'দিলে আশ্চর্য হব না। পায়ের জুতো জোড়ার অবস্থাও বেশ খারাপ। প্রফুল্লতে উনি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন না সেটা জানি। সেটা করছেন অপ্সরার স্টার অভিনেতা নেপাল লাহিড়ী।'

'কিন্তু কে ওঁর পিছনে লেগেছে বল তো', আমি প্রশ্ন করলাম।

'কী করে বলব বল। উনি যে দু জনের কথা বললেন তাদের এক জন হতে পারে। মোট কথা এ কেস আমার নেওয়া চলে না। আর অনেক সময় এগুলো স্রেফ ভাঁওতার উপর চলে। আমার কত টেলিফোন এসেছে বল তো হুমকি দিয়ে। সে সব মানতে হলে তো বাড়িতে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।'

কিন্তু এই চিঠির ব্যাপারটা যে ভাঁওতা নয় সেটা তিন দিন পরেই জানলাম।

॥ ২ ॥

খবরটা জানা গেল খবরের কাগজ মারফৎ। ছোট্ট করে লেখা খবর—অপ্সরা থিয়েটারের অভিনেতা নিখোঁজ। মহীতোষ রায় নাকি সন্ধ্যাবেলা থিয়েটার না থাকলে লেকের ধারে বেড়াতে যেতেন। গত পরশু, অর্থাৎ সোমবার, তিনি যথারীতি বেড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেন নি। বাড়ির চাকর থানায় গিয়ে খবর দেয়। পুলিশ এই নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।

ফেলুদা বিরক্ত হয়ে বলল, 'লোকটাকে পই পই করে বলেছিলাম সাবধানে থাকতে, তার লেকে বেড়াতে যাবার কি দরকার ছিল? যাই হোক, আমার কাছে যখন এসেছিলেন ভদ্রলোক, তখন একবার ওঁর বাড়িতে যাওয়া দরকার। ঠিকানাটা মনে আছে?'

'পাঁচ নম্বর পণ্ডিতিয়া প্লেস।'

'গুড। তোর স্মরণশক্তি পরীক্ষা করছিলাম।'

ন-টা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

পাঁচ নম্বর পণ্ডিতিয়া প্লেস একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি, তার একতলায় থাকতেন মহীতোষবাবু। চাকর দরজা খুলে দিলে আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। ফেলুদা চাকরকে বলল, 'তোমার মনিব আমার কাছে এসেছিলেন সাহায্য চাইতে। উনি মাঝে মাঝে হুমকি চিঠি পাচ্ছিলেন সে খবর তুমি জান?'

'জানি বইকী বাবু। আমি বাইশ বছর ওনার কাজ করছি। আমাকে সব কথাই বলতেন। আমি ওঁকে অনেক করে বলেছিলাম—আপনি বেড়াতে যাবেন না, বাড়িতে থাকুন, সাবধানে থাকুন। তা উনি আমার নিষেধ শুনলেন না। যখন দেখলাম রাত সাড়ে ন-টা হয়ে গেল তাও আসছেন না, তখন আমি নিজেই গেলাম লেকে। কোনখানটায় উনি বসতেন, কোনখানটায় বেড়াতেন, সেটা আমি জানতাম। কিন্তু কই, তাঁকে তো কোথাও দেখতে পেলাম না। তারপর পুরো একটা দিন কেটে গেল, এখনও কোনও খবর নেই। আমি থানায় গেলাম। তেনারা সব লিখে-টিখে নিলেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তো কিছুই হল না।'

ফেলুদা বলল, 'তুমি এখন আমাদের সঙ্গে একবার আসতে পারবে?

লেকে যে জায়গাটায় বসতেন সেটা যদি একবার দেখিয়ে দাও।'

'চলুন বাবু, যাচ্ছি।'

'তোমার নাম কী?'

'দীনবন্ধু, বাবু।'

আমরা তিন জন ট্যাক্সি করে লেকে গিয়ে হাজির হলাম।

জলের ধারে একটা আমলকি গাছের পাশে একটা বেঞ্চি, তাতেই নাকি হাঁটা সেরে বসতেন ভদ্রলোক। হাঁটার অভ্যাসটা ডাক্তারই বলে বলে করিয়েছিলেন। এখন চতুর্দিকে কোনও লোক নেই, ফেলুদা খুব মন দিয়ে বেঞ্চি আর তার চারপাশটা পরীক্ষা করে দেখল। প্রায় মিনিট পাঁচেক তন্ন তন্ন করে খুঁজে ঘাসের মধ্যে একটা পিতলের কৌটো পেল। দীনবন্ধু সেটা দেখামাত্র বলে উঠল, 'এ কৌটো তো বাবুর ছিল।' কৌটোটা খুলে ভিতরে এলাচ আর সুপুরি পাওয়া গেল। ফেলুদা সেটা পকেটে পুরে নিল। তারপর দীনবন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ভবানীপুর থানায় খবর দিয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।'

'ঠিক আছে। চল তোমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে আমরা একটু থানায় খবর দিয়ে আসি।'

মোটামুটি কলকাতার বেশির ভাগ থানার ও.সি.-র সঙ্গেই ফেলুদার আলাপ আছে। ভবানীপুর থানার ও.সি. হচ্ছেন সুবোধ অধিকারী। আমরা দীনবন্ধুকে পণ্ডিতিয়া প্লেসে নামিয়ে দিয়ে গেলাম অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে। রাশভারী হলেও বেশ মাইডিয়ার লোক, আর ফেলুদাকে খুব পছন্দ করেন। আমাদের দেখে একটু অবাক হয়েই বললেন, 'কী ব্যাপার, এত সকাল সকাল?'

আমরা দুটো চেয়ারে বসলাম।

ফেলুদা বলল, 'একটা ডিসাপিয়ারেন্সের কেস আপনাদের কাছে রিপোর্টেড হয়েছে। মহীতোষ রায়।'

'হ্যাঁ। এটা বোধহয় সত্যবান দেখছিল। দাঁড়ান, ওকে ডাকি। একটু চা চলবে?'

'তা আপত্তি নেই।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই ইনসপেক্টর সত্যবান ঘোষ এসে গেলেন।

ইনিও ফেলুদার যথেষ্ট চেনা; দু জনে হ্যান্ডশেক করার পর সত্যবান বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন।'

'মহীতোষ রায় বলে একটি অভিনেতা বোধহয় নিরুদ্দেশ হয়েছেন?'

'নিরুদ্দেশ কেন, আমার তো মনে হয় তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটা হুমকি চিঠি পাওয়া গেছে। আর লেকের ধারে মেরে ফেলে গায়ে কিছু ভারী জিনিস বেঁধে লাশ জলে ফেলে দিলে সে তো আর পাওয়াও যাবে না। আপনি এ ব্যাপারে কী করে ইন্টারেস্টেড হলেন?'

ফেলুদা মহীতোষবাবুর আসার কথাটা বলল। তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনারা কোনওরকম এগোবার রাস্তা খুঁজে পাননি বোধহয়?'

ঘোষ বললেন, 'ভদ্রলোক অপ্সরা থিয়েটারে অভিনয় করতেন। আমরা সেখানে খোঁজ করেছি, কিন্তু কিছু এগোতে পারিনি। থিয়েটারের কারুর সঙ্গে এমন শত্রুতা ছিল না যে খুন হতে পারে। পেটি জেলাসি সব সময়ই থাকতে পারে, কিন্তু সেটা খুনের কারণ হয় না।'

'ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?'

'মোটামুটি। বারো-শ টাকা মাইনে পেতেন। একা মানুষ, তাই চলে যেত। অবিশ্যি খুনই যে হয়েছে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। ভদ্রলোককে কেউ হয়তো ফুসলে নিয়ে গেছল, কিংবা ভদ্রলোক হয়তো নিজেই কোনও কারণে গা ঢাকা দিয়েছেন।'

'আমি আজ লেকের ওখানে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক যে বেঞ্চিতে বসতেন তার পাশেই ঘাসে ওঁর একটা মশলার কৌটো পাই।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো খুন বলেই মনে হচ্ছে। আততায়ীর সঙ্গে স্ট্রাগলের সময় পকেট থেকে কৌটোটা পড়ে গেছল।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'ঠিক আছে। আমাদের এদিক থেকে কোনও খবর পেলে আপনাকে জানাব।'

'ভেরি গুড। আমিও আপনাদের টাচে থাকব।'

মি. ঘোষ চলে গেলেন। চা এসে গিয়েছিল, আমরা চা খেয়ে উঠে পড়লাম।'

বাইরে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল, 'একবার অপ্সরা থিয়েটারে যাওয়া দরকার। ওই কেমিস্টের দোকান থেকে লালমোহনবাবুকে একটা ফোন করে বলে দে উনিও যেন চলে আসেন।'

ফোন করে আমরা আবার ট্যাক্সি ধরলাম। যেতে হবে সেই শ্যামবাজার।

॥ ৩ ॥

অপ্সরা থিয়েটারে পৌঁছে দেখি লালমোহনবাবু অপেক্ষা করছেন।

'কী ব্যাপার মশাই?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ কাগজ দেখেননি?'

'দেখেছি বইকী। মহীতোষ রায় তো হাওয়া।'

'হাওয়া কেন, বোধহয় খতম।'

সংক্ষেপে লালমোহনবাবুকে সকালের ঘটনাটা বলে দিল ফেলুদা।

'তাহলে এখন কি আমরা থিয়েটারে তদন্ত চালাব?'

'একবার অন্তত ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলি।'

আমরা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার গিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। গেটে দারোয়ান বলল ম্যানেজারের নাম কৈলাস বাঁড়ুজ্যে। তিনি তাঁর অফিসেই আছেন।

ম্যানেজারের আপিসে পৌঁছতে গেলে একটা ঘর পেরোতে হয়। সেখানে একজন ভদ্রলোক একটা টেবিলের সামনে বসে কাগজপত্র ঘাঁটছিলেন, জিগ্যেস করলেন আমাদের কী দরকার।

ফেলুদা এবার তার একটা কার্ড বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলল, 'একবার যদি কৈলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারি।'

ভদ্রলোক আমাদের অপেক্ষা করতে বলে গেলেন ভিতরের দিকে। মিনিটখানেক পরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আপনারা আসতে পারেন।'

আমরা তিন জনে গিয়ে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকলাম। বেঁটে, মোটা,

কালো ভদ্রলোক। নাকের নীচে একটা সরু গোঁফ, বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ। বললেন, 'আপনার নাম তো শুনেছি, কিন্তু হঠাৎ আমার এখানে আসার প্রয়োজন হল কেন সেইটেই ভাবছি।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার একজন অভিনেতা সম্বন্ধে কিছু জানার ছিল—যিনি দু দিন হল নিখোঁজ।'

'মহীতোষের কথা বলছেন? সে ব্যাপারে তো পুলিশ এসে এক দফা এনকোয়ারি করে গেছে।'

'ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিলেন। কতকগুলো হুমকি চিঠি পেয়েছিলেন সেই নিয়ে আমার পরামর্শ নিতে।'

'হুমকি চিঠি? তাহলে কি ও খুন হয়েছে নাকি? আমি তো ভাবলাম পাওনাদারের কাছ থেকে গা ঢাকা দিয়েছে।'

'না। ঠিক সে রকম মনে হচ্ছে না।'

'অবিশ্যি ও গিয়ে যে আমাদের একটা খুব বড় রকম ক্ষতি হয়েছে তা বলতে পারছি না। প্রশান্ত মোটামুটি চালিয়ে নিচ্ছে। পুলিশ কালকেই এসেছিল। আমরা বিশেষ কোনও ইনফরমেশন দিতে পারিনি। মহীতোষ একটু চাপা টাইপের চরিত্র ছিল। ওর কারুর সঙ্গে খুব একটা মাখামাখি ছিল না। অভিনয়টা মোটামুটি ভালই করত। তবে ওর ইচ্ছে ছিল প্রফুল্লতে মেন রোল করবার; সে ক্ষমতা ওর ছিল না।'

'ওঁর কোনও শত্রু ছিল না বলছেন?'

'বলছি তো—শত্রুও না, বন্ধুও না।'

'জগন্ময় ভট্টাচার্য বলে এককালে আপনাদের একজন অভিনেতা ছিলেন?'

'ছিল, কিন্তু তাকে তো অনেক দিন আগেই ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'তাঁর জায়গাতেই মহীতোষকে নেওয়া হয়, তাই না?'

'তা বটে। এটা আপনি ঠিক বলেছেন, আমার খেয়াল হয়নি।'

'এই জগন্ময় ভট্টাচার্যের বাড়ির ঠিকানা আপনার কাছে আছে?'

'পুরনো ঠিকানা আছে, সে তো এখন সেখানে নাও থাকতে পারে।'

কৈলাসবাবু একটা ঘণ্টা টিপলেন। পাশের ঘর থেকে একটি বছর পঁচিশ বয়সের ছেলে এসে দাঁড়াল।

'এঁদের জগন্ময়ের ঠিকানাটা দিয়ে দাও তো।'

এক মিনিটের মধ্যেই ঠিকানা এসে গেল। সাতাশ নম্বর নির্মল বোস স্ট্রিট। লালমোহনবাবু বললেন রাস্তাটা ওঁর জানা। আমরা উঠে পড়লাম।

নির্মল বোস স্ট্রিট শ্যামবাজারেরই একটা গলি। জগন্ময়বাবুর বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করে জানলাম ভদ্রলোক এখনও সেখানেই আছেন। ফেলুদা চাকরের হাতে তার কার্ডটা পাঠিয়ে দিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের ডাক পড়ল। আমরা একটা তক্তপোষ পাতা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তাতে একটি রোগা-রোগা কেন, রুগ্ণ বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে—ভদ্রলোক বসে আছেন। আমরা ঘরে ঢোকাতেও তিনি বসেই রইলেন।

'হঠাৎ আমার সঙ্গে ডিটেকটিভের কী প্রয়োজন পড়ল?'—ভদ্রলোকের প্রথম প্রশ্ন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি কি মহীতোষ রায় বলে একজন অভিনেতাকে চিনতেন?'

'চিনতুম বললে ভুল হবে। সে এল, আর আমি বরবাদ হয়ে গেলুম—এই চেনা। কিন্তু সে তো দেখছি উধাও হয়ে গেছে।'

'উধাও নয়, খুব সম্ভবত খুন হয়েছেন।'

'খুন? অবিশ্যি আমার তাতে বুক ফেটে কান্না আসবে তা নয়। সে আমার ভাত মেরেছিল, সেটাই হচ্ছে আমার কাছে সব চেয়ে বড় ট্রুথ।'

'তার মৃত্যুর আগে মহীতোষবাবু কতকগুলো হুমকি চিঠি পেয়েছিলেন। সেই ব্যাপারে আপনি কোনও আলোকপাত করতে পারেন?'

'আমি চিঠিগুলো লিখেছিলাম কিনা সেইটাই জানতে চাইছেন তো?'

'আপনার তার উপরে এখনও যথেষ্ট আক্রোশ আছে দেখছি।'

'সেটা আপনি কথাটা তুললেন বলে। মহীতোষ রায়ের ব্যাপার অতীতের ব্যাপার। এই নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাই না। আমি তারপরে দীপ্তি থিয়েটারে কাজ পেয়ে যাই, এখনও সেখানেই আছি, যা পাচ্ছি তাতে আমার চলে যায়। মদ ছেড়ে দিয়েছি। আমি সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কেবলমাত্র একটা সমস্যা আছে সে হল হাঁপের কষ্ট। এ

ছাড়া আমি দিব্যি আছি। মহীতোষের কথা আপনি মনে করিয়ে দিলেন বলে। নইলে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'আপনি অপ্সরা ছাড়ার পর মহীতোষবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?'

'নো স্যার। একবারও না। এমনকী মঞ্চে পর্যন্ত ওকে দেখিনি। অপ্সরা থিয়েটারে আমি যাই না।'

॥ ৪ ॥

এরপর তিন মাস কেটে গেছে; এর মধ্যে মহীতোষবাবুর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তিনি যে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন তাতে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। অপ্সরা থিয়েটারে আর একবার যাওয়া হয়েছিল ওখানে যদি কোনও খবর থাকে জানবার জন্য, কিন্তু তাতেও কোনও সুবিধা হয়নি। শুধু এই খবরটা পাওয়া গেছে যে মহীতোষ রায়ের জায়গায় আর এক জন অভিনেতা বহাল হয়েছে। এঁর নাম সুখেন্দু চক্রবর্তী। ইনি প্রফুল্লতে অভিনয় করছেন মহীতোষের জায়গায় এবং বেশ ভাল করছেন।

ফেলুদা এর মধ্যে মহীতোষ রায় সম্পর্কে আরও খবর নিয়েছে। ওঁর ছোট ভাই শিবতোষের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে যে সে দাদার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেনি।

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দাদার সঙ্গে আপনার বিরোধের কারণ কি শুধু সম্পত্তি?'

শিবতোষবাবু বললেন, 'তার বেশি আর কারণের দরকার আছে কি? দাদা বাবাকে খোশামোদ করতেন। আমি সে দিকে যাইনি। খোশামোদ আমার ধাতে নেই। ছোট ছেলে বলে আমাকে সব সময় ছোট করে দেখা হয়েছে। বাবাও তাই করেছেন—দাদা তো বটেই। তাই আমি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলাম। এতে বিরোধের সৃষ্টি হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?'

কথাগুলো শুনে আমার মনে হচ্ছিল শিবতোষবাবুর এখনও পুরোমাত্রায় আক্রোশ রয়েছে দাদার উপর।

ফেলুদা বলল, 'আপনি মহীতোষবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করতে চান কি? এটা হয়তো আপনি বোঝেন যে তিনি যদি আততায়ীর হাতেই প্রাণ হারান, তাহলে সেই আততায়ী আপনি হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।'

'আমি গত পাঁচ বছর দাদার মুখ পর্যন্ত দেখিনি। তাঁর সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক চুকে গিয়েছিল। আর তাঁর থিয়েটারের জীবনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না।'

'যে দিন মহীতোষবাবু নিখোঁজ হন সে দিন সন্ধ্যাবেলা ছটা থেকে আটটার মধ্যে আপনি কী করছিলেন মনে পড়ে?'

'রোজ যা করি তাই করছিলাম; আমার বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছিলাম।'

'কোথায়?'

'সর্দার শঙ্কর রোড। এগারো নম্বর। অনুপ সেনগুপ্তের বাড়ি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

ফেলুদা এটা চেক করার জন্যে সর্দার শঙ্কর রোডে শিবতোষবাবুর বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। তিনি বলে দেন যে তাদের বাড়িতে রোজ তাসের আড্ডা হয় এবং শিবতোষবাবু নিয়মিত আসেন।

একটা বড় সাসপেক্টকে তাই ফেলুদাকে বাদ করে দিতে হল।

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু এসে বললেন, 'মশাই, এ কেসটা কোনও কেসই না। আপনি মিথ্যে এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। তার চেয়ে চলুন আমরা দিন চারেকের জন্য কোথাও ঘুরে আসি। আমারও মাথায় একটা প্লট আসছে বলে মনে হচ্ছে, আর আপনিও মাথাটা একটু সাফ করে নিতে পারবেন।'

'কোথায় যাবেন?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'দীঘা গেলে কেমন হয়? ওটা তো এখনও দেখা হয়নি।'

'বেশ তাই হোক। আমারও মনে হয় এ কেসটার কোনও নিষ্পত্তি হবে না। মহীতোষের হত্যাকারী আইনের হাত থেকে পার পেয়ে যাবে।'

আমরা পরদিনই দীঘা গিয়ে হাজির হলাম। টুরিস্ট লজে বুকিং ছিল, দিব্যি আরামে থাকা যাবে বলে মনে হল। আর তার উপর সমুদ্রে স্নান।

লালমোহনবাবু একটা নতুন লাল সুইমিং কস্টুম কিনে এনেছিলেন।

দীঘাতে কলকাতার খবরের কাগজ আসতে আসতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। তিনদিনের দিন আনন্দবাজারটা হাতে নিয়ে প্রথম পাতা দেখেই ফেলুদা প্রায় লাফিয়ে উঠল।

'সর্বনেশে খবর।'

'কী ব্যাপার?' লালমোহনবাবু আর আমি একসঙ্গে বলে উঠলাম।

'অপ্সরা থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা খুন!' বলল ফেলুদা, 'এ কি আরম্ভ হয়েছে বল্ তো দেখি!'

খবরটা পড়ে দেখলাম। বলেছে অপ্সরা থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা নেপাল লাহিড়ী দু দিন আগে থিয়েটারের পর ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরছিলেন, পথে এক বন্ধুর বাড়িতে যাবেন বলে ট্যাক্সি থেকে নামেন। বন্ধুর বাড়ি একটা গলির মধ্যে। সেই গলিতেই তাকে ছোরা মেরে খুন করা হয়। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, তারা তদন্ত চালাচ্ছে। নেপালবাবুর স্ত্রী ও একটি বারো বছরের ছেলে আছে; তাঁরা এ বিষয় কোনও আলোকপাত করতে পারেননি।

'তাহলে কী হবে?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'তাহলে একবার আপনাকে যেতে হবে অপ্সরা থিয়েটারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে।'

'কেন, আমাকে কেন?'

'কারণ আমার পা-টা আজ মচকেছে সমুদ্রে স্নান করার সময়। কাল ভাল রকম ব্যথা হবে বলে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে চলুন আজই ফেরা যাক। কলকাতায় গিয়ে চুন-হলুদ দিয়ে পা-টা বেঁধে ফেলবেন।'

'আপনি পারবেন তো আমার ভূমিকা নিতে?'

'তা অ্যাদ্দিন যখন আপনার সঙ্গে রয়েছি তখন কিছুটা জ্ঞানগম্যি তো হয়েইছে।'

আমরা সে দিনই কলকাতায় ফিরে এলাম। কথা হল পরদিন সকাল ন-টায় লালমোহনবাবু আমাদের বাড়ি আসবেন, ফেলুদা তাঁকে কিছুটা তালিম দিয়ে দেবে, তারপর দশটা নাগাদ আমরা দু জনে যাব অপ্সরা থিয়েটার।

পরদিন সকালে ফেলুদার কাছে তালিম নিয়ে আমরা ঠিক দশটায় পৌঁছে গেলাম অপ্সরা থিয়েটারে। লালমোহনবাবুর গদগদ ভাব, বললেন, 'আমার অনেক দিনের আপশোষ ছিল যে তোমার দাদাকে আর একটু সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে পারি না। এইবারে তার সুযোগ এসেছে।' ভদ্রলোক আজ ধুতি পাঞ্জাবির বদলে প্যান্ট শার্ট পরে এসেছেন; বললেন এতে কাজটা অনেক চটপটে হয়। 'ওভারনাইট কার্ড ছাপিয়ে নিলুম আমার নামে, দেখতে কেমন হয়েছে।'

কার্ড নিয়ে দেখি তাতে ইংরিজিতে লেখা রয়েছে 'লালমোহন

গাঙ্গুলী, রাইটার।'

'দিব্যি হয়েছে', আমি বললাম।

দারোয়ানের হাতে একটা কার্ড ম্যানেজারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তিন মিনিটের মধ্যে আমাদের ডাক পড়ল।

কৈলাসবাবুকে দেখে মনেই হল না আমাদের উনি চিনতে পেরেছেন। বেশ রুক্ষভাবেই বললেন, 'শুনুন, আমার এখানে এখন বিশেষ গোলমাল। আপনি যদি নতুন নাটক নিয়ে এসে থাকেন তো অন্য সময় হবে। এই কটা দিন বাদ দিন।'

লালমোহনবাবু জিভ কেটে বললেন, 'নতুন নাটক নয় স্যার; আমি এসেছি প্রদোষ মিত্র প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের প্রতিভূ হয়ে। উনি অসুস্থ, তাই নিজে আসতে পারলেন না। উনি এর আগে মহীতোষ রায়ের ব্যাপারে একবার আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তখন আমিও এসেছিলাম ওঁর সঙ্গে।'

'হ্যাঁ—মনে পড়েছে। তা আপনি কী জানতে চাইছেন? খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তার বেশি কিছু বলার নেই।'

'একটা প্রশ্ন ছিল—নেপালবাবুও কি মহীতোষবাবুর মতো হুমকি চিঠি পেয়েছিলেন?'

'পেয়েছিল, তবে সে বিষয় প্রথম কদিন চেপে রেখেছিল। কোনও পাত্তা দেয়নি। তারপর তিনদিন আগে প্রথম আমাকে বলে। চিঠি পাচ্ছিল প্রায় দশদিন থেকে।'

'সে চিঠি আপনি দেখেছেন?'

'দু তিনটে দেখেছি। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। হুমকি চিঠি যে রকম হয় সে রকমই আরকি। আমি ওকে সাবধানে থাকতে বলি, কিন্তু নেপাল মঞ্চে হিরো সাজত বলে নিজেকেও একটা হিরো বলে মনে করত। সে বলে, "এসব হুমকিতে আমি ঘাবড়াই না"।'

'তিনি থাকতেন কোথায়?'

'নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেনে; সাতাশ নম্বর।'

'উনি কি বিবাহিত ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কাগজে লিখেছে উনি ওঁর এক বন্ধুর বাড়ি যাবেন বলে ট্যাক্সি

থেকে নেমেছিলেন। এই বন্ধুটি কে আপনি জানেন?'

'গলিতে বাড়ি বলে যখন বলছে তখন শশধর চাটুজ্যে বলে মনে হয়। সেও অভিনেতা, রূপম্ থিয়েটারে অভিনয় করে।'

'অন্যরা থিয়েটারে ওঁর কোনও শত্রু ছিল না?'

'সে আর আমি কি করে বলব বলুন। প্রধান অভিনেতাকে সকলেই ঈর্ষা করে। সে অর্থে শুধু আমাদের থিয়েটারে কেন, অন্য থিয়েটারেও নেপালের শত্রু ছিল। তাকে সরাতে পারলে আমার থিয়েটার কানা হয়ে যাবে এটা অনেকেই জানত।'

'আপনাদের থিয়েটার কি তাহলে এখন বন্ধ?'

'আজ প্রফুল্লর লাস্ট শো ছিল—সেটা আর হবে না। আমরা তো নতুন নাটক আলমগীর নামাব বলে তোড়জোড় করছিলাম। নাম ভূমিকায় তো নেপালেরই করার কথা ছিল। এখন অন্য অ্যাক্টরকে ট্রাই করা হচ্ছে। একজন নতুন লোক এসেছে।'

'কেমন?'

'মন্দ নয় বোধহয়। দাড়ি গোঁফ নিয়ে আলমগীর সাজবার চেহারা নিয়ে চলে এসেছে। তার মেক-আপ লাগবে না।'

এবার আমার একটা কথা মনে পড়ল। বললাম, 'এখানকার মেন অ্যাক্টরদের বাড়ির ঠিকানাগুলো নিয়ে নিই। ফেলুদা হয়তো ওদের কারুর কারুর সঙ্গে কথা বলতে চাইবে।'

'হ্যাঁ, এটা ঠিক বলেছ,' বললেন লালমোহনবাবু।

কৈলাসবাবুকে বলতে আবার ঘণ্টা টিপে ওঁর সেক্রেটারিকে আনিয়ে আমাদের সব নাম ঠিকানাগুলো আনিয়ে দিলেন।

'যেই বন্ধুর বাড়িতে সে দিন নেপালবাবু যাচ্ছিলেন, তিনি কোথায় থাকেন বলতে পারেন?'

'কাগজে দেখেননি? খুনটা হয়েছে মতি মিস্ত্রি লেনে। কাজেই তিনিও সেখানেই থাকতেন।'

আমরা ভদ্রলোককে আর বিরক্ত না করে উঠে পড়লাম। একবার মতি মিস্ত্রি লেনে শশধর চাটুজ্যের বাড়ি যাওয়া দরকার।

॥ ৫ ॥

মতি মিস্ত্রি লেনে তিন জনের বেশি লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। আমরা গাড়ি বড় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গলির দিকে এগোলাম। মোড়ে একটা পান বিড়ির দোকান। মালিককে জিগ্যেস করাতে বলে দিল শশধর চাটুজ্যে তিন নম্বর বাড়িতে থাকেন।

তিন নম্বরের দরজায় টোকা মারতে এক জন ভদ্রলোক দরজাটা খুললেন।

'কাকে চাই?'

'আমরা শশধর চাটুজ্যের খোঁজ করছিলাম।'

'আমিই সেই লোক। আপনাদের প্রয়োজন?'

লালমোহনবাবু একটা কার্ড বার করে দিতে ভদ্রলোকের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'আপনিই কি সেই বিখ্যাত রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনীর লেখক?'

লালমোহনবাবু একটু বিনয় করলেন।

'বিখ্যাত কিনা জানি না, তবে আমিই সেই লোক।'

'আরে বাবা! আপনার সব বই যে আমার পড়া! তা হঠাৎ এ গরিবের বাড়িতে কী মনে করে?'

'আমি এসেছি আমার বন্ধু গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্রের তরফ থেকে।'

'তাঁর নামও শুনেছি। আপনারা ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন।'

এতক্ষণে ঘরের ভিতর ঢুকলাম আমরা। একটা তক্তপোষেই প্রায় ঘরটা ভরে আছে, তবে তার সঙ্গে দুটো কাঠের চেয়ার রয়েছে।

লালমোহনবাবু চেয়ারে বসে বললেন, 'আপনার বন্ধুর খুনের ব্যাপারে আমরা তদন্ত করছি। সে সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু বলেন।'

'আমি আর কী বলব। সে আমার বাড়িতে ঢোকার আগেই খুন হয়। পাড়ার একটি ছেলে আমাকে খবর দেয়। বাইশ বছর হল আমাদের বন্ধুত্ব, যদিও রয়্যাল থিয়েটারে আমরা অভিনয় করতাম।'

'ওঁর কোনও শত্রু ছিল বলে জানেন?'

'নেপালের শত্রু থাকবে না? সে এত বড় একটা হিরো—অন্য সব

অভিনেতার সে ঈর্ষার পাত্র। তার তো শত্রু থাকবেই।'

'বিশেষ কারুর নাম মনে পড়ছে না?'

'না। তা পড়ছে না। সে রকম কোনও নাম নেপাল করেনি আমার কাছে। সে কাউকে বিশেষ তোয়াক্কা করত না। একটু বেপরোয়া গোছের লোক ছিল। তার পেশায় তার সমকক্ষ খুব কমই ছিল। অন্য বহু থিয়েটার তাকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু অপ্সরায় তার অভিনয় জীবনের শুরু বলে সে আর কোথাও যায়নি।'

'তিনি যে হুমকি চিঠি পাচ্ছিলেন সে কথা আপনাকে বলেছিলেন?'

'বলেছিল বইকী, কিন্তু সে পাত্তাই দেয়নি। এক নাম করা জ্যোতিষী তাকে বলেছিল সে বিরাশি বছর বাঁচবে। সেটা সে বিশ্বাস করত। বলত ওই বয়স অবধি সে অভিনয় চালিয়ে যাবে, আর মঞ্চের উপর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে।'

শশধরবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই, জানেন। আর আমার মন মেজাজও ভাল নেই। আপনারা বরং আসুন।'

আমরা উঠে পড়লাম।

এক সকালের পক্ষে অনেক কাজ হয়েছে মনে করে আমরা বাড়ির দিকেই রওনা দিলাম। ফেলুদাকে সব রিপোর্ট করতে হবে।

ফেলুদা সব শুনেটুনে লালমোহনবাবুর খুব তারিফ করল। বলল, 'আপনি তো একেবারে পেশাদারী গোয়েন্দার মতো কাজ করেছেন। যেটা বাকি রইল সেটা হচ্ছে অপ্সরা থিয়েটারের অন্য প্রধান অভিনেতাদের জেরা করা। বিশেষ করে টপ অভিনেতা—যাদের সঙ্গে নেপাল লাহিড়ীর হৃদ্যতাও ছিল, রেষারেষিও ছিল।'

'তোমার পা কী বলে?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'এখনও নট নড়ন-চড়ন। আরও দু দিন অন্তত লাগবে সারতে। ভাল কথা অভিনেতাদের সঙ্গে যখন কথা বলবেন তখন নতুনটিকেও বাদ দেবেন না।'

'না না, তা তো নয়ই।'

লালমোহনবাবু ফেলুদার কাজটা করে খুব খোশমেজাজে ছিলেন। বললেন, 'এ এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। আসলে আপনার কাজটা যত

কঠিন বলে মনে হয় তত কঠিন নয়।'

'কঠিন কেবল রহস্যোদ্‌ঘাটন।'

'তা বটে, তা বটে। সেটা এখনও পারব না নিশ্চয়ই। আর সে রকম দাবিও করছি না। তবে একটা কথা বলতে পারি—আজ ওখানে আমাকে দেখলে আপনি চিনতেই পারতেন না।'

'বটে?'

'সেন্ট পারসেন্ট।'

'ওখানে কি মহড়া চলছে?'

আমি বললাম, 'চলছে বোধ হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তো আলমগীর শুরু হবে।'

'তাহলে ম্যানেজারকে টেলিফোন করে কোন সময় গেলে সকলের সঙ্গে দেখা হবে আর কথা বলা যাবে সেটা জেনে নিবি।'

'ভেরি গুড।'

'পুলিশ দেখলি?'

'কই না তো।'

'আছে নিশ্চয়ই। কাগজে তো লিখেছে তারা তদন্ত চালাচ্ছে। একবার ইনসপেক্টর ভৌমিককে ফোন করব। ওর আন্ডারেই কেসটা পড়বে বলে মনে হচ্ছে।'

॥ ৬ ॥

ইনসপেক্টর ভৌমিকের সঙ্গে কথা বলে ফেলুদা জানল যে পুলিশ একটা গুণ্ডার দলকে সন্দেহ করছে। নেপালবাবুর নাকি একটা সোনার ঘড়ি ছিল সেটা খুনের পর পাওয়া যায়নি। খুবই দামি ঘড়ি, এবং সেটাই হয়তো খুনের কারণ হতে পারে। ফেলুদা বলল, 'তাহলে থিয়েটারের সঙ্গে এ-খুনের কোনও সম্পর্ক নেই বলছেন।' তাতে ভৌমিক বললেন ওঁর তাই ধারণা। একটা গুণ্ডার দল কিছু দিন থেকেই নাকি ওই অঞ্চলে উৎপাত করছে। তারা প্রায় সকলেই দাগি আসামি। ছুরিটা নেপালবাবুর গায়েই বিঁধে ছিল, কিন্তু তাতে কোনও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। সব শেষে ভৌমিক বললেন, তিনি আশা করছেন দিন

তিনেকের মধ্যেই কেসটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। 'এবার আর আপনাকে কোনও ভূমিকা নিতে হবে না', বললেন ভদ্রলোক।

ফেলুদা টেলিফোনটা রেখে বলল, 'ম্যানেজারকে ওই ফোনটা করে নে। অভিনেতাদের একবার জেরা করা দরকার।'

আমি তখনই অপ্সরা থিয়েটারে ফোন করলাম। বার তিনেক ডায়াল করবার পর লাইন পেলাম। ম্যানেজার বললেন, 'পুলিশ এক দফা জেরা করে গেছে সকলকে। তবে আপনারা যদি আবার করতে চান তা হলে বিষ্যুদবার সকাল সাড়ে দশটায় আসুন। সে দিন এগারোটায় রিহার্সাল আছে; আপনাদের আধ ঘণ্টায় কাজ শেষ করতে হবে।'

আমি ফোনটা নামিয়ে রাখার পর ফেলুদা বলল, 'টপ তিন জন আর ওই নতুন অ্যাক্টরটিকে জেরা করলেই হবে।'

বিষ্যুদবার সাড়ে দশটার পাঁচ মিনিট আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম অপ্সরা থিয়েটারে। ফেলুদাকে দেখে এসেছি তার আজও পায়ে ব্যথা রয়েছে। লালমোহনবাবু আজ আরও স্মার্ট; তাঁর হাঁটা চলা এবং কথা বলার ঢংই বদলে গেছে।

আমরা প্রথমে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বললাম যে আমরা তিন জন টপ অভিনেতা আর নতুন অভিনেতাটিকে প্রশ্ন করতে চাই।

'তাহলে ধরণীকে দিয়ে শুরু করুন। ধরণী সান্যাল। সে এখানের সিনিয়রমোস্ট আর্টিস্ট; ছাব্বিশ বছর হল কাজ করছে।'

আমাদের জেরার জন্য ম্যানেজারের পাশের ঘরটা খালি করে দেওয়া হল। ঘরে একটা সোফা আর তিনটে চেয়ার রয়েছে।

এক জন বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। সিংহের কেশরের মতো চুল—তার বেশির ভাগই সাদা—ঢুলঢুলু চোখ, গায়ের রং মাঝারি।

'আমার নাম ধরণী সান্যাল,' বললেন ভদ্রলোক। 'আপনারা গোয়েন্দা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' সোজাসুজি বললেন লালমোহনবাবু। 'আমরা নেপাল লাহিড়ীর ব্যাপারে তদন্ত করছি।'

'নেপাল হুমকি চিঠি পাচ্ছিল,' বললেন ধরণীবাবু। 'তাকে বললুম সাবধান হতে, সে কথা কানেই তুললে না। এর মধ্যে গেছে মতি মিত্তির লেনে। আরে বাবা, বন্ধুর সঙ্গে কদিন না হয় নাই দেখা করলে। আমি তো ওকে পুলিশে খবর দিতে বলেছিলাম, কিন্তু ও গা-ই করেনি। ঠিক এ রকম হয়েছিল আমাদের আর এক অভিনেতার—মহীতোষ রায়। অবিশ্যি মহীতোষের মৃত্যুটা থিয়েটারের পক্ষে তত বড় লস্ নয়।'

'নেপালবাবুর কোনও শত্রু ছিল বলে জানেন?'

'থিয়েটারের টপ পোজিশনে বসে থাকলে তার শত্রু থাকবেই। মানুষের ছয় রিপুর মধ্যে একটি হল মাৎসর্য। নেপালের শত্রু থাকবে না? তবে যদি জিগ্যেস করেন কোন শত্রু এই কুকীর্তি করেছে, বা শত্রু ছাড়া অন্য কেউ করেছে কিনা, তা বলতে পারব না।'

'আপনার বাড়িতে তাঁর যাতায়াত ছিল?'

'আজ্ঞে না। এমনিই থিয়েটারে হপ্তায় তিন দিন দেখা হচ্ছে, তার উপর সে আমার এমন বন্ধু ছিল না যে অন্য দিনও দেখা করব।'

'যে দিন খুন হয় সে দিন সন্ধ্যাবেলা আপনি কী করছিলেন?'

'কালিকিঙ্কর ঘোষের বাড়ি কেত্তন শুনছিলুম। ইচ্ছে করলে যাচাই করে নিতে পারেন।'

'ঠিক আছে; আপনাকে আর কোনও প্রশ্ন করার নেই।'

এবার এলেন দীপেন বোস। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল, ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট, দাড়ি-গোঁফ নেই।

ভদ্রলোক প্রথমেই বললেন, 'আমি আর নেপাল প্রায় এক সঙ্গেই অঙ্গরা থিয়েটারে জয়েন করি। সে ছিল জাত অভিনেতা। আমারও অ্যাম্বিশন ছিল, কিন্তু দেখলাম নেপালের সঙ্গে পেরে উঠব না।'

'তাতে আপনার মনে ঈর্ষা জাগেনি?'

'তা জেগেছে বইকী। বিলক্ষণ জেগেছে। অনেকদিন মনে মনে ভেবেছি—এই লোকটা আমার পথে কাঁটা হয়ে রয়েছে—এটাকে সরানো যায় না?'

'এই চিন্তাকে কার্যে পরিণত করার ইচ্ছা হয়নি কোনওদিন?'

'পাগল! আমরা ছাপোষা লোক। আমাদের দিয়ে কি খুনখারাপি হয়? নাটক করি, তাই নানারকম নাটকীয় চিন্তা মাথায় আসে—ব্যাস্, ওই পর্যন্ত।'

'যে দিন খুনটা হয় সে দিন সন্ধেবেলা আপনি কী করেছিলেন?'

'বায়স্কোপ দেখছিলাম। তবে প্রমাণ দিতে পারব না। টিকিটের অর্ধাংশ আমি কখনও রাখি না।'

'কী ছবি দেখলেন?'

'মনের মানুষ।'

'কেমন লাগল?'

'থার্ড ক্লাস।'

'ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন।'

তৃতীয় অভিনেতার নাম ভুজঙ্গ রায়। এঁর বয়স পঞ্চাশের উপর, চোখা নাক, চোখ কোটরে বসা, গাল তোবড়ানো, মাথার চুল পাতলা

হয়ে এসেছে।

'আপনার সঙ্গে নেপালবাবুর সদ্ভাব ছিল?'

'এই থিয়েটারে নেপালই ছিল আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।'

'তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে?'

'এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি থিয়েটার মহলে অনেক দিন হয়নি। নেপাল ছিল আশ্চর্য অভিনেতা। আমার সঙ্গে কোনওদিন ক্ল্যাশ হয়নি, কারণ ও করত নায়কের রোল আর আমি করতুম ক্যারেকটার পার্ট।'

'উনি হুমকি চিঠি পাচ্ছিলেন সেটা আপনাকে বলেছিলেন?'

'প্রথম দিনই। আমি ওকে ওয়ার্নিং দিই—এ সব চিঠি উড়িয়ে দিও না, আর বিশেষ করে মতি মিস্ত্রি লেনে কিছুদিন যাওয়া বন্ধ কর। ও পাড়াটা নটোরিয়াস। কে কার কথা শোনে? নেপালের বিশ্বাস ছিল তার আয়ু বিরাশি বছর—সেটা কেউ খণ্ডাতে পারবে না।'

'তাহলে আপনার ধারণা গুণ্ডার হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়?'

'তাই তো মনে হয়, কারণ তার দামি ঘড়িটাও তো পাওয়া যায়নি। সোনার ওমেগা ঘড়ি, দাম ছিল সাত হাজার টাকা।'

ভুজঙ্গবাবুকে ছেড়ে দিলাম। উনি আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন।

এবার এলেন নতুন অভিনেতা, নাম সুধেন্দু চক্রবর্তী। প্রথম দেখে একটু হকচকিয়ে যেতে হয়, কারণ মোগলাই দাড়ি আর গোঁফ দেখে মনে হয় উনি মেক-আপ নিয়ে রয়েছেন। বললেন, অপ্সরা থিয়েটারে আলমগীর হচ্ছে শুনেই উনি দাড়ি রাখতে আরম্ভ করেন। আগে শুধু গোঁফ ছিল।

'আপনি এর আগে কোথায় অভিনয় করতেন?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'কোথাও না। দু একটা আপিস ক্লাবে করেছি। আমার প্লাইউডের ব্যবসা ছিল। তবে অভিনয় আমার নেশা। আর কিছু না করার থাকলে আমি নাটকের বই খুলে পার্ট মুখস্থ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতাম। এখন অবশ্য তার আর দরকার হবে না।'

'আপনি কি আলমগীরে পার্ট পেয়ে গেছেন?'

'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে কোন্ পার্ট সেটা এখনো স্থির হয়নি।

সেন পার্টও হতে পারে।'

'আপনি থাকেন কোথায়?'

'আমহার্স্ট রো।'

'ব্যবসা কি এখন ছেড়ে দেবেন?'

'হ্যাঁ। অ্যাকটিংই আমার ধ্যান ছিল; সুযোগ পাইনি বলে ব্যবসা চালাচ্ছিলাম।'

ফেলুদাকে যাতে ঠিকভাবে রিপোর্ট দিতে পারি তাই আমি কথোপকথনটা টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করে নিচ্ছিলাম। বুঝতে পারছিলাম লালমোহনবাবু প্রশ্নগুলো করছিলেন নিজেকে ফেলুদা হিসেবে কল্পনা করেই। এটা আমাদের কাছে একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা।

সুখেন্দুবাবুকে আর একটাই প্রশ্ন করার ছিল।

'আপনার সঙ্গে নেপালবাবুর আলাপ হয়েছিল?'

'সামান্যই। তবে ওঁর অভিনয় আমি আগে অনেক দেখেছি। খুব ভাল লাগত।'

॥ ৭ ॥

ফেলুদা খুব মন দিয়ে আমাদের রিপোর্ট শুনল। তারপর বলল, 'আমার অ্যাবসেন্সে তো তোরা বেশ চালিয়ে নিতে পারছিস।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'প্রশ্ন করাটাতে খুব একটা বুদ্ধি লাগে না, আসল কথা হচ্ছে উত্তরগুলো থেকে কী বোঝা গেল। আমি তো মশাই এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরে। আর গুণ্ডা যদি মেরে থাকে লাহিড়ীকে তাহলে তো পুলিশ তার কিনারা করবেই।'

'গুণ্ডারা হুমকি চিঠি দিয়ে খুন করে না।'

'তা বটে। তা আপনার কি মনে হয় নেপাল লাহিড়ী আর মহীতোষ রায়কে একজন লোকই খুন করেছে?'

'এক জন বা একই দল। সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'কিন্তু মোটিভটা—?'

'ধরুন যদি অন্য থিয়েটারের লোক খুনটা করে থাকে, সেখানে তো

স্পষ্ট মোটিভ রয়েছে। অপ্সরা থিয়েটারে এখন টপ দু জন অভিনেতাই চলে গেল। ওদের আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে কি কম সময় লাগবে?'

ফেলুদার পায়ে এখনও বেশ ব্যথা। বোধহয় এক্স-রে করাতে হবে। ব্যান্ডেজ-বাঁধা পা কফি টেবিলের উপর তুলে ও সোফায় হেলান দিয়ে বসেছিল। বলল, 'তোরা তো অনেক কাজ করলি, এবার আমায় একটু নিরিবিলি কাজ করতে দে!'

'কী কাজ করবে তুমি?'

'চিন্তা করব। একটা আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি অন্ধকারের মধ্যে। সেইটে আরও উজ্জ্বল হওয়া দরকার।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনি ভাবুন; আমি আপনাকে কোনওরকম ডিসটার্ব না করে এক কাপ চা খাব। তপেশ ভাই, ভেতরে একটু বলে দিয়ে এসো না।'

ফেলুদা দেখলাম ভ্রূকুটি করে চোখ বুজে ফেলেছে। শেষটায় কি ও ঘরে বসেই রহস্যের সমাধান করে ফেলবে নাকি?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে ও একটা প্রশ্ন করল।

'এই সব অভিনেতাদের সঙ্গে যে কথা বললি, এদের কারুর মধ্যে কোনও বাতিক লক্ষ করলি?'

আমি বললাম, 'ভুজঙ্গ রায় নস্যি নেন; শশী সান্যাল বিড়ি খান আর সুখেন্দু চক্রবর্তী মশলা খান।'

'গুড।'

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। ইতিমধ্যে শ্রীনাথ লালমোহনবাবুকে চা এনে দিয়েছে; ভদ্রলোক বেশ তৃপ্তি সহকারে পান করছেন। আমি একটা পত্রিকার পাতা উলটে যেতে লাগলাম। ফেলুদার কাছে নানা রকম পত্রিকা আসে, তার বেশির ভাগই অবিশ্যি ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে চলে যায়।

মিনিট পাঁচেক নিস্তব্ধতার পর ফেলুদার দিকে চেয়ে দেখি ও চোখ খুলেছে, আর সেই চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'লালমোহনবাবু', চাপা স্বরে বলল ফেলুদা।

'আজ্ঞে?'

'এই যে সুখেন্দু চক্রবর্তী—ইনি কি মাঝারি হাইটের ভদ্রলোক?'

'হ্যাঁ।'

'ফরসা রং?'

'হ্যাঁ।'

'বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বয়স?'

'হ্যাঁ—কিন্তু আপনি এঁকে চেনেন নাকি?'

'শুধু আমি নয়, আপনারাও চেনেন।'

'বলেন কি?'

'এবার বোধহয় ঘরে বসেই রহস্যোদ্ঘাটন হয়ে গেল।'

'অ্যাঁ!'

'দাঁড়ান, আগে ইনসপেক্টর ভৌমিককে একটা ফোন করি।'

আমি ফেলুদার হয়ে নম্বরটা ডায়াল করে ফোনটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। ফেলুদা বলল, 'কে, হরিদাসবাবু? আমি প্রদোষ মিত্র কথা বলছি।—শুনুন, ওই অপ্সরা থিয়েটারের মামলাটা—আমার মনে হয় গুণ্ডাদের পিছনে সময় নষ্ট না করাই ভাল, কারণ আমি জেনে গেছি কে খুনটা করেছে। আমি তো চলৎশক্তিরহিত। কাজেই আপনাকেই আসতে হবে আমার কাছে। আমি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট সিওর...ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এলেই হবে।'

ফেলুদা ফোন রেখে দিল। আমরা ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি।

'খুব জানতে ইচ্ছে করছে, তাই না? ঠিক আছে। তোদের আর সাসপেন্সে রাখব না। ব্যাপারটা জলের মতো সোজা, অথচ জিলিপির মতো প্যাঁচালো। একটা কথা বলতেই হবে—হ্যাট্‌স অফ্ টু দ্য মার্ডারার। আশ্চর্য ফন্দি এঁটেছিল। ফেলু মিত্তিরের পর্যন্ত ধোঁকা লেগে গিয়েছিল। আসলে এটা স্রেফ ঈর্ষার ব্যাপার। নেপাল লাহিড়ীকে সরিয়ে প্রধান অভিনেতার স্থান দখল করার চেষ্টা; তার জন্যেই খুন।'

'কিন্তু মহীতোষ রায়?'

'তিনি খুন হননি।'

'অ্যাঁ!'

'না। তিনি এমনভাবে ঘটনাটাকে সাজিয়েছিলেন—হুমকি চিঠি থেকে আরম্ভ করে—যাতে মনে হয় তিনি খুন হয়েছেন। আসলে তিনি এখনও জীবিত এবং বহাল তবিয়তে রয়েছেন ছদ্মবেশে এবং নতুন ঠিকানায়। লেকে গিয়েছিলেন তিনি শুধু মশলার কৌটোটা ফেলে আসতে। তারপর গা ঢাকা দিলেই লোকের সন্দেহ হবে যে তিনি খুন হয়েছেন এবং তাঁর মৃতদেহ লেকের জলে ডুবে রয়েছে।'

'আশ্চর্য মাথা বটে লোকটার।'

'তারপর তিন মাসে দাড়ি গোঁফ গজিয়ে অপ্সরা থিয়েটারে আগমন। দাড়ি গোঁফে মানুষের চেহারা একদম বদলে যায়। তাই আপনারা চিনতে পারেননি। অপ্সরাতে অভিনেতা দরকার—সুতরাং ওঁকে না নেওয়ায় কোনও কারণ নেই, বিশেষত যখন সুপুরুষ চেহারা আর কণ্ঠস্বর ভাল।'

'সুখেন্দু চক্রবর্তী!'

'ইয়েস স্যার। মশলার অভ্যাস এখনো যায়নি—যদিও আপনাদের সামনে খেয়ে লোকটা কাঁচা কাজ করেছে। যাই হোক, তাঁর প্ল্যান একেবারে ষোলো আনা সফল হত, যদি না আপনারা আমাকে সাহায্য করতেন। লোকটা একটা পাকা খুনি বনে গিয়েছিল স্রেফ উচ্চাভিলাষের বশে। আংটি চুরিটা অবশ্য স্রেফ ভাঁওতা। কিন্তু ফেলু মিত্তিরকে তো সে চেনে না। আমার কাছে এসে যে কত বড় ভুল করেছে এবার সে বুঝতে পারবে।'

ফেলুদা যে ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছিল সেটা অবিশ্যি পরদিনই ইনসপেক্টর ভৌমিকের টেলিফোনে জানা গেল।

লালমোহনবাবু আমাকে আলাদা পেয়ে বললেন, 'তোমার দাদার সঙ্গে আমাদের তফাতটা কোথায় সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি।'

'কোথায় তফাত?'

লালমোহনবাবু তাঁর টাকের উপর ডান হাতের তর্জনীর ডগা দিয়ে টোকা মেরে বললেন—'মাথায়!'

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

Pradosh C. Mitter

Private Investigator

ভূস্বর্গ ভয়ংকর

১

‘এবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?’ এক মুঠো চানাচুর মুখে পুরে চায়ে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু—‘যা গন্‌গনে গরম পড়েছে, আর তো এখানে থাকা যায় না।’

‘কোথায় যাওয়া যায়, সেটা আপনিই বলুন না’, বলল ফেলুদা। ‘ভ্রমণের নেশা তো আপনার আরও প্রবল। আমি তো ইচ্ছা করলে বারো মাস কলকাতায় পড়ে থাকতে পারি।’

‘আপনার হাতে এখন কোনও কেস নেই তো ?’

‘তা নেই।’

‘তা হলে চলুন বেরিয়ে পড়ি।’

‘কোথায় যেতে চাইছে আপনার মন ?’

‘পাহাড় তো বটেই ; আর পাহাড় বলতে আমি হিমালয়ই বুঝি। বিন্ধ্য, ওয়েস্টার্ন ঘাট্‌স—এ সব আমার কাছে পাহাড়ই নয়। আমার মন যেখানে যেতে চাইছে, সেখানে না গেলে নাকি জন্মই বৃথা।’

‘কোথায় ?’

‘এত হিন্টস দিলুম তাও বুঝতে পারলেন না ?’

‘ভূস্বর্গ ?’

‘এগজ্যাক্টলি ! কাশ্মীর ! প্যারাডাইজ অন আর্থ। রোজগার তো বলতে নেই, দুজনেরই অনেক হল। সংসার আপনারও নেই, আমারও নেই। এত টাকা জমিয়ে রাখছি কার জন্যে ? চলুন বেরিয়ে পড়ি—ক্যালকাটা টু ডেল্‌হি, ডেল্‌হি টু শ্রীনগর।’

‘শ্রীনগরই তো কাশ্মীরের একমাত্র দেখার জায়গা নয়। আরও আছে।’

'সবই দেখা যাবে একে একে।'

'পাহালগাম, গুলমার্গ, খিলেনমার্গ—অনেক কিছু দেখার আছে।'

'তা বেশ তো ; দিন পনেরো হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। একটু ঘোরাঘুরি না করলে আমার মাথায় প্লট আসে না। পুজোর জন্য একটা কিছু লিখতে হবে তো !'

'আপনার অত অনেস্টির প্রয়োজন কী জানি না। আর পাঁচ জন যারা লিখছে, সব বিদেশি থ্রিলার থেকে প্লট সংগ্রহ করছে। ভদ্র ভাষায় বললাম, আসলে স্রেফ চুরি ছাড়া আর কিছুই না। আপনিও এবার লেগে পড়ুন।'

'হ্যাঁ, আমি চুরি করি আর শেষটায় আপনিই গালমন্দ করুন। আপনার কথার শ্লেষ ভুজালির চেয়েও তীক্ষ্ণ।'

'তা হলে যেভাবে চলছে চলুক—থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।'

'তা না হয় হল, কিন্তু কাশ্মীর যাবার ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে ?'

'হাউসবোটে থাকবেন তো ?'

'শ্রীনগরে ?'

'শ্রীনগর ছাড়া আর হাউসবোট নেই। ডাল লেকের উপরে থাকা যাবে।'

'সেই তো ভালো—তাই নয় কি ? বেশ একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

'অনেক খরচ কিন্তু। তার চেয়ে বোধ হয় হোটেল শস্তা।'

'ও সব খরচের কথা শুনতে চাই না। ব্যাঙ্কে অনেক জমে আছে—ইনকাম ট্যাক্স দিয়েও। যাব—গিয়ে ম্যাক্সিমাম ফুর্তি যাতে হয়, তাই করব।'

'তা হলে শ্রীনগরে হাউসবোট, পাহালগামে তাঁবু আর গুলমার্গে লগ ক্যাবিন।'

'চমৎকার ! টুরিস্ট অফিস থেকে লিটারেচর নিয়ে আসব, তারপর দিন ক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাবে।'

কাশ্মীরের প্রস্তাবটা ফেলুদারও মনে ধরেছিল, সেটা আমি বুঝেছিলাম। লালমোহনবাবু ঘণ্টা দু-এক আড্ডা মেরে চলে যাবার পর ফেলুদা ট্যুরিস্ট অফিসে গিয়ে কাশ্মীর সম্বন্ধে পুস্তিকা ইত্যাদি নিয়ে চলে এল। বলল, 'মনস্থির যখন করেই ফেলা হয়েছে, তখন আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আজ সোমবার ; শনিবার নাগাত বেরিয়ে পড়া যাবে।'

'ঠাণ্ডা হবে না ওখানে ?'

'তা হবে, এবং তার জন্যে তৈরি হয়ে যেতে হবে।'

'লালমোহনবাবু সেটা জানেন তো ?'

'নিশ্চয়ই জানেন। তবে সাবধানের মার নেই। কাজেই ওঁকে সেটা ফোনে জানিয়ে রাখা দরকার। এমনিতেই তো শীতকাতুরে।'

দু দিনের মধ্যে লন্ড্রি থেকে আমাদের শীতের কাপড় এসে গেল। ঠিক হল, প্রথমে শ্রীনগরেই দিন সাতেক থাকা হবে, তার পর অন্য জায়গাগুলো দেখা যাবে। হাউসবোট কাশ্মীর ট্যুরিজ্‌ম থেকে ব্যবস্থা করা হল। একটা হাউসবোটে একটা পুরো ফ্যামিলি থাকতে পারে। তাই তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। আমি সেখানে গিয়ে পড়া পর্যন্ত কল্পনাই করতে পারছিলম না ব্যাপারটা কি রকম হয়। নৌকোয় থাকা ! তাও আবার লাক্সারি নৌকো? বোধ হয় জমিদারি আমলের বজরার মতো। পুস্তিকায় ছবি দেখে বুঝলাম যে হাউসবোটগুলো কটেজের মতো দেখতে। সেই সঙ্গে আবার ছোট ছোট নৌকোর ছবিও দেখা যাচ্ছে, যাতে করে ডাল লেকে ঘুরে বেড়ানো যায় ; কারণ হাউসবোটগুলো নড়েচড়ে বেড়ায় না।

ফেলুদাকে বললাম, 'যা বুঝছি শ্রীনগর শহরটায় দেখবার জিনিসের মধ্যে আছে কিছু বিখ্যাত মোগল বাগান। তবে পাহাড়েঘেরা উপত্যকা, সব কিছুর মধ্যে দিয়ে ঝিলাম বয়ে চলেছে, তা ছাড়া দু'-তিনটে লেক, পপলার, ইউক্যালিপটাস, চিনার গাছের সারি—মনে হয় জায়গাটা খুব সুন্দর। তবে গুলমার্গ পাহালগামও কিছু কম যায় না। পরে যদি ১১,০০০ ফুট খিলেনমার্গে ওঠা যায়,

তা হলে সেখান থেকে নাঙ্গা পর্বতের নাকি একটা অদ্ভুত ভিউ পাওয়া যায়। পনেরো দিনের জন্য খুব খুব জমজমাট ট্যুর, কাজেই চিন্তা করার কিছুই নেই।'

প্ল্যানমাফিক আমরা শনিবারই বেরিয়ে পড়লাম। এবার প্লেনে তিনজনের এক লাইনে সিট পড়েনি বলে লালমোহনবাবুকে আলাদা বসতে হল। ভদ্রলোক দেখলাম তাঁর পাশের একটি বাঙালির সঙ্গে খুব আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। দিল্লীতে এয়ারপোর্টে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সহযাত্রীটি কে ছিলেন মশাই?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'নাম সুশান্ত সোম, এক রিটায়ার্ড জজের সেক্রেটারি। দলেবলে কাশ্মীর চলেছেন। ওঁরাও হাউসবোটে থাকবেন। ভদ্রলোক তোমার দাদাকে দেখেই চিনেছেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোনও তদন্তে যাচ্ছি কি না। একবার মনে হল বলি হ্যাঁ, তারপর মাইন্ড চেঞ্জ করে সত্যি কথাটাই বলে দিলুম।'

চারিদিকে বাঙালির ভিড়, তাদের অনেকের কথাবার্তা শুনেই মনে হল, তাঁরাও কাশ্মীর যাচ্ছেন। শ্রীনগরের প্লেন ছাড়তে আরও তিন ঘণ্টা দেরি। তার মধ্যে আমরা আর এক প্রস্থ চা খেয়ে নিলাম। রেস্টোর‍্যান্টে লালমোহনবাবুর আলাপী ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। উনি আমাদের টেবিলের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'আমার নাম সুশান্ত সোম,' ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন—'আপনার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে আলাপ হল, তাই ভাবলাম সুযোগ যখন মিলেছে, তখন আপনার সঙ্গেও আলাপটা সেরে নিই। আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত। আপনার তদন্তের কথা অনেক পড়েছি। দাঁড়ান, আমার বস্‌ও হয়তো আপনাকে দেখলে খুশি হবেন।'

রেস্টোর‍্যান্টের দরজা দিয়ে আরও দল ঢুকেছে। সুশান্তবাবু তাদের দিকেই এগিয়ে গেলেন। জনা চারেক ভদ্রলোক, তার মধ্যে একজন বেশ বয়স্ক, প্রায় বৃদ্ধ বললেই চলে। সুশান্তবাবু তাঁকে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কী বলতে ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা উঠে দাঁড়াল।

'বসুন বসুন—উঠছেন কেন ?' বললেন ভদ্রলোক। 'আমার নাম সিদ্ধেশ্বর মল্লিক। আমি প্রায় সারা জীবন ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এই প্রথম একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভকে দেখলাম।'

ফেলুদা বলল, 'ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত মানে— ?'

'আমি একজন রিটায়ার্ড জজ। বহু অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছি। এখন সে কাজ থেকে অবসর নিয়ে বিশ্রাম করছি। শরীরও কিঞ্চিৎ ভেঙে পড়েছে—সঙ্গে ডাক্তার নিয়ে ঘুরতে হয়। ছেলেও আছে, বেয়ারাও আছে। আর আছে প্রাইভেট সেক্রেটারি। এই ইনি। সুশান্ত খুব কাজের ছেলে। একে ছাড়া চলে না আমার।'

'আপনারা শ্রীনগরেই থাকবেন ?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'আপাতত। তবে ইচ্ছে আছে কাশ্মীরটা একটু ঘুরে দেখার।'

'আমাদেরও ওই একই প্ল্যান', বলল ফেলুদা। 'শ্রীনগরে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। আপনারা কি হাউসবোটে থাকবেন ?'

'হ্যাঁ। হাউসবোটটা একটা ইউনিক ব্যাপার। আমি সিক্সটি ফোরে একবার এসে থেকে গেছি। ইয়ে, এনার সঙ্গে তো আলাপ হল না—' ভদ্রলোক লালমোহনবাবুর দিকে ফিরেছেন।

'আমিও ক্রাইম', বলল জটায়ু। 'আমি একজন রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক।'

'ওরে বাবা ! তা হলে তো ক্রিমিন্যাল ছাড়া সবাই উপস্থিত দেখছি...ঠিক আছে। দেখা হবে শ্রীনগরে। আমরাও একটু চায়ের ব্যবস্থা দেখি গিয়ে।'

২

আকাশ থেকে শ্রীনগর উপত্যকার এক রূপ, আর মাটিতে নেমে আর এক রূপ। চোখ জুড়িয়ে যায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর এও ঠিক যে, এ জায়গার সঙ্গে দার্জিলিং-সিমলার কোনও মিল নেই। শ্রীনগরের দৃশ্য একেবারে অনন্য। সেটা আরও বেশি করে

বুঝতে পারলাম ট্যাক্সিতে করে শহরে আসার সময়। শহর থেকে এয়ারপোর্ট সাত মাইল। একবার মনে হয়েছিল উপত্যকা বলে বুঝি অনেকটা কাঠমাণ্ডুর মতো হবে, কিন্তু তার পর লেক আর ঝিলাম নদী দেখে সে ধারণা একদম পাল্টে গেল।

আমাদের যেতে হবে ডাল লেকের দক্ষিণে শহরের রাস্তা বুলেভার্ডে। আধ ঘণ্টায় বুলেভার্ডে পৌঁছে গেলাম। লেকের এ দিকটা পাকা গাঁথুনি দিয়ে ঘেরা। ঘাট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছোট নৌকোয় গিয়ে উঠতে হয়। এই নৌকোকে এখানে বলে শিকারা। ভেনিসে যেমন জলপথে যাতায়াতের জন্য গণ্ডোলা, এখানে তেমনি শিকারা। আমাদের হাউসবোটের নাম 'ওয়াটার লিলি'। 'ওয়াটার লিলি'র শিকারাও ঘাটেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা মালসমেত তাতে গিয়ে উঠলাম। তার পর পঞ্চাশ হাত খানেক গেলেই পাশাপাশি সার বাঁধা আর হাউসবোট নেই। যা আছে, সবই লেকের পশ্চিম অংশে।

শিকারা থেকে বোটে উঠতে কোনও কসরতের দরকার হয় না, খুবই সহজ ব্যবস্থা। বোটের সামনের দিকে খানিকটা খোলা জায়গা, সেখানে ইচ্ছা করলে বসা যায়, আবার সিঁড়ি দিয়ে উপরের ডেকে ওঠার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে চেয়ারে বসে চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করা যায়, চা খাওয়া যায়, আর স্রেফ আড্ডাও মারা যায়।

ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই বসবার ঘর, তাতে সোফা, চেয়ার, কার্পেট ইত্যাদি বৈঠকখানার যাবতীয় সরঞ্জাম রয়েছে, দেয়ালে ছবি রয়েছে, ফুলদানিতে ফুল রয়েছে, আবার একটা ছোট লাইব্রেরিও রয়েছে। বসবার ঘরের পরে খাবার ঘর, দুটো বেডরুম, বাথরুম ইত্যাদি। সব মিলিয়ে জলের উপর একটি বাংলো বাড়ি, যাতে সব রকম ব্যবস্থা আছে। কিচেনও আছে, তবে সেটা পিছন দিকে একটা ছোট্ট আলাদা নৌকোয়।

লালমোহনবাবুর মুখে হাসি লেগেই আছে, বললেন, 'ভাগ্যিস ডিসিশনটা নিয়েছিলাম। এর ক্রেডিট কিন্তু সবটাই আমার পাওনা। তোমার দাদা ভূস্বর্গের কথা ভাবেননি।'

ফেলুদা বলল, 'আমি তো আপনার মতো লেখক নই।

আইডিয়া আসা উচিত আপনার মাথা থেকে। যাকগে, এখন আগে একটু চা খেয়ে শিকারায় করে লেকটা একবার ঘুরে দেখা যাক।'

দুজন চাকর রয়েছে হাউসবোটের সঙ্গে, নাম মাহমুদিয়া আর আবদুল্লা।

চা খেয়ে বেরোতে সূর্য হেলে এল পশ্চিমে। মে মাস হলে কী হবে, বেশ ঠাণ্ডা; আমাদের কলকাতায় শীতের সময় যে পোশাক পরতে হয়, এখন এখানেও তাই পরতে হয়। ফেলুদা বলল, 'আজ শুধু লেকটা ঘুরে দেখা যাবে, কাল থেকে সাইট্ সিইং আরম্ভ হবে। বুলেভার্ডের পিছনেই দেখতে পাচ্ছেন পাহাড় রয়েছে, এক হাজার ফুট উঁচু। ওর মাথায় রয়েছে শঙ্করাচার্যের মন্দির। সম্রাট অশোকের ছেলে জালুকের তৈরি। তা ছাড়া লেকের পুব দিকে মোগল বাগান রয়েছে—নিশাদবাগ, শালিমার চশমা শাহি—এগুলোও দেখা চাই। চশমা শাহির স্প্রিং-এর জল নাকি একেবারে অমৃত—যেমনই স্বাদ, তেমনি ক্ষুধাবর্ধক।'

'লেকের মাঝখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, ওটা কী?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমি জানতাম ফেলুদা কাশ্মীর সম্বন্ধে সব পড়াশুনা করে এসেছে।

ফেলুদা বলল, 'ওটাকে বলে চার চিনার। দ্বীপটার চার কোণে চারটে চিনার গাছ রয়েছে।'

মাহমুদিয়া আর আবদুল্লা শিকারা চালাতে আরম্ভ করল, আমরা বাঁয়ে গোটা দশেক হাউসবোট পেরিয়ে আসল লেকে গিয়ে পড়লাম। দুটো পাশাপাশি হাউসবোট নিয়ে রয়েছেন রিটায়ার্ড জজ সিদ্ধেশ্বর মল্লিক আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ। আমরা খোলা লেকে পড়বার আগে একটা বোট থেকে সুশান্ত সোম আমাদের দিকে হাত নেড়ে বললেন, 'ফেরার পথে একবার ঢুঁ মেরে যাবেন। চায়ের নেমন্তন্ন রইল।'

ডাল লেকের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। স্বচ্ছ কাচের মতো জল, হাওয়া নেই বলে ঢেউ নেই, তাই আয়নার মতো চারিদিকের পাহাড়গুলো প্রতিফলিত হচ্ছে। এখানে-ওখানে পদ্ম শালুক শাপলা ফুটে আছে, শিকারা সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে

চলেছে। লালমোহনবাবুকে কবিতায় পেয়েছে, বললেন, 'কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের এথিনিয়াম ইস্কুলের মাস্টার বৈকুণ্ঠ মল্লিকের একটা আট লাইনের কবিতা আছে। ভদ্রলোক বহু জায়গায় ঘুরেছিলেন, আর সেই সব জায়গা নিয়ে পদ্য লিখে গেছেন। কাশ্মীরেরটা শুনুন ফেলুবাবু, কি রকম ডিসেন্ট—

করি নত শির
তোমারে প্রণমি কাশ্মীর
কুমারীকার অপর প্রান্তে
অবস্থান তব ভারতের উত্তর সীমান্তে
রাজধানী শ্রীনগর
ঝিলামের জলে ধোয়া অপূর্ব শহর
কত হ্রদ, কত বাগ, কত বাগিচা
অন্য নগরের সাথে তুলনা করিতে যাওয়া মিছা।...'

'বাঃ, দিব্যি', বলল ফেলুদা—যদিও বুঝলাম সেটা জটায়ুর মনে কষ্ট না দেবার জন্য। কবিতায় লালমোহনবাবুর রুচিটা যে একটু গোলমেলে, তার পরিচয় এর আগেও অনেকবার পেয়েছি।

শুধু কবিতা নয়, ডাল লেকের দৃশ্যে ভদ্রলোককে গানেও পেয়েছে। গুনগুন করে কী গাইছেন জিজ্ঞেস করাতে বললেন উর্দু গজল।

এদিকে সন্ধ্যার আলো অনেক বেশিক্ষণ থাকে—অন্তত বছরের এই সময়টায়। আমরা সাড়ে সাতটায় যখন ফিরছি, তখনও পুরো অন্ধকার হয়নি।

সুশান্ত সোম তাঁদের হাউসবোটের সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের দেখে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

'আসুন, একটু আড্ডা মারা যাক।'

আমরা এঁদের বোটের সামনে শিকারা দাঁড় করিয়ে ওপরে উঠলাম। এঁদের বোটের নাম 'রোজমেরি'। এঁদের পাশেই রয়েছে এঁদের অন্য বোট, সেটার নাম 'মিরান্ডা'। 'রোজমেরি'-তে থাকেন সুশান্ত সোম আর জজ সাহেবের ছেলে, নাম বিজয় মল্লিক। 'মিরান্ডা'-তে আছেন মিঃ মল্লিক, তাঁর ডাক্তার হরিনাথ মজুমদার

আর বেয়ারা প্রয়াগ।

চায়ের অর্ডার দিয়ে উপরের ডেকে উঠে সুশান্ত ফেলুদাকে বললেন, 'আপনার তাস চলে? তিন-তাস?'

'অভ্যেস নেই', বলল ফেলুদা, 'তবে তাসের প্রায় সব খেলাই মোটামুটি জানা আছে। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'নীচের বৈঠকখানায় তাসের আড্ডা জমেছে।'

'এত লোক পেলেন কোথায়?'

'ট্রেনে দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বিজয়ের। একজন বাঙালি, নাম সরকার; আর একজন পাঞ্জাবি। তিন জনেই জুয়াড়ি।'

আমরা চারজনে বসলাম। সত্যি, কলকাতা যে কোন সুদূরে চলে গেছে, তার কোনও হিসাবই নেই। হাউসবোটের টপ ডেকে বসে চা খাওয়ার আয়োজন—এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। আমাদের ডান দিকের হাউসবোটে সাহেবরা এসে উঠেছে—সেখান থেকে বিলিতি বাজনার শব্দ আসছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাহেব-মেম সেই বাজনার সঙ্গে নাচছে সামনের বৈঠকখানায়।

ফেলুদা সুশান্তবাবুকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, 'সিদ্ধেশ্বরবাবু ক'দিন হল রিটায়ার করেছেন?'

'পাঁচ বছর', বললেন সুশান্তবাবু। 'ওঁর তখন বাষট্টি বছর বয়স।'

'কিন্তু জজের তো রিটায়ার করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।'

'ওঁর শরীরটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অ্যানজাইনা। ভদ্রলোকের রিটায়ার করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ডাক্তারের কথায় বাধ্য হয়ে করতে হয়। উনি বহু অপরাধীর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন। এক-এক সময় বলেন, 'আমার শেষ জীবনে দুঃখ আছে। এত লোককে ফাঁসিতে পাঠালে তার একটা প্রতিক্রিয়া হবেই। উনি ডায়েরি লিখতেন; সে ডায়েরি সব এখন আমার হাতে, কারণ আমি ওঁর একটা জীবনী লিখছি—যদিও সেটা আত্মজীবনী হিসেবেই বেরোবে। সেই ডায়েরিতে উনি যেদিনই কারুর প্রাণদণ্ড দিয়েছেন সেদিনই লাল কালিতে একটা ক্রস দিয়ে রেখেছেন। মাঝে মাঝে ক্রসের সঙ্গে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে। সেটাতে বুঝতে হবে,

প্রাণদণ্ড দিয়ে নিজেরই মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে এটা ঠিক হল কি না। এখন কী করছেন জানেন? ওঁর যে ডাক্তার—মজুমদার—তিনি ভালো মিডিয়ম—তাঁর সাহায্যে প্ল্যানচেট করছেন, আর ফাঁসির আসামীর আত্মাদের ডেকে এনে তাদের জিজ্ঞেস করছেন, তারা সত্যিই খুন করেছিল কিনা। আত্মা যদি বলে যে হ্যাঁ, সে সত্যিই খুন করেছিল, তা হলে উনি খানিকটা নিশ্চিন্তবোধ করেন। এখন পর্যন্ত ওর জাজমেন্টে কোনও ভুল বেরোয়নি।'

'আপনারা কি এখানে এসেও প্ল্যানচেট করবেন নাকি?'

'সেই জন্যেই তো ডাক্তারকে একই হাউসবোটে রেখেছেন। ওর অ্যানজাইনাটা এখন অনেকটা কন্ট্রোলে এসেছে। আসলে ডাক্তার সঙ্গে এসেছেন প্ল্যানচেটের জন্য।'

'আজ রাত্রেও কি আপনাদের প্ল্যানচেট হবে।'

'আজ হয়তো হবে না, কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। ...কেন বলুন তো?'

'আমি ইন্টারেস্টেড', বলল ফেলুদা। 'অবশ্য উনি আমার উপস্থিতি বরদাস্ত করবেন কিনা সেটা একটা প্রশ্ন।'

'সেটা আমি বলে দেখতে পারি। উনি আপনার প্রতি বেশ প্রসন্ন, সেটা আমি এর মধ্যেই বুঝেছি। আর এমনিতে প্ল্যানচেটের ব্যাপারে উনি কোনও গোপনতা অবলম্বন করেন না। যা ফলাফল হয়, সবই তো ওঁর আত্মজীবনীতে থাকবে। আমি তো সম্পূর্ণ রেকর্ড রাখছি।'

'তা হলে আপনি একটু জিজ্ঞেস করে জানাবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

আমরা চা খাওয়া শেষ করে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে নিজেদের বোটে চলে এলাম। বৈঠকখানায় ঢুকে সোফায় ধপ করে বসে পড়ে লালমোহনবাবু বললেন, 'হাইলি ইন্টারেস্টিং ম্যান—দিস্ জজ সাহেব।'

'ইন্টারেস্টিং তো বটেই', বলল ফেলুদা, 'তবে উনিই একমাত্র জজ নন, যাঁর এইরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এ রকম ঘটনা

দেশে-বিদেশে আগেও শোনা গেছে।'

'ভালো কথা—আপনার সঙ্গে আমার পারমিশনটাও চেয়ে রাখবেন। প্ল্যানচেট দেখার সুযোগ ছাড়া যায় না।'

৩

দেখতে দেখতে চার দিন কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন শহরটা ঘুরে দেখলাম। লালমোহনবাবু একটা 'হটশট' ক্যামেরা কিনেছেন, তাই দিয়ে পটাপট ছবি তুলছেন। সেগুলো শহরের মাহাত্তা অ্যান্ড কোম্পানিতে ডেভেলাপ আর প্রিন্ট করে দেখা গেল মন্দ ওঠেনি। যদিও লালমোহনবাবুর নিজের মন্তব্য 'হাইলি প্রোফেশনাল' মোটেই মানা যায় না।

নিশাদবাগ, শালিমার আর চশমা শাহিও এক সকালে বেরিয়ে দেখে এলাম। মনটা চলে গেল সেই জাহাঙ্গির শাজাহানের আমলে। এই ট্রিপটা আমরা করেছিলাম মল্লিক ফ্যামিলির সঙ্গে, ফলে তাদের সঙ্গে আলাপটাও আরও জমে উঠল। সিদ্ধেশ্বরবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'আপনি শুনছি আমার প্ল্যানচেট সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। আপনি প্ল্যানচেটে বিশ্বাস করেন ?'

'আমার মনটা খুব খোলা, জানেন', বলল ফেলুদা। 'প্ল্যানচেট, স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি অনেক পড়েছি। পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যে সম্ভব, সেটা বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি বলে গেছেন ; সেক্ষেত্রে প্ল্যানচেট সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করার কোনও মানে হয় না। তবে যেমন সব কিছুর মধ্যে থাকে তেমনই এর মধ্যে ধাপ্পাবাজি চলে। আসলে মিডিয়ম যদি খাঁটি হয়, তাহলেই ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।'

'ডাঃ মজুমদার ইজ এ ফার্স্ট রেট মিডিয়ম। আপনি একদিন বসে দেখুন না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার বন্ধু আর আমার ভাইও আসতে চায়।'

'মনে বিশ্বাস থাকলে কোনও লোকের আসাতেই আমার আপত্তি নেই। আজই আসুন। ভালো কথা, আমি কাদের আত্মা নামাচ্ছি,

জানেন তো ?'

'যে সব লোককে আপনি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন, তাদের তো ?'

'হ্যাঁ। আমি জানতে চাইছি, আমার জাজমেণ্টে কোনও ভুলে হয়েছে কি না। এখন পর্যন্ত সে রকম ভুল পাইনি।'

'আপনারা রোজ একটি করে আত্মা নামান ?'

'হ্যাঁ। একটার বেশিতে ডাক্তারের স্ট্রেন হয়।'

'তা হলে ক'টায় আসব ?'

'আসুন রাত দশটায়। ডিনারের পর বসা যাবে। তখন চারিদিকটা বেশ নিস্তব্ধ হয়ে যায়।'

ডিনারের পর আমরা মিঃ মল্লিকের হাউসবোটে গিয়ে হাজির হলাম। বসবার ঘরে প্ল্যানচেটের ব্যবস্থা হয়েছে। একটা টেবিলকে ঘিরে পাঁচটা চেয়ার রাখা হয়েছে; বুঝলাম চেয়ারগুলো খাবার ঘর থেকে আনা হয়েছে। আমরা আর সময় নষ্ট না করে কাজে লেগে গেলাম। মিঃ মল্লিক বললেন, 'আজ আমরা রামস্বরূপ রাউত বলে একটি বিহারী ছেলের আত্মাকে নামাব। এই ছেলেটির আজ থেকে দশ বছর আগে ফাঁসি হয়, এবং আমিই সে ফাঁসির জন্য দায়ী ছিলাম। আমার বিশ্বাস: এর ফাঁসির দণ্ড হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু জুরির ভার্ডিক্ট ছিল গিল্টি, আর খুনটাও ছিল একটু নৃশংস ধরনের। তাই আমি সাময়িক ভ্রান্তিবশত জেনেশুনেও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিই। যদিও আমার মনে এই আদেশের যথার্থতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কেসটা এমন চতুরভাবে সাজানো হয়েছিল, যাতে ছেলেটিকে অপরাধী বলেই মনে হয়।...মজুমদার তুমি তৈরি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জানালার সব পরদা টেনে দিয়ে ঘরটাকে একেবারে অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সকলে যে যার জায়গায় বসেছি। আমার ডান দিকে ফেলুদা, বাঁ দিকে লালমোহনবাবু, ফেলুদার ডান পাশে মিঃ মল্লিক আর তাঁর পাশে—লালমোহনাবাবুর বাঁ দিকে—ডাঃ মজুমদার।

মিঃ মল্লিক গম্ভীরভাবে বললেন, 'ছেলেটির বয়স ছিল উনিশ। শার্প চেহারা, নাকের নীচে সরু গোঁফ, গায়ের রং পরিষ্কার। বিহারের ছেলে—নাম রামস্বরূপ রাউত। ছুরি দিয়ে খুনের মামলা, ঘটনাস্থল কলকাতার বাগবাজারের একটা গলি। ছেলেটিকে দেখে কিন্তু খুনি বলে মনে হয়নি। আপনারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী একটা চেহারা স্থির করে নিয়ে তাতে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করুন। প্রশ্ন আমিই করব, উত্তর মজুমদারের মুখ দিয়ে আসামীর কণ্ঠস্বরে বেরোবে।'

পনেরো মিনিট এইভাবে অন্ধকারে বসে থাকার পরই বুঝলাম টেবিলটা আস্তে আস্তে নড়তে আরম্ভ করেছে। তার পর আরও জোরে দোলানি শুরু হল। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিট খানেক পরে, মল্লিকমশাই প্রশ্ন করলেন—হিন্দিতে।

'তুমি কে?'

'আমার নাম রামস্বরূপ রাউত।'

ডাক্তারের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল, কিন্তু কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আলাদা। শুনে বেশ গা শিউরে ওঠে।

মিঃ মল্লিক আবার প্রশ্ন করলেন—

'তোমার ফাঁসি হয়েছিল ১৯৭৭ সালে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তোমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য দায়ী, তা তুমি জানো?'

'জানি।'

'খুনটা কি তুমিই করেছিলে?'

'না।'

'তবে কে করেছিল?'

'ছেদিলাল। সে ভয়ানক ধূর্ত ছিল। তার অপরাধ সে অত্যন্ত চতুরভাবে আমার ঘাড়ে ফেলে। পুলিশ আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করে।'

'আমি সেটা জানি। আমি তোমায় দেখেই বুঝেছিলাম যে, তোমার দ্বারা এ খুন করা সম্ভব নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি

তোমাকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করি।'

'সে নিয়ে এখন আর ভেবে কী হবে?'

'আমি চাই তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

'সেটা আমি খুব সহজেই করতে পারি। তবে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে যারা জীবিত আছে, তারা ক্ষমা করবেন কি না জানি না।'

'তাদের কথা আমি ভাবছি না। তোমার ক্ষমাটাই আমার প্রয়োজন।'

'মৃত্যুর পর আর কারুর ওপর কোনও আক্রোশ থাকে না।'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

মিঃ মল্লিক উঠে গিয়ে ঘরের বাতিটা জ্বালিয়ে দিলেন। ডাঃ মজুমদারের জ্ঞান আসতে আরও মিনিট দু'-এক লাগল।

এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল বটে।

'মনটা অনেকটা হাল্‌কা লাগছে', বললেন মিঃ মল্লিক, 'এই একটি মৃত্যুদণ্ডে যে আমি ভুল করেছিলাম, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এবং এখন তো বুঝতেই পারছি যে আমার ধারণাই ঠিক।'

ফেলুদা বলল, 'এই প্ল্যানচেট করে কি আপনি নিজের মনটাকে হালকা করতে চান?'

'শুধু তাই নয়', বললেন মিঃ মল্লিক, 'আমার মনে মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ জাগে যে, আদৌ *একজন* মানুষ আর একজনের প্রাণদণ্ড দিতে পারে কি না।'

'কিন্তু তা ব'লে খুনির শাস্তি হবে না?'

'হবে—কিন্তু প্রাণদণ্ডের দ্বারা নয়। কারাদণ্ড নিশ্চয়ই চলতে পারে। তা ছাড়া অপরাধীর সংস্কারের জন্য রাস্তা বার করতে হবে।'

ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে, তাই আমরা উঠে পড়লাম। মল্লিক বললেন, 'আমরা গুলমার্গ যাচ্ছি পরশু। আপনারা আসুন না আমাদের সঙ্গে।'

ফেলুদা বলল, 'সে তো খুব ভালোই হয়। ওখানে কি

থাকবেন ?'

'এক রাত', বললেন ভদ্রলোক। 'গুলমার্ক থেকে খিলেনমার্গ যাব—তিন মাইল পথ—হেঁটেও যাওয়া যায়, ঘোড়াতেও যাওয়া যায়। তার পর ফিরে এসে এক রাত থাকা। এখান থেকেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে ; আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্সিই আপনাদেরটাও করে দেবে।'

সেই কথা রইল। আমরা তিনজনে আমাদের হাউসবোটে ফিরে এলাম।

ফেলুদা শুতে যাবার আগে বলল, 'মল্লিকমশাইয়ের ধারণাটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা চলে না। একজন খুনির প্রাণদণ্ড হবে না, সেটা মেনে নেওয়া কঠিন। ভদ্রলোকের আসলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তির খানিকটা গোলমাল হয়ে গেছে। অবিশ্যি একজন জজের এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।'

'তবে ভেবে দেখুন', বললেন লালমোহনবাবু, 'এক কথায় একটা লোকের ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে। কতখানি ক্ষমতা দেওয়া থাকে একজন জজের হাতে। এই ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়লে একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষের মনে সংশয় আসতে পারে বইকি।'

'সেটা অবশ্য ঠিক', বলল ফেলুদা।

৪

শ্রীনগরের সঙ্গে গুলমার্গের কোনও মিলই নেই। এখানে হ্রদ, নদী, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি কিছুই নেই ; যা আছে, তা হল ঢেউ খেলানো পাহাড়ের গায়ে মসৃণ ঘন সবুজ ঘাস—যা দেখতে একেবারে মখমলের মতো ; আর আছে ঝাউ বন আর পাইন বন আর ইতস্তত ছড়ানো কিছু কাঠের ঘর বাড়ি। সব মিলিয়ে ছবির মতো সুন্দর। এই পাহাড়ের গায়েই গল্‌ফ খেলা হয়। আর শীতকালে যখন ঘাস বরফে ঢেকে যায়, তখন স্কিইং হয়।

শ্রীনগর থেকে টাংমার্গ পর্যন্ত আঠাশ মাইল ট্যাক্সি করেই আসতে হয়, তার পর শেষের চড়াই চার মাইল যেতে হয় ঘোড়াতে।

কলকাতায় থাকতেই ফেলুদা লালমোহনবাবুকে বলে দিয়েছিল যে, কাশ্মীরে ঘোড়ায় চড়তে হবে।—'ভয় নেই, উটের চেয়ে অনেক সহজ।' লালমোহনবাবু একেবারে পাকাপোক্ত রাইডিং ব্রিচেস করিয়ে এনেছিলেন। গুলমার্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে বললেন ঘোড়া চড়ার মতো সহজ ব্যাপার আর নেই।

আমাদের সঙ্গে মল্লিক মশাইরাও এসেছেন। আমরা আজকের রাতটা গুলমার্গে থেকে কাল এখান থেকে তিন মাইল দূরে আর দু' হাজার ফুট ওপরে খিলেনমার্গ দেখে বিকেলেই শ্রীনগর ফিরে যাব।

থাকার জন্য আমরা পাশাপাশি দুটো ক্যাবিন নিয়েছি। আমাদেরটা ছোট, ওদেরটা বড়। বিকেলে ক্যাবিনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় তিনজন ভদ্রলোক এসে হাজির—সুশান্তবাবু, সিদ্ধেশ্বর মল্লিকের ছেলে বিজয়বাবু ও আর একজন—যাকে আমরা চিনি না, সুপুরুষ চেহারা, টক্‌টকে রং, বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। সত্যি বলতে কি, তিনজনেই মোটামুটি এক বয়সী।

সুশান্তবাবু নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এঁর নাম অরুণ সরকার। ইনি কলকাতায় ব্যবসা করেন। আমাদের সঙ্গে এখানে এসে আলাপ। জুয়াড়িদের একজন বললে বোধ হয় আপনার চিনতে আরও সুবিধে হবে।'

সকলেই হেসে উঠল। সুশান্তবাবু বললেন, 'আমরা এসেছি কেন বোধ হয় বুঝতেই পারছেন। প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরের সঙ্গে আলাপ করতে এঁরা দুজনেই খুব ব্যগ্র। তা ছাড়া শুনছিলাম, আপনার বন্ধু মিঃ গাঙ্গুলিও তো একজন নামী লেখক—ওঁর সব বই-ই নাকি বেস্ট-সেলার।'

লালমোহনবাবু মাথা হেঁট করে হেঁ হেঁ করে একটু বিনয়ের ভাব দেখালেন।

বিজয় মল্লিক আর অরুণ সরকারের খাতিরে ফেলুদাকে তার গোটা দু'-তিন বিখ্যাত কেসের বর্ণনা দিতে হল। শেষ হয়ে যাবার পর সরকার ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কী কাশ্মীরে এই প্রথম?'

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ, এই প্রথম। আমি কিন্তু আপনাকে প্রথমে

দেখে কাশ্মীরী ভেবেছিলাম। আপনি বোধ হয় এখানে আর একবার এসেছেন ?'

'তা এসেছি', বললেন সরকার। 'ইন ফ্যাক্ট, আমার ছেলেবেলার কয়েকটা বছর শ্রীনগরেই কেটেছে। বাবা এখানে একটা হোটেলে ম্যানেজারি করতেন। তার পর বছর কুড়ি আগে আমরা কলকাতা চলে যাই।'

'এখানকার ভাষা আপনার জানা নেই ?'

'তা অল্পবিস্তর আছে বইকি।'

এবার ফেলুদা বিজয় মল্লিকের দিকে ফিরল।

'আপনার বাবার প্ল্যানচেট সম্বন্ধে আপনার কোনও কৌতূহল নেই ?'

বিজয়বাবু বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে 'না' বললেন।

'বাবার ভীমরতি ধরেছে', বললেন বিজয়বাবু। 'একজন খুনি মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না।'

'আপনি সে কথা বাবাকে বলেননি ?'

'বাবার সঙ্গে আমার সে রকম সম্পর্ক নয়। উনি আমার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেন না, আমিও ওঁর ব্যাপারে কিছু বলি না।'

'আই সি।'

'তবে বাবা যা করছেন তা করে যদি শান্তি পান, তা হলে আমার বলবার কিছু নেই।'

'আপনার মা নেই ?'

'না। মা বছর চারেক হল মারা গেছেন।'

'আর ভাই বোন ?'

'এক দাদা ছিল, আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং করত, সে গত বছর মারা যায়। তার মেমসাহেব বউ আর এদেশে আসেনি। এক বোন আছে, তার স্বামী ভূপালে কাজ করে।'

'আমার বিশ্বাস আপনার কাশ্মীরের দৃশ্য সম্পর্কে খুব একটা কৌতূহল নেই।'

'কী করে বুঝলেন ?'

'কারণ যে পরিমাণ সময় ঘরে বসে তাস খেলে কাটান !'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার মনে কাব্য নেই। আমি কাঠখোট্টা মানুষ। আমার দু'-একজন বন্ধু আর দু' প্যাকেট তাস হলেই হল !'

সরকার একটু হেসে বলল, 'আমি কিন্তু তাসও খেলি, আবার দৃশ্যও দেখি। সেটা বোধহয় ছেলেবেলায় কাশ্মীরে থাকার জন্য হয়েছে।'

'যাই হোক্'—বিজয়বাবু উঠে পড়লেন—'আমাদের কিন্তু তাসের সময় হয়ে যাচ্ছে। আজ সুশান্তকে দলে টেনেছি। আপনারা কেউ— ?

'আমরা ভাবছিলাম একটু ঘুরতে বেরোব। আপনারা এখন কিছুক্ষণ খেলবেন তো ?'

'এগারোটা পর্যন্ত তো বটেই।'

'তা হলে ফিরে এসে একবার টুঁ মারব।'

'বেশ। কাল আবার দেখা হবে।'

'তিন ভদ্রলোক গুডবাই করে চলে গেলেন। লালমোহনবাবু বললেন, 'এখন না বেড়িয়ে আফটার ডিনার ওয়াক্নে বেরোলে ভালো হত না ?'

'তথাস্তু', বলল ফেলুদা।

এখানে ক্যাবিনের সঙ্গে বাবুর্চি রয়েছে, তাকে বলে দিয়েছিলাম রাত্তিরে ভাত আর মুরগির কারি খাব। খেলাম দিব্যি রান্না করে। সাড়ে আটটার মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না, তাই তিনজনেই বেশ উৎসাহের সঙ্গে রাতের গুলমার্গ শহর দেখতে বেরোলাম।

নিরিবিলি শহর, তার মধ্য দিয়ে তিনজন হেঁটে চলেছি। পথে যে লোক একেবারে নেই, তা নয়। ভারতীয়দের মধ্যে বিদেশি টুরিস্টও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সত্যি বলতে কি, হিসেব নিলে বোধহয় বিদেশি টুরিস্টই সংখ্যায় বেশি হবে। লালমোহনবাবু এখনও গুনগুন করে গজল গাইছেন, খালি শীতের জন্য গলায় মাঝে মাঝে অযথা গিটকিরি এসে যাচ্ছে।

'শীত লাগছে ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'তা লাগছে, তবে মনে হয় খুব স্বাস্থ্যকর ঠাণ্ডা।'

'তা হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় এ সব জায়গায় বেশি রাত না করাই ভালো। চ' তোপ্‌সে, ফেরা যাক।'

আমরা উল্টোমুখে ঘুরলাম। শহর আর আমাদের ক্যাবিনের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে। সেখানটা বসতি নেই বললেই চলে। আমরা সেই জায়গাটা দিয়ে হাঁটছি। এমন সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল। কী যেন একটা জিনিস শন্‌শন্ শব্দে আমাদের মাথার পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা গাছের গায়ে লেগে মাটিতে পড়ে গেল। 'আমাদের মাথা' বলছি, কিন্তু আসলে সেটা ঠিক ফেলুদার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ফেলুদার কাছে টর্চ ছিল, সেটা জ্বালিয়ে গাছের তলায় ফেলতেই দেখা গেল বেশ বড় একটা পাথর। সেটা ফেলুদার মাথায় লাগলে নির্ঘাৎ একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হত।

প্রশ্ন হচ্ছে—কে এই লোকটা, যে-এভাবে আক্রমণটা করল ? আর এর কারণই বা কী ? আমরা তো সবে এখানে এসেছি। এখনও গোলমেলে ব্যাপার কিছু ঘটেনি, তদন্তের কোনও প্রশ্নই উঠছে না, তাহলে এই হুম্‌কির মানে কী ?

ক্যাবিনে ফিরে এসে ফেলুদা গম্ভীরভাবে বলল, 'ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগছে না। আমাকে পছন্দ করছে না কেউ ; এবং গোয়েন্দাকে হটানোর চেষ্টার একটাই কারণ হতে পারে—কোনও কুকীর্তি হতে চলেছে। অথচ সেটা যে কী, সেটা আন্দাজ করার কোনও উপায় নেই।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনার সেই ·৩২ কোল্ট রিভলভারটা আশা করি এনেছেন।'

ফেলুদা বলল, 'ওটা বাক্সেই রাখা থাকে। কিন্তু রিভলভার ব্যবহার করার সময় এখনই এল কই ? কোনও ক্রাইম তো ঘটেনি এখনও !'

'যাই হোক, রাত্তিরে দরজা-জানালা সব ভালো করে বন্ধ করে শুতে হবে। এখানে রিস্ক নেওয়া চলবে না। আশ্চর্য ব্যাপার

মশাই !—আপনার সঙ্গে ছুটিতে কোথাও বেরোলেই কি গণ্ডগোল শুরু হবে ?'

ফেলুদা একটু ভেবে বলল, 'যাই, ওদের সঙ্গে একটু তাস পিটিয়ে আসি। আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরব। আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

৫

আগেই বলেছি যে, খিলেনমার্গ যেতে হলে তিন মাইল পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে দু' হাজার ফুট উপরে উঠতে হয়। আমরা দুই ক্যাবিনের বাসিন্দারা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। সেটাই করা হল।

আমাদের মধ্যে এক মিঃ মল্লিকই ঘোড়া নিলেন, আর-সকলে হেঁটে যাওয়া স্থির করলাম। শুনেছি, পথের দৃশ্য অতি চমৎকার, আর দু' পাশে অনেক ফুল গাছ।

লালমোহনবাবু বললেন, 'এই সাত দিনেই এনার্জি বেড়ে গেছে মশাই। হেঁটে দু' হাজার ফুট পাহাড়ে ওঠাটা কোনও ব্যাপারই বলে মনে হচ্ছে না।'

সত্যিই পথের দৃশ্য অপূর্ব। আমরা তিনজনে মোটামুটি একসঙ্গে হাঁটছি, বাকি ওদের দল ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা দলে আছি সব সুদ্ধ ন' জন—আমরা তিন জন, মিঃ মল্লিক, বিজয় মল্লিক, ডাঃ মজুমদার, সুশান্তবাবু, মিস্টার সরকার আর বেয়ারা প্রয়াগ।

প্রায় দু' ঘণ্টা লাগল দু' হাজার ফুট উঠতে ; আর উঠেই এক আশ্চর্য দৃশ্য আমাদের হকচকিয়ে দিল। আমরা একটা পাহাড়ের পিঠে এসে উপস্থিত হয়েছি, মাটিতে বরফ, সামনে বরফের পাহাড় আর উল্টো-দিকে ছড়িয়ে আছে গাছপালা নদী হ্রদ-সমেত দিগন্ত বিস্তৃত উপত্যকা, আর তারও পিছনে আকাশের গায়ে যেন খোদাই করা রয়েছে নাঙ্গা পর্বত।

ফেলুদা বলল, 'এই বোধ হয় ক্লাইম্যাক্স। কাশ্মীরে এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু আছে কি ?'

লালমোহনবাবু ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বার বার বলছেন, 'আসুন, একটা গ্রুপ তুলি, একটা গ্রুপ তুলি এই বরফের উপর দাঁড়িয়ে।'

হঠাৎ বাকি দল থেকে একটা শোরগোল শোনা গেল। সেটা একটা প্রশ্নের আকার নিয়ে আমাদের কানে এল।

'মণ্টু কই ?'

প্রশ্নটা করেছেন মিঃ মল্লিক, অত্যন্ত ব্যস্ত কণ্ঠে। বুঝতে অসুবিধা হল না যে, মণ্টু হল বিজয় মল্লিকের ডাক-নাম। কারণ দলের মধ্যে একমাত্র তিনিই অনুপস্থিত।

কোথায় গেলেন ভদ্রলোক ? এতই পিছিয়ে পড়েছেন কি ? না, তা তো হতে পারে না। এঁরা একটু ছাড়া-ছাড়া ভাবে হাঁটছিলেন ঠিকই, কিন্তু বিজয়বাবু কি একেবারে দলছুট হয়ে গিয়েছিলেন ?'

এবার সুশান্ত সোমের গলা শোনা গেল। 'আপনি এখানেই থাকুন মিঃ মল্লিক। আমরা নীচে খোঁজ করে আসছি।'

যেমন কথা তেমন কাজ, আর এই অনুসন্ধানের পার্টিতেও আমরা যোগ দিলাম।

যে পথ দিয়ে উপরে উঠেছি, এবার সেই পথ দিয়েই নেমে যাওয়া। আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করছে। লোকটা গেল কোথায় ?

সুশান্তবাবু গলা তুলে চিৎকার দিলেন।

'বিজয়বাবু ! বিজয়বাবু !'

কোনও উত্তর নেই।

মিনিট পনেরো নামার পরেই হঠাৎ লালমোহনবাবু এক জায়গায় এসে থমকে থেমে গেলেন, তাঁর দৃষ্টি একটা ঝোপের দিকে।

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে দৌড়ে গেল ঝোপটার দিকে, কারণ পাতার ফাঁক দিয়ে একটা জুতো দেখা যাচ্ছে—পাহাড়ে ওঠার বুট।

'মিঃ সোম !' ফেলুদা হাঁক দিল।

মিঃ সোম দৌড়ে পৌঁছে গেল ফেলুদার পাশে, তার পিছনে বাকি চারজন।

ঝোপের পিছনে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন বিজয় মল্লিক।

ফেলুদা নাড়ি টিপেই বলল, 'হি ইজ অ্যালাইভ। মনে হয় মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

কাছেই একটা ঝরনা ছিল, তার থেকে আঁজলা করে জল এনে মুখে ঝাপটা দিতে ভদ্রলোক চোখ খুলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। তার পর অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায়— ?'

ফেলুদা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আপনার এ অবস্থা কী করে হল ?'

কেউ...ধাক্কা...'

'আপনি যেখানে পড়েছেন, মনে হয় আপনাকে অনেক উপর থেকে গড়িয়ে পড়তে হয়েছে।'

'হ্যাঁ...তাই...একটা ফুল দেখছিলাম ঝুঁকে পড়ে...'

'অজ্ঞানটা হয়েছেন এই গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠোকা খেয়ে ?'

'তাই হবে।'

'আপনি দেখুন তো উঠতে পারেন কি না।'

ফেলুদা ভদ্রলোকের দু' হাত ধরে নিজের কাঁধের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল। একটু টলোমলো অবস্থার পর ভদ্রলোক দেখলাম নিজেকে সামলে নিলেন।

ফেলুদা এবার মাথাটা দেখে বলল, 'একটা জায়গায় চোট লেগেছে, রক্ত বেরোয়নি, তবে জায়গাটা ফুলে গেছে। দু'-তিন দিন একটু ভোগাবে আপনাকে। এখন আপনি ফিরে চলুন। একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। তা না হলে আস্তে আস্তে হেঁটে চলুন। পরে এক সময় আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার ইচ্ছে রইল।'

বিজয়বাবু এতক্ষণে মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে গেছেন, কেবল দু'-এক বার মাথার একটা বিশেষ জায়গায় আলতো করে হাত বোলালেন।

আমি মনে মনে ভাবছি—ভদ্রলোকের এ দশা করল কে এবং কেন ?

গুলমার্গ ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। আমরা যে যার ক্যাবিনে চলে গেলাম। ফেলুদা বলল, 'আগে একটু চা খাওয়া

দরকার।'

খানসামাকে চায়ের অর্ডার দেওয়ার পর লক্ষ করলাম, ফেলুদার ভুরুটা অস্বাভাবিক রকম কুঁচকে আছে।

চায়ের পর দেখি, বিজয়বাবু নিজেই এসে হাজির, সঙ্গে সুশান্তবাবু আর মিঃ সরকার।

'বাধ্য হয়েই আপনার কাছে আসতে হল', বললেন বিজয়বাবু। 'আমি এত হতভম্ব আর কখনও হইনি।'

'আপনার উপর আক্রোশ থাকতে পারে এমন কেউ নেই এখানে ?'

'কে থাকতে পারে বলুন ! তাহলে তো সুশান্ত বা ডাঃ মজুমদার বা মিঃ সরকারের কথা বলতে হয়। সে তো হাস্যকর ব্যাপার হত !'

'কাশ্মীরে এসে পূর্বপরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি ?'

'না।'

'কলকাতাতে এমন কেউ নেই, আপনার উপর যার কোনও আক্রোশ থাকতে পারে।'

'আমি তো সে রকম কারুর কথা জানি না।'

'আপনি তো কলকাতাতেই পড়াশুনা করেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'গ্র্যাজুয়েট ?'

'হ্যাঁ। স্কটিশ চার্চ কলেজ।'

'মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট ছাত্রজীবন ছিল ?'

'ঠিক তা বলা যায় না।'

'কেন ?'

'কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে কুসঙ্গে পড়ি, নেশা ধরি, ড্রাগস।'

'হার্ড ড্রাগস ?'

'হ্যাঁ—কোকেন, মর্ফিন...'

'তার পর ?'

'বাবা টের পেয়ে যান।'

'বাবা তো তখনও জজিয়তি করতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তার পর?'

'তিনি আমার এই অভ্যাস ছাড়ানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। তার পর আশা ছেড়ে দেন।'

'এই অবস্থাতেও আপনি গ্র্যাজুয়েট হতে পেরেছিলে?'

'আমি খুবই ভালো ছাত্র ছিলাম।'

'আপনি বাড়িতেই থাকতেন?'

'কিছু দিন ছিলাম, তার পরে আর পারিনি। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কানপুরে এক আশ্চর্য লোকের সংস্পর্শে আসি। সাধুই বলতে পারেন। নাম আনন্দস্বামী। তখনও আমি নেশায় মত্ত, কিন্তু ভদ্রলোকের সংস্পর্শে এসে আমার নেশা চলে যায়। একে মিরাক্ল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আমি আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাই।'

'তার পর বাড়ি ফেরেন?'

'হ্যাঁ। বাবা আমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দেন।'

'তখন আপনার বয়স কত?'

'সাতাশ-আটাশ হবে।'

'তার পর? আপনি চাকরি করেন?'

'বাবাই একটা ফার্মে ঢুকিয়ে দেন। আমি এখনও সেখানেই আছি।'

'আপনার জুয়ার প্রতি একটা আসক্তি আছে না?'

'তা আছে।'

সেটা কোনও সমস্যার সৃষ্টি করছে না তো?'

'না।'

'আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, আপনার কোনও শত্রু আছে কি না, আপনি কী বলবেন?'

'যত দূর জানি, আমাকে খুন করতে চাইবে এমন কোনও শত্রু আমার নেই। ছোটখাটো শত্রু বোধ হয় সকলেরই থাকে—তার পিছনে ঈর্ষা থাকতে পারে। এটা যে অস্বাভাবিক নয়, সেটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।'

'একশোবার।...এবার আরও দু'-এক জন সম্বন্ধে আপনাকে আরও দু'-একটা প্রশ্ন করে নিই। ডাঃ মজুমদারকে আপনি কদ্দিন থেকে চেনেন?'

'উনি আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান আজ প্রায় পনেরো বছর হল।'

'বেশ। আবার সুশান্তবাবুকে একটা প্রশ্ন।'

সুশান্তবাবু বললেন, 'বলুন।'

'আপনি কতদিন হল মিঃ মল্লিকের সেক্রেটারির কাজ করছেন?'

'ওঁর রিটায়ার করার সময় থেকেই। তার মানে পাঁচ বছর।'

'বেয়ারা প্রয়াগ কত দিন আছে?'

ও-ও আন্দাজ পাঁচ বছর। মিঃ মল্লিকের পুরনো বেয়ারা মকবুল হঠাৎ মারা যায়। তার পর উনি প্রয়াগকে রাখেন।'

'বেশ, আজ এই পর্যন্তই থাক। তবে পরে দরকার হলে আবার প্রশ্ন করতে পারি তো?'

'নিশ্চয়ই', বললেন বিজয়বাবু।

৬

'কী মশাই, আবার যেই কে সেই?'

শ্রীনগর ফিরে এসে আমরা সকালে বোটের উপরের ডেকে বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় লালমোহনবাবু মন্তব্যটা করলেন।

'যেই কে সেই', বলল ফেলুদা। 'যা বুঝছি, ছুটি-ভোগ মানেই দুর্ভোগ। ক্রাইম যেন আমাদের পিছনে ওঁত পেতে থাকে, একটু আরাম করলেই ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে এবার যে রকম হতভম্ব হয়েছি, সে রকম কখনও হয়েছি বলে মনে পড়ে না। কোনও খুঁটিই যেন খুঁজে পাচ্ছি না, যেটা ধরে একটু এগোব। সব অন্ধকার।'

তার পর কিছুক্ষণ চুপ থেকে চা-টা শেষ করে একটা চারমিনার ধরিয়ে বলল, 'সুশান্তবাবুকে বলতে হবে একবার যদি মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলো দেন।'

'ও ডায়েরি দিয়ে আপনার কী লাভ ?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'কিসে কী কাজ দেয় তা আগে থেকে কেউ বলতে পারে ? অবশ্য মিঃ মল্লিকের রাজি হওয়া চাই। সেটা সুশান্তবাবুকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'তা, সে তো এখনই পারেন—ওই তো সুশান্তবাবু।'

সত্যিইদেখি, ভদ্রলোক শিকারা করে বুলেভার্ডের দিক থেকে ফিরছেন, সঙ্গে কিছু খরিদ করা জিনিসপত্র।

ফেলুদা ডেকের রেলিং-এর পাশে ঝুঁকে পড়ে ডাক দিল।

'ও মশাই, এক মিনিট এদিকে আসতে পারেন ?'

শিকারাটা আমাদের বোটের কাছে চলে এল। ফেলুদা বলল, 'মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলো কি আপনি সঙ্গে এনেছেন ?'

'সবগুলো', বললেন সুশান্তবাবু, 'চব্বিশটা আছে।'

'ওগুলো দু'-তিনটে করে ধার নিতে পারি ? মল্লিক ফ্যামিলি সম্বন্ধে আর একটু জানতে না পারলে আমি এই নতুন পরিস্থিতির ঠিক কিনারা করতে পারছি না। আমার মনে হয় ডায়েরিগুলো পড়লে কিছুটা সুবিধা হতে পারে।'

সুশান্তবাবু বললেন, 'আমি একবার সাহেবকে জিজ্ঞেস করি।'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার মনে হয় না উনি কোনও আপত্তি করবেন, কারণ আপনারা তো সবই শুনেছেন ওঁর মুখ থেকে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে সুশান্তবাবু চারটে পুরনো ডায়েরি সঙ্গে নিয়ে আমাদের হাউসবোটে এসে হাজির। বললেন, 'এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, "জীবনী যখন বেরোবে, তখন তো সবই জানাজানি হয়ে যাবে। কাজেই এখন পড়তে দিতে আর কী আপত্তি থাকতে পারে ? আর ক্রাইমের কথাই যদি হয়, তা হলে সবই তো খবরের কাগজের রিপোর্টে বেরিয়েছে"।

ফেলুদা বলল, 'এগুলো দেখা হয়ে গেলে আর এক সেট আমি আপনারা কাছ থেকে চেয়ে আনব।...তোপ্‌সে—তুই আর লালমোহনবাবু বরং যা, মানসবল লেকটা দেখে আয়। আমি এখন

একটু ঘরে বসে কাজ করব।'

'ভালো কথা', বললেন, 'সুশান্তবাবু, 'আপনার পাহালগাম যাবেন না ?'

'ইচ্ছে তো আছে।'

'কবে যাবেন ? আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গে গেলেই ভাল। আমরা পরশু যাচ্ছি।'

'ভেরি গুড।'

মানসবল লেকের মতো স্বচ্ছ জল আমি আর কোনও লেকে দেখিনি। জলের একেবারে তল অবধি উদ্ভিদ দেখা যায়; ভারি অদ্ভুত লাগে দেখতে।

লালমোহনবাবু দৃশ্য উপভোগ করলেন ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, মাঝে মাঝে ওঁর ফেলুদার তদন্তের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। একবার বললেন, 'তোমার দাদা ওই ডায়েরিগুলো পড়ছেন কেন জানি না। যাদের একবার ফাঁসি হয়ে গেছে, তারা তো আর খুনখারাপি করতে পারবে না।'

আমি বললাম, 'সেটা ফেলুদাকেই বুঝতে দিন না।'

মানসবল শ্রীনগর থেকে আঠারো মাইল দূরে ; আমাদের ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। ফেলুদা দেখলাম বৈঠকখানার সোফায় বসে তখনও ডায়েরি নিয়ে পড়ছে। বলল, 'সারা দিনে বারোটা ডায়েরি পড়ে শেষ করেছে এবং সব ক'টাই নাকি ইন্টারেস্টিং।'

'কোনও কাজ হল কি ?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, 'কাজ কিসে হয়, সেটা অনেক সময় আগে থেকে বোঝা যায় না। আপাতত আমার কাজ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। নতুন তথ্য কিছু বেরিয়েছে—শুধু ডায়েরি থেকে নয়। যেমন বিজয়বাবু বলেছেন যে, সেদিন যে উনি ঘাড়ে ধাক্কা খেয়েছিলেন তখন একটা ঠাণ্ডা, ধাতব স্পর্শ অনুভব করেছিলেন। আমার মতে সেটা আংটি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তবে তাতেও যে খুব সুবিধে হচ্ছে তা নয়, কারণ আংটি এখানে তিনজন পরেন—সুশান্তবাবু, মিঃ সরকার আর প্রয়াগ। আর যদি এ দলের

বাইরে কেউ থাকে, তা হলে তো চমৎকার। তা হলে আমাদের কোনও তদন্তই কাজ দেবে না।'

'কিন্তু সে রকম দল কি বেশি ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'তা ছিল না ঠিকই।'

'আমার তো একটিও মনে পড়ছে না।'

'একটি ছিল—পাঞ্জাবি দল—তবে তাদের পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই ছিল ঘোড়ার পিঠে।'

'আশা করি আর কোনও গোলমাল হবে না।'

'আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। ভূস্বর্গে এসে এ সব ঝামেলা ভালো লাগে না—বিশেষ করে যখন বুদ্ধি খাটাবার কোনও স্কোপ পাওয়া যাচ্ছে না।'

পাহালগাম যাবার আগে আমরা শ্রীনগরে আর এক দিন ছিলাম, তার মধ্যে ফেলুদা মিঃ মল্লিকের বাকি ডায়েরিগুলো পড়া শেষ করে ফেলল।

'কী বুঝলেন?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, 'অন্তত ছ'টা প্রাণদণ্ড সম্পর্কে উনি নিশ্চিত যে, সেগুলো অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোতে তিনি ভুল করেছেন। এই ছ'টা কেসেই কারাদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল। একটি বিশেষ কেস—সেখানে আবার আসামী হচ্ছেন কাশ্মীরী, নাম সপ্রু—সেখানে ফাঁসির হুকুম দেওয়ার পরে মল্লিকের খুব অনুশোচনা হয়। তার পরেই অবিশ্যি ওঁর অ্যানজাইনার পেইন আরম্ভ হয় এবং উনি কিছু দিনের মধ্যে রিটায়ার করেন।'

পাহালগাম শ্রীনগর থেকে ষাট মাইল। লিদর উপত্যকায় ছোট্ট শহর। এক পাশ দিয়ে খরস্রোতা লিদর নদী বয়ে গেছে। তাতে সাহেবরা ট্রাউট মাছ ধরে। শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে বরফের পাহাড় দেখা যায়। আগে এখানে হোটেল-টোটেল ছিল না, এখন অনেক হয়েছে। তবে এখনও ইচ্ছে করলে তাঁবু ভাড়া নিয়ে নদীর ধারে থাকা যায়। আমরা সেভাবেই থাকব বলে ঠিক করলাম।

চারটে ট্যাক্সি করে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। চমৎকার পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে বারোটার মধ্যে আমরা পাহালগাম পৌঁছে গেলাম। শহরটা একপেশে ; নদীর পশ্চিম দিকে শুধু পাহাড়, বাড়ি ঘরদোর কিছুই নেই। আর পুব দিকে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে আছে হোটেল, রেস্টোর‍্যান্ট, দোকান-পাট নিয়ে ছবির মতো শহর।

আমাদের তাঁবুর জন্য আগেই বলা ছিল, গিয়ে দেখি যে তাঁবু খাটাবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। এ তাঁবু স্পেশ্যাল ধরনের মজবুত তাঁবু, এতে ডাইনিং রুম, বেডরুম, অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম সবই আছে। আমাদের একটা তাঁবু আর মল্লিকদের দুটো। সামনে বিশ হাতের মধ্য দিয়ে তোড়ে বয়ে চলেছে লিদ্দর নদী, তার একটানা শব্দ কখনও থামে না। লালমোহনবাবু হলিউডের ছবির কথায় চলে গেলেন ; বললেন, 'মশাই, একমাত্র ওয়েস্টার্ন ছবিতেই এ রকম আউটডোর লাইফ দেখেছি ; আমাদের আবার কোনও দিন এ রকমভাবে থাকতে হবে, ভাবতে পারিনি।'

দুপুরে তাঁবুতে লাঞ্চ খেয়ে (এখানেও সঙ্গে কিচেন রয়েছে) সবে বাইরে বেরিয়েছি, এমন সময় দেখি সুশান্ত সোম আমাদের তাঁবুর দিকে আসছেন।

'লাঞ্চ শেষ ?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'হ্যাঁ', বলল ফেলুদা।

'এখান থেকে আট মাইল দূরে চন্দনওয়াড়ি বলে একটা জায়গা আছে, জানেন তো ?'

'যেখানে একটা বরফের ব্রিজ আছে—সেটা সারা বছর থাকে ?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা দেখতে যাবার মতলব করছেন নাকি ?'

'গেলে সবাই একসঙ্গে গেলেই তো ভাল হয় ?'

'তবে আজই সবে এলাম, আজ ভাবছিলাম পাহালগামটাই ঘুরে দেখব। চন্দনওয়াড়ি কাল গেলে হয় না ?'

'আমাদেরও সেই আইডিয়া। আমি শুধু আপনাদের ইনভাইট করতে এলাম।'

ফেলুদা বলল, 'অবশ্যই একসঙ্গে যাব। আমাকে ছাড়া বোধ হয়

আপনাদের আর চলবে না। এর মধ্যেই যা একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে গেল। এটাকে তো অ্যাটেম্‌টেড মার্ডার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বিজয়বাবুর খুব ভাগ্য ভাল যে, উনি বেঁচে গেলেন।'

'তা হলে কাল দুটো নাগাদ যাওয়া যাক। এখান থেকে আট মাইল ঘোড়া করে যেতে হয়। লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়া যাবে।'

'প্রয়াগ! প্রয়াগ!' মিঃ মল্লিক ডাকতে ডাকতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর চোখে ভ্রূকুটি। এ দিকে প্রয়াগ সামনেই নদীর ধারে হাত-মুখ ধুচ্ছে।

'বোধ হয় নদীর শব্দের জন্য শুনতে পাচ্ছে না', বলল ফেলুদা।

'না', বললেন মিঃ মল্লিক, 'ও এমনিতেই কানে একটু খাটো, তিনবার না ডাকলে উত্তর দেয় না।'

প্রয়াগ এবার ডাক শুনে মনিবের কাছে দৌড়ে গেল।

'যাও, আমার লাঠিটা নিয়ে এসো।'

'হুজুর', বলে প্রয়াগ তাঁবুর ভিতর চলে গেল।

কিছুক্ষণ থেকেই দেখছিলাম, ফেলুদা প্রয়াগকে একদৃষ্টে লক্ষ করছে। কেন, সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে অন্য তাঁবুটা থেকে বিজয়বাবু আর মিঃ সরকারও বেরিয়ে এসেছেন। সরকার এঁদের সঙ্গ ছাড়েননি। মনে হয় পুরো ট্যুরটাই এঁদের সঙ্গে ঘুরবেন।

'আমরা কাল চন্দনওয়াড়ি যাচ্ছি', বললেন সুশান্তবাবু।

সকলে প্রস্তাবে সায় দিল।

ফেলুদা বলল, 'তোরা দু-জনে ডেক-চেয়ার নিয়ে নদীর ধারে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ কর, আমি একটু পাহাড়ি পথে ঘুরে আসি। মাথাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার।'

'কতক্ষণের জন্য যাবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'এই ঘণ্টাখানেক,' বলল ফেলুদা।

'সঙ্গে আপনার বিশ্বস্ত অস্ত্রটি আছে তো?'

'তা আছে।'

ফেলুদা চলে গেল।

লালমোহনবাবুর মাথায় একটা নতুন গল্পের প্লট এসেছে, সেটা

আমাকে শুনিয়ে পরখ করে দেখে নিলেন। আমি আবার কিছু ইমপ্রুভমেন্ট সাজেস্ট করলাম। এই করতে করতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বেরিয়ে গেল। নদীর ধারে বসে থাকলে বোরিং লাগে না, তাই সময়টা বেশ কেটে যাচ্ছিল, এমন সময় লালমোহনবাবু বললেন, 'দু' ঘণ্টা হতে চলল, তবু তোমার দাদা এলেন না—'

সত্যিই তো! এটা আমার খেয়ালই হয়নি।

'কী করা যায়, বলো তো?'

ফেলুদার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও অভ্যাসে হয়ে গেছে মুহূর্তে ডিসিশন নেবার।

আমি উঠে পড়লাম।

'চলুন, ওকে খুঁজতে বেরোই।'

'চলো।'

ফেলুদা কোন্ রাস্তা ধরেছে সেটা আমরা জানতাম। আমরা দু' জনে সেই পাহাড়ি পথে চড়াই ধরে রওনা দিলাম। পাইন বনের মধ্য দিয়ে পথ, পরিবেশ চমৎকার, কিন্তু আমাদের সে সব উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা নেই। ফেলুদা বলেছিল এক ঘণ্টায় ফিরবে; এ বিষয়ে ওর কথার নড়চড় হয় না। কিছু একটা গণ্ডগোল নিশ্চয়ই হয়েছে।

আধ ঘণ্টা হাঁটার পরেই যা খুঁজছিলাম, তা পেয়ে গেলাম। একটা ঝোপের ধারে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ফেলুদা। আমার গলা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু পাল্‌স ধরেই বললেন, 'বেঁচে আছেন—কোনও চিন্তা নেই।'

ফেলুদাও নড়েচড়ে উঠল। তার পরেই উঠে বসে মাথার পিছনে হাতটা দিয়ে মুখটা বিকৃত করে বলল, 'এবার মিস্ করেনি রে। একেবারে মোক্ষমভাবে লক্ষ্যভেদ।'

'উঠতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই। ব্যথা তো মাথায়।'

ফেলুদা উঠে পড়ে আমাদের দু' জনের কাঁধে ভর করে কয়েক পা হেঁটে বলল, 'ঠিক হ্যায়, হাঁটতে পারব।'

'কিন্তু কাউকে কি দেখতে পেলেন ?'

'তা হলে তো তদন্ত ফুরিয়ে যেত। সে লোক অত কাঁচা নয়। ক'টা দিন যাক। আর একটু মাথা না খাটালে চলছে না।'

রাত্তিরে মিঃ মল্লিকের তাঁবুতে আবার প্ল্যানচেট হল। বলা হয়নি, এর মধ্যে শ্রীনগরে আর একদিন প্ল্যানচেট হয়েছিল, যাতে আমরাও উপস্থিত ছিলাম। শাসমল বলে এক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আত্মা এসে বলল যে, সে সত্যিই খুন করেছিল।

আজকের প্ল্যানচেটে ফেলুদা ডায়েরি পড়ে যার কথা বলেছিল, সেই কাশ্মিরি মিঃ মনোহর সপ্রুর আত্মা নামানো হল। আশ্চর্য মিডিয়ম ডাঃ মজুমদার—দশ মিনিটের মধ্যেই আত্মা চলে আসে।

সপ্রুর আত্মা প্রশ্ন করল, 'আমাকে কেন ডেকেছ ?'

মিঃ মল্লিক বললেন, 'তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলাম আমি। যে খুনের মামলার আমি ছিলাম জজ।'

'সেটা আমি জানি।'

'আমার বিশ্বাস হয়েছিল খুনটা তুমি করোনি।'

'খুন করেছিল হরিদাস ভগত। পুলিশ ভুল তদন্ত করেছিল। কিন্তু এখন আর তাতে কিছু এসে যায় না।'

'কিন্তু আমি যে সেই সেভেনটি এইট থেকে দুশ্চিন্তায় ভুগছি।'

'তুমি কি আমার কাছে ক্ষমা চাও ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, করলাম তোমাকে ক্ষমা। কিন্তু আমার যে সব আত্মীয়বন্ধু জীবিত আছে, তারা তোমায় ক্ষমা করেনি বা করবে না।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তোমার ক্ষমা চাই।'

'বেশ, ক্ষমা করলাম। আমি আসি।'

প্ল্যানচেট শেষ হল।

মিঃ মল্লিক আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আমরা নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এলাম।

বালিশে মাথা রাখার দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুম এসে গেল।

সকালে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি ফেলুদা। তার মুখের ভাব দেখেই বুঝলাম কোনও একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে।

'মিঃ মল্লিক খুন হয়েছেন।'

'অ্যাঁ!'

এবার আমার চিৎকারে লালমোহনবাবুরও ঘুম ভেঙে গেল।

'কাল মাঝরাত্তিরে,' বলল ফেলুদা। 'বুকে ছুরি মেরেছে। শুধু তাই না, খুনটাকে আরও পাকা করার জন্য মাথায়ও একটা ভারী কিছু দিয়ে মেরেছে। সব মিলিয়ে বিশ্রী ব্যাপার।'

এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। লালমোহনবাবুও উঠলেন। গায়ে দুটো গরম কাপড় চাপিয়ে দুজনেই তাঁবুর বাইরে চলে এলাম। ফেলুদা আমাদের খবরটা দিয়েই আবার বেরিয়ে গেল। মিঃ মল্লিক খুন! ব্যাপারটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনের মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

বাইরে দেখি সকলেই প্রায় তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, সকলেরই মুখ কালো। কথাবার্তায় বুঝলাম বিজয়বাবু পুলিশকে খবর দিতে গেছেন। এখান থেকে শহর বেশি দূর নয়, তাই পুলিশ আসতে বেশি সময় লাগা উচিত না।

ডাঃ মজুমদারই সকালে উঠে প্রথমে ব্যাপারটা দেখেন। বিছানার চাদর রক্তাক্ত। সেটা ছুরির আঘাতের ফলে, কারণ মাথায় বিশেষ রক্তপাত হয়নি। অস্ত্রটা অবশ্য পাওয়া যায়নি। মনে মনে বললাম, এমন চমৎকার লিদর নদী থাকতে অস্ত্র ফেলার জায়গার অভাব কোথায়? নদী এখন সে ছুরিকে ভাসিয়ে ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে?

তবে শুধু যে খুন, তা নয়; তার সঙ্গে চুরিও আছে। মিঃ মল্লিকের ডান হাতের অনামিকায় একটা বহুমূল্য হিরের আংটি ছিল—তাঁর এক গুজরাটি মক্কেলের দেওয়া। খুনি সেইটিও খুলে নিয়ে গেছে।

ফেলুদা ডাঃ মজুমদারকে প্রশ্ন করছিল।

'কাল রাত্রে ভদ্রলোক শুয়েছেন কখন ?'

'আমাদের অনেক আগে। উনি ন'টার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়তেন।'

'আপনি তো ডাক্তার, দেখে বুঝতে পারছেন না কখন খুনটা হয়েছে ?'

'মনে হয় রাত দুটো, আড়াইটে নাগাদ ; তবে সেটা পুলিশের ডাক্তার এলে আরও সঠিকভাবে বলতে পারবে।'

'রাত্রে কোনও শব্দটব্দ শোনেননি ? ঘুমের কোনও ব্যাঘাত হয়নি ?'

'উঁহু। আমার সচরাচর এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে যায়। আমি একটু তাড়াতাড়ি উঠি। সাড়ে ছ'টায় উঠেই দেখি এই কাণ্ড। আমার আগে প্রয়াগ উঠেছিল, কিন্তু ও এই দুর্ঘটনাটা লক্ষ করেনি। ও উঠেই তাঁবুর বাইরে চলে গিয়েছিল।'

'কে খুন করতে পারে, সে সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে ?'

'একেবারেই না।'

একটা পুলিশের জিপ এসে তাঁবুর কাছে থামল। বিজয়বাবু নামলেন, তাঁর পিছনে একজন ইনস্পেক্টর। বিজয়বাবুর নির্দেশ অনুযায়ী ইনস্পেক্টরটি এগিয়ে গেলেন মিঃ মল্লিকের তাঁবুর দিকে।

'আমার নাম ইনস্পেক্টর সিং', বললেন ভদ্রলোক। 'আমি এই কেসটার চার্জ নিচ্ছি। হোয়্যার ইজ দ্য ডেডবডি ?'

'বিজয়বাবু মিঃ সিংকে নিয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকলেন। আমরা বাইরেই রয়ে গেলাম।

ইনস্পেক্টরের পিছন পিছন কয়েকজন কনস্টেবল, ফোটোগ্রাফার ইত্যাদি এ সব ব্যাপারে যেমন হয়ে থাকে—ঠিক তেমনি ভাবেই কাজ শুরু করে দিল। এ জিনিস অনেকবার দেখেছি, তাই কৌতূহল মিটে গেছে। আর মিঃ মল্লিকের মৃতদেহ দেখবার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না। খালি মনে হচ্ছিল—কী আশ্চর্য, এই মল্লিক কতজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, আর হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর

হত্যাকারীরও মৃত্যুদণ্ড হবে।

ফেলুদা একা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখে লালমোহনবাবু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

ফেলুদা বলল, 'আমার মনের ভিতরের জটটা আরও বেশ ভাল করে পাকিয়ে গেল—এই তো ব্যাপার! এখন পুলিশ যদি কিছু করতে পারে।'

'আপনি নিজে কি হাল ছেড়ে দিলেন?'

'তা কি হয়? আমি তো প্রথম থেকে সবগুলো ঘটনাই দেখেছি; পুলিশ তো আর তা দেখেনি। অবিশ্যি ঘটনাগুলোর পরস্পরের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র আছে কিনা সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আমাকে যে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল, আর বিজয়বাবুকে যে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিল, দু' জনেই কি এক লোক? আর সেই লোকই কি এই খুনটা করেছে? হিরের আংটি চুরি যদি মোটিভ হয়ে থাকে, তা হলে হয়তো বাইরের থেকে খুনটা করে থাকতে পারে। কিন্তু আমার—'

ফেলুদা চুপ করে গেল। তার পর কিছুক্ষণ পরে বলল, 'ডাকাতির আইডিয়াটাকে অবিশ্যি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের চেনা লোকই কুকীর্তিটা করেছে।'

'চেনা লোক বলতে— ?'

'মিঃ মল্লিকের সঙ্গে যারা এসেছেন। ইনক্লুডিং মিঃ সরকার। কারণ তাঁর ডান হাতের আঙুলে 'S' লেখা আংটিটার কথা ভুললে চলবে না।'

ইনস্পেক্টর সিং তাঁবু থেকে বাইরে বেরোলেন। ভদ্রলোক তিনটে তাঁবুর দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই সবগুলোই কি একই পার্টির তাঁবু?'

বিজয়বাবু বললেন, 'না; এই দুটো আমাদের, আর ওইটা মিঃ মিত্তিরদের।'

'মিঃ মিত্তির?'

'হি ইজ এ ওয়েলনোন প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর ফ্রম ক্যালকাটা।'

মিঃ সিং ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলেন। তার

পর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি রাজগড়ের খুনের কেসটা সল্‌ভ করেছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মিঃ সিং হাত বাড়ালেন করমর্দনের জন্য।

'ইনস্পেক্টর বাজপাই ইজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন। তার কাছে আপনার খুব প্রশংসা শুনেছি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।'

ফেলুদা বলল, 'আমি কিন্তু এখানে ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি। কোনও কেস-টেস সল্‌ভ করতে নয়। আপনি আপনাদের কাজ চালিয়ে যান।'

'আমি তো চালিয়ে যাবই আমার কাজ, কিন্তু আপনিই বা চুপচাপ বসে থাকবেন কেন, বিশেষ করে এই ফ্যামিলির সঙ্গে যখন আপনার আলাপ হয়েছে। খুনটা তো বাইরের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছে। ছুরি যে বসিয়েছে, সে তো লেফট হ্যান্ডেড ; এখানে তো সবাই দেখছি রাইট হ্যান্ডেড। যাই হোক, ইউ আর ফ্রি টু ক্যারি অন ইওর ওন ইনভেস্টিগেশন।'

'অনেক ধন্যবাদ। আসলে আমার উপরও একটা অ্যাটেম্‌ট হয়েছিল, কাজেই আমি ব্যাপারটাকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় নিতে পারছি না।'

'ভাল কথা', মিঃ সিং বিজয়বাবুর দিকে ফিরলেন। 'ডেড বডির কী হবে ? ওটা কি আপনি কলকাতায় নিয়ে যেতে চান ?'

'তার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি ছাড়া তো বাবার আর কেউ নেই। মা মারা গেছেন, দাদা বিলেতে ছিলেন, দাদাও মারা গেছেন।'

'ভেরি ওয়েল, তা হলে এখানেই সৎকার হোক। তবে, বুঝতেই পারছেন, আপনাদের এখনও কিছু দিন পাহালগামে থাকতে হবে। অন্তত যত দিন না কেসটার সুরাহা হচ্ছে তত দিন। কারণ ইউ আর অল আন্ডার সাসপিশন। আমি একে একে প্রত্যেককেই জেরা করতে চাই।'

পুলিশ ঘণ্টা তিনেক ধরে জেরা চালাল। জেরা শুরু করার আগে মিঃ সিং ফেলুদাকে দু'-একটা প্রশ্ন করে নিলেন। 'আপনি কাল রাত্রে কোনও সন্দেহজনক শব্দ পাননি ?'—

'না। তাছাড়া এখানে নদীর শব্দে অন্য সব শব্দ চাপা পড়ে যায়।'

'জানি। সেটা ক্রিমিন্যালের পক্ষে একটা অ্যাডভানটেজ। ভাল কথা, আপনার বন্ধুর সঙ্গে তো আলাপ হয়নি।'

'ইনি মিঃ গাঙ্গুলি। হি ইজ এ রাইটার।'

এর পর আমরা তিনজন শহরের দিকে গিয়ে একটা রেস্টোরান্টে বসে চা আর অমলেট খেলাম। সকালে গোলমালে আর ব্রেকফাস্ট হয়নি।

খেতে খেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'সবচেয়ে আশ্চর্য দেখছি যে, প্রথমে ছেলেকে খুন করতে চেষ্টা করে না পেরে শেষটায় বাবাকে খুন করল।'

ফেলুদা বলল, 'সেটা যে একই লোক করেছে, তার কী গ্যারান্টি ? একজনের ছেলের উপর আক্রোশ থাকতে পারে, আর একজনের বাপের উপর। নট ভেরি সারপ্রাইজিং।'

'আমার কিন্তু একটি লোক সম্বন্ধে কি রকম সন্দেহ হয়।'

'কে ?'

'ডাঃ মজুমদার। এ দিকে ডাক্তার তার উপরে আবার আত্মা নামাচ্ছে। কম্বিনেশনটা অদ্ভুত লাগছে।'

'খুন করার সুযোগ অবশ্য ডাক্তারেরই বেশি ছিল, কারণ পাশের খাটে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু মোটিভ কী ? হিরের আংটি যদি নেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তা হলে বলতে হয় ডাক্তারের খুবই আর্থিক দুরবস্থা। কিন্তু সে রকম তো কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আর বিজয়বাবু ?'

'বিজয়বাবু অবশ্য তাঁর বাপের মৃত্যুতে খুবই লাভবান হবেন। অবিশ্যি মিঃ মল্লিক যদি উইল করে থাকেন, এবং সে উইল থেকে

যদি ছেলেকে বাদ দিয়ে থাকেন, তা হলে বিজয়বাবুর কোনওই লাভ নেই। তা না হলে বিজয়বাবু মোটা টাকা পাবেন, কারণ মিঃ মল্লিক নিঃসন্দেহে ধনী ব্যক্তি ছিলেন।'

'কিন্তু বিজয়বাবু তো তাঁর অফিস থেকে রোজগার করছেনই। তাঁর হঠাৎ এতটা টাকার দরকার পড়বে কেন যে, সে খুন করবে? খুন করা তো চাট্টিখানি কথা নয়।'

'দ্যাট ইজ ট্রু।'

'সুশান্ত সোম সম্বন্ধে কী মনে হয় আপনার?'

'কাজের ছেলে সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। আর বেশ কোয়ালিফাইড। মিঃ মল্লিক সুশান্তবাবুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। আর সুশান্তবাবুর কোনও খুনের মোটিভ খুঁজে পাওয়া মুশকিল।'

'আচ্ছা মিঃ মল্লিকের উপর কি কেউ প্রতিশোধ নিয়ে থাকতে পারে?'

'তা তো পারেই। আমি তো সেই কথাটাই বার বার ভাবছি। কত জনের প্রাণ নিয়েছেন লোকটা, ভেবে দেখুন।'

'কিন্তু বিজয়বাবুর বেলা তো প্রতিশোধ খাটে না।'

'তা তো খাটেই না, আর সেই ব্যাপারেই বার-কয়ের ধাক্কা খেতে হচ্ছে।'

দুপুর বেলা লাঞ্চের পর ফেলুদা বলল, একটু শহরের দিকে ঘুরে আসবে। একটু না হাঁটলে নাকি ওর মাথা খোলে না।

'শহর হোক আর যাই হোক সঙ্গে আপনার অস্ত্রটি রাখবেন', বললেন লালমোহনবাবু।

আমরা দু' জন নদীর ধারে গিয়ে বসলাম।

সুশান্তবাবু তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত', বললেন ভদ্রলোক।

আমরাও সায় দিলাম। সত্যিই, এমন যে হবে তা ভাবতেও পারিনি।

'ইনস্পেক্টর কী বলেন?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

সুশান্তবাবু বললেন, যত দূর মনে হল, ডাকাতের সম্ভাবনাটা

একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। আংটিটার বিস্তর দাম ছিল, মাঝখানে হিরে বসানো, তাকে গোল করে পান্না দিয়ে ঘেরা। আর এখানে যে ডাকাতির কেস একেবারে হয় না তা নয়। যত টুরিস্ট বাড়ছে, তত এ সবও নাকি বাড়ছে। বছর ত্রিশেক আগে পাহালগম অনেক নিরাপদ জায়গা ছিল।'

'আপনারা কি তাঁবুতে বন্দী ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।'

'না', বললেন সুশান্তবাবু, 'তবে পাহালগাম ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না।'

'মৃতদেহের সৎকার হবে কখন ?'

'বিকেলের মধ্যেই।'

বিকেলে জানতে পারলাম যে, মল্লিকরা ব্রাহ্ম ছিলেন। তাই বিজয়বাবুকে আর অশৌচ পালন করতে হবে না।

ফেলুদা পাঁচটার মধ্যে ফিরে এল। ও যতক্ষণ না ফিরছিল। ততক্ষণ আমার অসোয়াস্তি লাগছিল। কিন্তু ও বলল, যারা ওর পিছনে লাগতে পারত, তারা সকলেই এখন পুলিশের নজরে রয়েছে। তাই চিন্তা নেই।

'কিন্তু এই যে ঘুরে এলেন, এর কোনও ফল পেলেন ?'

'পেয়েছি বইকি', বলল ফেলুদা, 'তবে এখানে বসে থেকে সব ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে না। আমাকে একবার শ্রীনগর যেতে হবে।'

'কবে যাবেন ?'

'কালই সকালে।'

'আর আমরা ?'

'আমার দু' দিন আন্দাজ লাগবে। সে দু' দিন আপনারা এখানেই থাকবেন। চেঞ্জের পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা তো আর হয় না।'

'কিছু আলো দেখতে পেলেন ?'

'তা পেয়েছি। সত্যিই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু এখনও কিছুটা অন্ধকার রয়েছে।'

'সেই জন্যেই তো শ্রীনগর যাওয়া দরকার। তবে যাবার আগে

আমার দিক থেকেও কয়েক জনকে একটু জেরা করা দরকার। নিচু স্তর থেকে ওপরে ওঠাই ভাল । আগে প্রয়াগকে কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

সুশান্তবাবুকে দিয়ে খবর পাঠাতেই প্রয়াগ তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল।

'ব'সো এখানে,' বলল ফেলুদা।

প্রয়াগ এখন আমাদের তাঁবুতে।

'শোনো প্রয়াগ', বলল ফেলুদা, 'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুমি তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে।'

'পুছিয়ে বাবু।'

কথাবার্তা হিন্দিতেই চলল, আমি বাংলায় লিখছি।

'তুমি মল্লিক সাহেবের বাড়িতে কবে থেকে আছ?'

'পাঁচ বছর হয়েছে।'

'তার আগে কোথায় ছিলে?'

'জেকব সাহেবের বাড়িতে বেয়ারার কাজ করতাম। পার্ক স্ট্রিটে।'

'মল্লিক সাহেব তোমাকে কি করে পেলেন?'

'আমি জেকব সাহেবের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে মল্লিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। জেকব সাহেব বিলেত চলে যাচ্ছিলেন, তাই আর আমাকে দরকার লাগছিল না।'

'মল্লিক সাহেব জেকব সাহেবকে চিনতেন?'

'ওরা দু'জনে এক ক্লাবের মেম্বার ছিলেন।'

'তোমার পুরো নাম কী?'

'প্রয়াগ মিসির।'

'তোমার সংসার নেই?'

'বউ মারা গেছে, মেয়ে দুটোর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কাল রাত্রে তুমি কোনও রকম শব্দ পাওনি, যার জন্য তোমার ঘুম ভেঙে যেতে পারে?'

'না বাবু।'

'বাবুকে কে খুন করতে পারে, তাই নিয়ে তোমার কোনও ধারণা

আছে ?'

'না বাবু। এ রকম হবে আমি কল্পনাই করতে পারিনি।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো।'

এবার ফেলুদা সুশান্তবাবুকে বলল ডাঃ মজুমদারকে খবর দিতে। ডাঃ মজুমদার এলেন আমাদের তাঁবুতে।

ফেলুদা বলল, 'আমি আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'করুন।'

'মিঃ মল্লিক যেভাবে প্ল্যানচেট করেছিলেন, সেটা কি ডাক্তার হিসাবে আপনার কাছে খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় ?'

ডাঃ মজুমদার মাথা নাড়লেন।

'না। আমি ওঁকে অনেকবার বলেছি যে, এই সব পুরনো ব্যাপার নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। আর জজ যদি এক-আধটা ভুল ভার্ডিক্ট দিয়ে থাকে, তাতেই বা কী এসে গেল। ভুল তো সকলেরই হতে পারে।'

'আপনার নিজের মধ্যে যে ক্ষমতাটা রয়েছে, সেটা কবে থেকে প্রকাশ পেল ?'

'তা অনেক দিন। পঁচিশ বছর তো বটেই।'

'ওঁকে কে খুন করতে পারে, সে সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে ?'

'একেবারেই নেই।'

'ওঁর ছেলে সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা ?'

'ছেলে এক কালে ড্রাগসের প্রভাবে খুব গোলমালের মধ্যে পড়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি। কিন্তু সেই সাধুর প্রভাবেই হোক, আর অন্য কোনও কারণেই হোক, ও একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।'

'জুয়ার প্রতি ওর আসক্তি রয়েছে না ?'

'সেটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারব না, কারণ আমি ও রসে একেবারেই বঞ্চিত।'

'ও কোন অফিসে কাজ করে ?'

'চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং—ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট।'

'কোথায় অফিস ?'

'গণেশ এভিনিউ। দশ নম্বর।'

'ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন।'

ডাঃ মজুমদার চলে গেলেন। সুশান্তবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন ফেলুদার দিকে।

'এবার মিঃ সরকারের সঙ্গে একটু কথা বলব।'

'মিঃ সরকার ?'

সুশান্তবাবু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।'

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ। কেন, আপনার অবাক লাগছে ?'

'উনি তো ঠিক আমাদের দলের নন ; এক রকম বাইরের লোক।'

'তাঁর যে টাকার দরকার নেই সেটা আপনি কি করে জানলেন সুশান্তবাবু ? টাকার জন্য মানুষে খুন করে না ?'

'ঠিক আছে। আমি ডাকছি ওঁকে।'

মিঃ সরকার এলেন।

'আসুন, বসুন', বলল ফেলুদা।

'কাশ্মীর এসেছিলাম বেড়াতে, আর কিসের থেকে কী হয়ে গেল দেখুন।'

'কী করবেন বলুন—মানুষের কপালই ওই রকম।'

'এখন বলুন, আমাকে কী জিজ্ঞেস করতে চান।'

'আপনি কত বছর পর্যন্ত শ্রীনগরে ছিলেন ?'

'বছর বারো।'

'তার পর কলকাতায় যান ?'

'হ্যাঁ।'

'সেইখানেই পড়াশুনা করেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বাবা কি কলকাতাতেও হোটেল ম্যানেজারি করতেন ?'

'হ্যাঁ।'

‘কোন হোটেল ?’

‘ক্যালকাটা হোটেল।’

‘আপনি গ্র্যাজুয়েট ?’

‘বি কম।’

‘এখন কী করেন।’

‘একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে আছি।’

‘কোম্পানির নাম ?’

‘ইউনিভারসাল ইনসিওরেন্স।’

‘আপিস কোথায় ?’

‘পাঁচ নম্বর পোলক স্ট্রিট।’

‘আপনি জজ মিঃ মল্লিকের কথা জানতেন ?’

‘না। এখানে এসে আলাপ। বিজয়ের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে মিলে গেল, তাই একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।’

‘আপনি কি জুয়ার ভক্ত ?’

‘আই লাইক গ্যাম্বলিং, তবে বিজয়ের মতো নয়।’

‘হঠাৎ কাশ্মীর আসার ইচ্ছে হল কেন ?’

‘ছেলেবেলার স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে।’

‘ক’ দিনের জন্য এসেছেন ?’

‘দশ দিন—তবে এখন কী হয় জানি না। এ রকমভাবে আটকে পড়ব, কে জানত !’

‘আপনার হাতের আংটিটা একবার দেখতে পারি ?’

‘নিশ্চয়ই।’

সরকার তাঁর আংটিটা খুলে ফেলুদার হাতে দিলেন, সোনার আংটি, উপরে একটা ছ’ কোনা পাতের উপর মিনে করে নীলের উপর সাদা দিয়ে S লেখা।

ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে আংটিটা ফেরত দিয়ে দিল।

‘ঠিক আছে। আপনার জেরা শেষ।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ।’

পরদিন সকালে ফেলুদা ব্রেকফাস্টের পর ট্যাক্সি নিয়ে শ্রীনগরে চলে গেল। বলল, 'মনে হচ্ছে, পরশু ফিরে আসতে পারব ; তবে দু'-এক দিন দেরি হলে চিন্তা করিস না।'

ন'টা নাগাত পুলিশের জিপ এল, ইনস্পেক্টর সিং নামলেন। অন্য তাঁবুতে কাজ শেষ করে ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'হোয়্যার ইজ মিঃ হোমস ?' হেসে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

আমি বললাম, ফেলুদা একটু শ্রীনগর গেছে।

'এই কেসের ব্যাপারে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তার প্রয়োজন হচ্ছে কেন ? এই কেস তো জলের মতো সোজা।'

'কি রকম ?'

'বেয়ারাটাই হচ্ছে অপরাধী। তার সুযোগ ছিল। সে একই তাঁবুতে শুত। তাছাড়া এ সব লোকের লোভ হওয়াটা স্বাভাবিক। বেয়ারাগিরি করে আর কত রোজগার হয় ?'

'আপনি কি ওকে অ্যারেস্ট করছেন ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'আপাতত থানায় নিয়ে যাচ্ছি জেরার জন্য। তা ছাড়া, ও যে লেফট হ্যান্ডেড তাও প্রমাণ হয়ে গেছে। ওকে ওর নাম লিখতে বলেছিলাম। ডান হাতে লিখতেই পারল না, কিন্তু বাঁ হাতে বেশ পারল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ও অস্বীকার করছে, সুতরাং ওকে বেশ ভাল রকম জেরা করা দরকার।'

'আংটিটাও পেতে হবে', বললেন জটায়ু।

'সেটাও জেরার জোরে বেরিয়ে যাবে। পুলিশের পক্ষে খুঁজে পাওয়া তো মুশকিল। এই পাহাড়ি পরিবেশে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে কে জানে ?'

'ফেলুদা কি তাহলে বৃথাই গেল শ্রীনগর ? কেসটা এতই

সোজা ? আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। অত সহজ হলে ফেলুদা অত কাঠখড় পোড়াত না। আমি জানি ও কলকাতায় খোঁজ করবে। ওর লোক আছে, যাদের বলে দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওরা যে কোনও খবর জোগাড় করে দিতে পারে।

কিন্তু তার পরেই আবার মনে হয়ে যাচ্ছে, বেয়ারা লেফট-হ্যান্ডেড।

কিন্তু এত সাহস হবে লোকটার ? ও কি জানে না যে ওর ওপরেই প্রথমে সন্দেহ পড়বে ?

ইনস্পেক্টর সিং বিদায় নিয়ে প্রয়াগকে সঙ্গে করে চলে গেলেন। লোকটাকে দেখে আমার কষ্ট হল, কারণ ও কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে। পুলিশরা স্বীকারোক্তি আদায় করবার জন্য কত কী যে করতে পারে, সে আমার জানতে বাকি নেই। ফেলুদাও এ নিয়ে বহুবার আক্ষেপ করে বলেছে। ও বলে পুলিশরা কাজ জানে, ওরা কর্মঠ, কিন্তু দয়ামায়া বলে কিছু নেই ওদের মধ্যে। অবিশ্যি উপায়ও নেই। অনেক সময় জরুরি তথ্য সংগ্রহ করতে কড়া রাস্তা নিতে হয়। সে কাজটা প্রাইভেট গোয়েন্দার চেয়ে পুলিশে অনেক বেশি ভাল পারে।

সুশান্তবাবু এবার দেখি আমাদের দিকে আসছেন। বললেন, 'মিঃ মিত্তির তো বোধহয় শ্রীনগর গেছেন।'

আমি 'হ্যাঁ' বলতে বললেন, 'আমরা কিছু না বলতেই উনি আমাদের জন্য এত করছেন, এটা খুব আশ্চর্য বলতে হবে।'

'আসলে উনি এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। রহস্য জিনিসটা ওঁর কাছে অসহ্য। যতক্ষণ না সেটার কিনারা করতে পারছেন, ততক্ষণ ওঁর সোয়াস্তি নেই।'

লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনি কি মিঃ মল্লিকের জীবনী লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন ?'

'তা এক রকম দিয়েছিলাম বই কি। খানিকটা করে লিখছিলাম, আর উনি সেটা দেখে দিচ্ছিলেন। খুবই চিত্তাকর্ষক বই হত বলে মনে হয়।'

'এখন তো কাজটা বন্ধ হয়ে গেল।'

'তা তো হলই।'

'আপনিও কি প্রয়াগকে সন্দেহ করেন ?'

'মোটেই করিনি। ওর অত সাহস হবে বলেই আমার মনে হয়নি। কিন্তু পুলিশ যেভাবে চলছে...'

'মিঃ মিত্তিরের উপর আর একটা অ্যাটেম্‌ট হয়ে গেছে, সেটা বোধ হয় জানেন না ?'

'সে কি !'

'হ্যাঁ। এবার মাথায় বাড়ি মেরেছিল পাথর-টাথর কিছু দিয়ে। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে। কিন্তু কেউ যে ওর উপস্থিতি পছন্দ করছে না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তা, উনি তো পুলিশ প্রোটেকশন নিতে পারেন।'

'সেটা উনি মরে গেলেও নেবেন না, যদিও উনি পুলিশকে সাহায্য করতে সব সময়ই প্রস্তুত।'

'আপনাদের তাস খেলা বন্ধ বোধ হয় ?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'মৃত্যুর ছায়া এখনও ঘনিয়ে আছে ; এর মধ্যে কি ও সব চলে ?'

'তা বটে।'

ফেলুদার জন্য প্রাণটা ছটফট করছে, অথচ দ্বিতীয় দিনেও ও এল না। দিনটা আমরা সাইট সিইং-এ কাটালাম। টুরিস্ট আপিস থেকে খবর নিয়ে আড়াই মাইল দূরে শিকারগা লেক আর এক মাইল দূরে একটা পুরনো শিবমন্দির দেখে এলাম। তাঁবুতে থাকার চেয়ে দূরে থাকাই ভাল বুঝতে পারছিলাম। কারণ তাঁবুকে ঘিরে এখনও খুনের গন্ধ, ভাবতে গেলেই বুক ধড়ফড় করে।

তৃতীয় দিন সকাল দশটায় ভাবছি কী করা যায়, এমন সময় ফেলুদার ট্যাক্সি এসে হাজির। আমরা দুজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। ও হাত তুলে বলল, 'সবুরে মেওয়া ফলে !'

'আপনার মাথা পরিষ্কার কি না সেইটে শুধু বলে দিন', বললেন লালমোহনবাবু।

'পরিষ্কার, তবে অনেক জট ছাড়াতে হয়েছে। এমন একটা কেস

সচরাচর পাওয়া যায় না।'

'রহস্য উদ্‌ঘাটনের টাইমটা কী ?'

'সেটা ইনস্পেক্টর সিং-এর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করতে হবে।'

'উনি কিন্তু খুনি ধরে ফেলেছেন এর মধ্যেই।'

'মানে ?'

'বেয়ারা প্রয়াগ।'

'সর্বনাশ ! তা হলে তো আর সময় নষ্ট করা চলে না। আমি চললাম থানায়।'

ফেলুদা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শহরের দিকে চলে গেল।

ও যখন ফিরল, তখন আমাদের লাঞ্চ খাবার সময় হয়ে গিয়েছে। এসে বলল, 'আজ তিনটেয় মিটিং। ওঁদের তাঁবুতে।'

আমার বুকটা কেঁপে উঠল। ফেলুদার রহস্যোদ্‌ঘাটন যে না দেখেছে, সে কল্পনা করতে পারে না সেটা কত নাটকীয় হতে পারে।

তিনটের পাঁচ মিনিট পরেই পুলিশের জিপ এসে গেল। ইনস্পেক্টর সিং ফেলুদার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন যে, একজন পুলিশ ইনস্পেক্টর ক্রাইম স্টোরির ভক্ত হতে পারে ?'

'আপনি ও সব বই পড়েন নাকি ?'

'ও ছাড়া আর কিছুই পড়ি না। বিশেষ করে প্রাইভেট ডিটেকটিভের গল্প হলে তো আর কথাই নেই। আজ আপনার রহস্যোদ্‌ঘাটনের ব্যাপারেও আমার পড়া অনেক গল্পের কথা মনে পড়ছে। অবিশ্যি আপনি যে কী বলতে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই।'

'সেটা তো অল্পক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন।'

তাঁবুতে সকলে জমায়েত। দুটো তাঁবু থেকে চেয়ার এনে সকলের বসবার জায়গা করা হয়েছে। বিজয় মল্লিক, মিঃ সরকার, সুশান্ত সোম, ডাঃ মজুমদার—এঁরা সব চেয়ারে বসেছেন, আর তাঁবুর এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বেয়ারা প্রয়াগ। এই শেষের লোকটির

চেহারার মধ্যে একটা ক্লিষ্ট ভাব দেখে মনে হয়, পুলিশ তাকে বেশ ভালোভাবেই জেরা করেছে।

১০

ফেলুদা তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একবার সকলের দিকে দেখে নিল। তার পর এক গেলাস জল ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে নিয়ে খেয়ে তার কথা শুরু করল—

'মিঃ মল্লিক আজ আমাদের মধ্যে নেই, আমি তাঁকে দিয়েই আমার কথা আরম্ভ করছি। সিদ্ধেশ্বর মল্লিক ত্রিশ বছর জজিয়তি করে তার পর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই রিটায়ারমেন্টের কারণ ছিল অসুস্থতা। তা ছাড়া হয়তো মিঃ মল্লিক তাঁর পেশায় কিছুটা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। প্রাণদণ্ড নিয়ে হয়তো তাঁর মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। আমি এই সিদ্ধান্তের সত্যতা-অসত্যতার ভিতর যেতে চাইছি না। যা ঘটেছিল শুধু তাই বলছি।

'মিঃ মল্লিক দৈনিক ডায়েরি লিখতেন। এই ডায়েরির একটা বিশেষত্ব ছিল। যে দিন তিনি কাউকে ফাঁসির আদেশ দিতেন, সেই দিন ডায়েরিতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিটির নাম লিখে তার পাশে লাল কালিতে একটা ক্রস দিয়ে দিতেন। আর যে দিন এই দণ্ডের যথার্থতা সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা গভীর সন্দেহ দেখা দিত, সেদিন ক্রসের পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে দিতেন।

'আমি মিঃ মল্লিকের ডায়েরিগুলি দেখেছি। সবসুদ্ধ ছ'টি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে। তার মানে ছ'টি প্রাণদণ্ডের সমীচীনতা সম্পর্কে তিনি সন্দিগ্ধ ছিলেন।

'এইবার আমি আর এক দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মিঃ মল্লিকের মনে দ্বন্দ্ব হচ্ছিল কি না হচ্ছিল সেটা সম্বন্ধে জনসাধারণ কিছুই জানতে পারত না। কিন্তু যারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কি মিঃ মল্লিক কখনও ভেবেছিলেন? মনে তো হয় না, কারণ তাঁর ডায়রিতে এর কোনও

উল্লেখ নেই। ছেলের মৃত্যুদণ্ডে বাপ-মা কী ভাবছে, বাপের মৃত্যুদণ্ডে ছেলের বা ভাইয়ের বা স্ত্রীর বা অন্য আত্মীয়-স্বজনের কী মনোভাব হতে পারে, সেটা নিয়ে মিঃ মল্লিক বোধ হয় কখনও চিন্তা করেননি। কিন্তু আমরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারব যে, এই সব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অনেকেই নিশ্চয়ই গভীর বেদনা অনুভব করেছে।

'এইটে উপলব্ধি করার পরেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে—এই রকম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোনও ব্যক্তির আত্মীয়ই কি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মিঃ মল্লিককে হত্যা করে?

'যত ভাবি, ততই মনে হয় এটা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে যেখানে দণ্ড সম্বন্ধে জজের মনেও সন্দেহ আছে, সেখানে তো বটেই।

'এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে—এই ঘরে যারা উপস্থিত আছেন, তাদের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি কেউ আছেন?'

'এখানে প্রথমেই যাকে বাদ দেওয়া যায়, তিনি হলেন ডাঃ মজুমদার, কারণ তিনি আজ পনের বছর হল মল্লিকদের পারিবারিক চিকিৎসক।

'বাকি থাকেন আর চারজন—বিজয় মল্লিক, সুশান্ত সোম, মিঃ সরকার আর বেয়ারা প্রয়াগ।

'এখানে বিজয় মল্লিককে এই বিশেষ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁর কোনও আত্মীয়ের প্রাণদণ্ড হয়নি।

'সেই রকম সুশান্ত সোমকেও এই একই মর্মে বাদ দেওয়া যেতে পারে। কারণ তাঁরও কোনও নিকট জনের প্রাণদণ্ডের কথা আমরা ডায়েরিতে পাচ্ছি না।

'বাকি রইলেন মিঃ সরকার ও প্রয়াগ বেয়ারা।

'এখানে প্রয়াগকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

প্রয়াগ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ফেলুদা বলল, 'প্রয়াগ, সে দিন তুমি যখন নদীতে হাত ধুচ্ছিলে, তখন আমি তোমাকে লক্ষ করছিলাম। তোমার ডান হাতে একটি ছোট্ট উল্কি আছে—দুটি ইংরেজি অক্ষর—HR। এটার মানে

আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।'

প্রয়াগ গলা খাকরিয়ে নিয়ে বলল, 'ওর কোনও মানে নেই বাবু। উল্‌কি করাবার ইচ্ছা হয়েছিল তাই করিয়েছিলাম।'

'তুমি বলতে চাও, এটা তোমার নাম আর পদবির প্রথম অক্ষর নয়?'

'নেহি বাবু। মেরা নাম হ্যায় প্রয়াগ মিসির।'

'আমি যদি বলি, তোমার নাম প্রয়াগ নয়। কারণ প্রয়াগ বলে ডাকলে তুমি চট্‌ করে উত্তর দাও না—অথচ অন্য ব্যাপারে মোটেই তুমি কালা নও।'

'আমার নাম প্রয়াগ মিসির, বাবু।'

'না!' ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল। 'আমি জানতে চাই ওই R অক্ষরটা কিসের আদ্যক্ষর; কী পদবি তোমার?'

'আমি আর কী বলব বাবু!'

'সত্যি কথাটা, বলবে। এখানে জীবন-মরণ নিয়ে খেলা হচ্ছে, এখানে মিথ্যা চলবে না।'

'তবে আপনিই বলুন।'

'আমি বলছি। ওই R হচ্ছে রাউত। এবার তোমার পুরো নামটা বলো।'

প্রয়াগ হঠাৎ কেমন যেন ভেঙে পড়ল। তারপর কান্নার মধ্যেই বলল, 'ও আমার একমাত্র ছেলে ছিল বাবু। আর ও খুন করেনি। ওর মামলা এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যাতে ওকে খুনি বলে মনে হয়। আমার একমাত্র ছেলে—ফাঁসি হল!'

'তা হলে তোমার পুরো নামটা কী দাঁড়াচ্ছে?'

'হনুমান রাউত, বাবু। কিন্তু আমি বাবুকে খুন করিনি, ওঁর আংটি আমি নিইনি!'

'সেটা কি আমি একবারও বলেছি?'

'তা হলে বাবু আমাকে মাপ করে দিন।'

'পুরোপুরি মাপ করা কি চলে?' সত্যি কথা বল তো।'

হনুমান রাউত কেমন যেন ফ্যালফ্যাল করে ফেলুদার দিকে চাইল।

ফেলুদা বলল, 'তুমি খুন করনি, কিন্তু খুনের চেষ্টা করেছিলে।'

'না বাবু—'

'আলবৎ!' ফেলুদা গর্জিয়ে উঠল।' তোমার নিজের ছেলের মৃত্যুর জন্য যিনি দায়ী, তুমি তাঁর ছেলেকে মারতে চেয়েছিলে যাতে, তিনিও তোমার মতো পুত্রশোক ভোগ করেন। খিলেনমার্গ যাবার পথে তুমি বিজয়বাবুর ঘাড়ে ধাক্কা মারোনি? ঠিক করে বল তো। বাঁ হাতে তোমার আংটি রয়েছে, আর বাঁ হাত দিয়ে তুমি ডান হাতের কাজ করো, তাই না?'

'কিন্তু উনি তো বেঁচে আছেন বাবু: উনি তো মরেননি।'

'খুনের অভিপ্রায়েরও শাস্তি আছে হনুমান রাউত—সে শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে!'

দু' জন কনস্টেবল এসে বেয়ারাকে ঘর থেকে নিয়ে গেল।

ফেলুদা আর এক গেলাস জল খেয়ে নিল। তার পর আবার শুরু করল—'এবারে আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাচ্ছি। এটা আরও অনেক বড় প্রসঙ্গ। এখানে একজন ব্যক্তির প্রাণ নেওয়া হয়েছে। এ হল হত্যা। আর এর জন্য আমার মতে প্রাণদণ্ডই উচিত দণ্ড।'

সকলে একদৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে। তাঁবুতে পিন পড়লে তার শব্দ শোনা যেত নিশ্চয়ই, যদি না বাইরে লিদর নদীর স্রোতের অবিশ্রান্ত শব্দ থাকত।

ফেলুদা বলল, 'আমি এক জনকে এর আগেও কয়েকটা প্রশ্ন করেছি—এবার আর একবার করতে চাই। মিঃ সরকার।'

সরকার নড়েচড়ে বসে বললেন, 'বলুন।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি কবে শ্রীনগরে এলেন?'

'আপনাদের সঙ্গে একই ফ্লাইটে এলাম।'

'আচ্ছা, আপনার আঙুলের আংটির 'S'টা কিসের আদ্যক্ষর?'

'আমার পদবির অফকোর্স—সরকার।'

'কিন্তু, মিঃ সরকার, আমি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, সে দিন যাত্রীর তালিকায় সরকার বলে কেউ ছিলেন না। সেন ছিলেন, দু' জন সেনগুপ্ত ছিলেন, একজন সিং ছিলেন আর একজন সপ্রু ছিলেন।'

বাট—বাট—'

'বাট হোয়াট, মিঃ সরকার ? আপনার নাম বদলানোর দরকার হল কেন, জানতে পারি কি ?'

'মিঃ সরকার চুপ।

ফেলুদা বলল, 'আমি বলি ? আমার ধারণা আপনি মনোহর সপ্রুর ছেলে। আপনার চেহারার মধ্যে একটা পরিষ্কার কাশ্মীরী ছাপ রয়েছে। মিঃ মল্লিক মনোহর সপ্রুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। মিঃ মল্লিককে প্লেনে দেখেই আপনি নাম বদল করার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ তখন থেকেই আপনার মনে প্রতিশোধের ইচ্ছা জাগে। আপনি ওই ফ্যামিলির সঙ্গে মিশে যান, এবং সুযোগ খুঁজতে থাকেন—টু স্ট্রাইক। সেই সুযোগ আসে পাহালগামে।'

'কিন্তু...কিন্তু...দিস ক্রাইম ইজ কমিটেড বাই এ লেফ্‌ট-হ্যান্ডেড পার্সন।'

'আপনি ভুলবেন না, মিঃ সপ্রু—আমি আপনাকে তাস বাঁটতে দেখেছি। আর কেউ লক্ষ না করলেও আমি করেছি যে, আপনি বাঁ হাতে তাস ডিল করেন।'

মিঃ সপ্রু হঠাৎ কেমন যেন ক্ষেপে উঠলেন।

'বেশ, ঠিক কথা—আমি ওঁকে ছুরি মেরেছি, কিন্তু তার জন্য আমার একটুও অনুশোচনা নেই। আমার যখন মাত্র পনেরো বছর বয়স, তখন উনি আমার বাবাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলান—অ্যান্ড মাই ফাদার ওয়াজ নট গিল্টি ! কিন্তু...কিন্তু...'

সপ্রুর যেন হঠাৎ একটা নতুন কথা মনে পড়ল।

'আমি ওঁর আংটি তো নিইনি ! আই ওনলি কিলড্‌ হিম।'

'না', বলল ফেলুদা। 'আপনি ওঁর আংটি নেননি। সেটা নিয়েছেন আর একজন।

ঘরে আবার সেই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা।

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গেল।

'বিজয়বাবু—জুয়াতে আপনার অনেক লোকসান হয়েছে। তাই না ? আমি কলকাতায় খবর নিয়েছি। আমার লোক আছে খবর দেবার, পুলিশেও আমার বন্ধু আছে। আপনার বিস্তর দেনা হয়ে

গেছে।'

বিজয়বাবু চুপ।

ফেলুদা বলে চলল, 'আর আপনার বোধ হয় সন্দেহ হয়েছিল যে, বাবা আপনাকে উইলে কিছু দিয়েছেন কিনা। সেই জন্য তাঁকে মেরে তাঁর আংটিটি আপনি হাত করেছিলেন।'

'মেরে মানে?'

'মেরে মানে কোনও ভারী জিনিস দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত মেরে। আপনার বাবাকে আসলে দু' জন খুন করে। কার দ্বারা তিনি হত হয়েছিলেন, সেটা বোঝা যায় বিছানায় রক্ত দেখে। ছুরির আঘাতই আগে পড়ে, তার পর আপনি মাথায় বাড়ি মেরে হাত থেকে আংটিটা খুলে নিয়ে যান। আপনি খুনি না চোর, সেটা অবশ্য আইন বুঝবে, কিন্তু হাতকড়া বোধ হয় তিন জনের হাতেই পড়বে।'

মল্লিকদের তাঁবু থেকে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু মশাই, আপনি একটা ব্যাপারে তো কোনও আলোকপাত করলেন না। আপনাকে দু' বার মারার চেষ্টা করল কে?'

সে ব্যাপারে আলোকপাত করিনি, কারণ আমি নিজেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে শিওর নই। তিনজন অপরাধীর এক জন করেছে তাতে সন্দেহ নেই, এবং সুযোগের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রয়াগের কথাই মনে হয়। সপ্তু বা বিজয়বাবু দল থেকে বেরিয়ে এসে এটা করবেন, বিশ্বাস করা কঠিন। যাই হোক, এর জন্য মূল রহস্যোদ্ঘাটনে কোনও এ দিক ও দিক হচ্ছে না। ধরে নিন, এটা ফেলু মিত্তিরের একটা অক্ষমতার পরিচয়।'

'যাক্, বাঁচা গেল। আপনার ভুল হতে পারে, এটা জানতে পারলে একটু ভরসা পাওয়া যায়।'

'আপনি অযথা বিনয় করছেন। আমি কিন্তু বহু চেষ্টা করলেও আপনার মতো লিখতে পারতাম না।'

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য খোঁচা!'

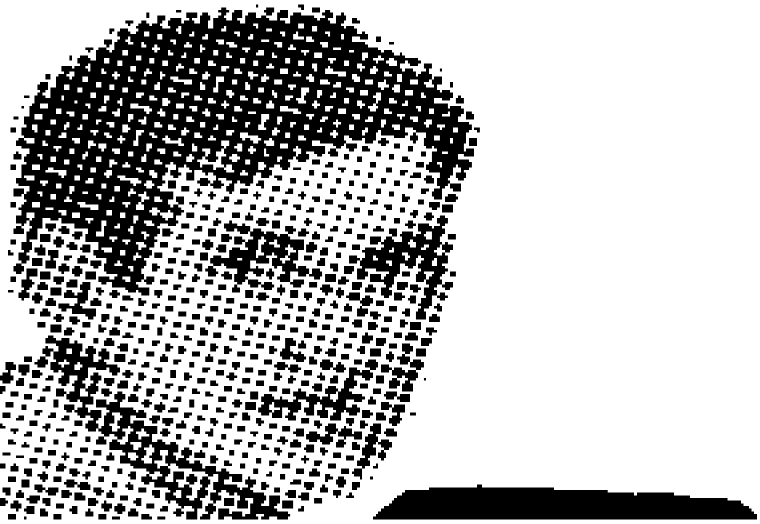

শকুন্তলার কণ্ঠহার

Pradosh C. Mitter

Private Investigator

শকুন্তলার কণ্ঠহার

॥ ১ ॥

শেষ পর্যন্ত লালমোহনবাবুর কথাই রইল। ভদ্রলোক অনেকদিন থেকে বলছেন, 'মশাই, সেই সোনার কেল্লার অ্যাডভেঞ্চার থেকে আমি আপনাদের সঙ্গে রইচি, কিন্তু তার আগে লখ্‌নৌ আর গ্যাংটকে আপনাদের যে দুটো অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে তখন তো আর আমি ছিলাম না। কাজেই সে দুটো জায়গাও আমার দেখা হয়নি। বিশেষ করে লখ্‌নৌ-এর মতো একটা ঐতিহাসিক শহর। আপনারা তো গেছেন সেই কবে, চলুন না এবার পুজোয় আরেকবার যাওয়া যাক।'

ফেলুদার লখ্‌নৌ ভীষণ ভাল লাগে জানি, আর সেই সঙ্গে আমারও। আইডিয়াটা মন্দ না। প্রথমবার যখন যাই, আর আমাদের বাদশাহী আংটির অ্যাডভেঞ্চারটা হয়, তখন আমি খুব ছোট। এখন গেলে লখ্‌নৌ আরও ভাল লাগবে সেটা আমি জানি।

ফেলুদা বলল, 'আমারও লখ্‌নৌ-এর কথা হলেই মনটা চনমন করে ওঠে। আর অত সুন্দর শহর ভারতবর্ষে কমই আছে। শহরের মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে এ রকম কটা জায়গা পাবেন আপনি? ব্রিজের একদিকে শহরের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক অন্য দিকে। তা ছাড়া নবাবি আমলের গন্ধটা এখনও যায়নি। চারিদিকে তাদের কীর্তির চিহ্ন ছড়ানো। তার উপর সেপাই বিদ্রোহের চিহ্ন। নাঃ—আপনার কথাই শিরোধার্য। কদিন থেকে ভাবছি কোথায় যাওয়া যায় এবার পুজোয়। লখ্‌নৌই চলুন।'

ফেলুদা আজকাল ভাল রোজগার করে। প্রাইভেট গোয়েন্দাদের মধ্যে ওর নামডাকই সবচেয়ে বেশি। মাসে অন্তত সাত-আটটা কেস আসে, আর প্রতি তদন্তের জন্য দু হাজার করে পায়। অবিশ্যি

রোজগারের দিক দিয়ে লালমোহনবাবুকে টেক্কা দেওয়া মুশকিল। একবার বলেছিলেন ওঁর বইয়ের থেকে বার্ষিক আয় নাকি প্রায় তিন লাখ টাকা। তার উপরে নতুন নতুন বই প্রতি বছরই বেরোচ্ছে।

আমরা আর দ্বিধা না করে লখ্নৌ যাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। দুন এক্সপ্রেসে তিনটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট—রাত নটায় বেরোনো, পরদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় পৌঁছানো। সেই সঙ্গে অবিশ্যি হোটেল বুকিংও টেলিগ্রাম করে ফেলা হল। ফেলুদা বলল, 'যাবই যখন তখন আরামে থাকব, নইলে ক্লান্তি যাবে না।'

'কোন হোটেলে উঠবেন?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'হোটেল ক্লার্কস-আওয়ধ।'

'আওয়ধ? আওয়ধ ব্যাপারটা কী?'

'আওয়ধ হল অযোধ্যার উর্দু নাম।'

'লখনৌ বুঝি অযোধ্যায়?'

'সেটাও জানেন না? লখ্নৌ নামটাও এসেছে লক্ষ্মণ থেকে।'

'রামের ভাই লক্ষ্মণ?'

'ইয়েস্ স্যার। আওয়ধ হল লখ্নৌ-এর সেরা হোটেল। একেবারে গুমতীর উপরে। হোটেলের পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে।'

'বাঃ—আইডিয়াল। আওয়ধ অন দি গুম্তী। ঠাণ্ডা কেমন হবে?'

'সন্ধের জন্য একটা পুলোভার নিয়ে নেবেন। অথবা আপনার গরম জহর কোট। আপনি সাহেব সাজবেন না বাঙালি সাজবেন তার উপর নির্ভর করছে।'

'দুটোই নেব।'

'ভেরি গুড।'

'ওখানে তো বাঙালি অনেক?'

'বিস্তর। ছ-সাত পুরুষ থেকে লখ্নৌতে প্রবাসী এমন বাঙালিও আছে। বেঙ্গলি ক্লাব আছে—সেখানে পুজো হয়। বলা যায় না—আপনার অনুরাগী পাঠকও সেখানে কিছু পেয়ে যেতে পারেন।'

'তা হলে আমার লেটেস্ট বই "সাংঘাইয়ে সংঘাত" কয়েক কপি সঙ্গে নিলে বোধহয় মন্দ হয় না।'

'কয়েক কপি কেন—এক ডজন নিয়ে নিন।'

৫ই অক্টোবর শনিবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনে প্রচুর ভিড়। রিজার্ভেশন ক্লার্ক দেখলাম ফেলুদাকে দেখে চিনলেন—বললেন, 'চলুন স্যার, আপনাদের বোগি দেখিয়ে দিচ্ছি। একটা ফোর্থ-বার্থ কম্পার্টমেন্টে তিনটে বার্থ—এই তো? এই যে আপনাদের বোগি। তিন নম্বর কামরা আপনাদের জায়গা—একটা লোয়ার, দুটো আপার বার্থ।'

আমরা গিয়ে আমাদের জায়গা দখল করলাম। বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে এসেছি, তাই ট্রেনে খাবার ঝামেলা নেই। একটা লোয়ার বার্থে আরেকজন ভদ্রলোক বসে আছেন, বছর পঞ্চাশ বয়স, মাঝারি হাইট, ঠোঁটের উপর একটা সরু গোঁফ। আমাদের দেখে একটু সরে বসে পাশে জায়গা করে দিলেন। ফেলুদা সেখানে বসল, আমরা দুজন উলটো দিকের বার্থে। দশ দিন থাকব আমরা লখ্‌নৌ। মালপত্র বেশি নিইনি; আমার আর ফেলুদার জিনিস একটা বড় সুটকেসে আর লালমোহনবাবুর জিনিস তাঁর বিখ্যাত লাল জাপানি সুটকেসে। বলেন ওটা নাকি ওঁর পাড়ার এক ধনী ব্যবসাদার বন্ধু হৃষীকেশ চৌধুরী জাপান থেকে স্পেশালি লালমোহনবাবুর জন্য এনে দিয়েছেন।

আমাদের সহযাত্রীটি বাঙালি কি না সে বিষয় একটু সন্দেহ ছিল। সেটা দূর হল ভদ্রলোক যখন নিজে আলাপ করলেন।

'আপনারা কদ্দূর যাবেন?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'লখ্‌নৌ', বললেন লালমোহনবাবু। 'আপনি?'

'আমিও লখ্‌নৌ যাচ্ছি। ওখানেই থাকি। আমরা তিন পুরুষ ধরে ওখানেই আছি। আপনারা কি বেড়াতে যাচ্ছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বললেন লালমোহনবাবু।

এবার ফেলুদা বলল, 'আপনার সুটকেসে দেখছি তিনটি ইংরিজি হরফ লেখা রয়েছে—এইচ. জে. বি.। এরকম অদ্ভুত ইনিশিয়ালস তো বড় একটা দেখা যায় না। আপনার নামটা জিজ্ঞেস করলে আশা করি আপনি বিরক্ত হবেন না।'

'মোটেই না। আমার নাম জয়ন্ত বিশ্বাস। এইচ-টা হল হেক্টর। আমি ক্রিশ্চান। আমাদের পরিবারের সকলেরই একটা করে ক্রিশ্চান নাম আছে।'

'ধন্যবাদ', বলল ফেলুদা। 'আপনার নামটা যখন বললেন তখন আমাদের নামও বলা সমীচীন। আমি প্রদোষ মিত্র, এটি আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ, আর ইনি আমাদের বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলী।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার শাশুড়ির নাম হয়তো আপনারা শুনে থাকবেন। উনি সাইলেন্ট যুগে ফিল্মে অ্যাকটিং করতেন। খুব পপুলার ছিলেন।'

'কী নাম বলুন তো?' জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'শকুন্তলা দেবী।'

'আরেব্বাস', বললেন লালমোহনবাবু, 'তিনি তো যাকে বলে তখনকার দিনে একজন বিখ্যাত স্টার! আমার এক প্রতিবেশী আছেন, নরেশ বোস—এখন বয়স হয়েছে, তবে যুবা বয়সে তিনি ফিল্মের পোকা ছিলেন। তাঁর কাছে বাঁধানো "বায়োস্কোপ" পত্রিকা দেখেছি। তাতে শকুন্তলা দেবীর বিস্তর ছবি রয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে লেখাও রয়েছে অনেক। তিনি বোধহয় বাঙালি ছিলেন না।'

'না। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলতে পারেন। আসল নাম ছিল ভার্জিনিয়া রেনল্ডস। তাঁর বাবা টমাস রেনল্ডস ছিলেন আর্মিতে। তিনি লখ্‌নৌতেই পোস্টেড ছিলেন। চোস্ত উর্দু বলতে পারতেন। তিনি একজন মুসলমান বাঈজিকে বিয়ে করেন। তাঁরই মেয়ে হলেন ভার্জিনিয়া।'

'হাইলি ইন্টারেস্টিং', বললেন লালমোহনবাবু। 'কিন্তু তিনি তো বোধহয় টকিতে অভিনয় করেননি।'

'না। এদেশে টকি আসার আগেই তিনি বিয়ে করে ফেলেন একজন বাঙালি ক্রিশ্চানকে। তারপর প্রথম সন্তান হবার পরই শকুন্তলা দেবী ছবির কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম দুটি সন্তান ছিল মেয়ে, তৃতীয়টি ছেলে। আমি দ্বিতীয় মেয়েকে বিয়ে করি ১৯৬০-এ। আমার বড় শালী বিয়ে করেন একটি গোয়ানকে। আমার ছোট শালা বিয়ে করেননি।'

এতদিন লখ্‌নৌতে থাকবার জন্যই বোধহয় ভদ্রলোকের বাংলায় একটা পশ্চিমা টান এসে গেছে। যদিও ভাষায় কোনও গণ্ডগোল নেই।

এবার ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল।

'কোনও এক মহারাজা শকুন্তলা দেবীকে একটা মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন, তাই না ?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বললেন জয়ন্তবাবু। 'মাইসোরের মহারাজা। শকুন্তলার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে একটি বহুমূল্য কণ্ঠহার উপহার দেন। তখনকার দিনেই দাম ছিল লাখ খানেকের মতো। কিন্তু এটা আপনি কী করে জানলেন ? যদ্দূর মনে হয় শকুন্তলা অভিনয় করতেন আপনার জন্মের আগে।'

'তা তো বটেই', বলল ফেলুদা। 'কিন্তু বছর পনেরো আগে আমি খবরের কাগজে একটা খবর পড়ি। এই হার চুরি হয়েছিল, তারপর পুলিশ সেটা উদ্ধার করে।'

'ঠিক কথা। তখনও শকুন্তলা দেবী বেঁচে। তিনি মারা গেছেন তিন বছর আগে আটাত্তর বছর বয়সে। মারা যাবার পরেও এই হারটার কথা কাগজে বেরিয়েছিল। কিন্তু আপনার সেই পনেরো বছর আগের খবরের কথা মনে আছে—আপনার মেমরি তো খুব শার্প দেখছি।'

'ক্রাইমের খবর আমি বহুদিন থেকেই খুব উৎসাহ নিয়ে পড়ি। আর পড়লে আমার মনেও থাকে। আসল কথাটা আপনাকে বলেই ফেলি। আমার পেশাটিও হচ্ছে ক্রাইমের সঙ্গে জড়িত।'

ফেলুদা পকেট থেকে তার একটা কার্ড বার করে জয়ন্তবাবুর হাতে দিল। ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল।

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর ! তাই বলুন। আপনার নামটা চেনা চেনা লাগছিল। আপনার তো একটা ডাকনামও আছে।'

'হ্যাঁ। ফেলু।'

'ফেলু। ইয়েস—ফেলুদা। আমার মেয়ে আপনার বিশেষ ভক্ত। আপনার সব অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তার পড়া। বাংলা সে এমনিতে একেবারেই পড়ে না, কিন্তু আপনার বইগুলো পড়ে। যাক, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল।'

এবার ফেলুদা লালমোহনবাবুর পরিচয়টাও দিয়ে দিল। বলল, 'এঁর নাম লখ্নৌ অবধি পৌঁছেছে কি না জানি না, তবে ইনি বাংলার একজন বিশেষ জনপ্রিয় থ্রিলার রাইটার। জটায়ু ছদ্মনামে এঁর উপন্যাস বেরোয়।'

'বাঃ দুজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে ট্রেনের কামরায় আলাপ হয়ে

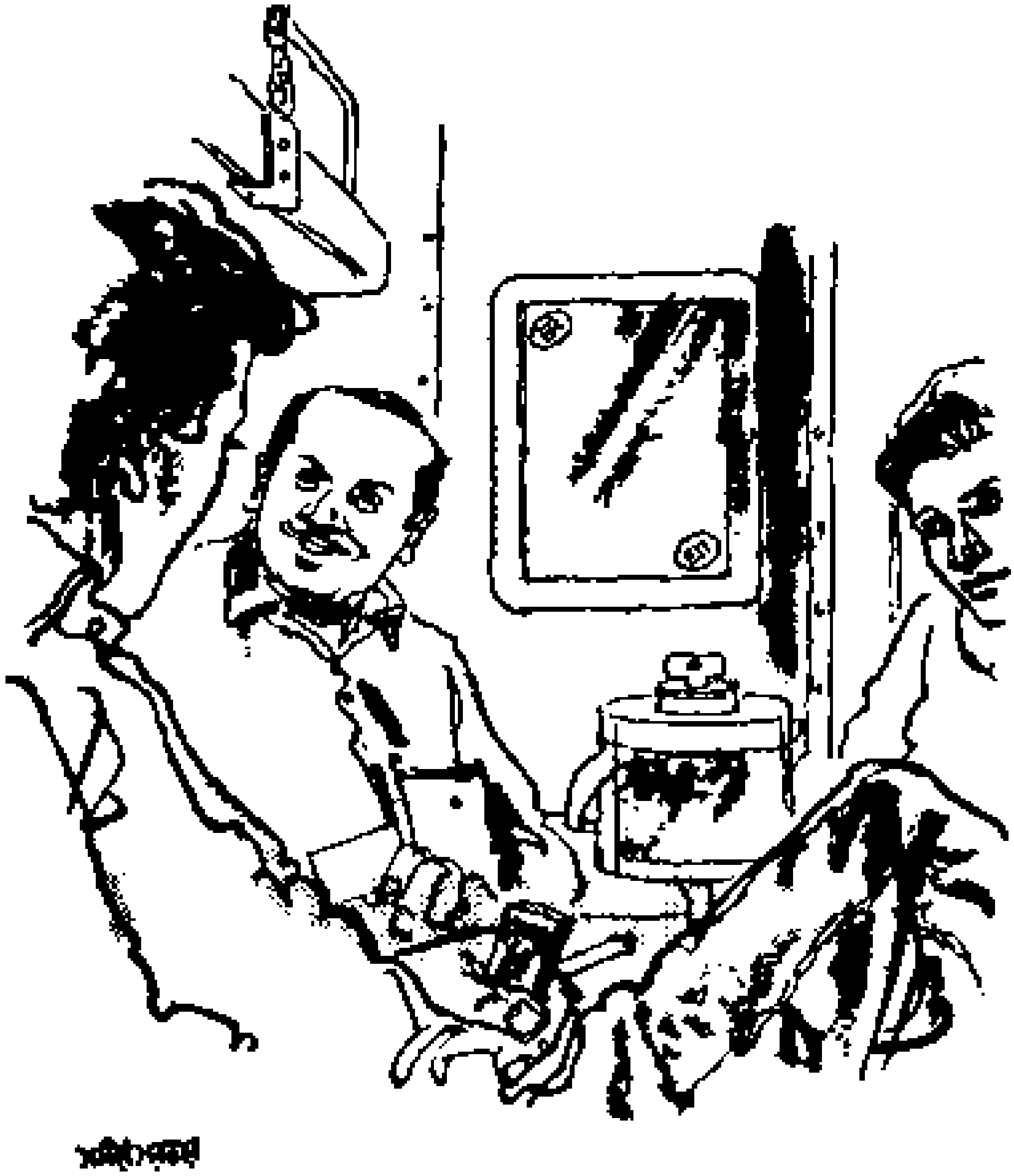

গেল এ তো আশ্চর্য ব্যাপার। লখ্‌নৌতে আপনারা উঠছেন কোথায়?'

'ক্লার্কস-আওয়ধ।'

'আমি থাকি নদীর ওদিকে—বাদশাবাগে। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। একদিন আমাদের বাড়িতে খেতে আসতে হবে আপনাদের। আমার স্ত্রী খুব ভাল মোগলাই রান্না রাঁধেন। তা ছাড়া আমার মেয়ে তো ফেলুদাকে দেখে থ্রিল্‌ড হয়ে যাবে। আপনাদের তিনজনেরই আসা চাই কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই', বলল ফেলুদা। 'আর সেই সঙ্গে আশা করি বিখ্যাত কণ্ঠহারটাও একবার দেখা যাবে।'

'সে তো খুব সহজ ব্যাপার। কারণ হারটা আমার কাছেই আছে। অর্থাৎ আমার স্ত্রীর কাছে।'

'কেন? ছোট মেয়ের কাছে কেন? বড় মেয়ের কাছে নয় কেন?'

'কারণ ভার্জিনিয়ার তাঁর ছোট মেয়ের উপর বেশি টান ছিল। আর অনেক গুণ ছিল এই ছোট মেয়ের—অর্থাৎ আমার স্ত্রী সুনীলার। অবিশ্যি সে সব গুণের সদ্ব্যবহার সে করেনি। বিয়ের পর পুরো গৃহিণী বনে গিয়েছিল। বিয়ে না করলে হয়তো ফিল্মে চান্স নিত, কারণ তার অভিনয় দক্ষতা ছিল যথেষ্ট।'

'আপনার স্ত্রীর নাম সুনীলা বললেন। ওঁনার কোনও ক্রিশ্চান নাম নেই?'

'হ্যাঁ। ওর পুরো নাম প্যামেলা সুনীলা।'

॥ ২ ॥

রাত্রে দশটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে সকালে সাড়ে ছটায় উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে বসমারে ব্রেকফাস্ট খেলাম। মোগলসরাই আসবে পৌনে নটায়। লাঞ্চ খাব প্রতাপগড়ে সাড়ে বারোটার সময়।

জয়ন্তবাবু দেখলাম খুব সকালেই ওঠেন। ব্রেকফাস্ট খেয়ে বললেন, 'কাছেই কুপেতে আমার এক চেনা ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

লালমোহনবাবুও স্নানটান করে দাড়ি কামিয়ে একেবারে ফিটফাট। উনি 'বিক' রেজার দিয়ে দাড়ি কামান। এগুলো বার তিন-চার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয়। কলকাতায় পাওয়া যায় না। লালমোহনবাবুর এক বন্ধু কাঠমাণ্ডু থেকে ওঁর জন্য চার প্যাকেট অর্থাৎ কুড়িটা এনে দিয়েছেন। বললেন, 'ভারী আরামে শেভ করা যায় মশাই।'

ফেলুদা বলল, 'দু মাস পরে তো আবার দিশি ব্লেডে ফিরে যেতে হবে।'

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, 'নো স্যার। দাড়ি কামানোর ব্যাপারে আমি একটু লাক্সারি পছন্দ করি। আমি নিউ মার্কেট থেকে উইলকিনসন ব্লেড কিনি।'

'সে তো অনেক দাম।'

'সংসার করিনি, টাকা কার জন্যে জমাব বলুন তো? তাই নিজের পেছনেই খরচ করি।'

'আমাদের পেছনেও কম খরচ হয় না আপনার। আপনার গাড়ি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি।'

'মশাই, তিনজনের একজন মাস্কেটিয়ারের গাড়ি আর দুজন চড়বে না—এ কেউ শুনেছে কখনও?'

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে বাইরের প্যাসেজে পায়চারি করতে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বলল, 'এক নম্বর কুপেতে জয়ন্তবাবু তাঁর আলাপীর সঙ্গে দিব্যি গল্পে মেতে আছেন। ইংরিজিতে কথা হচ্ছে, অর্থাৎ ভদ্রলোক অবাঙালি। দেখে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে মনে হল, যদিও রং আমাদেরই মতো।'

'কী কথা হচ্ছে শুনতে পেলেন নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'আলাপী বললেন, "আই গিভ ইউ জাস্ট থ্রি ডেজ।" এর বেশি আর কিছু শুনিনি।'

'কথাটা কি হুমকি বলে মনে হল?'

'ট্রেনের শব্দের জন্য গলা তুলতে হয় বলে সব কথাই হুমকির মতো শোনায়।'

একটু পরেই জয়ন্তবাবু তাঁর আলাপীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কামরায় এসে ফেলুদাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। দিস ইজ মিঃ সুকিয়াস—এ ওয়েলনোন বিজনেসম্যান অফ লাক্‌নাউ। তা ছাড়া আর্টের সমঝদারও বটে।'

সুকিয়াস ইংরিজিতে বললেন, 'আশা করি আমাদের আবার লখ্‌নৌতে দেখা হবে। মিঃ বিসওয়াস আমার অনেকদিনের পুরানো বন্ধু।'

সুকিয়াস চলে গেলেন। জয়ন্তবাবু তাঁর বার্থের আধখানা দখল করে বসলেন। বাকি আধখানায় যথারীতি ফেলুদা বসেছে।

ফেলুদা জয়ন্তবাবুকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনার শাশুড়ির আসল নাম বলছিলেন ভার্জিনিয়া রেনল্ড্‌স। এই রেনল্ড্‌স পরিবার কবে থেকে আছে ভারতবর্ষে?'

জয়ন্তবাবু বললেন, 'ভার্জিনিয়ার ঠাকুরদাদা জন রেনল্ড্‌স

ভারতবর্ষে আসেন ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স উনিশ। তিনি বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। ১৮৫৭-র সেপাই বিদ্রোহের সময় তিনি লখ্‌নৌতে পোস্টেড ছিলেন। যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়ে একেবারে শেষদিকে সেপাইদের কামানের গোলায় প্রাণ দেন। তাঁর ছেলে টমাসও বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। তিনি উর্দু শিখে একদম ভারতীয় বনে গিয়েছিলেন। রাজার হালে থাকতেন। নিজের বাড়িতে রেগুলার বাঈনাচের আয়োজন করতেন। ফরসিতে তামাক খেতেন, পান খেতেন, আতর

মাখতেন। এমনকী মাঝে মাঝে দিশি পোশাকও পরতেন। অবশেষে তিনি ফরিদা বেগম নামে এক কথক নাচিয়েকে ভালবেসে ফেলে তাকে বিয়ে করেন। বাড়িতে মুলসমান কেতা চালু ছিল। লোকে টমাসকে বলত "টমাস বাহাদুর"। টমাসের প্রথমে দুটি ছেলে হয়, নাম এডওয়ার্ড আর চার্লস। এরাও ছেলেবেলা থেকেই উর্দু বলত। এরা কেউই আর্মিতে যোগ দেয়নি। এডওয়ার্ড উকিল হয়, আর চার্লস আসামের চা-বাগানে ম্যানেজারি করতে চলে যায়। সে আর লখ্‌নৌতে ফেরেনি। টমাসের তৃতীয় সন্তান অবশ্য ছিল ভার্জিনিয়া। উনি ছেলেবেলা থেকেই উর্দু আর ইংরিজি একসঙ্গে শিখেছিলেন। গায়ের রংটা ছিল সাহেবের মতো ফরসা, কিন্তু চুল আর চোখ ছিল কালো। তাই যখন ছবিতে দিশি চরিত্রে অভিনয় করতেন, তাঁকে বেমানান লাগত না।

'আগেই বলেছি ভার্জিনিয়া একজন বাঙালি ক্রিশ্চানকে বিয়ে করেন। এঁর নাম ছিল পার্সিভ্যাল মতিলাল ব্যানার্জি। আসলে ইনি ছিলেন শকুন্তলার ছবির প্রোডিউসর। ইনিই আমার শাশুড়িকে ছবিতে নামান। স্ত্রীর ছবি থেকে উনি অনেক টাকা করেন। সত্যি বলতে কী, ভার্জিনিয়ার বাবা টমাস নবাবি করে শেষ জীবনে বেশ অর্থকষ্ট ভোগ করেন। তখন ভার্জিনিয়া তাঁর ফিল্মের রোজগার থেকে বাবাকে সাহায্য করেন।

'পার্সিভ্যাল আর ভার্জিনিয়ার তিনটি সন্তান জন্মায়। বড় এবং মেজো হল মেয়ে, ছোটটি ছেলে। বড়টির নাম মার্গারেট সুশীলা। ইনি যে একজন গোয়ার অধিবাসীকে বিয়ে করেন সে কথা আগেই বলেছি। এঁর নাম স্যামুয়েল সাল্‌ডান্‌হা। এনার একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান রয়েছে।

'দ্বিতীয় মেয়ে প্যামেলা সুনীলাকে আমি বিয়ে করি ১৯৬০-এ। আমার ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা আছে। আমার মেয়ের কথা তো আগেই বলেছি। এ ছাড়া আমার একটি ছেলেও আছে। তার নাম ভিক্টর প্রসেনজিৎ। মেয়েটির নাম মেরি শীলা। ছেলেটিকে আমার আপিসে ঢোকাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে রাজি হয়নি। সে নিজের পথে নিজের মর্জিমতো চলে। শীলা দুবছর হল ইজাবেলা থোবার্ন কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেছে। ভাল অভিনয় করতে পারে—বাংলা ইংরিজি দুইই। তবে ওর আসল ইন্টারেস্ট হল

জার্নালিজমে। দু একটা ইংরিজি লেখা কাগজে বেরিয়েছে—বেশ ভাল লেখা।'

ভদ্রলোক ফেলুদাকে একটা সিগারেট অফার করে নিজে একটা ধরালেন। লালমোহনবাবু যে সিগারেট খান না সেটা উনি জানেন।

ফেলুদা বলল, 'অদ্ভুত ইতিহাস।'

'হাইলি রোম্যান্টিক', বললেন লালমোহনবাবু।

'শকুন্তলা দেবীর কণ্ঠহারটা কি আপনার স্ত্রী কখনও পরেছেন?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'দু একটা পার্টিতে পরেছেন। তবে সচরাচর ওটা সিন্দুকেই তোলা থাকে। দেখলে বুঝবেন জিনিসটার কী মহিমা।'

'আমি তো না দেখে থাকতে পারছি না', বললেন লালমোহনবাবু।

'আর দিন চারেক ধৈর্য ধরুন', বললেন জয়ন্তবাবু।

॥ ৩ ॥

আমরা তিন দিন হল লখ্‌নৌতে এসেছি। প্রথমবারের কথা বার বার মনে পড়ছে। সেই বাদশাহী আংটি, মিঃ শ্রীবাস্তব, বনবিহারীবাবুর আশ্চর্য চিড়িয়াখানা, হরিদ্বার, আর লছমনঝুলার পথে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের শিহরন-জাগানো ক্লাইম্যাক্স।

সেবার অবিশ্যি আমরা হোটেলে থাকিনি। খুব সম্ভবত ক্লার্কস-আওয়ধ হোটেল তখনও তৈরিই হয়নি। হোটেলটা সত্যিই ভাল। আমরা পাশাপাশি একটা ডাবল আর একটা সিঙ্গল রুমে আছি। দু ঘরের জানালা দিয়েই গুম্‌তী নদী দেখা যায়। নদীর ওপারে পশ্চিমে যখন সূর্য অস্ত যায়, সে দৃশ্য দেখবার মতো। হোটেলের খাওয়াও দুর্দান্ত ভাল। আমরা অনেক জায়গায় অনেক হোটেলে থেকেছি, কিন্তু এত ভাল খাওয়া কোনও হোটেলে খাইনি।

এই তিন দিনে লালমোহনবাবু লখ্‌নৌ-এর প্রায় বেশির ভাগ দ্রষ্টব্যই দেখে নিয়েছেন। আমরা প্রথম গেলাম বড়া ইমামবড়ায়। এর থাম-ছাড়া বিশাল হলঘর দেখে এবারও মাথা ঘুরে গেল।

লালমোহনবাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে, কথা বেরোচ্ছে না, শুধু একবার বললেন, 'ব্রাভো নওয়াবস অফ লখ্‌নৌ।'

তারপর ভুলভুলাইয়া দেখে ভদ্রলোকের ভির্মি খাবার জোগাড়। এই গোলোকধাঁধায় নবাবরা তাঁদের বেগমদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন শুনে ওঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

আরও চমক এল রেসিডেন্সিতে। 'এ যে ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে উঠছে মশাই! গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছি, বারুদের গন্ধ পাচ্ছি। সেপাইদের এত এলেম ছিল যে এরকম একটা বিল্ডিংকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল?'

চতুর্থ দিনে সকালে একটু বাজারে গিয়েছিলাম এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি ভুনা পেঁড়া কিনতে, হোটেলে ফিরে এসে দেখি ঘরে ছাপানো নেমন্তন্ন চিঠি রয়েছে। পাঠিয়েছেন হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাস। আগামী শুক্রবার, অর্থাৎ পরশু, তাঁদের বিয়ের রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষে মিঃ অ্যান্ড মিসেস বিশ্বাস আমাদের ডিনারে ডেকেছেন। নেমন্তন্ন চিঠির সঙ্গে একটা আলাদা কাগজে রাস্তার প্ল্যান আর কোনখানে বাড়ি সেটা ছাপা রয়েছে। বাড়িটা যে নদীর ওদিকে সেটা ভদ্রলোক আগেই বলেছিলেন। প্ল্যান দেখে বাড়ি খুঁজে বার করায় কোনওই অসুবিধা হবার কথা নয়।

বিকেলবেলা জয়ন্তবাবু নিজে ফোন করলেন। ফোনের পর ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করাতে বলল ভদ্রলোক বলে দিলেন যেন আমরা অবশ্যই যাই। ওখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে, তা ছাড়া শকুন্তলার হারটাও দেখা যাবে। ফেলুদা আরও বলল যে ভদ্রলোক বলে দিয়েছেন যে একেবারে ইনফরম্যাল ব্যাপার, কোনও বিশেষ পোশাক পরবার দরকার নেই।

'এইটেই আমার ভয় ছিল', বলল ফেলুদা। 'নেমন্তন্নে আপত্তি নেই, কিন্তু তার জন্য যদি সাহেব কিংবা বাবু সাজতে হয় তা হলেই গোলমাল।'

আমাদের হাতে একদিন সময় ছিল, তার মধ্যে ছোটা ইমামবড়া, ছত্তর মঞ্জিল আর চিড়িয়াখানা দেখে নিলাম। খাঁচার বাইরে বাঘ সিংহ দেখে লালমোহনবাবু ভয়ানক ইমপ্রেস্‌ড। বললেন কলকাতাতে এরকম হওয়া উচিত।

শুক্রবার একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা পৌনে আটটায় বেরিয়ে

পড়লাম। প্ল্যান দেখে বাড়ি বার করতে কোনও অসুবিধা হল না। একতলা ছড়ানো বাড়ি, সামনে বেশ বড় ফুলের বাগান। তার মধ্য দিয়ে নুড়ি ঢালা পথ চলে গেছে বাড়ির দরজা পর্যন্ত। আমরা দরজায় বেল টিপলাম, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একজন উর্দি পরা বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল। বাড়ির ভিতর থেকে লোকজনের গলার শব্দ পাচ্ছিলাম, বেয়ারা ভিতরে গিয়ে বলতেই জয়ন্তবাবু চটপট বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'আসুন, আসুন, মিঃ মিত্র, আই অ্যাম সো গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ কাম।'

আমরা তিনজন জয়ন্তবাবুর পিছন পিছন বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম পাঁচ-সাত জনের বেশি লোক নেই। হয়তো পরে আরও আসবে।

এর পর আলাপ পর্ব। প্রথমে জয়ন্তবাবুর স্ত্রী। দেখে বুঝলাম মহিলা এককালে সুন্দরী ছিলেন। তারপর তাঁর দুই ছেলেমেয়ে। মেয়েটি—নাম মেরি শীলা দেখতে সুশ্রী। চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ; ছেলেটির একেবারে পার্ক স্ট্রিট মার্কা চেহারা—দাড়ি, গোঁফ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তাতে চিরুনি পড়েনি। এরই নাম ভিক্টর প্রসেনজিৎ। তারপর জয়ন্তবাবু বললেন, 'মিঃ অ্যান্ড মিসেস সালডান্‌হা।' অর্থাৎ জয়ন্তবাবুর বড় শালী এবং তাঁর স্বামী। ভদ্রমহিলা মোটা হয়ে গেছেন, ভদ্রলোক আবার তেমনই রোগা, দাড়ি গোঁফ কামানো, ষাটের কাছাকাছি বয়স। এই সালডান্‌হারই বাজনার দোকান আছে—ইনি গোয়ার অধিবাসী। আপাতত এই কজনই রয়েছেন ঘরে।

ঘরটা বেশ বড়, আর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল দেখে যে ঘরের একদিকে একটা সিনেমা স্ক্রিন টাঙানো রয়েছে আর অন্যদিকে রয়েছে একটা প্রোজেক্টর। জয়ন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করাতে বললেন ওঁদের কাছে শকুন্তলা দেবীর শেষ ছবির একটা প্রিন্ট আছে, সেটার একটা রিল নাকি ডিনারের আগে দেখানো হবে। এই ছবিতে নাকি শকুন্তলা দেবী তাঁর বিখ্যাত হারটা পরেছিলেন। গল্পটা কপালকুণ্ডলা, আর শকুন্তলা দেবী সেজেছিলেন লুতফ-উন্নিসা। আমার তো শুনেই মনটা চনমন করে উঠল।

ফেলুদা প্রাইভেট ডিটেকটিভ শুনে সকলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য

পড়ে গিয়েছিল। মেরি শীলা এসে বলল, 'আমি আপনার একজন ভীষণ অ্যাডমায়ারার। দুঃখের বিষয় আমার কোনও অটোগ্রাফ খাতা নেই। আমি আজকালের মধ্যেই একটা খাতা কিনে নিয়ে আপনার হোটেলে গিয়ে সই নিয়ে আসব।'

বাংলার মধ্যে অনেকগুলো ইংরিজি কথা ব্যবহার করছিল শীলা। সেটা এখানে প্রায় সকলের মধ্যেই লক্ষ করছিলাম।

বেয়ারা পানীয় পরিবেশন করছিল। আমরা তো মদ খাই না, তাই তিনজনে তিন গেলাস ফলের সরবত নিয়ে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিলাম। স্যামুয়েল সালডানহা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'হজরতগঞ্জে আমাদের মিউজিক শপ। একদিন দোকানে এলে আমি খুব খুশি হব।'

'আপনার দোকানে দিশি যন্ত্রও বিক্রি হয়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আমরা এখন সেতারও রাখছি', বললেন ভদ্রলোক।

এবার একজন ভদ্রলোক এলেন তাঁকে দেখেই বুঝলাম তিনি জয়ন্তবাবুর শালা, কারণ তাঁর চেহারার সঙ্গে সুশীলা দেবীর খুব সাদৃশ্য। ইনি প্রায় সাহেবের মতোই দেখতে, কারণ এঁর চুল আর চোখও কটা।

ইনি একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার নাম রতনলাল ব্যানার্জি। আমি জয়ন্তর ব্রাদার-ইন-ল। আপনাদের পরিচয়...?'

এই সময় জয়ন্তবাবু এগিয়ে এসে আমাদের পরিচয় দিয়ে দিলেন।

'প্রাইভেট ডিটেকটিভ?' রতনলাল ভুরু কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলেন। 'আপনি কি কোনও কেসের ব্যাপারে লখ্নৌতে এসেছেন?'

ফেলুদা হেসে বলে, 'না, স্রেফ ছুটি।'

এই সময় একজন ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন বাড়ির ভিতর থেকে। বৃদ্ধই বলা চলে। সম্ভবত ষাটের উপর বয়স নিশ্চয়ই। বুঝলাম তিনিও এই বাড়িতেই থাকেন। ভদ্রলোকের চেহারাটা কী রকম যেন অপরিচ্ছন্ন। এই পার্টিতে তাঁকে মানাচ্ছে না। পোশাক অপরিষ্কার, দাড়িও অন্তত দুদিন কামাননি, মাথার চুল লম্বা হয়ে কাঁধ

পর্যন্ত নেমেছে।

জয়ন্তবাবু ভদ্রলোকের পিঠে হাত দিয়ে আমাদের দিকে নিয়ে এলেন।

'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই', বললেন জয়ন্তবাবু। জানা গেল ইনি হচ্ছেন একজন চিত্রশিল্পী। নাম সুদর্শন সোম। এককালে খুব নাম করা পোর্ট্রেট পেন্টার ছিলেন, শকুন্তলা দেবীর অনেকগুলো ছবি এঁকেছিলেন। এখন রিটায়ার করে জয়ন্তবাবুর বাড়িতেই গেস্ট হয়ে থাকেন। আর্টিস্টকে এই বয়সে রিটায়ার করতে শুনিনি কখনও, তাই একটু অবাক লাগল। এবার লক্ষ করলাম বৈঠকখানার দেয়ালে একটা ছবি—এক মহিলার, বছর চল্লিশেক বয়স—তার তলার কোণের দিকে লেখা এস. সোম। ইনিই কি শকুন্তলা দেবী? বয়স বেশি হলেও চেহারায় বেশ একটা জৌলুস রয়েছে। তখন অবিশ্যি শকুন্তলা দেবী আর ছবি করেন না। সুদর্শন সোম এবার বেয়ারার ট্রে থেকে একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিলেন। ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি কষ্ট হচ্ছিল।

ঘরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কথা বলছিলেন স্যামুয়েল সালডান্হা। ইনি রাজনীতি নিয়ে উত্তেজিতভাবে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন রতনলাল ব্যানার্জির সঙ্গে। সেই তর্কে দেখলাম সুদর্শন সোমও যোগ দিলেন।

আমি খালি ভাবছিলাম শকুন্তলা দেবীর হারটা কখন দেখা যাবে। দুই গিন্নিকে দেখছি অতিথিদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলেছেন। জয়ন্তবাবুর স্ত্রী সুনীলা দেবী ফেলুদাকে এসে বললেন, 'আপনি অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাচ্ছেন, ব্যাপার কী—আপনি ড্রিংক করেন না বুঝি?'

ফেলুদা হেসে বলল, 'না, আমাদের পেশায় মাথাটা সব সময় ঠাণ্ডা রাখাই ভাল।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম প্রাইভেট ডিটেকটিভরা ভীষণ ড্রিংক করে।'

'সেটা আপনার ধারণা হয়েছে বোধহয় আমেরিকান ক্রাইম উপন্যাস পড়ে।'

'তাই হবে। আমি ভীষণ গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত।'

'ভাল কথা', ফেলুদা আর না বলে পারল না, 'আপনার স্বামী

বলছিলেন আজ শকুন্তলা দেবীর হারটা একবার আমাদের দেখাবেন।'

'ও হ্যাঁ—তা তো বটেই—দেখেছেন, আমি একদম ভুলে গেছি। শীলা!'

শীলা তার মা-র দিকে এগিয়ে এল।

'কী মা?'

'যাও তো সোনা—তোমার দিদিমার হারটা একবার নিয়ে এসো তো। জানো তো চাবি কোথায় আছে। মিঃ মিত্র একবার দেখতে চাইছেন।'

শীলা তক্ষুনি চলে গেল আদেশ পালন করতে।

'চাবি বুঝি আপনার কাছে থাকে না?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'না। ওটা থাকে আমার ড্রেসিং টেবিলের দেরাজে। হারটা থাকে সিন্দুকে। এ বাড়িতে চুরি হবার কোনও ভয় নেই। আমার চাকররা সব পুরনো। সুলেমান—যে আপনাদের দরজা খুলে দিল—সে আছে আজ ত্রিশ বছর। অন্য চাকরও সব পুরনো আর বিশ্বস্ত।'

তিন মিনিটের মধ্যে শীলা ফিরে এল—তার হাতে একটা গাঢ় নীল মখমলের বাক্স। মেয়ের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে নিলেন সুনীলা দেবী। তারপর 'এই যে' বলে বাক্সটা খুলে এগিয়ে দিলেন ফেলুদার দিকে।

আমি আর লালমোহনবাবু বাক্সটার দুদিকে দাঁড়ালাম, আর দুজনের মুখ থেকে একই সঙ্গে একটা বিস্ময়সূচক নিশ্বাস টানার শব্দ বেরিয়ে এল।

এমন অপূর্ব গয়না আমি কখনও দেখিনি। নকশাদার সোনার হার। তাতে হিরে থেকে শুরু করে যত রকম মণিমুক্তো হয় সব বসানো।

'আশ্চর্য জিনিস', বলল ফেলুদা। 'এরকম হার দুটি হয় না। এটার আজকের দর কত হতে পারে তা আন্দাজ আছে আপনার?'

'তা দুই আড়াই লাখ হবে নিশ্চয়ই।'

'থাক্—এটা আর বেশিক্ষণ বাইরে রাখা ভাল না। নাও, শীলা, এটা আবার রেখে দিয়ে এসো।'

শীলা হারটা নিয়ে চলে গেল।

একটা জিনিস লক্ষ করছিলাম যে জয়ন্তবাবুর ছেলে আমাদের দিকে বেশি ঘেঁসছে না। দেখে মনে হল ছেলেটি শিশুকে নয়। আর পার্টিটাও যেন সে বিশেষ উপভোগ করছে না। অবিশ্যি এই টাইপের এই বয়সী ছেলেরা এরকমই হয়, এটা কলকাতাতেও লক্ষ করেছি। এরা নিজেরা দল ছাড়া কোনও দলের সঙ্গেই মিশতে পারে না।

ড্রিংকসের পর্ব বোধহয় শেষ হল, কারণ এবার একজন ভদ্রলোক এসে এক রোল ফিল্ম নিয়ে প্রোজেক্টরে চাপাতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি রেডি আছি।'

জয়ন্তবাবু এবার ঘোষণা করলেন যে শকুন্তলা দেবী অভিনীত কপালকুণ্ডলা ছবির একটা রিল দেখানো হবে। 'সুলেমান, ঘরের বাতিগুলো নিবিয়ে দাও তো।'

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর ঘর্ঘর শব্দ তুলে প্রোজেক্টর চলতে শুরু করল। পর্দায় ছবি নড়ে উঠল। সেই আদ্যিকালের ছবি। জয়ন্তবাবু বললেন, 'এটা ১৯৩০ সালের ছবি। ভারতবর্ষে টকি আসার ঠিক আগে।'

আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম শকুন্তলা দেবীকে। দেখলে মেমসাহেব মনে হয় না। চেহারা সত্যি খুবই সুন্দর—আজকের দিনেও পর্দায় এত সুন্দরী বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু সাইলেন্ট ছবির যা দোষত্রুটি আর থিয়েটারি অভিনয় সেটাও যে নেই এই কপালকুণ্ডলায় তা নয়। তবুও জানা গেল শকুন্তলা দেবীর পপুলারিটির খানিকটা কারণ। মহারাজা থেকে শুরু করে পানবিড়িওয়ালা পর্যন্ত সকলকেই মুগ্ধ করেছিলেন তিনি। সকলেই তাঁর ছবি দেখত আর বাহবা দিত।

দশ মিনিট চলে ছবি বন্ধ হল।

ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। সকলে আবার কথাবার্তা শুরু করল।

এই অন্ধকার অবস্থাতেই যে আরেকজন ঘরে ঢুকেছে তা টের পাইনি। এঁকে আমরা চিনি। ইনি হলেন মিঃ সুকিয়াস। ইনি ক্ষমা প্রার্থনা করলেন পার্টির দিনে এসে পড়ার জন্য। অর্থাৎ ইনি নিমন্ত্রিত হননি—এমনি বোধহয় জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

বেয়ারা এসে খবর দিল পাত পড়েছে—ডিনার ইজ সার্ভড।

চমৎকার মোগলাই রান্না খেয়ে আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম তখন বেজেছে সোয়া এগারোটা। পার্টি যে আরও কিছুক্ষণ চলেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

॥ ৪ ॥

পরদিন সকালে ফেলুদা আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে ঘুম থেকে তুলল। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

'কী ব্যাপার ফেলুদা ?'

ফেলুদার মুখ গম্ভীর।

'জয়ন্তবাবু ফোন করেছিলেন। এক্ষুনি। শকুন্তলা দেবীর কণ্ঠহার মিসিং।'

'সর্বনাশ !'

'তুই চট করে তৈরি হয়ে নে। আমি লালমোহনবাবুকে খবরটা দিয়ে আসছি। আমাদের ব্রেকফাস্ট খেয়েই যেতে হবে ওখানে। শুধু মিঃ সুকিয়াস ছাড়া আর সকলেই এসেছে ওখানে খবরটা পেয়ে।'

'পুলিশে খবর দেয়নি ?'

'দিয়েছে, কিন্তু আমাকেও চায়।'

আমরা সাড়ে আটটার মধ্যে জয়ন্তবাবুর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। বাড়ির সবাই কেমন যেন পাথরের মতো চুপ। ফেলুদা ক্ষমা চাইল। 'কাল আমাদের দেখানোর জন্যই হারটা বার করা হয়েছিল। তার সঙ্গে এ চুরির কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু আমি নিজে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছি বলে কথাটা বললাম।'

পুলিশের লোক আগেই এসে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে যিনি কর্তা তিনি ফেলুদার দিকে এগিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমি ইনস্পেক্টর পাণ্ডে। আপনি তো বোধহয় প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর মিঃ মিটার ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বলল ফেলুদা।

'আই অ্যাম ফ্যামিলিয়ার উইথ ইয়োর নেম', বললেন পাণ্ডে। 'আপনার কয়েকটা সাক্সেসফুল ইনভেস্টিগেশনের কথা আমার মনে আছে। তা আপনি তো বোধহয় জেরা করতে চান?'

'আগে আপনার কাজ শেষ হয়ে যাক,' বলল ফেলুদা। 'তারপর আমার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

প্রশ্ন করে জানা গেল যে কাল রাত্রে সবাই চলে যাবার পর বারোটা নাগাদ জয়ন্তবাবুর স্ত্রী তাঁর বেডরুমে গিয়ে শুতে যাবার আগে কেন জানি আরেকবার হারটা দেখার ইচ্ছা অনুভব করেন। হয়তো কপালকুণ্ডলা ছবিতে শকুন্তলা দেবীকে হার পরা অবস্থায় দেখেই সে ইচ্ছেটা জাগে। ভদ্রমহিলা নিজেই বললেন, 'এটা একটা ভ্যানিটির ব্যাপার। আমার মা-র গলায় হারটা এত সুন্দর মানাত; সেটা দেখেই আমার মনে একটা ইচ্ছে হল হারটা একবার পরে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখি। মেয়েরা শুতে যাবার আগে বেশ খানিকটা সময় ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে কাটায়। সেই সময়ই দেরাজ থেকে চাবিটা বার করে সিন্দুক খুলে দেখি হারটা নেই। আমি তৎক্ষণাৎ আমার মেয়েকে ডাকি। মেয়ে জোর দিয়ে বলে যে সে সিন্দুকেই রেখে ছিল হারটা। সেখানে ছাড়া আর কোথায়ই বা রাখবে? সিন্দুকেই তো চিরকাল থেকেছে হারটা।'

'আপনারা ভাল করে খুঁজে দেখেছেন হারটা?' পাণ্ডে জিজ্ঞেস করল।

'কোথায় আর খুঁজব বলুন,' বললেন সুনীলা দেবী, 'ওটা যে কেউ সিন্দুক থেকে বার করে নিয়েছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই!'

'আপনাদের বাড়িতে কাল পার্টি ছিল, তাই না?' পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ', বললেন জয়ন্তবাবু।

'কটা থেকে কটা পর্যন্ত?'

'আটটা থেকে পৌনে বারোটা।'

'মিসেস বিশ্বাস, আপনি কি পার্টির পরেই আপনার ঘরে চলে

যান ?'

'হ্যাঁ।'

'আর তার কতক্ষণ পরে আবিষ্কার করেন যে হারটা নেই ?'

'মিনিট পনেরো।'

'এর মধ্যে আপনি ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোননি ?'

'না।'

'অর্থাৎ হারটা চুরি হয়েছে ডিউরিং দ্য পার্টি ?'

'তাই তো মনে হয়,' বললেন জয়ন্তবাবু। 'এখানে একটা কথা বলি—পার্টির মধ্যে হারটাকে আমার মেয়ে একবার সিন্দুক থেকে

এই ঘরে আনে—মিঃ মিত্রকে দেখানোর জন্য।'

'তার পরেই—তখনই কি আপনার মেয়ে হারটাকে আবার সিন্দুকে তুলে দেয়?'

'হ্যাঁ', বলল মেরি শীলা। 'আমি এক মুহূর্ত দেরি করিনি।'

'এখানে একটা জরুরি কথা বলা দরকার,' বললেন জয়ন্তবাবু। 'হারটা তুলে রাখার কিছু পরেই এ ঘরে একটা দশ মিনিটের ফিল্ম দেখানো হয়।'

'তার জন্য তখন বাতি নেবানো হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'এ বাড়িতে চাকর কজন?'

'তিনজন। একজন রান্না করে। আর দুজন বেয়ারা।'

'কতদিনের লোক এরা?'

'কেউই পনেরো বছরের কম না। এরা অত্যন্ত বিশ্বাসী। সুলেমান তো আমার শ্বশুরের আমল থেকে আছে।'

'তা হলে একটাই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে,' বললেন পাণ্ডে। 'জিনিসটা শুনতে খারাপ লাগবে, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে। এই বাড়ির লোক সমেত এই পার্টিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরই একজন হারটা নিয়েছেন।'

আমারও সেই কথাই মনে হচ্ছিল, আর আমার মনে হয় ফেলুদা আর লালমোহনবাবুরও তাই।

পাণ্ডে এবার ফেলুদার দিকে ফিরলেন।

'মিঃ মিটার, আপনার সঙ্গে যে দুজন এসেছেন, তাঁদের পরিচয় পেতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই', বলল ফেলুদা। 'ইনি আমার কাজিন তপেশ মিত্র, আর ইনি আমার বন্ধু—বিখ্যাত লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী।'

'এই লেখকটিকে আপনি কতদিন হল চেনেন?'

'বছর পাঁচ-ছয়।'

আমি লালমোহনবাবুর দিকে দেখছিলাম। ভদ্রলোক ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। আমি ওঁকে কণ্ঠহার চোর হিসেবে কল্পনা করলাম। এই সংকটের অবস্থাতেও আমার হাসি পেয়ে গেল।

এবার পাণ্ডে অন্য প্রশ্নে গেলেন।

'এখানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে কজন এ বাড়িতে থাকেন ?'

জয়ন্তবাবু বললেন, 'আমি, আমার স্ত্রী, আমার দুই ছেলেমেয়ে এবং আর্টিস্ট মিঃ সোম।'

মিঃ সোম আজও দাড়ি কামাননি ; তাই তাঁকে আরও অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে।

'আর সকলেই বাইরের লোক ?' পাণ্ডে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। মিঃ সালডান্‌হা থাকেন ক্লাইভ রোডে। উনি আমার ব্রাদার-ইন-ল। ওঁর স্ত্রী আমার স্ত্রীর বড় বোন।'

'আরেকজনকে দেখছি,' রতনলালের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন মিঃ পাণ্ডে।

'উনি রতনলাল ব্যানার্জি—আমার স্ত্রীর ছোট ভাই।'

'এ ছাড়া আর কেউ ছিল ?'

'একজন ছিলেন। লাটুশ রোডের মিঃ সুকিয়াস। উনি অবশ্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন না, এমনিই এসে পড়েন। তিনি এসেছিলেন যখন ফিল্মটা দেখানো হচ্ছে তার মাঝখানে। আলো জ্বালার পরে আমি তাঁকে দেখি।'

'এই সুকিয়াসের প্রোফেশন কী ?'

'হি ইজ এ কালেক্টর অফ আর্ট অবজেক্টস। তা ছাড়া তেজারতির কারবার আছে।'

'ইনি কি এই হারটা সম্বন্ধে কোনওদিন ইন্টারেস্ট দেখিয়েছিলেন ?'

'উনি ওটা কিনতে চেয়েছিলেন আমরা বিক্রি করিনি।'

'আই সি।'

ইন্সপেক্টর পাণ্ডে একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, 'এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে কাল এখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন হারটা নিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে, সেই হারটা কোথায়।'

জয়ন্তবাবু গলা খাঁকরে নিয়ে বললেন, 'আপনি যদি সার্চ করতে চান তা হলে করতে পারেন। এমনকী ব্যক্তিগত খানাতল্লাশিতেও আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।'

পাণ্ডে বললেন, 'তা তো করতেই হবে। সার্চ থেকে মহিলারাও বাদ পড়বেন না। এবং তার জন্য আমি মেয়ে পুলিশের বন্দোবস্ত করছি। তা ছাড়া বাড়িটাও ভাল করে সার্চ করা দরকার।'

সার্চের ব্যাপারে দেখলাম কেউই আপত্তি করলেন না। খালি সাল্‌ডান্‌হা বললেন, 'আমার দোকান খুলতে হবে দশটার সময়। তার মধ্যে আমার সার্চটা হয়ে গেলে ভাল।'

ফেলুদা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। এবার বলল, 'এখানে সার্চ চলুক। আমি তা হলে এখন আসি। যদি হারটা পাওয়া যায় তা হলে আশা করি জয়ন্তবাবু আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন। না হলে আমি ও বেলা আবার আসব।'

আমরা তিনজনে হোটেলে ফিরে এলাম। লালমোহনবাবুও আমাদের সঙ্গে আমাদের ঘরেই এলেন। ভদ্রলোক ঢুকেই বললেন, 'এ নিয়ে কবার হল বলুন তো, যে আমরা বেড়াতে গিয়ে কেসে জড়িয়ে পড়েছি? এ জিনিস টেলিপ্যাথি ছাড়া হয় না।'

ফেলুদা বলল, 'দেখি আপনার স্মরণশক্তি কতদূর। তোপ্‌সেকে তো এর আগে অনেকবার পরীক্ষা করেছি, আপনাকে কখনও করা হয়নি।'

'ভেরি ওয়েল স্যার, আই অ্যাম রেডি', বললেন জটায়ু।

'আগে শকুন্তলা দেবীর ফ্যামিলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি।'

'করুন।'

'ভদ্রমহিলার তিন সন্তানের নাম বলুন তো।'

'বড় মেয়ে সুশীলা—'

'তার আগে একটা ক্রিশ্চান নাম আছে।'

'ও হ্যাঁ—ক্রিশ্চান নাম...ক্রিশ্চান নাম...'

'তোপ্‌সে বলতে পারিস?'

আমার মনে ছিল। বললাম, 'মার্গারেট।'

'ভেরি গুড। তার পরের মেয়ে, অর্থাৎ জয়ন্তবাবুর স্ত্রী? এই প্রশ্নটা কিন্তু লালমোহনবাবুকে করছি।'

লালমোহনবাবু এটা ভোলেননি। বললেন, 'প্যামেলা সুনীলা।'

'গুড। তাঁর পরের ভাই?'

'ইয়ে—রতনলাল। অ্যালবার্ট রতনলাল।'

'এবার সুশীলা দেবীর স্বামীর নাম?'

'স্যামুয়েল সাল্‌ডান্‌হা।'

'ভেরি গুড। সুনীলা দেবীর ছেলেমেয়ে?'

'মেয়ে শীলা—মেরি শীলা। আর ছেলে প্রসেনজিৎ। ক্রিশ্চান নাম ভুলে গেছি।'

'ভিক্টর। আর কে ছিলেন কাল পার্টিতে?'

'সেই আর্টিস্ট ভদ্রলোক। নামটা মনে পড়ছে না।'

'তোপ্‌সে?'

'সোম। সুদর্শন সোম।'

'গুড।'

'কিছু মাইন্ড করবেন না মশাই', লালমোহনবাবু বললেন, 'ভদ্রলোককে কিন্তু আমার ভাল লাগল না।'

'কেন?'

'কীরকম পাগলাটে চেহারা। দাড়ি কামাননি।'

'আর্টিস্টরা সব সময় সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলে না।'

'তা হতে পারে। মোট কথা, উনি আর আরেকজন আমার কাছে এই চুরির ব্যাপারে প্রাইম সাসপেক্টস।'

'আরেকজন কে?'

'জয়ন্তবাবুর ছেলে প্রসেনজিৎ। একেবারে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের বাউন্ডুলেদের মতো চেহারা। অবশ্য মদ তো দেখলাম খায় না ছেলেটি।'

'খেলেও হয়তো বাপের সামনে খায় না।'

'এনিওয়ে, পার্টিতে কিন্তু আরেকজন ছিলেন।'

'মিঃ সুকিয়াস তো?'

'হ্যাঁ। এঁর কিন্তু হারটার উপর লোভ ছিল।'

'যে কোনও আর্ট কালেক্টরেরই থাকবে। সেটা কিছুই আশ্চর্য না। আর্ট কালেক্টর হলে কিনতে চাইবে। আর অভাবী লোক হলে হাতাতে চাইবে। এঁদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কোনও কিছুই জানি না। কাজেই এখন অন্ধকারে হাতড়ে লাভ নেই।

বিকেলে জয়ন্তবাবু ফোন করবেন, তার আগে পর্যন্ত আমরা ফ্রি। চলুন, আপনাকে কাইজার-বাগটা দেখিয়ে আনি।'

'ভেরি গুড আইডিয়া', বললেন লালমোহনবাবু। 'তদন্তের চাপে যদি লখ্‌নৌ শহরটা দেখা সম্পূর্ণ না হয় তা হলে খুব আপসোস থেকে যাবে।'

॥ ৫ ॥

বিকেলে কথামতো জয়ন্তবাবু ফোন করলেন। পুলিশ সার্চ করে কিছু পায়নি। বাড়ির চাকরদের জেরা করা হয়েছে, তাতেও কোনও ফল হয়নি। ফেলুদা বলল, 'চল, এবার একবার জয়ন্তবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক। এবার ফেলু মিত্তিরের কাজ শুরু। অবিশ্যি পুলিশ তাদের তদন্ত চালিয়েই যাবে, কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যাচ্ছে না।'

হোটেলেই ট্যাক্সি ছিল, একটা নিয়ে গুমতীর ব্রিজ পেরিয়ে জয়ন্তবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। আজ বাড়িটাকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল, বেশ বোঝা যাচ্ছিল ওখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

সুলেমান এসে দরজা খুলে দিল, আমরা তিনজন ভিতরে ঢুকলাম। জয়ন্তবাবু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন বৈঠকখানায়, আমাদের দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে এলেন।

'ওটা পাওয়া গেল না', প্রথম কথাই বললেন ভদ্রলোক।

ফেলুদা বলল, 'সেটা অস্বাভাবিক নয়। আমারও মনে হয়েছিল ওটা পাওয়া যাবে না। যে নিয়েছে সে তো আর বোকা নয় যে হাতের কাছে রেখে দেবে জিনিসটা।'

'আপনিও কি আলাদা করে সার্চ করতে চান?'

'না,' বলল ফেলুদা। 'আমি আপনার বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। এখন এ বাড়িতে কে কে রয়েছেন?'

'আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে, ছেলে বোধহয় এখনও ফেরেনি। আর আছেন সোম—যাঁর সঙ্গে কাল আপনাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।'

'আমার কিন্তু মিঃ সালডানহার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। আর মিঃ সুকিয়াস।'

'সেটা কোনও অসুবিধা নেই। আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দেব, আপনি ফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে চলে যাবেন।'

'তা হলে আপনাকে দিয়ে শুরু করা যাক।'

'বেশ তো।'

আমরা সকলেই সোফায় বসলাম।

'একটু চা খাবেন তো?' জয়ন্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'তা খেতে পারি।'

জয়ন্তবাবু সুলেমানকে ডেকে চার কাপ চায়ের অর্ডার দিলেন। তারপর ফেলুদা একটা চারমিনার ধরিয়ে তার প্রশ্ন শুরু করল।

'আপনি বলছিলেন সুকিয়াস আপনার শাশুড়ির হারটা কিনতে চেয়েছিলেন। সেটা কতদিন আগে?'

'বছরখানেক হবে।'

'সুকিয়াস জানলেন কী করে এই হারের কথা?'

'এটার কথা অনেকেই জানে। এককালে খবরের কাগজে বেরিয়েছিল তো। আমার শাশুড়ি মারা যাবার পর তাঁর একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানকার "পায়োনিয়ার" কাগজে বেরিয়েছিল। তাতে হারের কথাটা ছিল। সুকিয়াস এমনিতে মানিলেন্ডার, তেজারতির কারবার করে। ভাবলে মনে হয় এমন লোকের শিল্পের দিকে কোনও ঝোঁক থাকবে না। কিন্তু সুকিয়াস এ ব্যাপারে একটা বিরাট ব্যতিক্রম। আমি ওর বাড়িতে গিয়েছি, ওর সংগ্রহ দেখেছি। দেখবার মতো সব জিনিস আছে ওর কাছে। ওর রুচি অনবদ্য।'

'আপনি যখন হারটা বিক্রি করলেন না, তখন ওর প্রতিক্রিয়া কী হয়?'

'ও খুবই হতাশ হয়েছিল। ও দু লাখ টাকা অফার করেছিল। আমি নিজে হলে কী করতাম জানি না, কিন্তু আমার স্ত্রী হারটার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। কোনও মতেই ওটা হাতছাড়া করবে না। আর সেই হারই...'

জয়ন্তবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আপনি কাউকে সন্দেহ করেন এই ব্যাপারে ?'

'আমি সম্পূর্ণ হতভম্ব। চাকরবাকর কাউকেই আমার সন্দেহ হয় না। ওরা বেইমানি করবে এটা আমি বিশ্বাস করি না। অথচ তার বাইরে কে যে এটা নিতে পারে, এবং কেন, সেটা বোঝার সাধ্যি আমার নেই।'

'আপনি তো ব্যবসাদার', ফেলুদা বলল।

'ব্যবসাদার মানে আমার একটি ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের আপিস আছে।'

'কেমন চলে আপিস ?'

'ভালই। আমাদেরই কোম্পানি। আমার একজন পার্টনার আছে।'

'কী নাম ?'

'ত্রিভুবন নাগর। এখানকারই লোক। আমার প্রথম জীবনে আমি ব্যবসায় ছিলাম না, একটা সওদাগরি আপিসে চাকরি করতাম। নাগর ছিল আমার বন্ধু। ত্রিশ বছর আগে নাগর আর আমি মিলে আমাদের ব্যবসা শুরু করি।'

'আপনাদের কোম্পানির নাম কী ?'

'মডার্ন ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট।'

'কোথায় আপনাদের আপিস ?'

'হজরতগঞ্জে।'

ইতিমধ্যে আমাদের চা এসে গেছে, আমরা খেতে শুরু করে দিয়েছি। ফেলুদা বলল, 'আরেকটা প্রশ্ন আছে।'

'কী ?'

'কাল যখন ফিল্মটা চলছিল তখন আপনি কাউকে চলাফেরা করতে, কিংবা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন ?'

'উঁহু।'

'আপনার ছেলে কোনও চাকরি করে ?'

'এখনও না। ওকে আমার আপিসে ঢোকানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু ও রাজি হয়নি।'

'ওর বয়স কত ?'

'পঁচিশ।'

'ওর কোনদিকে ঝোঁক?'

'ঈশ্বর জানেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। একবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা যায় কি?'

'নিশ্চয়ই। ও খুবই ডিপ্রেস্‌ড হয়ে পড়েছে, বুঝতেই পারেন।'

'আমি বেশি বিরক্ত করব না ওঁকে?'

চা খাবার পর জয়ন্তবাবু গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আনলেন। ভদ্রমহিলা কান্নাকাটি করেছেন সেটা এখনও দেখলে বোঝা যায়। দিনের বেলা দেখে আরও বেশি করে মনে হল যে শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে এঁর আশ্চর্য চেহারার মিল। ভদ্রমহিলা চাপা গলায় বললেন, 'আপনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইছিলেন...?'

ফেলুদা বলল, 'হ্যাঁ। বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না। সামান্য কয়েকটা প্রশ্ন।'

'বলুন।'

'আপনার মা যে হারটা আপনার দিদিকে না দিয়ে আপনাকে দিলেন তাতে আপনার দিদির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?'

'তিনি বোধহয় এ ব্যাপারটা আগে থেকেই আন্দাজ করেছিলেন।'

'কেন?'

'দিদি ছিল আমার বাবার ফেভারিট, আর আমি ছিলাম মা-র। মা মারা যাবার তিন বছর আগে হারটা আমাকে দেন। দিদির মনের অবস্থা কী হয়েছিল বলতে পারব না, কারণ এ নিয়ে আমাদের মধ্যে কখনও কোনও আলোচনা হয়নি।'

'আপনার দিদির সঙ্গে আপনার সদ্ভাব আছে?'

'হ্যাঁ। যত দিন যাচ্ছে আমরা দুজনে তত আরও কাছাকাছি এসে পড়ছি। যখন ইয়াং ছিলাম তখন দুজনের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব ছিল।'

'আপনি তো অভিনয় করতে খুব ভালবাসেন?'

'হ্যাঁ। তাই তো মা আমাকে নিয়ে এত প্রাউড ছিলেন। এ

ব্যাপারে দিদির কোনও শখ ছিল না।'

'আপনার মেয়ের?'

'শীলা স্কুলে কলেজে অ্যাকটিং করেছে, ক্লাবে-টলাবেও দু-একবার করেছে। তার বেশি নয়। ও ফিল্মে অফার পেয়েছে, কিন্তু নেয়নি।'

'ও কী করতে চায়?'

'ও ওয়ার্কিং গার্ল হতে চায়। আপিসে কাজ করবে, নিজে রোজগার করবে। ও তো সবে বি-এ পাশ করেছে। এর মধ্যে কিছু জার্নালিজ্‌ম করেছে, খবরের কাগজে ওর দু একটা লেখা বেরিয়েছে।'

'আপনি কি এই চুরির ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন?'

'কাউকেই না। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে একেবারেই সাহায্য করতে পারব না।'

'কাল যখন ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল তখন কাউকে হাঁটাচলা করতে দেখেছিলেন?'

'না। মনে হল সকলেই তন্ময় হয়ে ছবিটা দেখছে।'

'ঠিক আছে, মিসেস বিশ্বাস। আপনার ছুটি।'

মিসেস বিশ্বাস ধন্যবাদ দিয়ে উঠে চলে গেলেন।

ফেলুদা জয়ন্তবাবুর দিকে ফিরল।

'আমি একবার মিঃ সোমের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বেশ তো, আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

জয়ন্তবাবু ভিতরে চলে গেলেন।

দু মিনিটের মধ্যে সুদর্শন সোম এসে হাজির হলেন। আজ তিনি দাড়ি কামিয়েছেন কোনও একটা সময়, তাই তাঁকে একটু ভদ্রস্থ লাগছে। তিনি ফেলুদার সামনের সোফায় বসলেন, তাঁর মুখে চুরুট। কাল পার্টিতে এঁকে চুরুট খেতে দেখেছি। কড়া গন্ধে ঘরটা ভরে গেল।

ফেলুদা প্রশ্ন শুরু করল।

'আপনি কত দিন এ বাড়িতে রয়েছেন?'

'বছর পনেরো হল। শকুন্তলা দেবীই আমাকে এ বাড়িতে

থাকতে বলেন।'

'আপনি এক কথায় রাজি হয়ে যান? পরের আশ্রিত হতে কোনওরকম দ্বিধা-সংকোচ বোধ করেননি?'

'তখন আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে আসছে। এখন আমার বয়স সাতষট্টি। তখনই আমি পঞ্চাশের উপর। ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আরথ্রাইটিস, তাই ছবি আঁকতে পারছি না। শকুন্তলা দেবীর অনুগ্রহে আমার তবু একটা সংস্থান হল। তা না হলে আমি যে কী করতাম জানি না। আমায় না খেয়ে মরতে হত। অবশ্য পরের চ্যারিটি ভোগ করছি এই নিয়ে অনেকদিন খুব সচেতন

ছিলাম, মনটা খচ্‌খচ্‌ করত। কিন্তু এঁরাও আমার উপস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন, শীলা আর প্রসেনজিৎ আমাকে খুব ভালবাসত, তাই ব্যাপারটা ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।'

'আপনার নিজের রোজগার বলে তো কিছুই নেই।'

'দু একটা পুরানো ছবি মাঝে মাঝে অল্প দামে বিক্রি হয়। সে তেমন কিছুই না। সত্যি বলতে কী, আই অ্যাম পেনিলেস। জয়ন্তবাবু আমাকে প্রতি মাসে হাত খরচের জন্য কিছু টাকা দেন, আর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাটা রয়েছে। চুরুটের অভ্যাসটা অনেক চেষ্টা করেও ছাড়তে পারিনি। তবে অনেক কমিয়ে দিয়েছি।'

'এই চুরির ব্যাপারে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?'

মিঃ সোম একটু ভেবে বললেন, 'চাকরদের কাউকে হয় না।'

'তবে কাকে হয়?'

মিঃ সোম আবার চুপ করে গেলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি ইতস্তত করলে কিন্তু আমার কাজটা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। আপনি নিশ্চয়ই চান যে শকুন্তলা দেবীর হারটা আবার উদ্ধার হোক।'

'তা তো বটেই।'

'তা হলে বলুন আপনার কাউকে সন্দেহ হয় কি না।'

'একজনকে হয়।'

'কে সে?'

'প্রসেনজিৎ।'

'কেন এ কথা বলছেন?'

'প্রসেনজিৎ আর আগের মতো নেই। সে অনেক বদলে গেছে। আমার ধারণা সে কুসঙ্গে পড়েছে। হয়তো জুয়া খেলে, নেশা করে, তার জন্য তার টাকার দরকার পড়ে। চাকরি-বাকরি তো কিছুই করে না। বাপ তাকে যা দেন তাতে তার চলে না। সে আমার কাছ থেকে পর্যন্ত টাকা ধার চায়। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু আমার কথায় সে কানই দেয় না।'

'আই সি...। কাল যখন সিনেমা হচ্ছিল তখন কাউকে নড়াচড়া করতে বা জায়গা পরিবর্তন করতে দেখেছিলেন?'

'আজ্ঞে না। আমি পর্দায় ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।'

'ঠিক আছে, মিঃ সোম। অনেক ধন্যবাদ। এবার আপনি যদি শীলাকে একটু পাঠিয়ে দেন।'

মিঃ সোম শীলার খোঁজে চলে গেলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শীলা এসে পড়ল। তার পরনে সালওয়ার কামিজ, গায়ে কোনও গয়না নেই। একেবারে আধুনিকা।

'কী করছিলে, শীলা?' শীলা সোফায় বসার পর ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'একটা আর্টিক্ল লিখছিলাম।'

'খবরের কাগজের জন্য?'

'হ্যাঁ।'

'কী বিষয়?'

'ঘর কী করে সাজাতে হয় তাই নিয়ে।'

'তুমি কি ইনটিরিয়র ডেকোরেশনে ইন্টারেস্টেড নাকি?'

'হ্যাঁ। ওটাকেই আমার প্রোফেশন করার ইচ্ছে আছে।'

'এ বিষয় শিখেছ কিছু?'

'এমনি কিছু শিখিনি, কিন্তু ও বিষয় অনেক বই পড়েছি।'

'আঁকতে পার?'

'মোটামুটি। ছেলেবেলায় সুদর্শনকাকু আমাকে খুব এনকারেজ করতেন। যখন আমার বারো-তেরো বছর বয়স।'

'তোমার দাদার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কীরকম?'

'আগে দুজনে খুব বন্ধু ছিলাম। এখন দাদা বদলে গেছে। আমার সঙ্গে প্রায় কথাই বলে না।'

'তাতে তোমার খারাপ লাগে না?'

'আগে লাগত, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'কাল রাত্রে হারটা আমাদের দেখিয়ে আবার ঠিক জায়গায় রেখেছিলে তো?'

'নিশ্চয়ই। চাবিও ঠিক জায়গায় রেখেছিলাম।'

'তারপর সেটা কী ভাবে উধাও হল সে বিষয়ে তোমার কোনও ধারণা আছে?'

'আমার কী করে থাকবে ?' শীলা একটু হেসে বলল। 'বরং আপনার থাকা উচিত। আপনি তো ডিটেকটিভ।'

'ডিটেকটিভরা তো প্রশ্ন করেই তাদের তদন্ত করে, সেটা নিশ্চয়ই তুমি জান।'

'তা জানি।'

এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় বেলের শব্দ হল। সুলেমান দরজা খুলে দিতে প্রসেনজিৎ ঢুকল। সে আমাদের দেখে যেন একটু হকচকিয়ে গেল, কিন্তু তার পরেই সামলে নিয়ে বলল, 'ডিটেকটশন চলছে বুঝি ?'

ফেলুদা বলল, 'তোমার বোনকে প্রশ্ন করছিলাম কালকের ব্যাপার নিয়ে। এবার ভাবছি তোমাকে করব, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তি আছে বই কী। পুলিশও আমাকে জেরা করার চেষ্টা করেছিল। আমি কোনও কথার জবাব দিইনি।'

'কিন্তু আমি তো পুলিশ নই।'

'ইট মেকস নো ডিফারেন্স। কোনও কথার জবাব আমি দেব না।'

'তা হলে কিন্তু তোমার উপর সন্দেহ পড়তে পারে।'

'পড়ুক। আই ডোন্ট কেয়ার। শুধু সন্দেহে তো আর কিছু হবে না। প্রমাণ চাই, সেই হারটা খুঁজে পাওয়া চাই।'

'বেশ, তুমি যখন কো-অপারেট করবে না তখন আমাদের দিক থেকেও বলার কিছু নেই। আমরা তোমাকে ফোর্স করতে পারি না।'

ফেলুদা উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমরা দুজনও।

কিন্তু ফেলুদার কাজ শেষ হয়নি। সে বলল, 'আমি এবার বাড়ির প্ল্যানটা দেখতে চাই।'

শীলা বলল, 'চলুন, আমি আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি।'

যা দেখলাম তা মোটামুটি এই—বৈঠকখানার পরেই খাবার ঘর, তারপর জয়ন্তবাবু আর সুনীলা দেবীর বেডরুম, তার সঙ্গে বাথরুম। এই বেডরুমের দুপাশে আরও দুটো বাথরুম সমেত

বেডরুম, সে দুটোর একটাতে থাকে শীলা, অন্যটায় প্রসেনজিৎ। জয়ন্তবাবুর ঘর থেকে দুটো ঘরে যাবার জন্য দরজা আছে। প্রসেনজিতের ঘরের পাশে একটা ছোট্ট গেস্টরুম আছে তাতে থাকেন মিঃ সোম।

প্ল্যানটা দেখে বৈঠকখানায় ফিরে এলে শীলা ফেলুদাকে বলল, 'আমি কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে আসছি।'

'আমি তো বসেইছি।' ফেলুদা বলল, 'যখন ইচ্ছে এসো—তবে একটা ফোন করে এসো। আমি তো এখন তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি—কখন কোথায় থাকি বলতে পারি না। ভাল কথা—তোমার বাবাকে একবার আসতে বলবে? একটু দরকার ছিল।'

শীলা জয়ন্তবাবুকে পাঠিয়ে দিল।

'হল আপনার কোয়েশ্চনিং?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'তা হল, তবে আপনার ছেলে কোনও প্রশ্ন করতে দিল না।'

জয়ন্তবাবু আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'প্রসেনজিৎ ওরকমই। ওর আশা আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।'

'যাই হোক্—আপনাকে ডাকার কারণ—মিঃ সাল্ডান্হা কি এখনও দোকানে থাকবেন?'

'এখন তো সাড়ে পাঁচটা—এখনও নিশ্চয়ই থাকবে।'

'তা হলে ওঁর দোকানের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা যদি দেন।'

জয়ন্তবাবু তখনই টেলিফোনের পাশে রাখা প্যাড থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে ফেলুদার হাতে দিলেন।

'এখান থেকেই ফোন করে নিই?' বলল ফেলুদা।

'সার্টেনলি।'

ফেলুদা ফোন করতেই ভদ্রলোককে পেয়ে গেল। উনি তখনই ফেলুদাকে চলে আসতে বললেন।

'আরেকজনের সঙ্গে কথা বলা বাকি থেকে যাচ্ছে', বলল ফেলুদা, 'তিনি হলেন আপনার শালা রতনলালবাবু।

মিঃ সুকিয়াসকে কাল প্রশ্ন করব।'

'রতনলাল থাকে ফ্রেজার রোডে একটা ফ্ল্যাটে। তার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরও আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। তাকে পাবার ভাল সময় হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটার পর।'

॥ ৬ ॥

হজরতগঞ্জে সালডান্‌হা অ্যান্ড কোম্পানিতে পৌঁছে একটু হকচকিয়েই গেলাম। এত পুরনো দোকান সেটা ভাবতে পারিনি। আর পনেরো মিনিট পরেই দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। ভদ্রলোক একটা ডেস্কের পিছনে বসে ছিলেন, দোকানে কোনও খদ্দের নেই, খালি একজন কর্মচারী এদিক ওদিক ঘুরছে। সালডান্‌হা আমাদের দেখেই হেসে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'আসুন, বসুন, মিঃ মিটার।'

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসলাম।

'এখানে এসে আপনাকে অসুবিধায় ফেললাম না তো?' ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'মোটেই না। এখন তো ক্লোজিং টাইম এসে গেল। এখানে আপনার কী কথা আছে বলে নিন, তারপর আপনাদের আমার গাড়িতে করে আমার বাড়ি নিয়ে যাব। সেখানে কফি খাবেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবেন।'

'তা হলে ভালই হবে,' বলল ফেলুদা, 'কারণ আপনার স্ত্রীকেও দু একটা প্রশ্ন করার আছে। কালকের পার্টির সকলকেই আমরা প্রশ্ন করছি।'

'দ্যাট্‌স অল রাইট। আই ডোন্ট থিংক সি উইল মাইন্ড।'

'আমার প্রথম প্রশ্ন—আপনার এ দোকান কতদিনের?'

'তা প্রায় সত্তর বছর হল। আমার ঠাকুরদাদা দোকানটার পত্তন করেন। লখ্‌নৌ-এর প্রথম মিউজিক শপ।'

'কিন্তু এখন নিশ্চয়ই আরও মিউজিক শপ হয়েছে?'

'আরও দুটো হয়েছে—দুটোই আমাদের জাতভাইদের করা।

একটার মালিক ডিমেলো, আরেকটার নরোন্‌হা। এদের মধ্যে একটা আবার হজরতগঞ্জেই—আমার দোকানের কাছেই। দুঃখের বিষয় আমরা ঠিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারিনি। সেটা বোধহয় দোকানের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছেন।'

'আপনাদের ব্যবসা তার মানে ভাল চলছে না ?'

'কী আর বলব, মিঃ মিটার। এটা কম্পিটিশনের যুগ। আমার ছেলেকে যদি দোকানে বসাতে পারতাম তা হলে তার ইয়াং আইডিয়াজ অনেক কাজে দিত। কিন্তু সে ডাক্তারি পাশ করে চলে গেল আমেরিকা। এখন অবশ্য সে সেখানে খুব ভালই রোজগার করছে। আর আমি বুড়ো মানুষ একাই দোকান সামলাচ্ছি। বিক্রি যে একেবারে হয় না তা নয়, আমার কিছু ফেইথফুল কাস্টমারস আছে। কিন্তু আজকাল যুগ অনেক বদলে গেছে। অনেস্টির আর দাম নেই ; লোকে চায় চটক।'

ফেলুদা সহানুভূতি প্রকাশ করে আসল প্রশ্নে চলে গেল।

'কাল যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল, সেটা সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে ?'

'কী আর বলব বলুন। ও হার যখন আমার স্ত্রী না পেয়ে আমার শালী পেল, তখন মার্গারেট একেবারে ভেঙে পড়ে। সি লাভ্‌ড দ্যাট নেকলেস। কার না ভাল লাগবে বলুন—এমন একটা আশ্চর্য সুন্দর প্রাইসলেস জিনিস ?'

'আপনি বলছেন ঈশ্বরের চোখেও এটা একটা অন্যায় বলে মনে হয়েছিল ?'

'তা না হলে প্যামেলার এ ক্ষতি হবে কেন ? শকুন্তলা দেবীর পক্ষপাতিত্ব ভগবানের চোখেও দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু কে এই হারটা নিতে পারে সে বিষয় আপনার কোনও ধারণা আছে ?'

'নো, মিঃ মিটার। সে বিষয় আমি আপনাকে কোনওরকম ভাবে সাহায্য করতে পারব না। আমার কোনও ধারণা নেই।'

'সুনীলা দেবীর ছেলে যে কুপথে যাচ্ছে সেটা আপনি জানেন ?'

'আমি সেটা আন্দাজ করেছি।'

'সে বোধহয় নেশা করে। আর তার জন্য তার প্রায়ই টাকার দরকার হয়।'

সালডানহা চুকচুক্ করে আক্ষেপসূচক শব্দ করলেন। তারপর বললেন, 'দ্যাট মে বি সো। কিন্তু তাই বলে সে তার মা-র এমন একটা সাধের জিনিস চুরি করবে? এটা আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে।'

'কাল ফিল্মটা চলার সময় কাউকে ঘর থেকে বেরোতে দেখেছিলেন?'

'নো। বাট আই স সুকিয়াস কামিং ইন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম।

মিঃ সালডানহার গাড়িতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম যখন, তখন সোয়া ছটা—সাড়ে সন্ধে হয়েছে।

সালডানহার বাড়ি জয়ন্তবাবুর বাড়ির তুলনায় অনেক ছোট। এটাও এক-তলা বাংলো টাইপের বাড়ি। ভেতরে ঢুকে বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। এ বৈঠকখানায় জয়ন্তবাবুর বাড়ির বৈঠকখানার বাহার নেই। বোঝাই যায় সালডানহার অবস্থা তেমন ভাল না। এবং তাঁর গৃহিণীর বাড়ি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার দিকে তেমন ঝোঁক নেই।

'মার্গারেট-- ইউ হ্যাভ ভিজিটরস' বলে একটা হাঁক দিয়ে সালডানহা আমাদের পাশের সোফায় বসে পড়লেন। আমাদের অবিশ্যি পরমুহূর্তেই দাঁড়াতে হল। কারণ ঘরে মিসেস সালডানহা, অর্থাৎ মার্গারেট সুশীলা দেবী, এসে ঢুকেছেন।

'ও—মিঃ মিত্র!'

ভদ্রমহিলার ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দিল। তবে সে হাসি মুখ আলো করা হাসি নয়। কারণ হাসা সত্ত্বেও একটা অবসাদের ভাব মুখে থেকে গেল।

ফেলুদা বলল, 'বসুন, সুশীলা দেবী। আপনি বোধহয় জানেন

না যে জয়ন্তবাবু কালকের চুরির ব্যাপারে আমাকে তদন্ত করতে বলেছেন।'

'সেটা আজ সকালেই আন্দাজ করছিলাম।'

'সেই ব্যাপারেই আমি আপনাকে দু একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

সাল্‌ডান্‌হা এই সময় উঠে পড়ে বললেন, 'আমি আপনাদের জন্য কফি বলছি, আর আমার পোশাকটা বদলে একটু মুখটা ধুয়ে আসছি। ততক্ষণ আপনারা কথা বলুন।'

সাল্‌ডান্‌হা চলে গেলেন ভিতরে।

সুশীলা দেবী বললেন, 'কী প্রশ্ন করবেন করুন।'

'আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন ?'

'পঁয়ত্রিশ বছর।'

'আপনার একটি ছেলে আমেরিকায় আছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ।'

'এ ছাড়া আর কোনও সন্তান আছে ?'

'একটি মেয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে কুলুতে থাকে। তার স্বামীর সেখানে অ্যাপ্‌ল অর্চার্ড আছে।'

'আপনার বোনের চেয়ে আপনি কত বড় ?'

'দু বছরের।'

'তার মানে আপনারা প্রায় পিঠোপিঠি ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার বোনের প্রতি আপনার কীরকম মনোভাব ছিল ?'

'একেবারে ছেলেবয়সে আমরা দুজন ভীষণ বন্ধু ছিলাম। প্যামের আমাকে ছাড়া চলতই না। আমরা দুজনে একসঙ্গে পুতুল খেলতাম, নার্সারি স্কুলে যেতাম, একরকম জামা কাপড় পরতাম।'

'তারপর ?'

'আমার যখন বছর পনেরো বয়স তখন থেকেই আমি বুঝতে পারি যে মা-র টান আমার চেয়ে প্যামের উপর বেশি। তা ছাড়া প্যামের মধ্যে তখন থেকে অনেক গুণের প্রকাশ পেতে থাকে। ও খুব ভাল আবৃত্তি করত, অভিনয় করত, পড়াশুনায় আমার চেয়ে ভাল ছিল, দেখতেও আমার চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

দেখলাম প্যামই মা-র আদরের হয়ে উঠছে। আমার উপরে ভালবাসা কমে যাচ্ছে। অবিশ্যি বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন, কিন্তু মা-র ভালবাসা পেলাম না বলে আমার মনে একটা হিংসার ভাব জেগে ওঠে যেটা আমি তখন কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সব শেষে মা যখন তাঁর হারটা প্যামকে দিয়ে দিলেন তখন আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। এ দুঃখ ভুলতে আমার অনেক সময় লেগেছে।'

'এখন মনে হিংসের ভাব নেই ?'

'না। এক এক সময় ছেলেবেলার কথা মনে হলে জেলাস লাগে। কিন্তু এমনিতে দুজনের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব আছে। কাল তো দেখলেন আমাদের—কী মনে হল ?'

'দিব্যি সদ্ভাব।'

'শুধু তাই না। ওর সম্বন্ধে একটা অনুকম্পার ভাবও বোধ করি।'

'কেন বলুন তো ?'

'কারণ আমার ভগ্নীপতি। তাঁর টাকার টানাটানি যাচ্ছে।'

'তাই বুঝি ?'

'এটা কিন্তু আপনাকে গোপনে বলছি।'

'আপনি আমাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন।'

'আমার ভগ্নীপতি অনেক দেনা করে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে ড্রিঙ্কিং বেড়ে গেছে।'

'কিন্তু কাল ওরকম পার্টি দিলেন ?'

'কী করে দিলেন জানি না। আমি এবং আমার স্বামী নেমন্তন্ন পেয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।'

'হয়তো এর মধ্যে অবস্থার উন্নতি হয়েছে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু আমি দু মাস আগের কথাও জানি। আমার বোন আমার কাছে এসে কান্নাকাটি করেছে। তার উপর ওদের ছেলের গোলমাল তো আছেই। সে ব্যাপার জানেন তো ?'

'শুনেছি।'

'আশা করি আপনার কথাই ঠিক—ওদের অবস্থার উন্নতি

হয়েছে।'

'হারটা কে চুরি করতে পারে সে সম্বন্ধে আপনার কোনও বক্তব্য আছে?'

'একেবারেই না। ওটা আমার কাছে একটা বিরাট রহস্য।'

'প্রসেনজিৎকে আপনার সন্দেহ হয় না?'

'প্রসেনজিৎ?'

ভদ্রমহিলা যেন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'একটা ব্যাপার আছে। ফিল্মটা যখন দেখানো হচ্ছিল তখন প্রসেনজিৎ আমার কাছেই ছিল। ফিল্ম চলা অবস্থায় সে উঠে কোথায় যেন যায়।'

'অন্য কোনও লোককে জায়গা বদলাতে দেখেছিলেন?'

'না। তা ছাড়া আমার দৃষ্টি পর্দার উপর ছিল। প্রায় কুড়ি বছর পরে দেখছিলাম ছবিটা।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সুশীলা দেবী—আমার প্রশ্ন শেষ।'

আমরা কফি খেয়ে উঠে পড়লাম। বাড়ির বাইরে এসে ফেলুদা বলল, 'এবার অ্যালবার্ট রতনলাল। তা হলেই আজকের মতো আমার কাজ শেষ।'

সাল্ডান্হার বাড়ি থেকে আমরা রতনলালের ফ্ল্যাটে গেলাম। অত্যন্ত সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, আর একজনের পক্ষে বেশ বড়। ভদ্রলোক সোফায় বসে একটা হাই-ফাই স্টিরিওতে গজল শুনছিলেন, পরনে একটা বেগুনি ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ। ভদ্রলোক যে আতর ব্যবহার করেন সেটা জানতাম না। ঘরে বেশ ঝাঁঝালো আতরের গন্ধ।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে স্টিরিওটা বন্ধ করে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

ফেলুদা বলল, 'কালকে চুরির ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল। আমরা সকলকেই করেছি।'

'এভরিওয়ান?'

'শুধু মিঃ সুকিয়াসকে বাকি। সেটা কাল করব।'

'আপনার কি ধারণা আমি চুরিটা করে থাকতে পারি?'

'মোটেই না। তবে চোর ধরতে আপনি সাহায্য করতে পারেন।'

'আই অ্যাম নট ইন দ্য লিস্ট বিট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য থেফ্‌ট।'

'এত দামি আর ভাল একটা জিনিস চুরি হল, আর তাতে আপনার ইন্টারেস্ট নেই?'

'মাইসোরের দেওয়া জিনিস তো দামি হবেই, তাতে আশ্চর্যের কী আছে?'

'আপনার মা-র এত সাধের জিনিস ছিল!'

'আমার মা-র ফিল্ম কেরিয়ার সম্বন্ধেও আমার কিছুমাত্র উৎসাহ

নেই। আই থিংক অল ফিল্মস আর রট্‌ন। সাইলেন্ট ফিল্মস তো বটেই।'

'আপনার পেশাটা কী জানতে পারি ?'

'তা পারেন। আমি একটা মার্কেনটাইল ফার্মের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।'

'তা হলে আপনি আর কোনওরকমে সাহায্য করতে পারছেন না আমাদের ?'

'আই অ্যাম ভেরি সরি। আমার কিছু বলার নেই।'

'একটা শেষ প্রশ্ন আছে।'

'কী ?'

'কাল ফিল্মটা চলার সময় আপনি কাউকে জায়গা পরিবর্তন করতে দেখেছিলেন ?'

'আমি তো ফিল্ম দেখছিলাম না। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলাম। আই স মিঃ সুকিয়াস কাম ইন।'

'ধন্যবাদ। আপনি দেখছি আপনার পিতামহের মতো হিন্দি গানের ভক্ত।'

রতনলাল কোনও মন্তব্য না করে আবার স্টিরিওটা চালিয়ে দিলেন। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে ফেলুদা বলল, 'তোরা বরং দিলখুশাটা দেখে আয়। আমার একটু চিন্তা করার আছে, তা ছাড়া দু একটা টেলিফোন করারও আছে। সুকিয়াসের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। ইনস্পেক্টর পাণ্ডেকেও একটা ফোন করব।'

আমরা দুজনে আজ ট্যাক্সির বদলে একটা টাঙ্গা নিয়ে বেরোলাম। লালমোহনবাবুর ভীষণ শখ টাঙ্গা চড়ার কারণ উনি জানেন বাদশাহী আংটির সময় আমরা টাঙ্গা চড়েছিলাম।

টাঙ্গা রওনা হবার পর লালমোহনবাবু বললেন, 'দিলখুশার ইতিহাসটা একটু জেনে নিই।'

আমি বললাম, 'দিলখুশা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নবাব সাদাত আলির তৈরি একটা বাগানবাড়ি ছিল। এর আশেপাশে

হরিণ চরে বেড়াত। এখন শুধু ব্যাপারটার ভগ্নাবশেষ রয়েছে, তবে তার পাশে একটা সুন্দর পার্ক রয়েছে যেখানে লোকে বেড়াতে যায়। দিলখুশার উত্তরে বিখ্যাত লা মার্টিনিয়ার ইস্কুল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্লড মার্টিনের তৈরি। মার্টিন ছিলেন মেজর জেনারেল। দিলখুশা থেকে এই স্কুলটা দেখতে পাবেন।'

টাঙ্গাতে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল—সত্যি, লখ্‌নৌ-এর মতো বাহারের শহর ভারতবর্ষে কমই আছে। লালমোহনবাবু অবশ্য বার বারই বলছেন, 'ইতিহাস চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

দিলখুশার ভগ্নাবশেষ দেখতে বেশি সময় লাগে না। তাই আমরা সে কাজটা শেষ করে পার্কটায় একটু বেড়াতে গেলাম, আর সেখানে গিয়েই একটা বিশ্রী ঘটনায় আমাদের জড়িয়ে পড়তে হল।

প্রথমে মনে হয়েছিল পার্কে কোনও লোকজন নেই। লোক সচরাচর হয় বিকেলের দিকে। আমরা ফুলবাগানের মধ্যে দিয়ে খানিকদূর হাঁটার পর একটা গাছের পিছনে একটা বেঞ্চির খানিকটা অংশ দেখলাম, আর সেই সঙ্গে মানুষের গলার আওয়াজ পেলাম। গাছটা পেরোতেই যে দৃশ্যটা দেখলাম তাতে আমাদের বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

দেখি কী, প্রসেনজিৎ আর দুটি তারই ধাঁচের ছেলে বেঞ্চিতে বসে কী যেন খাচ্ছে। তিনজনেরই চুল উস্‌কো খুস্‌কো আর চোখ ঘোলাটে। ওরা যে নেশা করছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আর এই নেশা বড় সহজ নেশা নয়। এ হল ড্রাগের ব্যাপার, যা খেয়ে মানুষ সম্পূর্ণ হুঁশ হারিয়ে খুন পর্যন্ত করতে পারে।

প্রসেনজিৎ এত মশ্‌গুল ছিল যে সে আমাদের প্রথমে দেখতেই পায়নি। তারপর যখন দেখল তখন তার মুখে এক অদ্ভুত ক্রূর হাসি ফুটে উঠল।

'ডিটেকটিভের চেলাদের দেখছি, ডিটেকটিভ কোথায়?' প্রশ্ন করল সে জড়ানো গলায়।

'তিনি আসেননি', বললেন লালমোহনবাবু।

'আহা, এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেলেন না।'

আমরা চুপ।

'চোর ধরা পড়ল?' বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করল প্রসেনজিৎ।

'এখনও পড়েনি।'

'আমাকেই তো সকলে সন্দেহ করছে, তাই না? কারণ আমার টাকার অভাব। লোকের কাছে ধার চাইতে হয় ঘণ্টাখানেক স্বর্গবাসের জন্য। শুনুন—আই ক্যান টেল ইউ দিস—হার চুরি করার মতো বোকা আমি নই। আমার লাক্ খুলে গেছে। আমি বেশির ভাগ টাকা পাই জুয়া খেলে। মাঝে মাঝে লোকের কাছে ধার করতে হয়, কারণ এ জিনিস একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না। আপনি ধরলে আপনিও আর ছাড়তে পারতেন না, মিস্টার থ্রিলার রাইটার। একবার ট্রাই করে দেখুন না—আপনার লেখা অনেক ইমপ্রুভ করে যাবে। মাথার মধ্যে গল্পের প্লট ভিড় করে আসবে। কী, মিস্টার রাইটার—কী বলেন?'

আমরা দুজনেই নির্বাক। এরকম একটা দৃশ্যের সামনে পড়তে হবে ভাবতেই পারিনি।

'তবে একটা কথা বলে রাখি'—হঠাৎ তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠে খস্‌খসে ধারালো গলায় বলল প্রসেনজিৎ। তারপর তার জীনসের পকেট থেকে একটা ফ্লিক্ নাইফ বার করে খ্যাঁচ করে বোতাম টিপে ফলাটা বার করে সেটা আমাদের দিকে বাড়িয়ে বলল, 'আজকের কথা যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে তা হলে বুঝব সেটা আপনাদের কীর্তি। তখন বুঝবেন এই ছুরির ধার কত। নাউ ক্লিয়ার আউট ফ্রম হিয়ার!'

বেগতিক ব্যাপার। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়, আর কোনও প্রয়োজনও নেই। যা দেখার তা দেখে নিয়েছি, আর এ দৃশ্য শুধু আমরাই দেখেছি, আর কেউ দেখেনি। আমরা দুজনে আবার টাঙ্গা করে হোটেলে ফিরে এলাম। সারা পথ দুজনের মুখে একটিও কথা নেই।

হোটেলে ফিরে দেখি আমাদের ঘরে শীলা বসে আছে, তার হাতে অটোগ্রাফ খাতা। আমাদের দেখে শীলা উঠে পড়ল। বলল, 'আপনার কিছুটা সময় নষ্ট করে গেলাম। এনিওয়ে, সই-এর জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনার ডিটেকশন সফল হবে।'

শীলা চলে গেলে পর লালমোহনবাবুকেই বলতে দিলাম ফেলুদাকে দিলখুশার ঘটনাটা। ফেলুদা সব শুনে বলল, 'আমার ওর চোখের চাহনি দেখেই সন্দেহ হয়েছিল ও ড্রাগ ব্যবহার করে। ও ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

'কিন্তু তা হলে ওই কি কণ্ঠহার চোর?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ফেলুদা কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, 'ভাল কথা, আপনাদের আরেকবার একটু বেরোতে হবে।'

'হোয়াই স্যার?'

'সুকিয়াসের টেলিফোন খারাপ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। আমিই বেরোতাম, কিন্তু শীলা এসে পড়ল। ওঁর বাড়িতে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে। চট করে বেরিয়ে পড়লে এখনও ওঁকে বাড়িতে পাবার চান্স। আমার মাথায় একটা জিনিস দানা বাঁধছে তাই আমি বেরোতে চাচ্ছি না। যা তোপ্‌সে, ট্যাক্সি নিয়ে

বেরিয়ে পড় ।'

লালমোহনবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'জেরা শুনতে শুনতে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল, এবার তবু একটা কাজ পাওয়া গেল ।'

আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। সাত নম্বর লাটুশ রোড বলতেই ট্যাক্সি আমাদের সোজা গন্তব্যস্থলে নিয়ে গেল। আমরা ট্যাক্সিটাকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বললাম।

বেশ বড় একতলা বাড়ি, গেটের গায়ে মার্বল ফলকে লেখা 'এস. সুকিয়াস'। গেট দিয়ে ঢুকে দুদিকে বাগান। তাতে ফুল নানা রকমের। বাগানের মধ্যে দিয়ে পথ গাড়িবারান্দায় পৌঁছেছে। বাড়ির বয়স অন্তত পঞ্চাশ বছর তো হবেই।

আমরা কলিং বেল টিপতে একজন বেয়ারা এসে দরজা খুলে দিল।

লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ সুকিয়াস হ্যায় ?'

'জি হাঁ হুজুর—আপকা সুভনাম ?'

'জারা বোলিয়ে মিঃ মিটারকে পাস সে দো আদমি আয়ে হ্যায় এক মিনিট বাৎচিৎকে লিয়ে।'

হিন্দিতে কটা ভুল হল জানি না, কিন্তু বেয়ারা ব্যাপারটা বুঝে নিল। আমাদের এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে সে ভিতরে চলে গেল।

এক মিনিট পরে যে বেয়ারা বেরিয়ে এল তার চেহারাই পালটে গেছে। দৃষ্টি বিস্ফারিত, হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছে না।

'কেয়া হুয়া ?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'আপলোগ...অন্দর আইয়ে...' কোনওরকমে বলল বেয়ারা। আমরা বেয়ারার পিছন পিছন ভিতরে ঢুকলাম। বেয়ারা সেইভাবেই কাঁপতে কাঁপতে বৈঠকখানা পেরিয়ে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল আমাদের।

ঘরটা হল যাকে বলে স্টাডি। চারিদিকে নানারকম শিল্পদ্রব্য আর বইয়ে ঠাসা আলমারি। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। তার পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ার। সেই চেয়ারে বসে টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন মিঃ সুকিয়াস, পরনে সাদা শার্ট,

তার পিঠ রক্তে লাল। এরকম বীভৎস দৃশ্য আমি কমই দেখেছি।

'কী হরিব্‌ল ব্যাপার!' বললেন লালমোহনবাবু। তারপর বেয়ারার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি শেষ কখন দেখেছ তোমার মনিবকে?'

বেয়ারা আমতা আমতা করে যা বলল তাতে বুঝলাম মিঃ সুকিয়াস সকালে ব্রেকফাস্ট করে এই ঘরে চলে আসেন কাজ করতে। তিনি নিজেই সব করেন, তাঁর সেক্রেটারি নেই, বা বাড়িতে অন্য কোনও লোক নেই। বেয়ারা এই সময়টা প্রয়োজন না হলে তাঁকে ডিসটার্ব করে না। আজও সেই একই নিয়ম মানা হয়েছে।

'সকালে কোনও লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেনি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বেয়ারা মাথা নাড়ল।

'নেহি হুজুর। কোই নেহি আয়া।'

আমি বুঝতেই পারছিলাম যে বাইরে থেকে সামনের দরজা দিয়ে লোক আসার কোনও দরকার নেই, কারণ সুকিয়াসের চেয়ারের পিছনেই হাট করে খোলা একটা জানালা, তাতে শিক নেই। খুনি যে সেই জানালা দিয়েই ঢুকেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

'তোমাদের টেলিফোন তো খারাপ, তাই না?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'হাঁ হুজুর—দো রোজসে খারাপ হ্যায়।'

'কিন্তু—'

আমি বললাম, 'পুলিশের কথা ভুলে গিয়ে চলুন ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে গিয়ে ফেলুদাকে নিয়ে আসি। যা করার ওই করবে।'

'তাই চলো।'

॥ ৮ ॥

আমরা দশ মিনিটে হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

ফেলুদাকে খবরটা দিতেই সে তার খাতাটা ফেলে দিয়ে কোনও কিছু না বলে জ্যাকেটটা চাপিয়ে নিয়ে আমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার ভুরু ভীষণ কুঁচকে গেছে।

সুকিয়াসের বাড়ি পৌঁছে সে প্রথমেই বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ড্রাইভার আছে ?'

'হ্যায় হুজুর, গাড়ি ভি হ্যায় ।'

'ড্রাইভারকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও ।'

ড্রাইভার আসতে ফেলুদা তাকে তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দিতে বলল । ড্রাইভার চলে গেল ।

এবার আমরা গিয়ে স্টাডিতে ঢুকলাম ।

'ছুরি মেরেছে ভদ্রলোককে,' বলল ফেলুদা, 'অস্ত্রটা নিয়ে গেছে ।'

তারপর টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ভদ্রলোক চিঠি লিখছিলেন ।'

সেটা অবশ্য আমিও দেখেছিলাম। ইংরিজি চিঠির বেশ খানিকটা লেখা হয়ে গেছিল যখন ছুরিটা মারে।

'একী—এ যে আমাকেই লেখা চিঠি ?' বলে উঠল ফেলুদা। তারপর বলল, 'যদিও পুলিশ আসার আগে এখানে কিছু নড়চড় করা উচিত না, চিঠিটা যখন আমার তখন সেটার উপর আমার নিশ্চয়ই একটা ক্লেম আছে।'

এই বলে ফেলুদা চিঠিটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে ভাঁজ করে পকেটে পুরে নিল।

তারপর জানালার কাছে গিয়ে বাইরে ঝুঁকে দেখল।

জানালার বাইরে একটা হাত চারেক চওড়া প্যাসেজ, তার পরেই বাড়ির পাঁচিল। সেই পাঁচিল টপকে লোক আসা খুব কঠিন নয়।

'বোঝাই যাচ্ছে খুনটা কোনও ভদ্রলোক করেননি।'

ফেলুদা প্রায় আপনমনেই কথাটা বলল। তারপর বলল, 'যতদূর মনে হয় এ হল লখ্‌নৌইয়া ভাড়াটে গুণ্ডার কাজ। আর এখানে ডাকাতির কোনও প্রশ্ন আসছে না, কারণ এই একটা ঘরেই অন্তত লাখ টাকার জিনিস রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই শয়তানটিকে কিনি এমপ্লয় করেছিলেন ; অর্থাৎ লোকটি কার অ্যাকমপ্লিস ?'

'সেটা অবশ্য মিঃ সুকিয়াসের ব্যক্তিগত ইতিহাস না জানলে বোঝা যাবে না', বললেন লালমোহনবাবু। 'তাই নয় কি ?'

ফেলুদা বলল, 'ভদ্রলোকের বিষয় যে আমরা একেবারেই কিছু জানি না তা নয়। অদ্ভুত লোক ছিলেন সেটা তো জানি। চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়ার সঙ্গে উঁচু দরের শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহ গড়ে তোলা সাধারণ লোকের কম্ম নয়। আমরা ধারণা চিঠিতেও কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।'

'সেটা একবার পড়বেন না ?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'চিঠিটার উপরে "কনফিডেনশিয়াল" লেখা ছিল সেটা বোধহয় আপনি দেখেননি। ওটা পড়ব যথাস্থানে যথা সময়ে। আততায়ীকে সুকিয়াস দেখেছিলেন বলে মনে হয় না। কাজেই তার আইডেনটিটি তো আর চিঠিতে থাকবে না।'

দশ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে গেল। আবার ইনস্পেক্টর পাণ্ডে। ফেলুদার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আপনি তো আমাদের টেক্কা দিয়েছেন দেখছি।'

'তা দিয়েছি, কিন্তু এখন থেকে এ কেসের ভার সম্পূর্ণ আপনাদের উপর। আমি আর এতে নাক গলাতে চাই না, কারণ তাতে কোনও লাভ হবে না। শুধু আততায়ীকে ধরলে পরে আমাকে একটা খবর দেবেন।'

'আপনি তার মানে চললেন ?'

'হাঁ। তবে আপনার সঙ্গে হয়তো দু একদিনের মধ্যেই আবার দেখা হবে। কারণ আমি সেই চুরির মামলাটা মোটামুটি সল্‌ভ করে এনেছি।'

'বলেন কী !'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'আমরা কিন্তু মিঃ বিশ্বাসের ছেলেকে সন্দেহ করছি। আপনিও কি তাই ?'

'সেটা এখনও বলতে পারছি না। আমায় মাপ করবেন।'

'আমরা ডেফিনিট প্রুফ পেয়েছি ও ড্রাগ্‌সের খপ্পরে পড়েছে। ওর পিছনে একজন লোকও লাগিয়ে দিচ্ছি আমরা।'

'ওয়েল, বেস্ট অফ লাক্‌। এবার তো আপনাদের হাতে আরেকটি ক্রাইম পড়ল। আচ্ছা, একটা প্রশ্ন আছে। গুণ্ডা লাগিয়ে খুন সবখানেই সম্ভব এবং সেটা লখ্‌নৌতেও সম্ভব বোধহয়।'

'খুব বেশি মাত্রায়।'

'থ্যাঙ্কস।'

॥ ৯ ॥

কোনও একটা মামলার মাঝখানে ফেলুদাকে এত নিষ্কর্মা হয়ে পড়তে দেখিনি কখনও। আমরা পর পর দুদিন লালমোহনবাবুকে নিয়ে লখ্‌নৌ শহর দেখিয়ে বেড়ালাম। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ফেলুদা, কী ব্যাপার বলো তো ? তুমি এত চুপচাপ বসে আছ কেন ?'

ফেলুদা বলল, 'অর্ধেক মামলার সমাধান হয়ে গেছে। বাকি অর্ধেক পুলিশের সাহায্য ছাড়া হবে না। আমি এর মধ্যে পাণ্ডের কাছ থেকে দুবার ফোন পেয়েছি। মনে হয় পাকা খবর আর দুদিনের মধ্যেই পেয়ে যাব।'

'পুলিশের ব্যাপারটা কি সুকিয়াসের খুনের সঙ্গে জড়িত?'

'ইয়েস', বলল ফেলুদা।

'আর হার চুরি?'

'সেটা নিয়ে আর ভাববার কিছু নেই।'

'আর সুকিয়াসের খুন সম্বন্ধে তোমার কি কোনও ধারণাই নেই?'

'আছে, কিন্তু প্রমাণ চাই। সেই প্রমাণটা পুলিশ গুণ্ডাটাকে ধরতে পারলেই পেয়ে যাব। কে খুন করিয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটা পরিষ্কার ধারণা আছে।'

আরও একটা দিন এই ভাবে কেটে গেল। আমরা ভিক্টরকে নিয়ে মিউজিয়াম দেখিয়ে আনলাম। এখন ভিক্টরের লখনৌ দেখা শেষ বললেই চলে। আমাদের কলকাতায় ফিরতে আর দুদিন বাকি আছে।

দুপুরবেলা ফেলুদা যে ফোনটা আশা করছিল সেটা এল। মিঃ পাণ্ডের কাছ থেকে। কথা বলার পর ওকে জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল, 'কেস খতম। ওরা গুণ্ডাটাকে ধরেছে। শম্ভু সিং বলে একটা পাঞ্জাবি। সে আদালতে দোষ স্বীকার করেছে, আসল লোকটাকে দেখিয়ে দেবে বলেছে। যে ছুরিটা দিয়ে খুনটা করা হয়েছিল সেটাও পাওয়া গেছে।'

'তা হলে এখন কী হবে?'

'রহস্য উদ্‌ঘাটন। আজ সন্ধ্যা সাতটায় জয়ন্ত বিশ্বাসের বাড়িতে।'

এর পর ফেলুদাকে পর পর অনেকগুলো ফোন করতে হল। প্রথমে অবশ্য জয়ন্তবাবুকে। ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'বাকি সবাইকে তা হলে আপনিই খবর দিয়ে দিন। আপনি তো সকলের টেলিফোন নম্বরই জানেন।'

ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে পৌনে সাতটার সময় হেক্টর জয়ন্ত বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। ইনস্পেক্টর পাণ্ডেও এসে পড়লেন সাতটার পাঁচ মিনিট আগে—সঙ্গে দুজন কনস্টেবল, আর আরেকটি লোক যার হাতে হাতকড়া। বুঝলাম সেই হচ্ছে খুনি গুণ্ডা।

সাতটা বেজে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সকলে এসে পড়ল। সকলে বলতে তালিকাটা দিয়ে দিই—জয়ন্তবাবুর বাড়ির পাঁচজন,

সালডানহার বাড়ির দুজন আর রতনলাল ব্যানার্জি। প্রশস্ত বৈঠকখানায় সকলে চেয়ার আর সোফাতে ছড়িয়ে বসলেন। রতনলাল আগেই প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াট ইজ় দিস ফার্স ?' ফেলুদা বলল, 'আপনি এটাকে প্রহসন বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু আর সকলের কাছে ব্যাপারটা বোধহয় খুবই সিরিয়াস।'

'হারটা পাওয়া গেছে কি ?' চাপা স্বরে প্রশ্ন করলেন সুনীলা দেবী।

'যথাসময়েই তার উত্তর পাবেন', বলল ফেলুদা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত সকলের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'রহস্যের সমাধান হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এটা পুলিশের সাহায্য ছাড়া হত না। আমি আপনাদের এখন ঘটনাটা বলতে চাই। আশা করি আপনাদের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন রয়েছে তার জবাবও আমার কথায় পেয়ে যাবেন।'

'আই হোপ খুব বেশি সময় নেবেন না,' বললেন রতনলাল ব্যানার্জি, 'আমার একটা ডিনার আছে।'

'যতটুকু দরকার তার এক মুহূর্ত বেশি নেব না', বলল ফেলুদা।

সবাই চুপ।

'তা হলে এবার শুরু করি ?'

'করুন', বললেন জয়ন্তবাবু।

'গোড়াতেই বলে রাখি যে এখানে দুটো তদন্তের ব্যাপার নিয়ে আমাদের কারবার। এক হল শকুন্তলা দেবীর হার চুরি, আর দ্বিতীয় হল মিঃ সুকিয়াসের মার্ডার।

'এই তদন্তের ব্যাপারে আমি সকলকে জেরা করি। তার মধ্যে সকলেই যে সব সময় সত্যি কথা বলেছেন তা নয়। তাদের মিথ্যে কিছু ধরা পড়েছে অন্যের জেরাতে। কেউ কেউ কিছু কিছু জিনিস লুকোতে চেয়েছেন, কেউ কেউ আবার আমার প্রশ্নের জবাবই দেননি। হারের ব্যাপারে অনেককে সন্দেহ করা চলতে পারত। তার মধ্যে ছিলেন শ্রীমান প্রসেনজিৎ, যিনি ড্রাগের নেশা ধরেছেন এবং সে ড্রাগ কেনার জন্য তাঁর প্রায়ই টাকার দরকার হয়। সে টাকা তিনি এর-ওর কাছ থেকে ধার করেন এবং জুয়া খেলেও জোগাড় করেন। তারপর আরেকজনকে সন্দেহ করা চলতে পারে ; তিনি হলেন সুদর্শন সোম। পরের আশ্রিত তিনি, অভাবী লোক,

হয়তো সে অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি হারটা চুরি করেছিলেন। তা ছাড়া আছেন মিঃ সালডানহা। তাঁর দোকান ভাল চলছে না, তিনি নিজের অবস্থার উন্নতি করার জন্য হারটা চুরি করতে পারেন। এক জনের উপর সন্দেহ করার কোনও কারণ ছিল না, তিনি হলেন জয়ন্তবাবু। কারণ তাঁর জবানিতে তিনি বলেছিলেন যে তাঁর ব্যবসা ভালই চলছে, তাঁর টাকার কোনও অভাব নেই। কিন্তু আরেকজনের জবানিতে আমি শুনি যে তাঁর ব্যবসা মোটেই ভাল যাচ্ছে না, তিনি ফ্রাস্ট্রেশন বশত তাঁর মদের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। অবিশ্যি এই জবানি থেকে কিছু প্রমাণ হয় না, এটা ভুলও হতে পারে।

'এখানে সুকিয়াসের খুনের ব্যাপারে আমাকে আসতে হচ্ছে। তিনি যখন খুন হন তখন একটা চিঠি লিখছিলেন। চিঠিটা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সেটা আমাকে উদ্দেশ করে লেখা। এই চিঠি লেখার কারণ হল—তাঁকে হঠাৎ কানপুর চলে যেতে হচ্ছিল সেই সকালেই, তাই আমাকে তিনি কোয়েশ্চনিং-এর জন্য সময় দিতে পারছিলেন না। কিন্তু কানপুর যাবার আগেই তিনি খুন হন।

'এই চিঠি থেকে আমি দুটো তথ্য জানতে পারি। এক হল এই যে শকুন্তলা দেবীর হারটা অবশেষে জয়ন্তবাবু তাঁকে বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন দু লাখ টাকায়। এই হারটা আর তিনদিনের মধ্যেই সুকিয়াসের হস্তগত হবার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই হারটা চুরি হয়ে যায়।

'দ্বিতীয় তথ্য হল, এই ঘরে সমবেত সকলের মধ্যে একজন আছেন যিনি মিঃ সুকিয়াসের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করেন দেড় মাস আগে। তিনি বলেছিলেন টাকাটা এক মাসের মধ্যে সুদসমেত ফেরত দিয়ে দেবেন, কিন্তু দেননি। সুকিয়াস তাঁকে অনেক অনুরোধ করেও টাকাটা আদায় করতে পারেননি। তখন তিনি বলেন আইনের আশ্রয় নেবেন। এইসব তথ্য আমার জেরায় প্রকাশ পেয়ে যেত বলেই তাঁকে খুন করা হয়। অবিশ্যি যিনি খুনটা করিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে সুকিয়াসের চিঠির কথা জানার কোনও উপায় ছিল না, কারণ খুনের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। যিনি উপস্থিত ছিলেন, অর্থাৎ এই ভদ্রলোকের অ্যাকমপ্লিস, তাকে পুলিশ ধরেছে এবং সে তার অপরাধ স্বীকার করেছে। আর

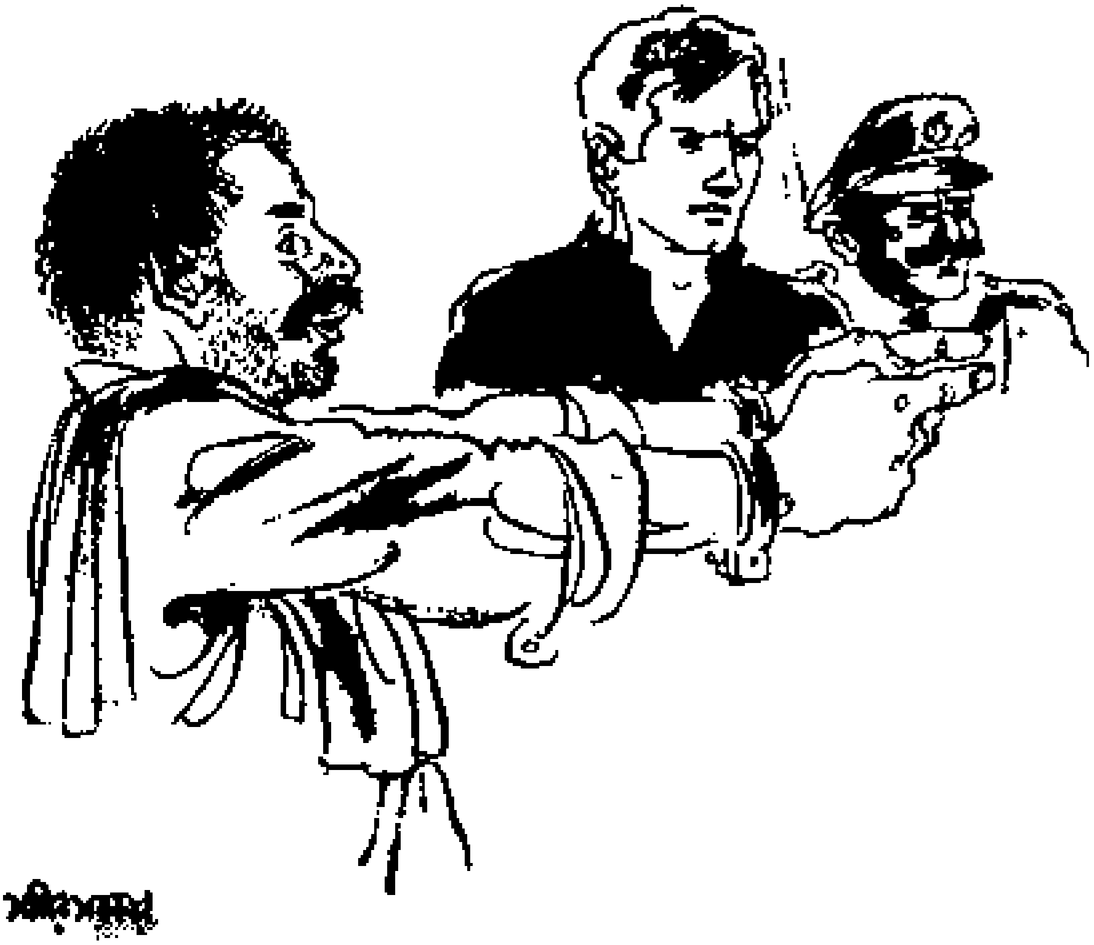

এটাও সে বলেছে যে, যে তাকে এমপ্লয় করেছিল তাকে সে দেখিয়ে দেবে।'

ফেলুদা এবার পাণ্ডের দিকে ফিরল।

'মিঃ পাণ্ডে—আপনি আপনার লোককে আনান তো।'

দুজন কনস্টেবল গিয়ে শম্ভু সিংকে নিয়ে এল।

ফেলুদা বলল, 'তোমাকে যে খুনটা করতে বলেছিল সে লোক কি এখানে রয়েছে?'

শম্ভু সিং এদিক ওদিক দেখে বলল, 'হাঁ হুজুর।'

'তাকে দেখাতে পারবে?'

'ওই যে সেই লোক', বলে একজন বিশেষ ব্যক্তির দিকে শম্ভু সিং তার হাতকড়া পরা দুটো হাত একসঙ্গে তুলে দেখাল।

সকলে অবাক হয়ে দেখল, যে রতনলাল ব্যানার্জির মুখ থেকে তাঁর পাইপটা খসে ঠকাস শব্দে মাটিতে পড়ল।

'হোয়াট ননসেন্স ইজ দিস?' বলে উঠলেন রতনলাল ব্যানার্জি।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ননসেন্সই বলুন, আর ফার্সই বলুন, ইয়োর গেম ইজ আপ, মিঃ ব্যানার্জি।'

সমস্ত ঘরে একটা থমথমে ভাব, তার মধ্যে ফেলুদা কথা বলে চলল।

'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, মিস্টার অ্যালবার্ট রতনলাল ব্যানার্জি। আপনার কীসের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করার প্রয়োজন হয়েছিল সেটা বলবেন কি?'

'আই উইল নট', এখনও তেজের সঙ্গে বললেন রতনলাল।

'তা হলে আমিই বলি', বলল ফেলুদা। 'আপনি যা রোজগার করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি খরচ করতেন। সুকিয়াস লিখেছে আপনি বাঈজিদের পিছনে অঢেল টাকা ঢালতেন। আমরা যেদিন আপনার ঘরে গিয়েছিলাম সেদিন আতরের গন্ধ পেয়েছিলাম। আমার ধারণা আমরা আসার আগে আপনার ঘরে একজন বাঈজি ছিলেন, তাঁকে আপনি ভিতরে পাঠিয়ে দেন। আপনি নিজে আতর ব্যবহার করলে পার্টির দিনেও নিশ্চয়ই করতেন, কিন্তু সেদিন কোনও গন্ধ পাইনি। আমার মনে হয় আপনি আপনার পিতামহের স্বভাব পেয়েছিলেন। তাঁরও শেষ জীবনে অর্থাভাব হয়েছিল। আপনিও সেই একই কারণে সুকিয়াসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।'

'ও মাই গড!' মাথা হেঁট করে রুদ্ধস্বরে বললেন রতনলাল। 'আই অ্যাম ফিনিশড।'

ইনস্পেক্টর পাণ্ডে ও একজন কনস্টেবল তাঁর দিকে এগিয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আমার বক্তব্য অবিশ্যি এখনও শেষ হয়নি। এখনও একটা রহস্য উদ্‌ঘাটন হতে বাকি আছে, সেটা হল শকুন্তলা দেবীর কণ্ঠহার। সেটা জয়ন্তবাবু নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি, কারণ সেটা তার আগেই অন্য একজনের হাতে যায়।'

'কার?' চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সুনীলা দেবী।

'এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই', বলল ফেলুদা। 'একটা ধারণা হয়েছিল যে সেদিন পার্টিতে যখন ফিল্মটা দেখানো হচ্ছিল সেই অন্ধকার অবস্থাতেই বুঝি কেউ গিয়ে হারটা নিয়ে আসে। কিন্তু আসলে ফিল্ম যখন চলে তখন পর্দা থেকে প্রতিফলিত আলোয় ঘর আর সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকে না। আমি সেদিন

প্রোজেক্টরের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার দৃষ্টি শুধু পর্দার দিকে ছিল না। ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে গেলে আমি নিশ্চয় দেখতে পেতাম। কেউ বেরোয়নি। প্রসেনজিৎ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সোফায় বসে আর ছবি চলার মধ্যে সুকিয়াস প্রবেশ করেন। ঘরে আর কোনও নড়াচড়া হয়নি।'

'তা হলে ?' সুনীলা দেবী হতভম্ব।

'তা হলে এই যে ছবি শুরু হবার আগেই হারটা সিন্দুক থেকে বার করে আনা হয়েছিল।'

'সে তো হয়েইছিল,' বললেন সুনীলা দেবী। 'শীলা এনেছিল আপনাকে দেখানোর জন্য এবং শীলাই সেটা আবার তুলে রাখে।'

'না। সেখানেই ভুল। শীলা হারটাকে আর সিন্দুকে তোলেনি। সে সেটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল। এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু কারণটা বুঝিনি। পরে রাত্রে সে সেটাকে একটা ফুলের টবে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখে। এ কথা শীলা নিজে আমাকে বলেছে। এই যে সেই হার।'

ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে হারটা বার করে ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর রাখল। ঘরের সকলের মুখ থেকে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল।

সুনীলা দেবী বললেন, 'কিন্তু...কিন্তু সে এরকম করল কেন ?'

'কারণ সে তার ঘর থেকে আপনার এবং আপনার স্বামীর মধ্যে কথোপকথন শুনে ফেলেছিল। তার শোবার ঘর তো আপনাদের শোবার ঘরের পাশেই এবং মাঝখানের দরজা খোলাই থাকে। মাঝরাত্রে তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন আপনি আপনার স্বামীকে বলছিলেন যে হারটা আপনি সুকিয়াসকে বিক্রি করতে রাজি আছেন। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অবিশ্যি আপনার অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে আপনি রাজি হয়েছিলেন সেটা তো ঠিক। এমন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তাই শীলা হারটা সরিয়ে রেখেছিল, এবং সে এটা করেছিল বলেই আজও হারটা আপনাদের কাছে রয়েছে এবং আশা করা যায় থাকবে। এমন জিনিস হাতছাড়া করাও একটা ক্রাইম।'

★

হোটেলে ফিরে এসে লালমোহনবাবু মাথা চুলকে বললেন, 'মশাই, লাক্‌নাউ মানে তো ভাগ্য এখনই। তা এখানে ভাগ্যটা কার সেটা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ফেলুদা বলল, 'কেন পারছেন না? ভাগ্য আপনার, কারণ আপনি আবার ফেলু মিত্তিরের একটা তারাবাজি দেখতে পেলেন বিনে পয়সায়।'

আমি বললাম, 'তা ছাড়া সুনীলা দেবীদেরই ভাগ্য ভাল যে হারটা তাদেরই রয়ে গেল। থ্যাংকস্ টু মেরি শীলা।'

'যা বলেছ তপেশ ভাই', বললেন লালমোহনবাবু।

'শীলার মতো মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না—তাই না ফেলুবাবু?'

ফেলুদা বলল, 'শকুন্তলা দেবীর হারটা যদি সত্যি করে কেউ কদর করে, সে হল মেরি শীলা বিশ্বাস।'

ফেলুদা রহস্য
লন্ডনে ফেলুদা
সত্যজিৎ রায়

লন্ডনে ফেলুদা

॥ ১ ॥

'টেলিভিশনটা কিনে কোনও লাভ হল না মশাই', বললেন লালমোহনবাবু। 'দেখার মতো কিস্যু থাকে না। রামায়ণ মহাভারত দুটোই দেখতে চেষ্টা করেছি। পাঁচ মিনিটের বেশি স্ট্যান্ড করা যায় না।'

'আপনি যে খেলাধুলোয় ইন্টারেস্টেড নন', বলল ফেলুদা 'তা হলে দেখতেন মাঝে মাঝে বেশ ভাল প্রোগ্রাম থাকে টেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল—কোনওটাই বাদ নেই। যেমন দেশের খেলা, তেমনি বিদেশের খেলা।'

'তবে ওরা আমার একটা গল্প থেকে টি ভি সিরিয়াল করতে চাচ্ছে।'

'বাঃ, এ তো ভাল খবর!'

'ভাল মানে? প্রখর রুদ্র করবে এমন কোনও অ্যাকটর আছে বাংলাদেশে? অথচ ও দেশে দেখুন—সুপারম্যানের জন্য পর্যন্ত লোক পেয়ে গেল। মনে হয় একেবারে বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে।'

আমাদের পাড়ায় কোনও বড় পুজো নেই। তবে একটু দূরেই আছে, সেখান থেকে মাঝে মাঝে লাউডস্পিকারে হিন্দি গান ভেসে আসছে। লালমোহনবাবু তার সঙ্গে গলা মেলাতে চেষ্টা করে পারছেন না; গানটা ভদ্রলোকের একেবারেই আসে না, যদিও বলেন ওঁর দাদামশাই নাকি খান ত্রিশেক ওস্তাদি গান রেকর্ড করেছিলেন।

চা এক প্রস্থ হয়ে গেছে, আরেকবার হবে কি না ভাবছি, এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ পেলাম; আর তার পরেই ডোরবেল।

দরজা খুলে দেখি এক লম্বা চওড়া ধবধবে ফরসা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

'এটা কি প্রদোষ মিত্রের বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—আসুন ভিতরে।' ফেলুদা সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। ধুতি, পাঞ্জাবি আর কাঁধে সাদা চাদর। পায়ে সাদা পাম্প শু। আভিজাত্য ফুটে বেরোচ্ছে সমস্ত শরীর থেকে।

'বসুন', বলল ফেলুদা।

ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে লালমোহনবাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন। 'ইনি আমার বন্ধু লালমোহন গাঙ্গুলী', বলল ফেলুদা। লালমোহনবাবু একটা নমস্কার করলেন, কিন্তু ভদ্রলোক যেন সেটা দেখেও দেখলেন না। পায়ের উপর পা

ভুঁড়ি গিলে করা ধুতির কোঁচটাকে সযত্নে কোলের উপর রেখে বললেন, 'আপনার কথা আমায় বলে পাইকপাড়ার সাধন চক্রবর্তী।'

'ওঁর একটা তদন্তের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম', বলল ফেলুদা।

'ভদ্রলোক আপনার সুখ্যাতি করলেন, তবে ডিটেল কিছু দেননি। আপনি কদ্দিন ধরে 'করছেন এ কাজ?'

'বছর দশেক হল।'

'সিসটেমটা দিশি না বিলিতি?'

'যে কেসে যেমনটা দরকার হয় আর কী।'

'আই সি...'

'আপনার সমস্যাটা কী সেটা যদি বলেন...

'সেটাকে সমস্যা বলা চলে কি না জানি না। সেটা আপনিই বিচার করবেন।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। তারপর তার থেকে সযত্নে একটা ছবি বার করে ফেলুদাকে দিলেন। আমি ফেলুদার কাঁধের উপর দিয়ে দেখলাম ফিকে হয়ে যাওয়া পুরনো একটা ফোটোগ্রাফ, তাতে রয়েছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে দু'জনে প্যান্ট-শার্ট পরা ছেলে। তাদের বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি নয়।

'এর মধ্যে কাউকে চিনছেন কি?' ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

'বাঁ দিকের জন তো আপনি', বলল ফেলুদা।

'হ্যাঁ, ওই একজনকেই আমিও চিনতে পারছি।'

'অন্যটি আপনার বন্ধু অবশ্যই।'

'দেখে তো তাই মনে হয়, তবে ওর পরিচয় ধরতে পারিনি। ছবিটা আমি সম্প্রতি পেয়েছি। একটা দেরাজের কাগজপত্রের তলায় ছিল। আপনাকে আমি একটিমাত্র কাজ দিতে এসেছি। ভেবে দেখুন সেটা নেবেন কি না।'

'কী কাজ?'

'আমার সঙ্গে ওই ছেলেটি কে সেটা আমার জানা চাই। এর পরিচয় আপনাকে অনুসন্ধান করে উদ্ঘাটন করতে হবে। ও কোথায় আছে, কী করে, আমার সঙ্গে পরিচয় হল কবে, কী করে—সে সব আমার জানা চাই। সেটা করলেই আপনার কাজ শেষ। এর জন্য আপনার পুরো পারিশ্রমিক আমি দেব।'

'আমার আগে জানা দরকার, আপনি নিজে কোনও খোঁজ করেছেন কি না।'

'ক্লাবে আমার স্কুল-কলেজের কয়েকজন সহপাঠী আছে, আমি তাদের দেখিয়েছি। তারা কেউ চিনতে পারেনি। আপনি লক্ষ করবেন ছেলেটি বাঙালি কি না তাও বোঝা শক্ত।'

'চুলটা তো কালো, তবে চোখ দুটো যেন একটু কটা। আপনার সাহেব বন্ধু ছিল কখনও?'

'আমি ইংল্যান্ডে চার বছর স্কুলে আর এক বছর কলেজে পড়ি। বাবা ওখানে ডাক্তারি করতে গিয়েছিলেন। তারপর অবিশ্যি আমরা সবাই দেশে ফিরে আসি। ফিরে আসার আগে ইংল্যান্ডের কোনও কথা আমার মনে নেই, কারণ ওখানে থাকতে বাইসিক্‌ল থেকে পড়ে গিয়ে আমার স্কাল ফ্র্যাকচার হয়ে যায়। তার ফলে পাঁচ-সাত বছরের স্মৃতি আমার মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে।'

'কোন স্কুল আর কলেজে পড়েছিলেন সেটা মনে নেই?'

'বাবা বলেছিলেন। সে-ও অনেক বছর আগে। কলেজ বোধ হয় কেমব্রিজ। স্কুলের নাম মনে নেই।'

'স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য কোনও ওষুধ-টষুধ খাচ্ছেন না?'

'অ্যালোপ্যাথিক খেয়েছি। তাতে কোনও কাজ হয়নি। এখন একটা কবিরাজি ওষুধ খাচ্ছি।'

'ইংল্যান্ড থেকে ফিরে কী হয়?'

'সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি হই। বাবাই সব ব্যবস্থা করে দেন, কারণ তখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি।'

'সেটা কোন বছর?'

'ফিফটি টু। ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই।'

'হুঁ...।'

ফেলুদা ছবিটা হাতে নিয়ে মিনিটখানেক ভাবল। তারপর প্রশ্ন করল, 'আপনার কি মনে হয় এই ছেলের সঙ্গে কোনও একটা বিশেষ ঘটনা জড়িয়ে আছে?'

'সেরকম মনে হয়েছে। এক-এক সময় আবছা আবছা স্মৃতি ফিরে আসে, আর তখন যেন এসে দেখতে পাই। কিন্তু এর পরিচয় অজানাই থেকে যায়। অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার। যার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব ছিল সে কে, সে এখন কোথায় আছে, কী করে, আমাকে মনে রেখেছে কি না, এ সব জানার জন্য প্রবল কৌতূহল হয়। কাজটা সহজ না বুঝতে পারছি, কিন্তু সেই কারণেই হয়তো আপনি ইন্টারেস্টেড হতে পারেন।'

'ঠিক আছে। কাজটা আমি নিচ্ছি। তবে এতে কত সময় লাগবে তা আমি বলতে পারছি না। আর ধরুন যদি বিলেত যেতে হয়?'

'তা হলে আপনার এবং আপনার অ্যাসিস্ট্যান্টের প্লেন ভাড়া আমি দেব, ওখানে হোটেলে থাকার খরচ আমি দেব, যে পাঁচশো ডলার আপনাদের প্রাপ্য তার টাকাটা আমি দেব। বুঝতেই পারছেন আমি এর পরিচয় পাবার জন্য কতটা আগ্রহী।'

'আপনার বাবা কি—?'

'মারা গেছেন। বিলেত থেকে ফেরার পাঁচ বছরের মধ্যেই মা-ও মারা গেছেন দশ বছর হল। আমার স্ত্রী বর্তমান। একটিই সন্তান আছে—আমার মেয়ে। সে বিয়ে করে দিল্লিতে রয়েছে। স্বামী আই. এ. এস.। এই হল আমার কার্ড। এতে আমার নাম ঠিকানা ফোন নম্বর সবই পাবেন।'

কার্ডটা দেখলাম। নাম-রঞ্জন কে. মজুমদার; ঠিকানা—১৩ রোল্যান্ড রোড; ফোন—২৮-৭৪০১।

ফেলুদা বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ রাখব। কোনও প্রয়োজন হলে আশা করি আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব।'

ভদ্রলোক উঠে পড়ে বললেন, 'ছবিটা তা হলে আপনার কাছেই রইল।'

'হ্যাঁ। ওটার একটা কপি করে ওরিজিনালটা আপনাকে ফেরত দিয়ে দেব। ভাল কথা—আপনি কী করেন সেটা তো জানা হল না।'

'সরি। আমারই বলা উচিত ছিল আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বি. কম পাশ করি সেন্ট জেভিয়ার্স থেকেই। লী অ্যান্ড ওয়াটকিনস্ হচ্ছে আমার আফিসের নাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আমি তা হলে। গুড ডে।'

'অভিনব মামলা', ভদ্রলোকের গাড়ি চলে যাবার পর বললেন লালমোহনবাবু।

'সে বিষয়ে সন্দেহ নেই', বলল ফেলুদা। 'এমন কেস আর পেয়েছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'একবার ছবিটা দেখতে পারি কি?'

ফেলুদা ছবিটা জটায়ুকে দিল। ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে সেটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'সাহেব না ইন্ডিয়ান তা বোঝার কোনও উপায় নেই। এ কেস আপনি কীভাবে কন্ডাক্ট করবেন তা আমার মাথায় আসছে না।'

'আপনার মাথার প্রয়োজন নেই। ফেলু মিত্তিরের মাথায় এলেই হল।'

॥ ২ ॥

ফেলুদার একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মক্কেল ছিল, নাম ধরণী মুখার্জি। ফেলুদা টেলিফোনে তার সঙ্গেই যোগাযোগ করল। ভদ্রলোক বললেন, রঞ্জন মজুমদারকে খুব ভাল করে চেনেন, কারণ দু'জনেই স্যাটার্ডে ক্লাবের মেম্বার। রঞ্জনবাবু কীরকম লোক জিজ্ঞেস করাতে ধরণীবাবু বললেন যে, তিনি একটু চাপা ধরনের লোক, বিশেষ মিশুকে নন, বেশিরভাগ সময় ক্লাবে চুপচাপ একা বসে থাকেন। ড্রিংক করেন—তবে মাত্রাতিরিক্ত নয়। রঞ্জনবাবু যে ছেলেবেলায় কিছুকাল বিলেতে ছিলেন সে কথাও ধরণীবাবু জানেন, কিন্তু তার বাইরে আর কিছুই বিশেষ জানেন না।

১৯৫২-তে সেন্ট জেভিয়ার্সে ইন্টারমিডিয়েটে কে কে ছাত্র ছিল তার হদিস পেতে ফেলুদার বিশেষ বেগ পেতে হল না। সেই ছাত্রদের তালিকায় খুব ভাল করে চোখ বুলিয়ে ফেলুদা বলল, 'এর মধ্যে একজনের নাম চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যদ্দুর মনে হয় ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি করেন।' বাড়ি ফিরে এসে বলল, 'তোপসে, ডাক্তার হীরেন বসাকের নামটা ডিরেক্টরিতে বার করে ভদ্রলোকের টেলিফোন নাম্বারটা আমায় দে তো।'

আমি দু' মিনিটে কাজটা সেরে দিলাম। ফেলুদা সেই নম্বরে ফোন করে

একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইল। ডাক্তার ফেলুদার নাম শুনেই হয়তো পরদিন সকালেই সময় দিয়ে দিলেন—সাড়ে এগারোটা।

কেস কেমন যাচ্ছে খবর নিতে পরদিন সকালে লালমোহনবাবু এসেছিলেন আমরা তাঁর গাড়িতে ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম।

ওয়েটিং রুমে ভিড় দেখেই বোঝা যায় ডাক্তারের পসার ভাল। ডাক্তারের সহকারী 'আসুন, আসুন' বলে ফেলুদাকে একেবারে আসল ঘরে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল; পিছন পিছন অবশ্য আমরা দু'জনও ঢুকলাম।

ডাক্তার বসাক ফেলুদাকে দেখে হাসিমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'কী ব্যাপার? আপনার তো বড় একটা ব্যারাম-ট্যারাম হয় না।'

'ব্যারাম না', ফেলুদা হেসে বলল। 'একটা তদন্তের ব্যাপারে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে এসেছি।'

'কী প্রশ্ন?'

'আপনি কি সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র ছিলেন?'

'হ্যাঁ, তা ছিলাম।'

'আমার আসল প্রশ্নটা হল—এই দুটি ছেলেকে কি চিনতে পারছেন?'

ফেলুদা পকেট থেকে সেলোফেনে মোড়া ছবিটা বার করে ডাক্তার বসাকের হাতে দিল। এক দিনের মধ্যেই ছবিটার কপি করিয়ে নিয়ে আসল ছবিটা ফেলুদা রঞ্জনবাবুকে ফেরত দিয়ে এসেছে। ডাক্তার ভুরু কুঁচকে ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'এদের মধ্যে একজন তো মনে হয় আমাদের সঙ্গে পড়ত। রঞ্জন। হ্যাঁ, রঞ্জনই তো নাম।'

'আমি বিশেষ করে অন্যজনের সম্বন্ধে জানতে চাইছি।'

ডাক্তার ছবিটা ফেরত দিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, 'অন্যটিকে কস্মিনকালেও দেখিনি আমি।'

'আপনাদের সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ত না?'

'ডেফিনিটলি না।'

ফেলুদা ছবিটা আবার সেলোফেনে মুড়ে পকেটে রেখে দিল।

'আপনি তা হলে বলছেন আপনার ক্লাসের অন্য ছেলেদের জিজ্ঞেস করেও খুব একটা লাভ নেই?'

'আমার তো মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট।'

'তাও, আপনি একটা কাজ করে দিলে আমি খুব উপকৃত হব।'

'কী?' ফেলুদা পকেট থেকে সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্রদের তালিকাটা বার করে ডাক্তার বসাককে দেখাল।

'এর মধ্যে থেকে সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্রদের তালিকাটা বার করে ডাক্তার বসাককে দেখাল।

'এর মধ্যে কারুর বর্তমান খবর জানেন?'

আমি বুঝলাম ফেলুদা সহজে ছাড়বে না।

ডাক্তার তালিকাটা উপর চোখ বুলিয়ে বললেন, 'একজনের খবর জানি। জ্যোতির্ময় সেন। ইনিও ডাক্তার, তবে অ্যালোপ্যাথ।'

'কোথায় থাকেন বলতে পারেন?'

'হেস্টিংস। ঠিকানাটাও আপনি টেলিফোনের-বইয়েতেই পেয়ে যাবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

গাড়িতে উঠে লালমোহনবাবু বললেন, 'স্কুল-কলেজের বাইরেও তো বন্ধু হয় মশাই। অ্যাট প্রেজেন্ট আমার যে ক'জন বন্ধু আছে তাদের কেউই আমার সহপাঠী ছিল না।'

'এটা ঠিকই বলছেন', বলল ফেলুদা। 'আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজে ছবি দিয়ে এনকোয়ারি করতে হবে। তবে আগে এই হেস্টিংসের ডাক্তারকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক।'

জ্যোতির্ময় সেন আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন তিন দিন পরে, সকাল সাড়ে ন'টায় ফেলুদার নাম শুনেছেন, যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বললেন, আর বললেন উনি দশটায় চেম্বারে যান, তার আগেই আমাদের সঙ্গে কাজটা সেরে নিতে চান। ফেলুদা বলল, 'আর এটাও জানিয়ে রাখি যে এর সঙ্গে ব্যারামের কোনও সম্পর্ক নেই; ব্যাপারটা আমার একটা তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।'

লালমোহনবাবুও অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা জেনে নিয়েছিলেন; তাঁর

গাড়িতেই আমরা শুক্রবার সকালে ঠিক সাড়ে ন'টায় হেস্টিংসে জ্যোতির্ময় সেনের বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

এঁর পসার যে ভাল সেটা বাড়ি দেখেই বোঝা যায়। বেয়ারা এসে সেলাম ঠুকে আমাদের বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বলল, 'ডাক্তারবাবু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছেন।'

লালমোহনবাবু গলা নামিয়ে ফেলুদাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কার বিষয় জানতে চাইবেন—রঞ্জন মজুমদার, না ছবির অন্য ছেলেটি?'

ফেলুদা বলল, 'রঞ্জন মজুমদার লোকটাকে একটু ভাল করে জানা দরকার। এখন পর্যন্ত খুবই সামান্য জানি। তাঁর বন্ধুর বিষয় এই ডাক্তার কিছু বলতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

ফেলুদার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোতির্ময়বাবু এসে গেলেন।

'আপনি তো প্রদোষ মিত্র', বললেন ভদ্রলোক সোফায় বসে। 'অবিশ্যি ফেলুদা নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। ইনি তো তোপসে, বুঝতেই পারছি, আর ইনি নিশ্চয়ই জটায়ু আপনার তদন্তের সব কাহিনী আমার বাড়ির ছেলে বুড়ো সবাই পড়ে, তাই আপনাকে একরকম আত্মীয় বলেই মনে হয়। বলুন, কী প্রয়োজন আপনার।'

'এই ছবির দু'জনের একজনকেও চেনেন?'

'এ তো দেখছি রঞ্জন মজুমদার। পরিষ্কার মনে পড়ছে এ চেহারা। এই দ্বিতীয় ছেলেটাকে চিনলাম না।'

'কলেজে আপনাদের ক্লাসে ছিল না?'

'উঁহু—তা হলে মনে থাকত।'

'তা হলে এই রঞ্জন মজুমদার সম্বন্ধে দু-একটা প্রশ্ন করব।'

'কলেজে রঞ্জন আমার ইন্টিমেট বন্ধু ছিল। আমরা দু'জনে এক বেঞ্চে বসতাম, একসঙ্গে সিনেমা দেখতাম। ও আমার হয়ে প্রক্সি দিত, আমি ওর হয়ে দিতাম। অবিশ্যি এখন ওর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই।'

'কীরকম ছেলে ছিলেন তিনি? অর্থাৎ, মানুষ হিসেবে কীরকম?'

জ্যোতির্ময় সেন ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'একটু খ্যাপাটে গোছের অবিশ্যি সেটা আমি মাইন্ড করতাম না।'

'খ্যাপাটে কেন বলছেন?'

'কারণ ওই বয়সে অত স্ট্রং ন্যাশনালিস্ট ফিলিং আমি কারুর মধ্যে দেখিনি। এটা মনে হয় ওর ঠাকুরদাদার কাছ থেকে পাওয়া। রঘুনাথ মজুমদার। ইয়াং বয়সে টেররিস্ট দলে ছিলেন, বোমা-টোমা তৈরি করতেন। রঞ্জনের বাবার মধ্যেও বোধ হয় এ জিনিসটা ছিল। বিলেতে ডাক্তারি করতেন। কোন এক সাহেবের সঙ্গে বনেনি বলে আবার দেশে ফিরে আসেন।'

'বিলেতে থাকার সময় রঞ্জনবাবু তো ওখানকার স্কুলে পড়তেন।'

'তা পড়ত হয়তো, কিন্তু সে সম্বন্ধে ও নিজে কিছুই বলেনি। ওর তো ওখানে একটা বিশ্রী অ্যাক্সিডেন্ট হয়—সে বিষয় জানেন বোধ হয়?'

'হ্যাঁ। উনি নিজেই বলেছিলেন।'

'তার ফলে ও পাঁচ-সাত বছরের ঘটনা একদম ভুলে যায়। অর্থাৎ বিলেতের সব ঘটনাই ওর মন থেকে লোপ পেয়ে যায়।'

'তা হলে ওখানে কার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল না-হয়েছিল সেটাও জানবার কোনও উপায় নেই?'

'না। যদি না ঘটনাচক্রে স্মৃতি আবার ফিরে আসে। তবে এটা বলে রাখি—রঞ্জন খুব সাধারণ ছেলে ছিল না। অসুখে ওর কী ক্ষতি করেছিল জানি না—বা ইংল্যান্ডের ছাত্র অবস্থা ওর কীরকমভাবে কেটেছে জানি না, কিন্তু ওর মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব ছিল যেটা ওই বয়সেও বোঝা যেত।'

পরদিন সকালে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমি আর ফেলুদা রঞ্জন মজুমদারের বাড়ি গেলাম। 'কদ্দুর এগোলেন?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'এই ছেলেটি যে কলকাতায় আপনার সহপাঠী ছিল না সেটা জানতে পেরেছি। এবার একটা স্টেপ নেব ভাবছি যেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই এবং আপনার অনুমতি চাই।'

'কী স্টেপ?'

'এই ছবি থেকে অচেনা ছেলের ছবিটা খবরের কাগজে ছাপতে চাই—একটা বিজ্ঞাপনে। কলকাতা আর দিল্লির কাগজে দিলেই হবে।'

ভদ্রলোক একটু ভেবে বললেন, 'আমার নামের কোনও উল্লেখ থাকবে না তো?'

'মোটেই না', বলল ফেলুদা 'আমি শুধু জানতে চাই এই ছেলের পরিচয় কেউ জানে কি না। যদি জানে তা হলে আমার সঙ্গে যেন যোগাযোগ করে। আমার নাম-ঠিকানা থাকবে।'

'ঠিক আছে। আপনার ইনভেস্টিগেশনের জন্য যা যা করার দরকার সে তো আপনাকে করতে হবে। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

॥ ৩ ॥

পাঁচ দিন পরে রবিবারের কলকাতা আর দিল্লির স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপনটা বেরোল।

প্রথম দিন কোনও ফলাফল নেই, কেউ যোগাযোগ করল না।

'বোঝাই যাচ্ছে কলকাতার কেউ নয়; তা হলে এর মধ্যে টেলিফোন এসে যেত', বলল ফেলুদা।

বুধবার সকালে ফেলুদার একটা ফোন এল। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে। জন

ডেক্সটার বলে একজন টুরিস্ট। তিনি একটা অস্ট্রেলিয়ান দলের সঙ্গে ভারতবর্ষ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, দিল্লিতে এসে আচমকা কাগজে ছবিটা দেখেই স্থির করেছিলেন কলকাতায় এসে ফেলুদার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। বললেন আজই বিকেলে কাঠমাণ্ডু চলে যাচ্ছেন, দুপুর একটা নাগাদ আমাদের বাড়ি আসতে পারেন।

ফেলুদা অবশ্যই হ্যাঁ বলল। সে বেশ উত্তেজিত। বিজ্ঞাপনের যে কোনও ফল হবে সেটা ও আশা করেনি।

একটার কাছাকাছি একটা ট্যাক্সি এসে আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। ফেলুদা দরজা খুলল। ট্যাক্সি থেকে নেমে এক বছর পঞ্চাশের সাহেব ফেলুদার দিকে এগিয়ে এল।

'মিস্টার মিটার?'

'ইয়েস—প্লিজ কাম ইন।'

ভদ্রলোক ভিতরে এসে ঢুকলেন। গায়ের চামড়া রোদে পুড়ে একটা বাদামি রঙে এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝাই যায় ভদ্রলোক বেশ কিছু দিন হল ভারত দর্শন করে বেড়াচ্ছেন।

ভদ্রলোক বসার পরে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাগজের ছবিটা দেখেছেন?'

'সেটা দেখেছি বলেই তো আসছি। অ্যাদ্দিন পরে আমার খুড়তুতো ভাই পিটার ডেক্সটরের ছবি কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখে অবাক লাগল।'

'এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিত যে এটা আপনার খুড়তুতো ভাইয়ের ছবি?'

'হ্যাঁ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমি খুব অল্প বয়সে অস্ট্রেলিয়া চলে যাই। তারপরে আর পিটারের খবর রাখিনি। ইন ফ্যাক্ট, আমার ফ্যামিলির সঙ্গেও আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই ওরা এখন কে কী অবস্থায় আছে তা বলতে পারব না। এইটুকু মনে আছে যে পিটারের বাবা—আমার কাকা—মাইকেল ডেক্সটার ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন। আমার মনে হয় ইনডিপেনডেন্সের পরে উনি আবার দেশে ফিরে যান।'

'পিটারই কি ওঁর একমাত্র ছেলে ছিল?'

'ওঃ নো। সবসুদ্ধ সাতজন সন্তান ছিল মাইকেল ডেক্সটারের। পিটার ছিল ষষ্ঠ। বড় ছেলে জর্জও ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিল।'

'মাইকেল ডেক্সটার বিলেতে কোথায় থাকতেন?'

'কাউন্টিটা মনে আছে। নরফোক। শহরের নাম মনে নেই।'

'এতেও অনেক কাজ হল।'

জন ডেক্সটার উঠে পড়লেন। তাঁকে হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খেতে হবে—তাঁর দলের লোক সব অপেক্ষা করছে। ফেলুদা ভদ্রলোককে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

পরদিন আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আমরা রঞ্জন মজুমদারের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

'বিজ্ঞাপনের কোনও ফল পেলেন?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

'সেইটে জানাতেই আপনার কাছে আসা', বলল ফেলুদা। 'ছেলেটি ব্রিটিশ, নাম পিটার ডেক্সটার।'

'কী করে জানলেন।'

ফেলুদা জন ডেক্সটারের ঘটনাটা বলল।

রঞ্জনবাবু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বিড়বিড় করে দু'বার বললেন, 'পিটার ডেক্সটার...পিটার ডেক্সটার...'

'কিছু মনে পড়ছে কি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আবছা আবছা। একটা দুর্ঘটনা...না, এই স্মৃতির ওপর নির্ভর করা চলে না।'

'আপনি যে-সময়ের কথা ভুলে গেছেন, সেই সময়ের ঘটনা কি মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়?'

'যা মনে পড়ে সেটা সত্যি কি না কী করে বিচার করব? এমন তো কেউ নেই যাকে জিজ্ঞেস করে যাচাই করতে পারি। বাবা-মা দু'জনেই মারা গেছেন। আমার বিলেতের ঘটনা ওঁরাই জানতেন।'

'একটা জিনিস বোধ হয় বুঝতে পারছেন, যে কলকাতায় বসে এই পিটার ডেক্সটার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যাবে না।'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ...তা তো বুঝতেই পারছি...'

ভদ্রলোক আবার অন্যমনস্ক।

'না কি ব্যাপারটা এখানেই ইতি দেবেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠলেন।

'মোটেই না—মোটেই না।' হাঁটুর চাপড় মেরে বললেন রঞ্জন মজুমদার। 'সে কোথায় আছে, কী করছে, আমাকে মনে আছে কি না—সব আমি জানতে চাই। আপনি কবে যেতে পারবেন?'

হঠাৎ এই প্রশ্নে যেন ফেলুদা একটু হকচকিয়ে গেল। বলল, 'কোথায়?'

'লন্ডন—আবার কোথায়? লন্ডন তো আপনাকে যেতেই হবে।'

'হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি।'

'কবে যাবেন?'

'আমার তো অন্য কোনও কাজ নেই। এটাই একমাত্র কেস।'

'আপনাদের পাসপোর্ট-টাসপোর্ট হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমরা কয়েক বছর আগে হংকং যাই; তখনই করিয়ে নিয়েছিলাম।'

'তা হলে আর কী—বেরিয়ে পড়ুন। আমি টিকিটের ব্যবস্থা করছি।'

'আমাদের সঙ্গে এক বন্ধু যাবেন—নিজের খরচে অবশ্য।'

'ঠিক আছে—তাঁর নাম আমার সেক্রেটারি পশুপতিকে দিয়ে দেবেন। পশুপতিই আমার ট্রাভেল এজেন্টের থ্রু দিয়ে আপনাদের যাবার এবং ওখানে থাকার সব ব্যবস্থা করে দেবে। তা ছাড়া ফরেন এক্সচেঞ্জের ব্যাপারটা তো আছে; সেটাও ও করে দেবে।'

'ওখানে কদ্দিন থাকা?'

রঞ্জনবাবু একটু ভেবে বললেন, 'সাত দিনে যদি হল তো হল, না হলে চলে আসবেন। আমি রিটার্ন বুকিংটাও সেইভাবেই করব।'

'আমি যদি সাকসেসফুল না হই, তা হলে কিন্তু আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে প্রস্তুত নই।'

'আপনি কোনও কেসে বিফল হয়েছেন?'

'তা হইনি।'

'তা হলে এটাতেও হবেন না।'

॥ ৪ ॥

'ইউ. কে!'

লালমোহনবাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ফেলুদা ভদ্রলোককে কলকাতার ঘটনা সব বলে দিয়ে তারপর লন্ডনের ব্যাপারটা বলল। ভদ্রলোক এটার জন্য একেবারেই তৈরি ছিলেন না।

'আপনি গেলে কিন্তু আপনার নিজের খরচে যেতে হবে। আমাদের খরচ মিস্টার মজুমদার দিচ্ছেন।'

'কুছ পরোয়া নেহি। খরচের ভয় আমাকে দেখাবেন না, মিস্টার হোমস। আপনার পসার বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও আমার রোজগার আপনার চেয়ে বেশি। শুধু বলে দিন কী করতে হবে।'

'দিন সাতেকের মতো গরম কাপড় নেবেন। পাসপোর্টটা হারাননি তো?'

'নো স্যার—কেয়ারফুলি কেপ্ট ইন মাই অ্যালমাইরা।'

'তা হলে আর আপনার করণীয় কিছু নেই। যাবার তারিখটা যথাসময়ে জানতে পারবেন। যদ্দূর মনে হয়—এখান থেকে বম্বে, বম্বে থেকে লন্ডন।'

'ওখানে থাকছি কোথায়?'

'সেটা রঞ্জনবাবুর ট্রাভেল এজেন্ট ব্যবস্থা করবে। একটা থ্রি-স্টার হোটেল হবে আর কী।'

'হোয়াই ওনলি থ্রি স্টারস?'

'তার চেয়ে বেশি চড়তে গেলে মজুমদার মশায়ের পকেট ফাঁক হয়ে যাবে। লন্ডনের খরচ সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে আপনার?'

'তা অবিশ্যি নেই; তবে একটা কথা বলে রাখি—গড়পারে এক ভদ্রলোক থাকেন, আমার খুব চেনা। চন্দ্রশেখর বোস। ব্যবসাদার। বছরে দু'বার করে বিলেত যান। তাঁর কাছ থেকে কিছু ডলার ম্যানেজ করব—কী বলেন?'

'ব্যাপারটা কিন্তু বেআইনি। অতএব নীতিবিরুদ্ধ।'

'আরে মশাই আপনি অত সাধুগিরি করবেন না তো। আজকাল নীতির ডেফিনিশন চেঞ্জ করে গেছে।'

'ঠিক আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার কারচুপিতে সায় দিচ্ছি।'

আমাদের মঙ্গলবারে এয়ার ইন্ডিয়াতে যাওয়া ঠিক হল। প্লেন ছাড়বে রাত তিনটেয়, তারপর বম্বে হয়ে লন্ডন পৌঁছাবে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটায়। হোটেলের ফেলুদা বলল, 'খুব ভাল লোকেশন। একেবারে শহরের মাঝখানে।' ফেলুদা ক'দিন থেকে লন্ডন সংক্রান্ত গাইড বুকে ডুবে আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শহরের ম্যাপ দেখছে।

যাবার আগের দিন মিস্টার মজুমদারকে ফোন করা হল। মিনিট দুয়েক কথা বলে ফোন নামিয়ে রেখে ফেলুদা বলল, 'জানতে চেয়েছিলেন ওঁর বাবা কোনও হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না। বললেন ওঁর মনে নেই। ওঁরা কোথায় থাকতেন জিজ্ঞেস করাতেও একই উত্তর পেলাম। বললেন ওঁর বাবা ওঁকে বলেছিলেন কিন্তু এখন আর মনে নেই। আমার মনে হয় অ্যাকসিডেন্টটা ওঁর স্মৃতিশক্তিকেই দুর্বল করে দিয়েছে। লন্ডনে আমার কলেজের এক সহপাঠী আছে, সে-ও ডাক্তার। দেখব ওর কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যায় কি না।'

দেখতে দেখতে যাবার দিন চলে এল। ফেলুদার দৌলতে কত জায়গাই

না দেখলাম, কিন্তু লন্ডন যাওয়া হবে এটা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। লালমোহনবাবু বললেন, 'বিলেত আজকাল রাম শ্যাম যদু মধু সকলেই যাচ্ছে, সেই ভেবে মনটাকে একটু ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করছিলাম—ও মা, কাল রাত্তিরে দেখি পাউন্ড রেট বেড়ে একশো দশে উঠেছে। এমনিতে আশির বেশি কদাচিৎ ওঠে।'

এখানে বলে রাখি, লালমোহনবাবু তাঁর গড়পারের বন্ধুর কাছ থেকে বেশ কিছু ডলার ম্যানেজ করেছেন।

ফেলুদাকে ক'দিন থেকে একটু চুপচাপ দেখছি, যদিও কাজ যা করার সবই করছে। কেসটা যে সহজ নয় সেটাই বোধ হয় মাথার মধ্যে ঘুরছে। আমি তো কল্পনাই করতে পারছি না ও কীভাবে এগোবে। তথ্য এত কম। তার ওপরে রঞ্জনবাবুর স্মৃতিলোপ। যে ক'টা বছর ওই ছেলেটির সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব ছিল, সেই ক'টা বছরের কথাই উনি ভুলে বসে আছেন। লালমোহনবাবু সোজাসুজি বললেন, 'আপনি অনেক রহস্যের সমাধান করেছেন, কিন্তু এটার মতো কঠিন কেস আর কখনও আপনার হাতে এসেছে বলে তো মনে হয় না। আপনি যে কেসটা কেন নিলেন তা বুঝতে পারছি না।'

'এটা নিলাম বলেই কিন্তু আপনার বিলেত যাওয়া হচ্ছে।'

'তা বটে, তা বটে।'

যাবার দিন এবং তারপর যাবার সময়ও এসে পড়ল। লালমোহনবাবুর গাড়িতেই এয়ারপোর্ট গেলাম। ভদ্রলোক পুরোদস্তুর সাহেব সেজেছেন। এই টাইটা আগে দেখিনি, বুঝলাম নতুন কিনেছেন।

কাস্টমসের ঝামেলা এখানেই চুকিয়ে দিয়ে বম্বে পৌঁছে লাগেজজমা দিয়ে লাউঞ্জে কিছুটা সময় অপেক্ষা করে, লাউডস্পিকারের ঘোষণা শুনে আমরা প্লেনে গিয়ে উঠলাম। আশ্চর্য—এখন বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর কথা, কিন্তু যাবার উত্তেজনায় একটুও ঘুম পাচ্ছে না। লালমোহনবাবু নাকি দুপুরে এক দফা ঘুমিয়ে নিয়েছেন, তাই বললেন প্লেনে আর ঘুমোনোর দরকার হবে না। ভদ্রলোক নিজের জায়গায় বসে বেল্ট বেঁধে বললেন, 'সেই পঞ্চুলালের গল্প পড়েছিলাম না—তিমি মাছের পেটে ঢুকেছিল পঞ্চু—এও যেন সেই তিমি মাছের পেট। এত লোক সমেত প্লেনটা মাটি থেকে ওঠে কী করে সেটাই আশ্চর্য।

সেই আশ্চর্য ঘটনাটাও ঘটে গেল। রানওয়ে দিয়ে যখন প্লেন কান-ফাটানো শব্দ করে ছুটে চলেছে, লালমোহনবাবুর চোখ তখন বন্ধ। ঠোঁটটা একবার নড়ে উঠল, আর বুঝলাম যে উনি বললেন 'দুগ্গা দুগ্গা', আর সেই মুহূর্তে প্লেনটা জমি ছেড়ে আকাশে উঠে পড়ল, জানালা দিয়ে দেখলাম বম্বের আলো দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। তারপর প্লেনটা ক্রমে নাক উঁচু অবস্থা থেকে সোজা হল, শব্দ কমে গেল, আর লাউডস্পিকারে এয়ার হোস্টেসকে বলতে শোনা গেল আমরা এখন বেল্ট খুলতে পারি, তবে আলগা করে পরে থাকাই ভাল। তারপর এক দিকে-একজন

ছেলে আর অন্য দিকে একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে লাইফ জ্যাকেট আর অক্সিজেনের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

আমরা নন-স্মোকিং এরিয়াতে বসেছি। ফেলুদা সিগারেট খায় বটে, কিন্তু দরকার পড়লে অনায়াসে দশ-বারো ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে পারে। 'সিনেমা দেখাবে না?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, 'সচরাচর তো দেখায় বলেই শুনেছি।'

সিনেমা দেখাল ঠিকই, সেই সঙ্গে কথা শোনার জন্য একটা করে হেডফোন দিল, কিন্তু এত বাজে ছবি যে আমি দশ মিনিট দেখে হেডফোন খুলে রেখে ঘুম দিলাম।

ঘুমটা যখন ভাঙল তখন জানালা দিয়ে রোদ আসছে। ফেলুদাও বলল ও ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিয়েছে। কেবল লালমোহনবাবুই নাকি একটানা জেগে আছেন। বললেন, 'হোটেলে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেব।'

বরফে ঢাকা আলপসের উপর দিয়ে প্লেনটা না উড়ে গেলে প্রায় কিছুই দেখার থাকত না। পাহাড়টার নাম জেনে লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন,'আমরা কি মন্ট ব্ল্যাঙ্ক দেখতে পাব?' ফেলুদা বলল, 'তা পাব, তবে মন্ট ব্ল্যাঙ্ক নয়, লালমোহনবাবু। এখন ইউরোপ এসেছেন, এখানকার দ্রষ্টব্যগুলোর নামের উচ্চারণ ঠিক করে করতে শিখুন। ওটা হল ম ব্লাঁ।'

'তার মানে অনেকগুলো অক্ষরের কোনও উচ্চারণই নেই?'

'ফরাসিতে সেটা খুব স্বাভাবিক।'

লালমোহনবাবু বেশ কয়েকবার ম ব্লাঁ ম ব্লাঁ বলে নিলেন।

'আর আমাদের হোটেল যেখানে', বলল ফেলুদা, 'সেটার বানান দেখে পিকাডিলি বলতে ইচ্ছা করলেও আপনি যদি পিক্‌লি বলেন তা হলে ওখানকার সাধারণ লোকে বুঝবে আরও সহজে। পিক্‌লি সার্কাস।'

'পিক্‌লি সার্কাস। থ্যাঙ্ক ইউ।'

আধ ঘণ্টা লেটে আমাদের প্লেন লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেল। ফেলুদা বলল, 'এখান থেকে সেন্ট্রাল লন্ডন তিনরকমে যাওয়া যায়। এক হল বাস, দুই হল ট্যাক্সি আর তিন টিউব। ট্যাক্সিতে দেদার খরচা, আর বাসের চেয়ে টিউবে কম সময় লাগে। আমার ম্যাপ বলছে একেবারে পিকাডিলি সার্কাস পর্যন্ত টিউব যায়, কাজেই তাতেই যাওয়া ভাল।'

'টিউবটা কী ব্যাপার মশাই?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'টিউব হল কলকাতায় আমরা যাকে মেট্রো বলি, সেই। অর্থাৎ পাতাল রেল। লন্ডনের নীচ দিয়ে কিলবিল করে ছড়ানো রয়েছে এই টিউবের লাইন। একবার বুঝে নিলে টিউবে যাতায়াতের মতো সহজ জিনিস আর নেই। ম্যাপ পাওয়া যায়; একটা আপনাকে এনে দেব।'

॥ ৫ ॥

আমাদের হোটেলটা বেশ বড় আর পরিচ্ছন্ন, অথচ ভাড়া খুব বেশি নয়। 'ট্র্যাভল এজেন্ট ভালই চয়েস করেছিল মশাই', বললেন লালমোহনবাবু। টিউব থেকে বেরিয়ে শহরের চেহারা দেখে প্রথমে ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছিল না। শেষে বললেন, 'আচ্ছা মশাই, আমাদেরও পাশি ডবল ডেকার, আর এখানেও দেখছি লাল ডবল ডেকার, এগুলো কেমন ছিমছাম, আর আমাদেরগুলো এমন ছিবড়ে চেহারা কেন বলুন তো?'

লাঞ্চ হোটেলে সেরে ফেলুদা বলল, 'তোরা যদি খুব টায়ার্ড না বোধ করিস তা হলে একবার অক্সফোর্ড স্ট্রিটটা ঘুরে দেখে আয়। ব্যস্ত লন্ডনের এমন চেহারা আর কোথাও পাবি না।'

'আর তুমি কী করবে?'

'বলছিলাম না—আমার এক কলেজের বন্ধু—বিকাশ দত্ত—এখানে ডাক্তার। তাকে একবার ফোন করে জানিয়ে দিই আমি এসেছি, আর দেখি যদি ও কোনও ইনফরমেশন দিতে পারে।'

আমরা অবিশ্যি তেমন কিছু ক্লান্ত হইনি, তাই বেরোনোই স্থির করলাম।

ফোন করে তার বন্ধুকে পেয়ে গেল ফেলুদা। মিনিটখানেক কথা বলে ফোন রেখে বলল, 'বিকাশ আমার গলা শুনে একেবারে থ! একটা মামলা যে কোনও দিন আমাকে লন্ডনে এনে ফেলবে সেটা ও ভাবতেই পারেনি। তা ছাড়া ওর কাছ থেকে একটা খবরও পাওয়া গেল।'

'কী খবর?'

'লন্ডনে এক বৃদ্ধ বাঙালি ডাক্তার আছেন, তিনি নাকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার কিছু পরেই এখানে আসেন ডাক্তারির ছাত্র হয়ে। তারপর লন্ডনে প্র্যাকটিস করেন। নাম নিশানাথ সেন। খুব মিশুকে লোক। বিকাশের ধারণা, উনি হয়তো রঞ্জনবাবুর বাবাকে চিনতেন। ওঁর চেম্বারের ঠিকানাটা দিয়ে দিল। আমি একবার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'অন্ধকারে ঢিল যদি ছুঁড়তেই হয়, তা হলে সেটা এখনই আরম্ভ করে দেওয়া ভাল।'

আমরা একসঙ্গেই বেরোলাম। ফেলুদা টিউব স্টেশনের দিকে গেল, আমরা ওর কাছ থেকে ডিরেকশন নিয়ে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দিকে হাঁটা দিলাম।

অক্টোবর মাস, তাই বেশ ঠাণ্ডা। আমরা দু'জনেই গলায় মাফলার জড়িয়ে নিয়েছি।

পথে অনবরত ভারতীয় চোখে পড়ছে, তাই বোধ হয় জটায়ু বললেন, 'বেশ

আট-হোম ফিল করছি ভাই তপেশ। অবিশ্যি রাস্তার মসৃণ চেহারা মোটেই হোমের কথা মনে পড়ায় না।'

অক্সফোর্ড স্ট্রিটে পৌঁছে চোখ টেরিয়ে গেল। শুধু যে দোকানের বাহার তা নয়; এরকম ভিড় আর কোনও রাস্তায় কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

'জনসমুদ্র! ওশন অফ হিউম্যানিটি, তপেশ, ওশন অফ হিউম্যানিটি।'

এই জনসমুদ্রের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হচ্ছে, তাই আস্তে হাঁটার উপায় নেই। সমস্ত রাস্তাটাই যেন একটা অবিরাম ব্যস্ততার ছবি। আর দোকানের কথা কী আর বলব! ঝলমলে লোভ লাগানো চেহারা নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল বিশাল ডিপার্টমেন্ট স্টোর। নামগুলো পড়ছি—ডেবেনহ্যাম, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসরস বুটস ডি এইচ এভান্স

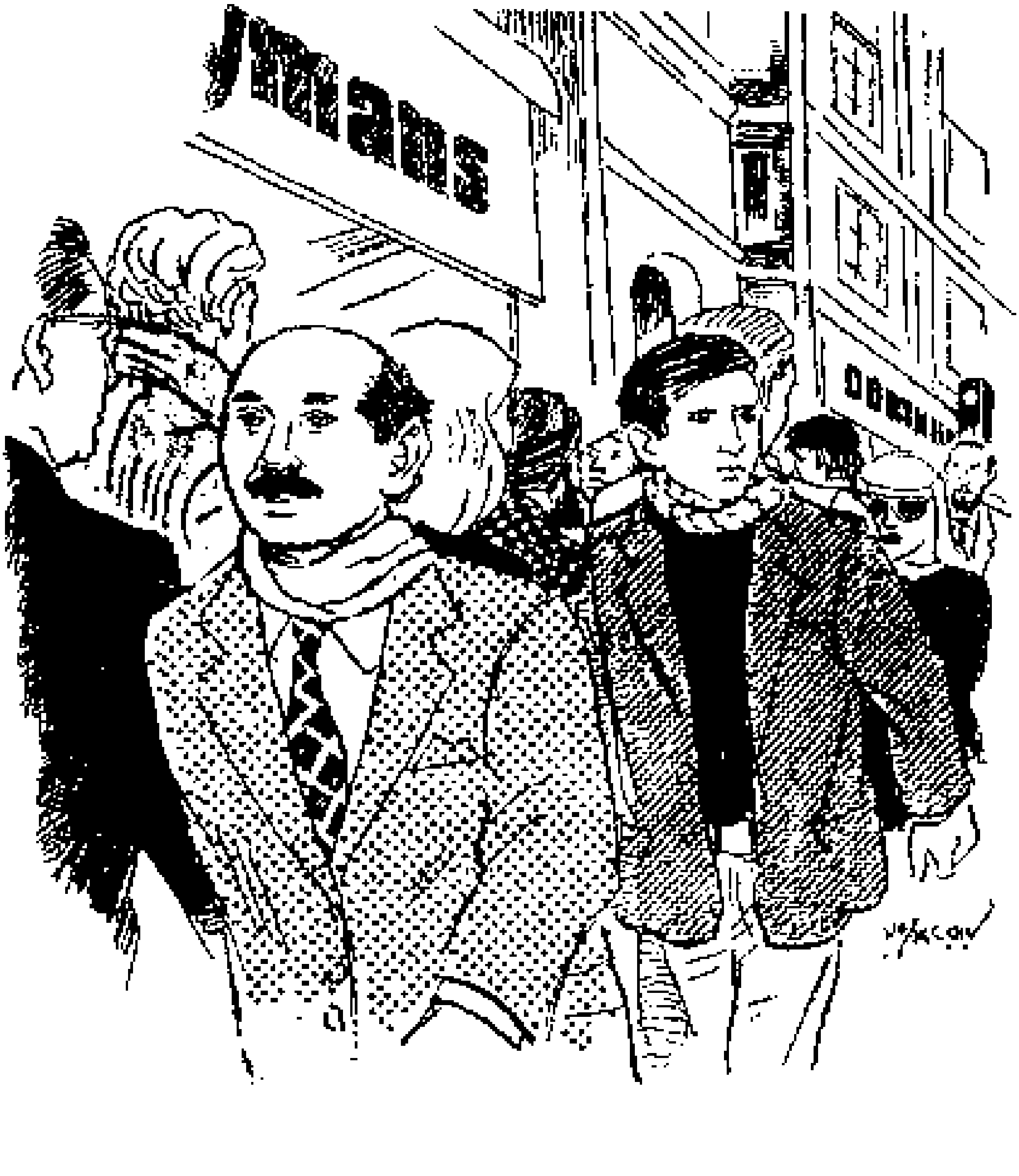

একটা বড় দোকানের কথা আমি আগেই জানতাম—সেলফ্রিজেস—আর এটাও জানতাম যে সেটা অক্সফোর্ড স্ট্রিটের একেবারে শেষ প্রান্তে। দোকানটা যে এত বড় সেটা আমি ভাবতেই পারিনি। 'চলুন, একটা জিনিস দেখাই' বলে লালমোহনবাবুকে হাত ধরে রাস্তা পার করে সেলফ্রিজেসের সামনে এসে দাঁড়ালাম। তারপর ঘুরপাক খাওয়া দরজা দিয়ে দু'জনে দোকানের ভিতর ঢুকলাম। আমাদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। রাজ্যের সবরকম জিনিস এই এক দোকানে পাওয়া যায়, তাই ক্রেতাদের ভিড়ও দেখবার মতো। সেই ভিড়ের চাপে এদিকে ওদিকে টলছি, এক পা এগোচ্ছি তো দু' পা পেছোচ্ছি। জটা যাতে হারিয়ে না যান তাই তাঁর হাতটা চেপে ধরে আছি।

'মানুষেরও যে ট্র্যাফিক জ্যাম হয় তা এই প্রথম দেখলাম', বললেন ভদ্রলোক।

খানিক দূর এগিয়ে একটা মোটামুটি কম ভিড়ের জায়গায় পৌঁছলাম।

'এমন জায়গায় এসে কিছু না কিনে ফিরে যাব?' বললেন লালমোহনবাবু।

'কী কিনতে চাইছেন আপনি?'

'চারিদিকে তো দেখছি কলম পেনসিল নোটবুকের সম্ভার : একটা মাঝারি দামের ফাউন্টেন পেনসিল নোটবুকের সম্ভার। একটা মাঝারি দামের ফাউন্টেন পেনও যদি কিনতে পারতাম। সামনের উপন্যাসটা লন্ডনে কেনা কলমে লিখতে পারলে...'

'বেশ তো, আপনি দেখে বেছে নিন।'

মিনিট পাঁচেক দেখার পর ভদ্রলোক একটা মনের মতো কলম খুঁজে পেলেন। 'থ্রি পাউন্ডস থার্টি পেন্স। তার মানে আমাদের দেশের হিসেবে কত হল?'

'তা প্রায় পঁচাত্তর টাকা।'

'গুড। এই জিনিসের কলকাতায় দাম হত দুশো।'

'আর কী—পেমেন্ট করে দিন।'

'কী বলব বলো তো? মানে, প্রথম দিন তো, একটু গাইডেন্স না পেলে...'

'আপনাকে কিছুই বলতে হবে না। কলমটা নিয়ে ক্যাশ কাউন্টারে দিন আর একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট দিন। ওরা চেঞ্জ ফেরত দেবে, আর কলমটা ওদের একটা খামে পুরে দেবে। ব্যাস্, খতম।'

'তুমি প্রথম দিন এত কী করে জানলে বলো তো?'

'আমি তো এসে অবধি চতুর্দিকে দেখছি। আপনিও দেখছেন, কিন্তু আপনি অবজার্ভ করছেন না।'

দু' মিনিটের মধ্যে ভদ্রলোক তাঁর নতুন কেনা কলম নিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। আমি বললাম, 'চা খাবেন?'

'কোথায়?' 'আমি যত দূর জানি, ওপরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে।'

'বেশ তো, চলো যাওয়া যাক।'

চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে চার তলায় খাবার জায়গাটা আবিষ্কার করলাম, আর সেই সঙ্গে ভাগ্যক্রমে একটা খালি টেবিলও পেয়ে গেলাম।

চা খাওয়া শেষ করে আবার অক্সফোর্ড স্ট্রিটের জনসমুদ্র পেরিয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন সাড়ে চারটা বেজে গেছে। ঘরে গিয়ে দেখি ফেলুদা হাজির।

'বিলেত ব্যাপারটা কী তার কিছু আন্দাজ পেলেন?'

লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'কেমন লাগল বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'কেন, আপনার বই পড়ে তো মনে হয় আপনার বিশেষণের স্টক অফুরন্ত।'

'বাংলায় বোঝাতে পারব না। বলতে হয় সুপার-সেনসেশন্যাল! এখনও মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। বিশ্রী দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি।'

'কেন?'

'লন্ডন দেখব, না আপনার তদন্তের প্রোগ্রেস দেখব।'

'তদন্ত তো সবে শুরু। তেমন জমে উঠলে আমি নিজে থেকেই বলব। আপাতত লন্ডন দেখে নিন।'

'সেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হল, তবে কথা প্রায় কিছুই হল না। ভদ্রলোক রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কাল সকালে ওঁর বাড়ি যেতে বলেছেন। রিচমন্ডে থাকেন।'

'সেটা কোথায়?'

'পিকাডিলি আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে রওনা হয়ে সাউথ কেনসিংটনে চেঞ্জ করে গ্রিন লাইন ধরে সোজা রিচমন্ড। এ ধরনের জায়গাও তো দেখা দরকার। ভদ্রলোক স্টেশনের বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবেন আমাদের জন্য। বেশ অমায়িক লোক রঞ্জনবাবুর বাবাকে চিনতেন এটুকু জেনেছি।'

হোটেলের ঘরে ঘরে টেলিভিশন, তাই দেখেই সন্ধেটা দিব্যি কেটে গেল। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে শুয়ে পড়লাম আর বালিশে মাথা রাখতেই চোখে ঘুম ঢুলে এল।

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘলা, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আমার একটা ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট ছিল, সেটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। ফেলুদা আর লালমোহনবাবু দু'জনেই ম্যাকিনটশ চাপিয়েছে।

ব্রেকফাস্ট সেরে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে ফেলুদা বলল, 'মিস্টার জটায়ু

আপনাকে বলে রাখি যে এটাই হল লন্ডনের স্বাভাবিক চেহারা। কাল যে খটখটে দিন আর ঝলমলে রোদ পেয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রম।'

'এখানে কলকাতার মতো জল জমে না নিশ্চয়ই।'

'তা জমে না। আর খুব যে মুষলধারে বৃষ্টি হয় তাও নয়।'

আন্ডারগ্রাউন্ডে দেখি সকলেরই তাড়া, কেউ আস্তে হাঁটছে না। আমরাও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললাম।

'এই স্পিডটা দেখছি ছোঁয়াচে', বললেন লালমোহনবাবু। 'কলকাতায় এমন রুদ্ধশ্বাসে হাঁটবার কথা কল্পনাই করতে পারি না।'

চেঞ্জ করার সময়ও সেই একই তাড়া। এক লাইন থেকে আরেক লাইনে যেতে হচ্ছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন আসছে যাচ্ছে, সময় যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য লোকে উঠে পড়ে লেগেছে।

রিচমন্ড পৌঁছলাম এগারোটা বেজে পাঁচে। নিশানাথবাবু বলে দিয়েছিলেন হাতে কত সময় রাখতে হবে, তাই কোনও অসুবিধা হল না।

স্টেশনের বাইরে বেরোতেই একজন ষাট-বাষট্টি বছরের সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক হাসিমুখে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না, যদিও আকাশে মেঘ।

'ওয়েলকাম টু রিচমন্ড।'

ফেলুদা ভদ্রলোককে সম্ভাষণ জানিয়ে আমাদের দু'জনের পরিচয় দিয়ে দিল।

'আপনি রাইটার?' লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক। 'কতকাল যে বাংলা বই পড়িনি তার হিসেব নেই।'

'আপনি দেশে যান না মাঝে মাঝে?' লালমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'লাস্ট গেছি সেভেনটি থ্রিতে তারপর আর না। কার জন্যেই বা যাব বলুন। আমার পুরো ফ্যামিলিই তো এখানে। আমার বাড়িতে অবিশ্যি আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া কেউ থাকে না, কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে এই ইংল্যান্ডেই রয়েছে আমার দুই ছেলে দুই মেয়ে, নাতি-নাতনি।'

ভদ্রলোকের গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করা ছিল; বললেন, 'এখানে তবু কম; লন্ডনে গাড়ি পার্কিং হচ্ছে একটা বিরাট সমস্যা। আপনি হয়তো সিনেমা যাবেন, গাড়ি পার্ক করতে হবে সিনেমা হাউস থেকে আধ মাইল দূরে আমরা গাড়িতে উঠলাম। ভদ্রলোক নিজেই ড্রাইভ করেন, ফেলুদা ওঁর পাশে বসে স্ট্র্যাপ লাগিয়ে নিল। ব্যাপারটা দেখে একটু অবাক হয়ে লালমোহনবাবু আমার দিকে চাইতে বললাম, 'এখানে গাড়িতে সামনের সিটে বসলে স্ট্র্যাপ লাগানো নিয়ম।'

'কেন?'

'যাতে অ্যাক্সিডেন্ট হলে লোকে মুখ থুবড়ে না পড়ে।'

নিশানাথবাবু গাড়ি চালু করে দিয়ে বললেন, 'আমার বাড়ি এখান থেকে দেড়

মাইল। এখানে এখনও মাইল চলে। দেশে তো কিলোমিটার, কিলোগ্রাম হয়ে গেছে, তাই না?'

রিচমন্ডকে খুব ছোট জায়গা তা মনে হল না, কারণ দোকানপাট সবই রয়েছে। অক্সফোর্ড স্ট্রিটে যে সব দোকানের নাম দেখেছিলাম, তার কিছু কিছু এখানেও দেখলাম।

নিশানাথ সেনের বাড়ি একটা সুন্দর নিরিবিলি জায়গায়, চারিদিকে গাছপালা, গাছের পাতায় শরৎকালের হলদে আর বাদামি রঙ। দোতলা বাড়িটাও সুন্দর, সামনের বাগানে ফুল—একেবারে পোস্টকার্ডের ছবি।

আমরা একতলায় বসবার ঘরে বসলাম। আজ বেশ ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে, তাই ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছে।

আমরা বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন বয়স্ক মেমসাহেব এসে ঢুকলেন, মুখে হাসি।

'আমার স্ত্রী এমিলি', বললেন নিশানাথবাবু। আমরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিয়ে দিলাম।

'আপনাদের জন্য একটু কফি করি?' মহিলা জিজ্ঞেস করলেন ফেলুদা সম্মতি জানিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে দিল। এবার নিশানাথবাবুও ফেলুদার সামনে একটা কাউচে বসে বলছেন, 'কী জানতে চান বলুন।'

'আপনি কাল বলছিলেন রঞ্জন মজুমদারের বাবাকে চিনতেন। আমি রঞ্জন মজুমদার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করছি।'

'রঞ্জনের বাপ রজনী আর আমি প্রায় একই সঙ্গে ফর্টি এইটে বিলেতে আসি। ও আমার চেয়ে ষোল-সতেরো বছরের বড় ছিল। আলাপটা হয় পরে। তত দিনে আমি এডিন বরায় ডাক্তারি পাশ করে লন্ডনে প্র্যাকটিস শুরু করেছি, আর রজনী মজুমদার সেন্ট মেরিজ হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচড রয়েছেন। একটা থিয়েটারে আমাদের পাশাপাশি সিট পড়েছিল। কী নাটক তাও মনে আছে—মেজর বারবারা। ইন্টারমিশনে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হয়। ওর সঙ্গে ওর স্ত্রীও ছিলেন। ও থাকত গোলডার্স গ্রিনে, আর আমি—তখনও আমার বিয়ে হয়নি—হ্যাম্পস্টেডে।'

'আর ওঁর ছেলে?'

'ছেলেও এখানে এসে কিছু দিনের মধ্যেই স্কুলে ভর্তি হয়।'

'কী স্কুল মনে আছে?'

'আছে বইকী—ওয়ারেনডেল। এপিং-এ। তারপর কেমব্রিজে যায়।'

'কোন কলেজ?'

'যদ্দূর মনে পড়ে—ট্রিনিটি। সেই সময়ই আমার সঙ্গে রজনী মজুমদারের আলাপ।'

নিশানাথবাবু একটু ভেবে বললেন, 'পিকিউলিয়ার।'

'কেন—পিকিউলিয়ার বলছেন কেন?'

'আমার মনে হয় ওদের পুরো ফ্যামিলিটাই একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। রজনী মজুমদারের বাবা রঙনাথ মজুমদার ইয়াং বয়সে টেররিস্ট ছিলেন, বোমা-টোমা তৈরি করেছেন। পরে উনি নামকরা হার্ট স্পেশালিস্ট হন। তখন আর সাহেবদের ওপর কোনও বিদ্বেষ নেই। এমনকী তিনিই জোর করে রজনীকে বিলেত পাঠান। ওঁর শখ তাঁর নাতি সাহেব ইস্কুলে পড়বে আর ছেলে লন্ডনে প্র্যাকটিস করবে। এরকম রূপান্তর বড় একটা দেখা যায় না। আর রজনী যে ভাবে দেশে ফিরে গেল সেও অদ্ভুত। ওর একটা ধারণা ছিল যে ইংরেজরা এখনও ভারতীয়দের ঘৃণার চোখে দেখে। আমি ওকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে ব্যাপারটা সত্যি নয়। এই বিদ্বেষের দু-একটা আইসোলেটেড ঘটনা হয়তো ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু এখানে বহু ভারতীয় ইংরেজদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে, দুই জাতের মধ্যে কোনও ক্ল্যাশ নেই।

'কিন্তু রজনী মজুমদার আমার কথা মানতে রাজি হয়নি। একটা সামান্য ব্যাপারে—ওরই এক ব্রিটিশ পেশেন্টের একটা কথায়—ও হঠাৎ স্থির করে দেশে ফিরে যাবে।'

'ততদিনে তো ওঁর ছেলের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে?'

'তা পেছে। সেই ছেলে এখন কী করছে? তার তো পঞ্চাশের ওপর বয়স হওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ। উনি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট।'

'তার মানে এখানকার পড়াশুনা ওর কোনওই কাজে লাগেনি? কলকাতায় ফিরে গিয়ে নতুন করে পড়াশুনা করতে হয়?'

'তাই তো মনে হয়। ইয়ে—রঞ্জনের বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধে কিছু জানতেন কি?'

'না। নথিং অ্যাট অল।'

ইতিমধ্যে কফি এসে গিয়েছিল, আর আমাদের খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক ফেরার পথেই একরকম জোর করেই আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিলেন।

॥ ৭ ॥

আমরা পরদিন টিউবে করে এপিং গিয়ে পৌঁছলাম বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ। স্টেশন থেকে হেঁটে ওয়ারেনডেল স্কুলে পৌঁছতে লাগল কুড়ি মিনিট। বিশাল খেলার মাঠের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে স্কুল বিল্ডিং অন্তত দুশো বছরের পুরনো তো হবেই। ফেলুদার উদ্দেশ্য হল রঞ্জন মজুমদার ওখানে ছাত্র ছিল কি না এবং পিটার ডেক্সটর ওর সঙ্গে পড়ত কি না সেইটে জানা।

ইস্কুলের সদর দরজায় পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে, সে জিজ্ঞেস করল আমরা কার সঙ্গে দেখা করতে চাই। ফেলুদা বলল সে চল্লিশের দশকের শেষ দিকের একজন ছাত্র সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে চায়। পোর্টার আমাদের একটা লাইব্রেরি জাতীয় ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'মিস্টার ম্যানিং দেয়ার উইল হেলপ ইউ।'

ম্যানিং ভদ্রলোকটি একটা ডেস্কে বসে পুরু কাচের চশমা পরে একটা খাতায় কী জানি লিখছিলেন, ফেলুদা তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে একটা মৃদু গলা খাঁকরানি দিল। ভদ্রলোক লেখা থামিয়ে চোখ তুলে বললেন, 'ইয়েস?'

ফেলুদা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

'হুইচ ইয়ার ডিড ইউ সে?'

'নাইনটিন ফর্টি এইট।'

মিস্টার ম্যানিং তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠে পিছন দিকে গিয়ে একটা বইয়ের তাক থেকে বেশ বড় এবং মোটা একটা খাতা বার করলেন। তারপর সেটাকে এনে ফেললেন তাঁর ডেস্কে।

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, ভদ্রলোক খাতার পাতা উলটিয়ে একটা বিশেষ পাতায় এসে চশমার ওপর দিয়ে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'হোয়াট নেম ডিড ইউ সে?'

'আই হ্যাভন্‌ট টোল্ড ইউ ইয়েট', বলল ফেলুদা। 'দ্য নেম ইজ মজুমদার, অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট নেম ইজ রঞ্জন।'

'ম্যাজুমডা, ম্যাজুমডা', নামের তালিকার ওপর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বিড়বিড় করতে লাগলেন মিস্টার ম্যানিং।

হঠাৎ আঙুলটা এক জায়গায় এসে থেমে গেল।

'ইয়েস আর, ম্যাজুমডা', বললেন মিস্টার ম্যানিং।

'ওর সঙ্গে কি পিটার ডেক্সটার বলে কেউ পড়ত?'

'ডেক্সটার...ডেক্সটার...নো, নো ডেক্সটার ইন দ্য সেম ক্লাস।'

'আই সি।' ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেছে। বলল, 'যদি অনুগ্রহ করে ফর্টি নাইনটাও একটু দেখে দাও। হয়তো পিটার ডেক্সটার পরের বছর এসেছে।'

দুঃখের বিষয় ফর্টি নাইনের খাতাতেও পিটার ডেক্সটারের নাম পাওয়া গেল না। অর্থাৎ এখানে আর আমাদের থাকার কোনও মানে হয় না।

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি ভেরি মাচ', বলল ফেলুদা। 'ইউ হ্যাভ বিন মোস্ট হেলপফুল।'

ট্রেনে আসতে আসতে ফেলুদা বলল, 'কেমব্রিজে গিয়ে খোঁজ করলেই ডেক্সটারের নাম পাওয়া যাবে। কিন্তু তাও আমার মনে হচ্ছিল যে এখানেও কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে মন্দ হত না।'

'কী বিজ্ঞাপন?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'টাইমসের পার্সোন্যাল কলামে দেব। নরফোকের পিটার ডেক্সটার সম্বন্ধে

কারও কোনও ইনফরমেশন থাকলে সে যেন অমুক হোটেলের অমুক ঘরের অমুক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

'এতে কী ফল হতে পারে বলে আপনি আশা করছেন?'

'কীসে ফল হল আর কীসে না হল সেটা তো সব সময় আগে থেকে বলা যায় না। কেমব্রিজের তালিকায় নাম পেলে তো শুধু নামটাই পাওয়া যাবে; লোকটা সম্বন্ধে তো কিছু জানা যাবে না। দিয়েই দেখি না একটা বিজ্ঞাপন।'

'কিন্তু সে তো বেরোতে বেরোতে তিন-চার দিন লেগে যাবে।'

'দু'দিনের বেশি সময় লাগার কথা না। একটা দিন যদি ফাঁক পাই তা হলে সেদিন আমরা লন্ডন দেখব। এখানে দেখার জিনিসের কি অভাব আছে? মাদাম ত্যুসোর নাম শুনেছেন?'

'ম্যাডাম টুসড?'

'আপনার উচ্চারণে তাই।'

'সেখানে বিখ্যাত লোকেদের মোমের প্রতিকৃতি আছে তো?'

'ইয়েস স্যার। অবশ্য দ্রষ্টব্য। তারপর আর্ট গ্যালারিগুলো আছে, পার্লামেন্ট হাউসে বিগ বেন আছে, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল আছে—কত চাই? হেঁটে হেঁটে আপনার পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ে যাবে। অথচ এগুলো না দেখলে দেখা হল বলা চলে না।'

'আপনার বিজ্ঞাপনটা কবে দিচ্ছেন?'

'আজই এক ঘণ্টার মধ্যেই। পরশু বেরিয়ে যাবে।'

'তা হলে কালকের দিনটা আমরা শহর দেখছি?'

'হ্যাঁ।'

মাদাম ত্যুসো (ফেলুদার উচ্চারণে) দেখে তাক লেগে গেল ঠিকই। প্রত্যেকটা ঘরের দরজার সামনে পোর্টার দাঁড়িয়ে আছে এমনভাবে যে সেগুলোকেও দেখলে মনে হয় মোমের তৈরি। তারপর চেম্বার অফ হররস—সত্যিই গায়ে কাঁটা দেয়।

মিউজিয়ম দেখার পর বাইরে বেরিয়ে আমরা ফেলুদাকে অনুসরণ করে চললাম। এবারে কোথায় যাচ্ছে সেটা আগে থেকে কিছুই বলল না।

এখানকার অনেক রাস্তার নাম বড় বড় পাথরের ফলকে লেখা থাকে। একটুক্ষণ চলার পর সেইরকম একটা ফলক চোখে পড়ায় ব্যাপারটা এক ঝলকে বুঝে নিলাম। রাস্তার নাম বেকার স্ট্রিট। ২২১ বি বেকার স্ট্রিটে যে শার্লক হোমসের বাড়ি সে কে না জানে? ওই নম্বরে যদিও সত্যি করে কোনও বাড়ি নেই। কিন্তু কাছাকাছি নম্বর তো আছে। ফেলুদা সেইরকম একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'গুরু, তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি। আজ আমার লন্ডন আসা সার্থক হল।'

বিশ্বের গল্প সাহিত্যে যত চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে খ্যাতিতে যে শার্লক

হোমস নামের ওরাল সেটা ফেলুদা অনেকবার বলেছে। কন্যান ডয়েল একটা গল্পে তিনি হোমসকে মেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু পাবলিক অ্যায়সা হল্লা করে যে ডয়েল বাধ্য হয়ে হোমস্‌কে আবার বাঁচিয়ে তুলেছিলেন।

বেকার স্ট্রিটে না এলে লন্ডন দেখা সম্পূর্ণ হত না এটা বুঝতে পারলাম।

॥ ৮ ॥

দু'দিন পরে অর্থাৎ রবিবার, টাইমসে ফেলুদার বিজ্ঞাপন বেরোল। আর আশ্চর্য ব্যাপার—তার পরদিনই বিজ্ঞাপনের ফল পাওয়া গেল। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় ফেলুদার ফোন বেজে উঠল। মিনিটখানেক কথা বলে ফেলুদা ফোনটা রেখে বলল, 'অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক। নাম আর্চিবল্ড ক্রিপস। বলল ওর কাছে পিটার ভেঙ্কটেশের খবর আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাচ্ছে লোকটা। ধড়িবাজ হতে পারে। তুই লালমোহনবাবুকে খবর দে।'

লালমোহনবাবু তৈরি ছিলেন, এসে বললেন এত তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেটা উনি ভাবতেই পারেননি।

সোয়া ন'টার সময় দরজায় টোকা পড়ল। মৃদু নয়, বেশ জোরে। আমি দরজা খুললাম। রুক্ষ গলার সঙ্গে মানানসই রুক্ষ চেহারাওয়ালা একজন ভদ্রলোক ঢুকে এলেন। তাঁর দৃষ্টি প্রথমে গেল জটায়ুর দিকে।

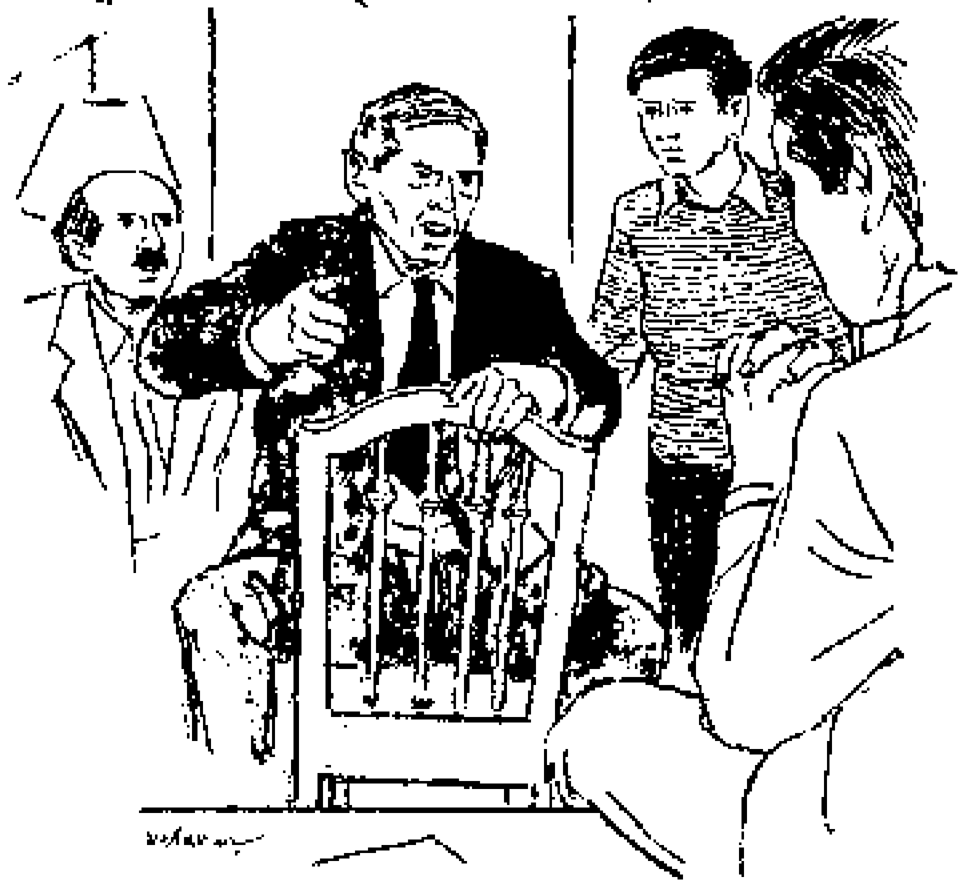

'আর ইউ মিস্টার মিটার?'

'নো না। হি, হি।'

লালমোহনবাবু ফেলুদার দিকে দেখিয়ে দিলেন। ক্রিপস সাহেব একটা চেয়ার টেনে এনে তাতে বসে ফেলুদার দিকে কঠোর দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট পিটার ডেক্সটার?'

'প্রথমত, সে এখন কোথায়?'

'হি ইজ ইন হেভন।'

'তার মৃত্যু হয়েছে শুনে আমি দুঃখিত। কবে হল?'

'আজ নয়। অনেক কাল আগে। হোয়েন হি ওয়জ ইন কেমব্রিজ।'

'উনি কেমব্রিজে পড়তেন?'

'হ্যাঁ, আর মূর্খের মতো ক্যাম নদীতে নৌকো চালাতে গিয়েছিল।'

'মূর্খের মতো কেন?'

'কারণ ও সাঁতার জানত না। নৌকো উলটে গিয়ে জলে পড়ে তার মৃত্যু হয়।'

'ওঁরা তো শুনেছি অনেক ভাইবোন ছিলেন।'

'ফাইভ ব্রাদার্স অ্যান্ড টু সিস্টারস। তার মধ্যে শুধু দু'জনের খবর জানি— বড় ছেলে জর্জ আর ছোট ছেলে রেজিন্যাল্ড। জর্জ আর্মিতে ছিল, ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর এখানে চলে আসে। বলত শিখ আর গুর্খা ছাড়া ও দেশের সবাই হয় বদমাইশ না হয় অকর্মণ্য। ডেক্সটারদের কেউ-ই ইন্ডিয়ান নিগারদের পছন্দ করে না।'

'নিগার? নিগার তো ভারতবর্ষে নেই। ইন ফ্যাক্ট, আমেরিকাতেও আজকাল নিগ্রোদের আর কেউ নিগার বলে না।'

ফেলুদার মুখ গম্ভীর। বলল, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভারতীয়দের সম্বন্ধে আপনার ধারণাও ডেক্সটারদের মতোই।'

'তা তো বটেই। একশোবার।'

'তা হলে আপনার কাছ থেকে আর কোনও ইনফরমেশন আমি চাই না। যেটুকু দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।'

এই গরম কথাগুলো শুনে ক্রিপস সাহেব যেন একটু নরম হলেন। বললেন, 'আই অ্যাম সরি ইফ আই হ্যাভ অফেন্ডেড ইউ। রেজিন্যাল্ডের কথাটা বলেই আমি উঠছি। রেজিন্যাল্ড ওদের ছোট ভাই। সে ইন্ডিয়াতে একটা চা বাগানে আছে, কিন্তু বেশিদিন থাকবে না।'

ফেলুদা চেয়েই রয়েছে ভদ্রলোকের দিকে, মুখে কিছু বলছে না।

'বিকজ হি হ্যাজ ক্যানসার', বলে চললেন ক্রিপস। 'ও গিয়েছিল শুধু পয়সা রোজগারের জন্য। ভারতবর্ষের ওপর ওর কোনও মমতা নেই।'

ফেলুদা উঠে দাঁড়াল।

'থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার ক্রিপস। আমার আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই।'

ক্রিপসও কেমন যেন বোকা-বোকা ভাব করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ 'গুড ডে' বলে সটান ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'কী জঘন্য লোক মশাই', দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন লালমোহনবাবু। 'তবে আপনি লন্ডনে বসে একজন সাহেবকে যেভাবে দাবড়ানি দিলেন, তার কোনও জবাব নেই।'

'যাইহোক', বলল ফেলুদা, 'এর কাছ থেকে অন্তত একটা জরুরি তথ্য পাওয়া গেল। পিটার ডেক্সটার কেমব্রিজে ছিলেন এবং নৌকোডুবি হয়ে মারা যায়।'

'এখন কী করা?'

'সময় ত হু হু করে বেরিয়ে যাচ্ছে', বলল ফেলুদা। 'পরশু আমাদের ফেরার দিন, ভুলবেন না। আজই দুপুরে তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে কেমব্রিজ যাত্রা।'

আমরা দেড়টার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

পিকাডিলি সার্কাস থেকে প্রথম লিভারপুল স্ট্রিটে গিয়ে সেখানকার রেল স্টেশন থেকে সাধারণ ট্রেন ধরে যেতে হয় কেমব্রিজে। পৌঁছতে লাগে এক ঘণ্টা। এখানে ট্রেন খুব দ্রুত চলে, আর চড়েও আরাম কারণ কামরাগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।

সুন্দর শহর কেমব্রিজ, তার মধ্যে ইউনিভার্সিটি দাঁড়িয়ে আছে তার প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে। পাশাপাশি অনেকগুলো কলেজ আছে—ফেলুদা বলল, আটশোটা—তবে নিশানাথবাবু বলে দিয়েছিলেন রঞ্জন মজুমদার ট্রিনিটি কলেজে পড়তেন, তাই আমরা সেখানেই খোঁজ করলাম। জানা গেল যে ১৯৫১-তে রঞ্জন মজুমদার ইতিহাস পড়তে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন এবং তার সঙ্গে একই ক্লাসে ছিল পিটার ডেক্সটার।

'এই পিটার ডেক্সটার তো নৌকাডুবি হয়ে মারা যান?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা। যে ভদ্রলোক আমাদের সাহায্য করছিলেন—নাম মিস্টার টেলর—তিনি বললেন যে তিনি মাত্র সাত বছর হল জয়েন করেছেন, কাজেই পুরনো ঘটনা কিছুই জানেন না।

'তবে এখানে একজন খুব পুরনো গার্ডনার আছে, চল্লিশ বছর হল এখানে কাজ করছে, নাম হকিন্স। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

ফেলুদা বাগানেই হকিন্সকে পাকড়াও করল। গায়ের চামড়া এখনও বেশ টান-টান, তবে চুল সাদা। তাও দিব্যি কাজ করে চলেছে।

'তুমি এখানে অনেকদিন আছ, তাই না?' ফেলুদা মোলায়েম সুরে প্রশ্ন করল।

'ইয়েস', বলল হকিন্স। 'তবে আর বেশিদিন নয়, কারণ আমার রিটায়ারমেন্টের সময় এসে গেছে। আমার বয়স তেষট্টি হল, কিন্তু এখনও

পরিশ্রম করতে পারি। আমার বাড়ি চ্যাটাওয়র্থ স্ট্রিট—এখান থেকে দু' মাইল। রোজ হেঁটে আসি, হেঁটে ফিরি।'

'ছাত্রদের সঙ্গে তোমার কীরকম সম্পর্ক?'

'খুব ভাল। দে অল লাভ মি। আমার সঙ্গে এসে গল্প করে, ঠাট্টা তামাশা করে, আমাকে সিগারেট দেয়, বিয়ার দেয়। আই গেট অ্যালং ভেরি ওয়েল উইথ দেম।'

'পুরনো ঘটনা মনে থাকে তোমার? স্মরণশক্তি কেমন?'

'হালের ঘটনা ভুলে যাই, কিন্তু পুরনো কিছু কিছু মনে আছে। অবিশ্যি কত পুরনো তার ওপর নির্ভর করে।'

'মনটাকে চল্লিশ বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

'হোয়াই?'

'তোমাদের এখানে ক্যাম নদীতে নৌকো চালায় না ছেলেরা?'

'শুধু ছেলেরা কেন, মেয়েরাও চালায়।'

'কোনও নৌকোডুবির ঘটনা মনে পড়ছে?'

হুকিন্স মাথা নেড়ে গলাটাকে ভারী করে বলল, 'ইট্‌স এ স্যাড স্টোরি, স্যাড স্টোরি। একটি ইংরেজ ছেলে, নাম মনে নেই। নৌকো উলটিয়ে জলে ডুবে মারা যায়। সাঁতার জানত না।'

'সে কি একাই ছিল?'

'একা? না বোধহয়। সঙ্গে বোধহয় আরেকজন ছিল।'

'ঠিক করে ভেবে বলো তো।'

'অত দিন আগের কথা তো—তাই ভাল মনে পড়ছে না।'

'ওই ইংরেজ ছেলেটির একজন ভারতীয় বন্ধু ছিল না?'

'আই থিংক হি হ্যাড।'

'একটু চেষ্টা করে মনে করে দেখ তো—সেই ভারতীয় ছেলেটিও নৌকোয় ছিল কি না।'

'মে বি হি ওয়াজ—মে হি বি ওয়াজ...'

'ওই ঘটনার সময় তুমি কোথায় ছিলে?'

'আমি একটা ঝোপের ধারে বসে বিশ্রাম করছিলাম। হয়তো সিগারেট খাচ্ছিলাম।'

'ঘটনাটা তুমি দেখেছিলে?'

'হেল্‌প-হেল্‌প চিৎকার শুনে আমি, নদীর ধারে যাই। গিয়ে দেখি এই কাণ্ড।'

'তা হলে তো তোমার মনে থাকা উচিত নৌকোতে আর কেউ ছিল কি না।'

হুকিন্‌স মাথা হেঁট করে যেন ভাববার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'নাঃ—এর বেশি আর মনে করতে পারছি না। আই অ্যাম সরি। এইটুকু যে মনে আছে তার একটা কারণ ওই একই দিনে আমি বিয়ে করি। ম্যাগি। দ্য বেস্ট ওয়াইফ ওয়ান কুড হ্যাভ।'

॥ ৯ ॥

টাইম্‌সের বিজ্ঞাপনের ফল যে মিস্টার ক্রিপ্‌স-এর আনাতেই শেষ হয়ে গেল তা নয়। কেমব্রিজ যাবার পরদিনই ফেলুদা টেলিফোন পেল এক ভারতীয় ভদ্রলোকের বললেন পিটার ডেক্সটার সম্বন্ধে কিছু তথ্য তিনি দিতে পারেন। 'আমি এগারোটা নাগাদ তোমাদের হোটেলে পৌঁছতে পারি।'

'খুব ভাল কথা', বলল ফেলুদা, 'চলে আসুন।'

সত্যনাথন কথা মতো এলেন। বেশ গাঢ় কালো রঙ, মাথার চুল একেবারে সাদা একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'বিজ্ঞাপনটা পড়েই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব ভেবেছিলাম, কিন্তু কয়েকটা কাজে একটু আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনি লন্ডনেই থাকেন?'

'না। কিলবার্নে। এখান থেকে বেশি দূর নয়। ওখানে একটা ইস্কুলে মাস্টারি করি। পিটার ডেক্সটারের সঙ্গে একসঙ্গে আমি কেমব্রিজে ছিলাম।'

'তার মানে রঞ্জন মজুমদারও আপনার সহপাঠী ছিল?'

'তা তো বটেই।'

'তাকে মনে আছে?'

স্পষ্ট। পিটারের খুব বন্ধু ছিল। অবিশ্যি দু'জনের মধ্যে ঝগড়াও হত প্রায়ই।'

'কী নিয়ে?'

'পিটার ভারতীয়দের একেবারে পছন্দ করত না। রঞ্জনকে দেখে একেবারে সাহেব বলে মনে হত, তাই পিটার তাকে বন্ধু হিসেবে মেনে নেয়। বলত—ইউ আর নট ইন্ডিয়ান, ইউ আর হাফ ইংলিশ।'

'আপনার সঙ্গে পিটারের কীরকম সম্পর্ক ছিল?'

'আমার গায়ের রঙ তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমাকে সে দুবার ডার্টি নিগার বলে সম্বোধন করেছে। আমি ব্যাপারটা হজম করে নিতাম।'

'পিটারের মৃত্যুর কথা মনে আছে?'

'তা থাকবে না? এমন কী দিনটাও মনে আছে—হুইট-সানডের আগের দিন। পিটার যখন সাঁতার জানত না তখন ওর নৌকোয় চড়া অত্যন্ত ভুল হয়েছিল।'

'ওর সঙ্গে আর কে ছিল?'

'রঞ্জন।'

'সে বিষয় আপনি নিশ্চিত?'

'অ্যাবসোলিউটলি। রঞ্জনের সর্বাঙ্গে জলে ভেজা চেহারাটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। আমি তখন আমার ঘরে ছিলাম। আমাদের মালি হকিন্সের চেঁচামেচিতে বাইরে বেরিয়ে এসে সব ব্যাপারটা জানতে পারি। রঞ্জন তার বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাট ইট ওয়জ টু লেট। রেজিনাল্ডও চেষ্টা করেছিল দাদাকে বাঁচাতে, কিন্তু পারেনি।'

'পিটারের পরের ভাই?'

'হ্যাঁ। সে আমাদের পরের বছরই কেমব্রিজে ভর্তি হয়। সেই একই ছাঁচে ঢালা। ভারতীয়দের সঙ্গে প্রায়ই হাতাহাতি লেগে যেত। অনেকবার ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। রেজিন্যাল্ডের ধারণা ছিল রঞ্জন ইচ্ছা করলে পিটারকে বাঁচাতে পারত। এই কথা সে সারা কলেজে বলে বেড়াত—"হি ডেলিবারেটলি লেট হিম ড্রাউন।"'

'রঞ্জন মজুমদার তো এক বছরের বেশি কেমব্রিজে পড়েনি?'

'না। একটা বাইসিক্ল অ্যাক্সিডেন্টের পর সে দেশে ফিরে যায়।'

কথা শেষ, তাই সত্যনাথন উঠে পড়লেন। ওঁর কাছ থেকে একটা মূল্যবান তথ্য জানা গেল—নৌকোতে পিটারের সঙ্গে রঞ্জন ছিলেন, আর তিনি বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা করে পারেননি।

সত্যনাথন চলে যাবার পর থেকেই লক্ষ্য করলাম ফেলুদার ভুরুটা কুঁচকে গেল। লাঞ্চ খেতে খেতে লালমোহনবাবু বললেন, 'আপনাকে যেন ডিস্‌স্যাটিসফায়েড বলে মনে হচ্ছে। কারণটা জানতে পারি কি?'

'একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে।'

'কী?'

'মনে হচ্ছে হকিন্স যা বলেছে তার চেয়ে বেশি ও জানে এবং ওর মনে আছে; কোনও একটা কারণে তথ্য লুকিয়ে যাচ্ছে।'

'তা হলে কী করবেন?'

'আরেকবার কেমব্রিজ যাওয়া দরকার। এবারে হকিন্সের বাড়ি রাস্তার নামটা ও বলেছিল। মনে আছে, তোপসে?'

মনে ছিল। বললাম, 'চ্যাটওয়র্থ স্ট্রিট।'

'ভেরি গুড। কেমব্রিজ গিয়ে রাস্তার একটা পুলিশকে জিজ্ঞেস করলেই বাতলিয়ে দেবে। এটাও জেনে রাখুন, লালমোহনবাবু—এখানকার পুলিশ, যাকে এরা বলে "ববি"—এদের হেল্‌পফুল পুলিশ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।'

লাঞ্চের পর ফেলুদা বলল ওর একটা কাজ আছে, ও একটু বেরোবে। ও ফিরলে তারপর আমরা কেমব্রিজ যাব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কেমব্রিজের ট্রেন ছাড়ে—কোনও অসুবিধা নেই।

সাড়ে চারটায় রওনা হয়ে আমরা যখন কেমব্রিজে পৌঁছলাম, তখন রাস্তার

বাতি জ্বলে গেছে। আমরা একটা বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে একটা পুলিশের কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

'চ্যাটওয়র্থ স্ট্রিট কোথায় বলতে পার?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। পুলিশ প্রায় কাগজে নকশা আঁকার মতো করে বুঝিয়ে দিল।

আধঘণ্টা লাগল চ্যাটওয়র্থ স্ট্রিট পৌঁছতে। এটাকে গলি বললেই চলে, দেখে বোঝা যায় যে খুব অবস্থাসম্পন্ন লোকেদের পাড়া নয়। একটা বাড়ির সামনে একজন লোক রাস্তা থেকে একটা বেড়ালকে তুলে কোলে নিল। তাকেই ফেলুদা জিজ্ঞেস করল হুকিন্স কোন বাড়িতে থাকে।

'ফ্রেড হুকিন্স?' ভদ্রলোক বললেন। 'নাম্বার সিক্সটিন।'

এখানে সব বাড়ির বাইরেই নম্বর লেখা থাকে, তাই বোলো খুঁজে পেতে সময় লাগল না। এগিয়ে গিয়ে দরজায় নক করতে হুকিন্স নিজেই দরজা খুলল।

'গুড ইভনিং', বলল ফেলুদা।

আমাদের দেখে হুকিন্সের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। 'সে কী—তোমরা আবার...?'

'একটু ভিতরে আসতে পারি?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

হুকিন্স এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আমাদের ঢোকবার জায়গা করে দিল। আমরা তিনজনে ঢুকলাম। এটাই বসবার ঘর, যদিও আয়তনে খুবই ছোট। আমরা দুটো চেয়ারে আর একটা সোফায় ভাগাভাগি করে বসলাম।

'ওয়েল?'

ফেলুদার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলে হুকিন্স।'

'তোমাকে দু' একটা তার বেশি তো আর কিছু জানি না।'

'আমি নতুন প্রশ্ন করব।'

'কী?'

'মিস্টার হুকিন্স, যে নৌকো ধীরে চলছে, তাতে কেউ নেশা অবস্থায় জলে পড়ে যেতে পারে এটা কি তোমার বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়?'

'যদি ঝড় থাকে তা হলে নৌকো নিশ্চয়ই উলটে যেতে পারে। দেয়ার ওয়জ এ হাই উইন্ড দ্যাট ডে।'

'আমি আজই দুর্ঘটনার পরের দিনের খবরের কাগজ দেখেছি। তাতে পিটার ডেক্সটারের মৃত্যু সংবাদ আছে, কিন্তু ঝড়ের কোনও খবর নেই। ওয়েদার রিপোর্টে বলছে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩৫ মাইল। সেটাকে কি তুমি হাই উইন্ড বলবে?'

হুকিন্স চুপ। ঘরে একটা টেবিল ক্লকের টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

ফেলুদা বলল, 'আমার ধারণা তুমি একটা কিছু লুকোচ্ছ। সেটা কী দয়া করে বলবে?'

'এতদিন আগের ঘটনা...'

'কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যে দু'জনকে নিয়ে ঘটনা, তার মধ্যে একজন তো তোমার বেশ কাছের লোক ছিল বলে মনে হচ্ছে।'

হুকিন্‌স ফেলুদার দিকে চাইল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে তার দৃষ্টিতে সংশয় ঘনিয়ে আসছে।

'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

'তোমার শেল্‌ফে আমি অনেকরকম জিনিসের মধ্যে একটা পিতলের গণেশ আর একটা আইভরির বুদ্ধ দেখতে পাচ্ছি। ওগুলো কী করে পেলে জানতে পারি কি?'

'রন দিয়েছিল আমাকে।'

'রন মানে বোধ করি রঞ্জন।'

'ইয়েস ওকে আমি রনও বলতাম, জনও বলতাম।'

'আই সি। এবার একটা কথা বলো—পিটারের হেল্‌প্ হেল্‌প চিৎকারের আগে তুমি ওদের কোনও কথা শোনোনি? ইন্ডিয়ান গডদের সামনে মিথ্যা কথা বলা কিন্তু মহাপাপ।'

'কী কথা বলছিল বুঝিনি—আই ওনলি হার্ড দেয়ার ভয়েসেস।'

'তার মানে ওরা বেশ জোরে কথা বলছিল?'

'পরহ্যাপস...পারহ্যাপস...'

'আমার কী বিশ্বাস জান?'

হুকিন্‌স আবার ফেলুদার দিকে দেখল।

'হোয়াট?'

'আমার বিশ্বাস ওদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। পিটার দাঁড়িয়ে উঠেছিল, আর—'

'ইয়েস, ইয়েস!' হুকিনস হঠাৎ বলে উঠল। 'আর ও রনকে আক্রমণ করতে যায়, আর টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায়।'

'তার মানে পিটার তার মৃত্যুর জন্য নিজেই দায়ী?'

'অফ কোর্স!'

'তোমাদের এই যে ক্যাম নদী, আমাদের দেশে এটাকে বলে কেন্যাল। এতে একটা লোক সাঁতার না জানলেও এত সহজে ডুবে যেতে পারে—বিশেষ করে যখন তাকে একজন বাঁচাবার চেষ্টা করছে?'

'ডুবল যে সে তো চোখের সামনে দেখলাম।'

'তুমি এখনও সত্যি কথা বলছ না, মিস্টার হুকিন্‌স। আই ওয়ান্ট দ্য ট্রুথ। আমি এত দূর থেকে এসেছি শুধু এই ট্রুথের সন্ধানে। পিটার কেন এত সহজে ডুবে গেল?'

হুকিন্‌সকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে সে ক্রমেই কোণঠাসা হচ্ছে।

এবার সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমি বলছি কেন পিটার ডুবে যায়। তার কারণ ও যখন জলে পড়ে তখন ওর জ্ঞান ছিল না।'

'জ্ঞান ছিল না?'

ফেলুদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে হুকিন্‌সের দিকে। তারপর চাপা স্বরে বলল, 'বুঝেছি। নৌকো বাইছিল রঞ্জন তাই না?'

'ইয়েস।'

'তার মানে তার হাতে দাঁড় ছিল।'

'ইয়েস।'

'অর্থাৎ একটা অস্ত্র ছিল, যেটা দিয়ে সে পিটারকে আঘাত করে। তার ফলে পিটার সংজ্ঞা হারিয়ে জলে পড়ে যায়। অর্থাৎ সে কোনও স্ট্রাগলই করেনি। আর রঞ্জন যে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল সেটা একটা অভিনয়। অর্থাৎ রঞ্জনই পিটারের মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

হুকিন্‌স মাথা চাপড়ে বলল, 'আমি তোমাদের আঘাত দিতে চাইনি। তাই সত্য গোপন করছিলাম। রঞ্জনের জায়গায় আমি থাকলে আমিও ওরই মতো করতাম। পিটার ওকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিচ্ছিল। বলছিল তোমার চামড়া সাদা হলে কী হবে, আসলে ব্ল্যাক নেটিভ। এতে কার মাথা ঠিক থাকে বলো!'

'তুমি ছাড়া এই ঘটনার সাক্ষী আর কেউ ছিল?'

'ইয়েস। ওনলি ওয়ান।'

'কে?'

'রেজিন্যাল্ড।'

'রেজিন্যাল্ড ডেক্সটর?'

'আমরা দু'জন একসঙ্গেই বসে সিগারেট খাচ্ছিলাম। সমস্ত ঘটনাই আমরা দু'জন একসঙ্গে দেখি। পরে আমি রনকে বাঁচাবার জন্য বলেছিলাম পিটার রনকে আক্রমণ করতে গিয়ে জলে পড়ে যায়। এদিকে রেজিন্যাল্ড অনবরত সত্যি ঘটনাটা বলে বেড়াচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সকলেই জানত যে রেজিন্যাল্ড ইন্ডিয়ানদের ঘৃণা করে, তাই তার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। থ্যাঙ্ক গড ফর দ্যাট—রন ওয়জ সাচ এ ফাইন বয়, সো জেনারাস, সো কাইন্ড।'

'এ ব্যাপারে তদন্ত হয়নি? ইনকুয়েস্ট হয়নি?'

'হয়েছিল বইকী।'

'তুমি সাক্ষী দিয়েছিলে?'

'ইয়েস।'

'মিথ্যে সাক্ষী তো?'

'তা বটে। অ্যান্ড ওয়জ উইলিং টু সেভ রঞ্জন। সেও অবশ্য সাক্ষী দিয়েছিল। আমি যা বলেছিলাম, সেও তাই বলেছিল।'

'আর রেজিন্যাল্ড? সে সাক্ষী দেয়নি?'

'হ্যাঁ—এবং সে সত্যি ঘটনাই বলেছিল। তবে তার কথায় ভারতীয় বিদ্বেষ এত প্রকাশ পাচ্ছিল যে জুরি তার কথা বিশ্বাস করেনি। তার রায় দিয়েছিল ডেথ বাই অ্যাক্সিডেন্ট।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার হিকিন্স। আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।'

হোটেলে ফিরলাম ডিনারের ঠিক আগে। রিসেপশন থেকে ঘরের চাবি নিচ্ছি, এমন সময় একজন কর্মচারী ফেলুদার দিকে চেয়ে বলল, 'মিস্টার মিটার?'

'ইয়েস।'

'তোমার একটি টেলিগ্রাম আছে।'

ফেলুদা টেলিগ্রামটা নিয়ে খুলে পড়ল। পাঠিয়েছেন রঞ্জন মজুমদার। তিনি বলছেন—'ক্যান রিকল এভরিথিং। রিটার্ন ইমিডিয়েটলি।'

'পারফেক্ট টাইমিং', বলল ফেলুদা। 'এখানের মামলা শেষ, কাল আমাদের রিটার্ন বুকিং, আর মিস্টার মজুমদারের স্মৃতি ফিরে এসেছে।'

প্লেনেই ফেলুদা বলেছিল যে দমদম থেকে সোজা মিস্টার মজুমদারের বাড়ি যাব। আমরা কলকাতায় পৌঁছালাম দুপুর একটা পাঁচে।

মনে গভীর উৎকণ্ঠা। রঞ্জনবাবু জানেন তিনি খুন করেছিলেন, এখন তিনি কী করবেন?

আমাদের ফেরার তারিখ আর সময় আগে থেকেই জানা ছিল, তাই লালমোহনবাবুর গাড়ি এয়ারপোর্টে হাজির ছিল।

রোল্যান্ড রোডে পৌঁছে বুকটা ধক্ করে উঠল। রঞ্জনবাবুর বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি কেন?

গাড়ি থেকে নেমে গেটের ভিতর ঢুকতেই আমাদের চেনা ইনস্পেকটর মণ্ডল গম্ভীর মুখে এগিয়ে এলেন।

'আজ সকাল আটটায় ব্যাপারটা ঘটেছে।'

'কী ব্যাপার?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'মিস্টার মজুমদার খুন হয়েছেন। সকালে নাকি একজন সাহেব এসেছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। সে কে তা জানা যায়নি। আপনি কোনও এনকোয়ারি করবেন?'

'না।'

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় লালমোহনবাবু এসে হাজির। ভদ্রলোক অত্যন্ত উত্তেজিত।

'পাঁচ নম্বরের পাতার খবরটা দেখেছেন?'

'কোন কাগজ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'স্টেটসম্যান—আবার কোন কাগজ।'

'না, এখনও দেখিনি।'

'প্রথম পাতায় তো মজুমদারের খবরটা রয়েছে—এবার পাঁচের পাতা দেখুন।'

ফেলুদা কাগজটা নিয়ে পাঁচের পাতা খুললে। 'নীচে বাঁ দিকে', বললেন জটায়ু।

খবরটা বার করে ফেলুদা পড়ে শোনাল। তার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—

॥ হোটেলে আত্মহত্যা ॥

সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে গতকাল রাত্রে গুলির আওয়াজ পেয়ে অনুসন্ধান করে দেখা যায় সাত নম্বর ঘরে একটি সাহেব মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁর হাতে রিভলভার। হোটেলের খাতা থেকে জানা যায় সাহেবের নাম রেজিন্যাল্ড ডেক্সটার। ইনি এসেছিলেন দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী খয়রাবাড়ি চা বাগান থেকে।

ডাঃ মুনসীর ডায়রি

Pradosh C. Mitter

Private Investigator

ডাঃ মুনসীর ডায়রি

আজ চায়ের সঙ্গে চানাচুরের বদলে সিঙাড়া। লালমোহনবাবু কিছুদিন থেকেই বলছেন, 'খাই-খাই' বলে একটা দোকান হয়েছে মশাই, আমার বাড়ি থেকে হাফ-এ-মাইল, সেখানে দুর্দান্ত সিঙাড়া করে। একদিন নিয়ে আসব।'

আজ সেই সিঙাড়া এসেছে, আর লালমোহনবাবুর কথা যে সত্যি, সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে।

'সামনের বৈশাখে আপনার যে বইটা বেরোবে তার ছক কাটা হয়ে গেছে ?' জিগেস করল ফেলুদা।

'ইয়েস স্যার ! কাম্পুচিয়ায় কম্পমান। এবার দেখবেন প্রখর রুদ্রের হাবভাব কায়দাকানুন অনেকটা ফেলু মিত্তিরের মতো হয়ে আসছে।'

'অর্থাৎ সে আরো প্রখর হয়ে উঠেছে, এই তো ?'

'তা তো বটেই।'

'গোয়েন্দার ইমপ্রুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্টিকর্তাও ইমপ্রুভ করছেন নিশ্চয়ই।'

'এই ক'বছর সমানে যে আপনার আশেপাশে ঘুর ঘুর করছি, তাতে অনেকটা বেনিফিট যে পাওয়া যাবে সেটা তো আপনি অস্বীকার করবেন না ?'

'সেটা মানব যদি আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন।'

'কী পরীক্ষা ?'

'পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরীক্ষা। বলুন তো আমার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখছেন কিনা। আপনি তো গতকালও সকালে এসেছিলেন ; আজকের আমি আর গতকালের আমির মধ্যে কোনো তফাত দেখছেন কি ?'

লালমোহনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে মিনিটখানেক ফেলুদাকে আপাদমস্তক স্টাডি করে বললেন, 'কই, না তো।' উঁহু। নো ডিফারেন্স। কোনো

তফাত নেই।' আপনি আমার দশ মিনিট

'হল না। ফেল। অতএব প্রখর রুদ্রও ফেল। কিছু দিনের আগে আমি প্রায় এক মাস পরে হাত আর পায়ের নখ কেটেছি। ওই দেখুন।'

চাঁদের মতো হাতের নখ এখনও মেঝেতে পড়ে আছে।

'তাও তো!'

লালমোহনবাবু কিছুক্ষণের জন্য খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে হঠাৎ ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'ভেরি ওয়েল; এবার আপনি বলুন তো দেখি আমার মধ্যে কী চেঞ্জ লক্ষ করছেন।'

'বলব?'

'বলুন।'

ফেলুদা চায়ের খালি কাপটা টেবিলে রেখে চারমিনারের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বলল, 'নাম্বার ওয়ান, আপনি কাল অবধি লাক্স টয়লেট সোপ ব্যবহার করেছেন; আজ সিন্থলের গন্ধ পাচ্ছি। খুব সম্ভবত টি. ভি.-র বিজ্ঞাপনের চটকের ফলে।'

'ঠিক বলেছেন মশাই। এনিথিং এল্স?'

'আপনি পাঞ্জাবির বোতাম সব কটাই লাগিয়ে থাকেন; আজ অনেকদিন পর দেখছি ওপরেরটা খোলা। নতুন পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগাতে অনেক সময় বেশ কসরত করতে হয়। ওপরেরটায় সেই কসরতে কোনো ফল হয়নি বলে মনে হচ্ছে।'

'রোকম ধরেছেন!'

'আরো আছে।'

'কী?'

'আপনি রোজ সকালে একটি করে রসুনের কোয়া চিবিয়ে খান; সেটা আপনি ঘরে এলেই বুঝতে পারি। আজ পারছি না।'

'আর বলবেন না। ভরদ্বাজটা এমন কেয়ারলেস। দিয়েছি কড়া করে ধমক। এইট্টিসিক্স থেকে রসুন ধরিচি মশাই, সকালে ডেইলি এক কোয়া। আমার সিসটেমটাই—'

জটায়ুর রসুনের গুণকীর্তন কমাতে হল, কারণ কলিং বেল বেজে উঠেছে। দরজা খুলে দেখি ফেলুদারই বয়সী এক ভদ্রলোক।

ফেলুদা উঠে দাঁড়াল।

'আসুন'—

'আপনিই তো?'

'আমার নাম প্রদোষ মিত্র।'

ভদ্রলোক সোফায় বসে বললেন, 'আমার নাম শঙ্কর মুন্সী। আমার বাবার

নাম হয়ত আপনি শুনে থাকবেন, ডাক্তার রাজেন মুন্সী।'

'সাইকায়াট্রিস্ট ?'

আমি জানতাম যারা মনের ব্যারামের চিকিৎসা করে তাদের বলে সাইকায়াট্রিস্ট।

'সেদিনই খবরের কাগজে ওঁর বিষয় একটা খবর পড়লাম না ? একটা ছবিও তো বেরিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন', বললেন শঙ্কর মুনসী। 'গত চল্লিশ বছর ধরে উনি একটা ডায়রি লিখেছেন, সেটা পেঙ্গুইন ছাপছে। আপনি হয়ত জানেন না। বাবার মনোবিজ্ঞানী হিসাবে সুনাম আছে ঠিকই, কিন্তু আরেকটা ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অসাধারণ ; সেটা হল শিকার। পঁচিশ বছর আগে শিকার ছাড়লেও, এই ডায়রিতে তাঁর শিকারের অভিজ্ঞতার বর্ণনাও আছে। পেঙ্গুইন এখনো লেখাটা পড়েনি ; সাইকায়াট্রিস্ট শিকারীর ডায়রি শুনেই ছাপার প্রস্তাব দেয়। তবে লেখক হিসেবে যে বাবার সুনাম আছে সেটা তারা জানে। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে চমৎকার ইংরিজিতে লেখা বাবার অনেক প্রবন্ধ নানান পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে।'

'খবরটা কি আপনারাই কাগজে দেন ?'

'না, ওটা প্রকাশকের তরফ থেকে বেরোয়।'

'আই সী।'

'যাই হোক, এবার আসল ব্যাপারটায় আসি। বাবার গর্ব হচ্ছে যে এ ডায়রিতে তিনি একটিও মিথ্যা কথা লেখেননি। তিনজন লোককে নিয়ে তিনটি ঘটনার উল্লেখ আছে ডায়রিতে। যাদের পুরো নামটা ব্যবহার না করে বাবা নামের প্রথম অক্ষরটা ব্যবহার করেছেন। এই অক্ষর তিনটি হল "এ", "জি", আর "আর"। এরা তিনজনেই আজ সমাজে সম্মানিত, সাক্সেসফুল ব্যক্তি। কিন্তু তিনজনেই, বেশ অনেককাল আগে, তিনটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেন, এবং তিনজনেই নানান ফিকিরে আইনের হাত থেকে রেহাই পান। যদিও পুরো নাম ব্যবহার না করার দরুন বাবা আইনের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবুও প্রকাশকের কাছ থেকে অফারটা পাবার পর বাবা তিনজনকেই ব্যাপারটা বলেন। "এ" আর "জি" প্রথমে আপত্তি তোলে, তারপর বাবা বুঝিয়ে বলার পর খানিকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়। "আর" নাকি কোনোরকম আপত্তি তোলেনি।

'গতকাল দুপুরে খেতে বসেছি, এমন সময় চাকর এসে বাবাকে একটা চিঠি দেয়। সেটা পড়ে বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। কারণ জিগ্যেস করাতে বাবার মুখে প্রথম "এ", "জি" আর "আর"-এর বিষয় শুনি, আগে কিছুই জানতাম না।'

'কেন ?'

'বাবা লোকটা একটু পিকিউলিয়ার। উনি পেশা আর পেশেন্ট ছাড়া আর কিছু

এটা বলব যে বাবার স্নেহ যেমন পাইনি, তেমনি তাঁর শাসনও ভোগ করিনি। আমি, মা, সংসার—এসব সম্পর্কেই বাবা সম্পূর্ণ উদাসীন। মা মানে আমার বিমাতা, স্টেপমাদার। আমার যখন তিন বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। তার দু বছর পরে বাবা আবার বিয়ে করেন। এই নতুন মা যে আমাকে খুব কাছে টেনে নিয়েছিলেন তা বলতে পারি না। আমাদের বাড়ির এক অনেক দিনের পুরানো চাকর আমার দেখাশুনা করত। সেই ব্যবধান এখনো রয়ে গেছে। যদিও জানেন না।'

'এবং তাঁর ডায়রিও পড়েননি?'

'না। শুধু আমি না, কেউই পড়েনি।'

'আসল প্রসঙ্গ থেকে আমরা একটু দূরে সরে এসেছি। ওই চিঠি কি এই তিনজনের একজন লিখেছেন?'

'ইয়েস, ইয়েস। এই দেখুন।'

শঙ্করবাবু একটা খাম বার করে ফেলুদাকে দিলেন। তা থেকে যে চিঠিটা বেরোল সেটা ফেলুদার পিছনে দাঁড়িয়ে আমি আর লালমোহনবাবুও পড়লাম। প্রথমেই তলায় দেখলাম 'এ'। তার উপর লেখা 'আই টেক ব্যাক মাই ওয়ার্ড। ডায়রি ছাপতে হলে আমার অংশ বাদ দিয়ে ছাপতে হবে। এটা অনুরোধ নয়, আদেশ। অমান্য করলে তার ফল ভোগ করতে হবে।'

'একটা প্রশ্ন আছে,' বলল ফেলুদা। 'এই তিন ব্যক্তির অপরাধের কথা আপনার বাবা জানলেন কী করে?'

'সেও খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। কৌশলে আইনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে "এ", "ডি" আর "আর" মনে শান্তি পায়নি। গভীর অনুশোচনা, শেষটায় ঘটনাচক্রে ধরা পড়ে যাবার ভয় ক্রমে মানসিক ব্যারামে দাঁড়ায়। বাবার তখনই দেশ নাম ডাক, এরা তিনজনেই বাবার কাছে আসে চিকিৎসার জন্য। সাইকায়াট্রিস্টের কাছে তো আর কিছু লুকোনো চলে না; সব প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিলে চিকিৎসাই হবে না। এই ভাবে বাবা এদের ঘটনাগুলো জানতে পারেন।'

'হুমকি কি শুধু "এ"-ই দিয়েছে?'

'এখন পর্যন্ত তাই, তবে "ডি" সম্বন্ধেও বাবার সংশয় আছে।'

'এই তিনজনের অপরাধ কী তা আপনি জানেন?'

'না। শুধু তাই না; এদের আসল নাম, এখন এরা কী করছে, এসব কিছুই বলেননি বাবা। তবে আপনাকে নিশ্চয়ই বলবেন।'

'উনি কি আমার খোঁজ করছেন?'

'সেই জন্যেই তো এলাম। বাবা ওঁর এক পেশেন্টের কাছ থেকে আপনার নাম শুনেছেন। আমাকে জিগ্যেস করাতে আমি বললাম গোয়েন্দা হিসেবে আপনার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাতে বাবা বললেন "মানুষের মনের চাবিকাঠি হাতে না

থাকলে ভালো গোয়েন্দা হওয়া যায় না। ওঁকে একটা কল দিতে পারলে ভালো হত। এইসব হুমকি-টুমকিতে শান্তিভঙ্গ হয়। ফলে কাজের ব্যাঘাত হয়। সেটা আমি একেবারেই চাই না।' আমি তখনই বাবাকে জিগেস করি মিত্তিরকে কখন আসতে বলব। বাবা বললেন, রবিবার সকাল দশটা। এখন আপনি যদি...'

'বেশ তো; আমার দিক থেকে আপত্তি করার তো কোনো কারণই নেই।'

'তাহলে এই কথা রইল। রবিবার সকাল দশটা, নাম্বার সেভ্‌ন সুইনহো স্ট্রীট।'

॥ ২ ॥

সাত নম্বর সুইনহো স্ট্রীট ডাক্তারের বাড়ি বলে মনেই হয় না ; তার সদর দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়ে একটা দাঁড়ানো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, আর তার পিছনের দেয়ালে উপর দিকে একটা বাইসনের মাথা ।

শঙ্করবাবু নিচেই অপেক্ষা করছিলেন, আমরা তাঁর সঙ্গে দোতলায় গিয়ে বৈঠকখানায় বসলাম । এঘরেও চতুর্দিকে শিকারের চিহ্ন । ভদ্রলোক ডাক্তারি করে এত জানোয়ার মারার সময় কী করে পেলেন তাই ভাবছিলাম ।

মিনিট খানেকের মধ্যেই ডাঃ মুনসী এসে পড়লেন । মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে, তবে এখনো যে বেশ শক্ত সমর্থ সেটা দেখলেই বোঝা যায় । ভদ্রলোক ফেলুদার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, 'আপনারও ব্যায়াম করা শরীর বলে মনে হচ্ছে । ভেরি গুড । আপনার কাজ প্রধানত মাথার হলেও আপনি যে শরীরের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন সেটা দেখে ভালো লাগল ।'

এবার ভদ্রলোক জটায়ু ও আমার দিকে চাইতে ফেলুদা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল ।

'এঁরা ট্রাস্টওয়র্দি কি ?' ডাঃ মুনসী প্রশ্ন করলেন ।

'সম্পূর্ণ', বলল ফেলুদা, 'তপেশ আমার খুড়তুতো ভাই এবং আমার সহকারী, আর মিঃ গাঙ্গুলী আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ।'

'এই জন্যে জিগ্যেস করছি কারণ আজ সেই তিন ব্যক্তির আসল পরিচয় আমাকে দিতে হবে, না হলে আপনি কাজ করতে পারবেন না । এই পরিচয় শুধু আপনারা তিনজনই জানবেন, আর কেউ জানে না, আর কাউকে বলিনি ।'

'আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন, ডাঃ মুনসী', বললেন জটায়ু । 'আমি অন্তত আর কাউকে বলব না ।'

'ভেরি ওয়েল ।'

'তাহলে বলুন কী করতে পারি । হুমকি চিঠির কথা আপনার ছেলে বলেছেন ।'

'শুধু হুমকি চিঠি নয়', বললেন ডাঃ মুনসী, 'হুমকি টেলিফোনও বটে । এটা কাল রাত্রের ঘটনা । তখন সাড়ে এগারোটা । বোঝাই যায় মত্ত অবস্থায় ফোন করছে । হিগিন্স । জর্জ হিগিন্স ।'

'আপনার ডায়রির "জি" ?'

'ইয়েস । বলে কী—"সেদিন টেলিফোনে আমি অত্যন্ত বোকার মতো কথা বলেছি । যখন তোমার কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য যাই, তখন আমার যে ব্যবসা ছিল, এখনও সেই ব্যবসাই রয়েছে । একচেটিয়া ব্যবসা আমার, সুতরাং 'জি' থেকে অনেকেই আমার আসল পরিচয় অনুমান করতে পারবে । সো কাট মি আউট ।"

মাতালকে তো আর যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝানো যায় না। ফলে ফোন রেখে দিতে হল। বুঝতেই পারছেন, আমি রুগী নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে এদের বাড়ি গিয়ে সামনাসামনি কথা বলে যে কিছু বোঝাবো তার সময় বা সামর্থ্য আমার নেই। এ কাজের ভারটা আমি আপনাকে দিতে চাই। "এ" এবং "জি"। "আর"-কে নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। কারণ তার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি যে নামের আদ্যক্ষর থেকে তাকে কেউ চিনে ফেলবে এ আশঙ্কা তার নেই।'

'কিন্তু এই তিনজনের আসল পরিচয়টা— !'

'কাগজ পেনসিল আছে ?'

ফেলুদা পকেট থেকে নোটবুক আর ডট পেন বার করল।

'লিখুন,"এ" হল অরুণ সেনগুপ্ত। ম্যাকনীল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার, রোটারি ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বাসস্থান এগারো নম্বর রোল্যান্ড রোড। ফোন নম্বর ডিরেক্টরিতে দেখে নেবেন।'

ফেলুদা চটপট ব্যাপারটা লিখে নিল।

'এবার লিখুন',বলে চললেন ডাঃ মুনসী,"জি" হল জর্জ হিগিন্‌স। টেলিভিশনের জন্য বিদেশে ক্যামেরার চালান দেবার ব্যবসা এঁর। বাড়ির নম্বর নব্বুই রিপন স্ট্রীট। বাঙালি নাম থেকে বুঝতে পারবেন উনি পুরো সাহেব নন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। তৃতীয় ব্যক্তির আসল পরিচয় প্রয়োজন হলে দেব, নচেৎ নয়।'

'এদের অপরাধগুলো ?'

'শুনুন, আমার পাণ্ডুলিপি আজ আপনি নিয়ে যাবেন। মন দিয়ে পড়ে আপনার বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করে আমাকে বলবেন এতে আপত্তিকর কিছু আছে কিনা যার ফলে বইটা বাজারে বেরোলে আমার ক্ষতি হতে পারে।'

'ঠিক আছে। তাহলে—'

ফেলুদাকে থামতে হল, কারণ ঘরে তিনজন লোকের প্রবেশ ঘটেছে। ডাঃ মুনসী তাদের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনি আসছেন শুনে এঁরা সকলেই আপনাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমার স্ত্রী ছাড়া এই কজন এবং আমার ছেলেই এখন আমার বাড়ির বাসিন্দা। আলাপ করিয়ে দিই, এ হচ্ছে সুখময় আমার সেক্রেটারি।'

একজন চশমা-পরা বছর চল্লিশেকের ভদ্রলোকের দিকে দেখালেন ডাঃ মুনসী।

'আর ইনি হচ্ছেন আমার শালক চন্দ্রনাথ।'

এঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেখে কেন জানি মনে হয় ইনি বিশেষ কিছু করেন-টরেন না, এ বাড়িতে আশ্রিত হয়ে রয়েছেন।

'আর ইনি আমার পেশেন্ট রাধাকান্ত মল্লিক। এঁর চিকিৎসা শেষ না হওয়া

পর্যন্ত এখানেই আছেন।'

ওঁকে দেখে মনে হয় ওঁর অসুখ এখনো সারেনি। হাত কচলাচ্ছেন, চোখ পিট পিট করছেন, আর একটানা সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। বয়স আন্দাজ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ।

পরিচয়ের পরে একমাত্র সুখময়বাবু ছাড়া আর সকলেই চলে গেলেন। ডাঃ মুনসী সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন, 'সুখময়, যাও, আমার লেখাটা এনে প্রদোষবাবুকে দাও।'

ভদ্রলোক দু মিনিটের মধ্যে একটা বড়, মোটা খাম এনে ফেলুদাকে দিলেন।

'এর কিন্তু আর কপি নেই', বললেন ডাঃ মুনসী। 'পাবলিশারকে দেবার আগে ওটা সুখময় টাইপ করে দেবে।'

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না', বলল ফেলুদা, 'আমি এটার মূল্য খুব ভালোভাবেই জানি।'

আমরা উঠে পড়লাম। শঙ্করবাবু পাশের ঘরেই অপেক্ষা করছিলেন। এবার এসে আমাদের সদর দরজা অবধি পৌঁছে দিলেন। তারপর লালমোহনবাবুর সবুজ অ্যাম্বাসাডরে চড়ে আমরা বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

'একটা রিকুয়েস্ট আছে মশাই', লালমোহনবাবু হঠাৎ বললেন।

'কী ?'

'আপনার পড়া হলে পর আমি একবার দু দিনের জন্য পাণ্ডুলিপিটা নেবো। এটা রিফিউজ করবেন না, প্লীজ !'

'আপনার না পড়লেই নয় ?'

'না-পড়লেই নয়। বিশেষ করে শিকার কাহিনী পড়তে আমার দুর্দান্ত লাগে।'

'বেশ, দেবো। তবে দু দিন নয়; আপনি যে সকালে নেবেন, তার পরের দিন সকালেই ফেরত দিতে হবে। তার মধ্যে শিকারের অংশ আপনার নিশ্চয়ই পড়া হয়ে যাবে। কারণ ১৯৬৫-এর পর তো আর ভদ্রলোক শিকার করেননি।'

'তাই সই।'

॥ ৩ ॥

ডাঃ মুনসীর হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার হলেও, তিনশো পঁচাত্তর পাতার পাণ্ডুলিপিটা পড়তে ফেলুদার লাগল তিন দিন। এত সময় লাগার একটা কারণ অবিশ্যি এই যে ফেলুদা পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অনেক কিছু নিজের খাতায় নোট করে নিচ্ছিল।

তিন দিনের পরের দিন রবিবার সকালে যথারীতি জটায়ু এসে হাজির। প্রথম প্রশ্নই হল, 'কী স্যার, হল ?'

'হয়েছে।'

'আপনি কী সিদ্ধান্তে এলেন শুনি। এ ডায়রি নির্ভয়ে ছাপার যোগ্য?'

'সম্পূর্ণ। তবে তাতে তো হুমকি বন্ধ করা যায় না। এই তিনজনের একজনও যদি ধরে বসে থাকে যে নামের আদ্যাক্ষর থেকেই লোকে বুঝে ফেলবে কার কথা বলা হচ্ছে তাহলে সে এ বই ছাপা বন্ধ করার জন্য কী যে না করতে পারে তার ঠিক নেই।'

'ইভ্‌ন মার্ডার?'

'তা তো বটেই। একজনের কথাই ধরা যাক। "এ"। অরুণ সেনগুপ্ত। পূর্ববঙ্গের এক জমিদার বংশের ছেলে। যুবা বয়সে ছিলেন এক ব্যাঙ্কের মধ্য পদস্থ কর্মচারী। কিন্তু রক্তের মধ্যে ছিল চূড়ান্ত সৌখিনতা। ফলে প্রতি মাসেই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। শেষে কাবুলিওয়ালার শরণাপন্ন হওয়া।'

এই ফাঁকে বলে রাখি, ফেলুদা একবার বলেছিল যে আজকাল আর দেখা যায় না বটে কিন্তু বছর কুড়ি আগেও রাস্তার মোড়ে মোড়ে দেখা যেত লাঠি হাতে কাবুলিওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। এদের ব্যবসা ছিল মোটা সুদে টাকা ধার দেওয়া।

ফেলুদা বলে চলল, 'একটা সময় আসে যখন দেনার অঙ্কটা এমন ফুলে ফেঁপে ওঠে যে মরিয়া হয়ে অরুণ সেনগুপ্তকে ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে চল্লিশ হাজার টাকা চুরি করতে হয়। কিন্তু সেটা সে এমন কৌশলে করে যে দোষটা গিয়ে পড়ে একজন নির্দোষ কর্মচারীর উপর। ফলে সে বেচারিকে জেল খাটতে হয়।'

'বুঝেছি,' বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললেন জটায়ু। 'তারপর অনুশোচনা, তারপর মাথার ব্যারাম, তারপর মনোবিজ্ঞানী। ...কিন্তু ভদ্রলোক যে এখন একেবারে সমাজের উপর তলায় বাস করছেন। তার মানে মুনসীর চিকিৎসায় কাজ দিয়েছিল?'

'তা তো বটেই। সে কথা মুনসী তাঁর ডায়রিতে লিখেওছেন—যদিও তারপরে আর কিছু লেখেননি। কিন্তু আমরা বেশ অনুমান করতে পারি যে এই ঘটনার পর সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই তার জীবনের ধারা পালটে ফেলে ত্রিশ বছর ধরে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উপরে উঠে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছেন। বুঝতেই পারেন সেখান থেকে আবার পিছলে পড়ার আশঙ্কা যদি দেখা দেয়, যতই অমূলক হোক, তাহলে সেনগুপ্ত সাহেব মাথা ঠিক রাখেন কী করে?'

'বুঝলাম,' বললেন জটায়ু, 'আর অন্য দুজন?'

"আর" ব্যক্তি সম্বন্ধে চিন্তার কোনো কারণ নেই সে তো সেদিন মুনসীর মুখেই শুনলেন। এঁর আসল নামটা উনি বলেননি, তাই আমিও বলতে পারছি না। ইনি এককালে একটি লোককে গাড়ি চাপা দিয়ে মারেন, তারপর এদিকে ওদিকে মোটা ঘুষ দিয়ে আইনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচান। ইনিও ডাঃ মুনসীর হাতে

নিজেকে সমর্পণ করে বিবেকযন্ত্রণা থেকে রেহাই পান।—ইন্টারেস্টিং হল ষষ্ঠ-এর ঘটনা।'

'কী রকম?'

'হিনি যে ফিরিঙ্গি সে তো জানেন। আর এঁর ব্যবসার কথাও জানেন। পঁচিশ নম্বর রিপন স্ট্রিটে একটি বড় দোতলা বাড়িতে থাকতেন ফ্র্যাঙ্ক হিগিন্স। ১৯৫০-এ এক সুইডিশ ফিল্ম পরিচালক কলকাতায় আসেন ভারতবর্ষের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ছবি করবেন বলে। তাঁর গল্পের জন্য একটি লেপার্ডের প্রয়োজন ছিল। উনি হিগিন্সের খবর পেয়ে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। হিগিন্সের একটা লেপার্ড ছিল বটে, কিন্তু সেটা রপ্তানীর জন্য নয়; সেটা তার পোষা! অনেক টাকা দিয়ে সুইডিশ পরিচালক একমাসের জন্য লেপার্ডটাকে ভাড়া করেন। এবং ফিল্ম একমাস পরে তিনি অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেবেন। আসলে কিন্তু পরিচালক মিথ্যা কথা বলেন, কারণ তাঁর গল্পে ছিল গ্রামবাসীরা সবাই মিলে লেপার্ডটাকে মেরে ফেলে। এক মাস পরে পরিচালক এসে হিগিন্সকে আসল ঘটনাটা বলে। হিগিন্স প্রচণ্ড রেগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তখনই পরিচালকের টুঁটি টিপে তাকে মেরে ফেলে। পরমুহূর্তে রাগ চলে গিয়ে তার জায়গায় আসে আতঙ্ক। কিন্তু সেই অবস্থাতেও পুলিশের চোখে ধুলো দেবার ফন্দি হিগিন্স বার করে। সে প্রথমে ছুরি দিয়ে মৃত পরিচালকের সর্বাঙ্গ ক্ষতচিহ্নে ভরিয়ে দেয়। তারপর তার কালেকশনের একটা হিংস্র বনবেড়ালকে খাঁচার দরজা খুলে বাইরে বার করে সেটাকে গুলি করে মারে। ফলে ব্যাপারটা দাঁড়ায়, খাঁচা ছাড়া বনবেড়াল পরিচালককে হত্যা করে এবং বনবেড়ালকে হত্যা করে হিগিন্স। ফিকিরটা কাজে দেয়, হিগিন্স আইনের হাত থেকে বাঁচে। কিন্তু তারপর একমাস পরে ক্রমাগত স্বপ্নে নিজেকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে দেখে অবশেষে মুনসীর চেম্বারে গিয়ে হাজির হয়।'

'হুঁ...' বললেন জটায়ু। 'তাহলে এখন কিং কর্তব্য?'

'দুটো কর্তব্য,' বলল ফেলুদা। 'এক হল পাণ্ডুলিপিটা আপনাকে দেওয়া, আর দুই—এঁকে একটা টেলিফোন করা।'

জটায়ু হাসিমুখে ফেলুদার হাত থেকে পাণ্ডুলিপি ভরা মোটা খামটা নিয়ে বললেন, 'ফোন করবেন কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার জন্য?'

'ন্যাচারেলি,' বলল ফেলুদা। 'আর দেরি করার কোনো মানে হয় না। তোপসে—এ সেনগুপ্ত, ১১ রোল্যান্ড রোড, নম্বরটা বার করতো।'

আমি ডাইরেক্টরিটা হাতে নিতেই ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ডাঃ মুনসী। ফেলুদাকে বলতেই ও আমার হাত থেকে ফোনটা ছিনিয়ে নিল।

ব্যাপার আর কিছুই নয়—সেনগুপ্ত আরেকটা হুমকি চিঠি দিয়েছেন। তাতে কী বলা হয়েছে সেটা ফেলুদা তার খাতায় লিখে নিল। তারপর ফেলুদা তার শেষ কথাটা বলে ফোনটা রেখে দিল।

সেনগুপ্তর দ্বিতীয় হুমকিটা হচ্ছে এই—'সাতদিন সময়। তার মধ্যে কলকাতার প্রত্যেক বাংলা ও ইংরিজি কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখতে চাই যে অনিবার্য কারণে কাহিনি ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। সাতদিন। তারপরে আর হুমকি নয়—কাজ, এবং কাজটা আপনার পক্ষে প্রীতিকর হবে না বলাই বাহুল্য।'

আমি সেনগুপ্তর ফোন নম্বর বার করে ডায়াল করে একবারেই লাইন পেয়ে গেলাম; ফেলুদার হাতে ফোনটা চালান দিয়ে আমি আর জটায়ু কেবল ফেলুদার কথাটাই শুনলুম। সেটা শুনে যা দাঁড়াল তা এই—

'হ্যালো—মিঃ সেনগুপ্তর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি—অরূপ সেনগুপ্ত?'

'——'

'মিঃ সেনগুপ্ত? আমার নাম প্রদোষ মিত্র।'

'——'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। ইয়ে—আমায় একদিন পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারেন?'

'——'

'তাই বুঝি? আশ্চর্য তো! কী ব্যাপার?'

'——'

'তা পারি বৈকি। কটায় গেলে আপনার সুবিধে?'

'——'

'ঠিক আছে। তাই কথা রইল।'

'ভাবতে পারিস?' ফোনটা রেখে বলল ফেলুদা, 'ভদ্রলোক নাকি আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাকে ফোন করতেন।'

'কেন, কেন?' প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

'সেটা ফোনে বললেন না, সামনা সামনি বলবেন।'

'কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট?'

'আধ ঘণ্টা বাদে।'

॥ ৪ ॥

এগারো নম্বর রোল্যান্ড রোড সাহেবী আমলের দোতলা বাড়ি। দরজার বেল টিপতে একজন উর্দিপরা বেয়ারার আবির্ভাব হল। সে কার্পেট ঢাকা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আমাদের দোতলায় নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসালো। মিনিট দুয়েকের

মধ্যেই মিঃ সেনগুপ্ত প্রবেশ করলেন। বাড়ির সঙ্গে মানানসই সাহেবী মেজাজ ; পরনে ড্রেসিং গাউন, পায়ে বেডরুম স্লিপার, হাতে চুরুট।

পরিচয় পর্ব শেষ হলে পর ভদ্রলোক জিগেস করলেন, 'আপনারা ড্রিংক করেন ?'

'আজ্ঞে না', বলল ফেলুদা।

'আমি যদি বিয়ার খাই আশা করি আপনারা মাইন্ড করবেন না ?'

'মোটেই না।'

ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে নিজের জন্য বিয়ার আর আমাদের তিনজনের জন্য চায়ের অর্ডার দিয়ে ফেলুদার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি আমাকে কেন ফোন করতে যাচ্ছিলেন সেটা আগে বলতে আপনার কোনো আপত্তি আছে ? তারপর আমি আমার দিকটা বলব।'

'বেশতো। জে. পি. চাওলার নাম শুনেছেন ?'

'ব্যবসাদার ? জয়প্রসাদ চাওলা ? যার নামে চাওলা ম্যানসনস ?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর এক নাতি তো— ?'

'হ্যাঁ। মিসিং। সম্ভবত কিড্‌ন্যাপড্‌।'

'কাগজে দেখছিলাম বটে।'

'গুরুপ্রসাদ আমার অনেকদিনের বন্ধু। পুলিশ তদন্ত করছে বটে, কিন্তু আমি ওকে আপনার নাম সাজেস্ট করি। তুলসী সেহানবিশের কাছে আপনার খুব সুখ্যাতি শুনেছি।'

'হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে ওঁকে আমি হেল্প করি।'

'তাহলে চাওলাকে কী বলব ?'

'মিঃ সেনগুপ্ত, দুঃখের বিষয় আমি অলরেডি একটা কেস হাতে নিয়ে ফেলেছি।'

'আই সী।'

'আর সেই ব্যাপারেই আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'কী ব্যাপারে শুনি ?'

'আমি ডাঃ মুনসীর কাছ থেকে আসছি।'

'হোয়াট !'

ভদ্রলোক সোফা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।—'মুনসী আপনাকে আমার পরিচয় দিয়ে দিয়েছে ? তার মানে তো আর কদিনে পাঁচশো লোক জেনে যাবে মুনসীর ডায়রির "এ" ব্যক্তিটি আসলে কে।'

'মিঃ সেনগুপ্ত, আমি অত্যন্ত সাবধানী লোক। গোপন ব্যাপার কী করে গোপন রাখতে হয় তা আমি জানি। আমার উপর আপনি সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারেন। তবে আপনি যদি ঘন ঘন ডাঃ মুনসীকে হুমকি চিঠি দেন, তার ফল কী হবে সেটা আমি জানি।'

'আমি হুমকি চিঠি দেব না কেন ? আপনি ডায়রিটা পড়েছেন ?'

'পড়েছি।'

'আপনার কী মনে হয়েছে ?'

'ত্রিশ বছরের পুরানো ঘটনা। এর মধ্যে অন্তত শ' পাঁচেক ব্যাঙ্কে তহবিল তছরুপ হয়েছে। যারা এ কাজ করেছে হয়ত তাদের অনেকেরই নামের প্রথম অক্ষর "এ"। সুতরাং আপনার ভয় সম্পূর্ণ অমূলক।'

'মুনসী কি ব্যাঙ্কের নাম করেছে ?'

'না।'

'আমার ব্যাঙ্কে দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল যারা চুরির ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করে, কারণ ঠেকায় পড়ে আমি দুজনের কাছে টাকা ধার চেয়েছিলাম। দুজনেই অবিশ্যি রিফিউজ করে।'

'মিঃ সেনগুপ্ত, আমি আবার বলছি—আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। আর এই ধরনের চিঠি দিয়ে আপনার লাভটা কী হচ্ছে? ডাঃ মুনসী আইনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ। অর্থাৎ আপনি কোনো লিগ্যাল স্টেপ নিতে পারছেন না। তা হলে কি আপনি আইনের বাইরে কোনো রাস্তা ভাবছেন?'

'আমার বিপদের আশঙ্কা দেখলে আমি আইন-টাইন মানব না মিঃ মিত্তির। আমার অতীতের ইতিহাস থেকেই আপনি বুঝছেন যে প্রয়োজনে বেপরোয়া কাজ করতে আমি দ্বিধা করি না।'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মিঃ সেনগুপ্ত। তখনকার আপনি আর এখনকার আপনি কি এক? আজ আপনি সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি। এই অবস্থায় আপনি এমন একটা ঝুঁকি নেবেন?'

মিঃ সেনগুপ্ত মিনিট খানেক কিছু না বলে কেবল চুক চুক করে বিয়ার খেলেন। তারপর তাঁর চাউনির সামান্য পরিবর্তন দেখা গেল। তারপর তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এক চুমুকে বাকি বিয়ারটা শেষ করে গেলাসটা টেবিলে রেখে বললেন, 'ঠিক আছে—ডান ইট! লেট হিম গো অ্যাহেড।'

'আপনি তাহলে হুমকির ব্যাপারে ইতি দিচ্ছেন?'

'ইয়েস ইয়েস ইয়েস!—তবে বিপদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা দেখলেই কিন্তু'—

'আর বলতে হবে না', বলল ফেলুদা, 'বুঝেছি।'

॥ ৫ ॥

লালমোহনবাবু কথামতো পরদিন সকালেই পাণ্ডুলিপিটা ফেরত নিয়ে এলেন। ফেলুদা বলল, 'এখন আর চা খাওয়া হবে না। কারণ আধ ঘণ্টার মধ্যেই "ভি"-র সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

নব্বুই নম্বর রিপন স্ট্রীটের দরজায় বেল টিপতে যাঁর আবির্ভাব হল তাঁর মাথায় টাক, কানের পাশের চুল সাদা, আর এক জোড়া বেশ তাগড়াই গোঁফ, তাও সাদা।

'মিঃ মিটার, আই অ্যাম জর্জ হিগিন্‌স।'

তিনজনের সঙ্গেই করমর্দনের পর হিগিন্‌স আমাদের নিয়ে দোতলায় চলল। গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকেই দুটো বেশ বড় খাঁচা দেখেছি, তার একটায় বাঘ, অন্যটায় দুটো হায়না। দোতলায় উঠে বাঁয়ে একটা ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম তাতে গোটা পাঁচেক কোয়ালা ভালুক বসে আছে মেঝেতে।

বসবার ঘরে পৌঁছে সোফায় বসে হিগিন্‌স ফেলুদাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, 'ইউ আর এ ডিটেকটিভ?'

'এ প্রাইভেট ওয়ান', বলল ফেলুদা।

বাকি কথাও ইংরিজিতেই হল, যদিও হিগিন্স মাঝে মাঝে হিন্দিও বলে ফেলছিলেন, বিশেষ করে কারুর উদ্দেশে গালি দেবার সময়। অনেকেরই উপরেই ভদ্রলোকের রাগ। যদিও কারণটা বোঝা গেল না। অবশেষে বললেন, 'মল্লিক তাহলে এখনো প্র্যাকটিস করে? আই মাস্ট সে, সে আমার বিপদের সময় অনেক উপকার করেছিল।'

'তাহলে আর আপনি তাকে শাসাচ্ছেন কেন?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

হিগিন্স একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'সেটার একটা কারণ হচ্ছে সেদিন রাত্রে

নেশার মাত্রাটা একটু বেশি হয়েছিল। তবে মানুষের কি ভয় করে না? আমার বাবা কী ছিলেন জান? স্টেশন মাস্টার। আর আমি নিজের চেষ্টায় আজ কোথায় এসে পৌঁছেছি দেখ। এ আমার একচেটিয়া ব্যবসা। মানসির ডায়রি ছাপা হলে যদি আমাকে কেউ চিনে ফেলে তাহলে আমার আর আমার ব্যবসার কী দশা হবে ভাবতে পার?'

ফেলুদাকে আবার বোঝাতে হল যে হিগিন্স আইন বাঁচিয়ে কিছুই করতে পারবেন না। ওঁকে আবার বাঁকা রাস্তায় যেতে হবে। 'সেটাই কি তুমি চাইছ?' বেশ জোরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ফেলুদা। 'তাতে কি তোমার প্রেসটিজ আরো বেশি বিপন্ন হবে না?'

হিগিন্স কিছুক্ষণ চুপ করে বিড়বিড় করে বললেন, 'একবার কেন, শতবার খুন করতে পারতাম ও পাজি সুইন্ডলটাকে। বাহাদুর, আমার সাধের লেপার্ড, মাত্র চার বছর বয়স, তাকে কিনা লোকটা মেরে ফেলল!...'

আবার দশ সেকেন্ডের জন্য কথা বন্ধ; তারপর হঠাৎ সোফার হাতল চাপড়ে গলা তুলে হিগিন্স বললেন, 'ঠিক আছে: মানসিকে বলো আমি কোনো পরোয়া করি না। ও যা করছে করুক, বই বেরোলে লোকে আমাকে চিনে ফেললেও আই ডোন্ট কেয়ার। আমার ব্যবসা কেউ টলাতে পারবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মি. হিগিন্স, থ্যাঙ্ক ইউ।'

অরুণ সেনগুপ্তর খবরটা ফেলুদা আগেই ফোনে ডাঃ মুনসীকে জানিয়ে দিয়েছিল। হিগিন্সের খবরটা দিতে আমরা মুনসীর বাড়িতে গেলাম, কারণ পাণ্ডুলিপিটা ফেরত দেবার একটা ব্যাপার ছিল। ভদ্রলোক ফেলুদাকে একটা বড় রকম ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'তাহলে তো আপনার কর্তব্য সারা হয়ে গেল। এবারে আপনার ছুটি!'

'আপনি ঠিক বলছেন? "আর" সম্বন্ধে কিছু করার নেই তো?'

'নাথিং।...আপনি আপনার বিল পাঠিয়ে দেবেন, আমি ইমিডিয়েটলি পেমেন্ট করে দেব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

'এটাকে কি মামলা বলা চলে?' বাড়ি ফিরে এসে বলল জটায়ু।

'মিনি মামলা বলতে পারেন। অথবা মামলাপু।'

'যা বলেছেন।'

'আশ্চর্য এই যে এমন গর্হিত কাজ করার পঁচিশ ত্রিশ বছর পরে লোকগুলো শুধু বেঁচে নেই, দিব্যি সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে চালিয়ে যাচ্ছে।'

'হক্ কথা', বললেন জটায়ু। 'কালই বাড়িতে বসে ভাবছিলুম ত্রিশ বছর আগে

যাদের চিনতুম তাদের কারুর সঙ্গে আজও যোগাযোগ আছে কিনা, বা তারা এখন কে কী করছে সেটা জানি কিনা। বিশ্বাস করুন আজই আধ ঘণ্টা ভেবে শুধু একটা নাম মনে পড়ল, অপরেশ চাটুজ্যে, যার সঙ্গে একসঙ্গে বসে বায়োস্কোপ দেখেছি, ফুটবল খেলা দেখেছি, সাঙ্গুভ্যালিতে বসে চা খেয়েছি।'

'সে এখন কী করে জানেন?'

'উঁহু। আউট অফ টাচ। কমপ্লিটলি। কবে কীভাবে যে ছাড়াছাড়িটা হল, সেটা অনেক ভেবেও মনে করতে পারলুম না।'

পরদিন সকালে লালমোহনবাবু এসে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনাকে একটু ডাউন বলে মনে হচ্ছে? কোনওকিছু ভালো লাগছে না বুঝি।'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'নো স্যার, তা নয়, একটা ব্যাপারে কৌতূহল নিবৃত্তি হল না বলে অসোয়াস্তি লাগছে।'

'কী ব্যাপার?'

'"আর" ব্যক্তিটির আসল পরিচয়। ইনি একটা হুমকি-টুমকি দিলে মন্দ হত না।'

'রটন, রাবিশ, রিডিকুলাস', বললেন জটায়ু। '"আর" জাহান্নমে যাক। আপনি আপনার যা প্রাপ্য তা তো পাচ্ছেনই।'

'তা পাচ্ছি।'

ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। 'হ্যালো' বলতেই ওদিক থেকে কথা এল 'আমি শঙ্কর বলছি।' আমি ফোনটা ফেলুদার হাতে চালান দিলাম।

'বলুন স্যার।'

উত্তরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদার কপালে গভীর খাঁজ পড়ল। তিন-চারটে 'হুঁ' বলেই ফেলুদা ফোনটা রেখে দিয়ে বলল, 'সাংঘাতিক খবর! ডাঃ মুনসী খুন হয়েছেন, আর সেই সঙ্গে ডায়রিও উধাও।'

'বলেন কী!' চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন জটায়ু।

'ভেবেছিলাম শেষ। আসলে এই সবে শুরু।'

আমরা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে লালমোহনবাবুর গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম।

সুইনহো স্ট্রীটে পৌঁছে দেখি পুলিশ আগেই হাজির। ইনস্পেক্টর সোম ফেলুদার চেনা, বললেন, 'মাঝ রাত্তিরে খুনটা হয়েছে, মাথার পিছন দিকে ভারী কিছু দিয়ে মেরেছে।'

'কে প্রথম জানল?'

'ওঁর বেয়ারা। ভদ্রলোক ভোর ছটায় চা খেতেন। সেই সময়ই বেয়ারা

ব্যাপারটা জানতে পারে। ডাঃ মুনসীর ছেলে বাড়ি ছিলেন না। পুলিশে খবর দেন ডাঃ মুনসীর সেক্রেটারি।'

'আপনাদের জেরা হয়ে গেছে?'

'তা হয়েছে; তবে আপনি নিজের মতো করুন না। আপনি যে আমাদের কাজে ব্যাঘাত করবেন না সেটা আমি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি। আর চারটি তো প্রাণী. ভদ্রলোকের ছেলে, সেক্রেটারি, শ্যালক আর পেশেন্ট। অবিশ্যি মিসেস মুনসী আছেন; তাঁকে কিছু জিগ্যেস করিনি এখনো।'

আমরা তিনজন শঙ্করবাবুর সঙ্গে দোতলায় রওনা দিলাম। সিঁড়ি ওঠার সময় ভদ্রলোক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনেক কিছুই আশঙ্কা করছিলাম, কিন্তু এটা করিনি।'

বাবার ঘরে পৌঁছে ফেলুদা বলল, 'আপনি যখন রয়েছেন তখন আপনাকে দিয়েই শুরু করি।'

'বেশতো। কী জানতে চান বলুন।'

আমরা সকলে বসলাম। চারিদিকে জন্তু জানোয়ারের ছাল, মাথা ইত্যাদি দেখে মনে হচ্ছিল, এতবড় শিকারী, আর এইভাবে তাঁর মৃত্যু হল!

ফেলুদা জেরা আরম্ভ করে দিল।

'আপনার ঘর কি দোতলায়?'

'হ্যাঁ। আমারটা উত্তর প্রান্তে, বাবারটা দক্ষিণ প্রান্তে।'

'আপনি আজ সকালে বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

আমাদের ডাক্তারের ফোন খারাপ। উনি রোজ ভোরে লেকের ধারে হাঁটেন, তাই ওঁকে ধরতে গিয়েছিলাম। কদিন থেকেই মাথাটা ভার-ভার লাগছে। মনে হচ্ছিল প্রেশারটা বেড়েছে।

'প্রেশার কি আপনার বাবা দেখে দিতে পারতেন না?'

'এটা বাবার আরেকটা পিকিউলারিটির উদাহরণ। উনি বলেই দিয়েছিলেন আমাদের বাড়ির সাধারণ ব্যারামের চিকিৎসা উনি করবেন না। সেটা করেন ডাঃ প্রণব কর।'

'আই সী...একটা কথা আপনাকে বলি শঙ্করবাবু, আপনি যে বলেছিলেন ডাঃ মুনসী আপনার সম্বন্ধে উদাসীন, ডায়রি পড়ে কিন্তু সেরকম মনে হয় না। ডায়রিতে অনেকবার আপনার উল্লেখ আছে।'

'ভেরি সারপ্রাইজিং!'

'আপনার ডায়রিটা পড়ার ইচ্ছে হয় না ?'

'অত বড় হাতে লেখা ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়ার ধৈর্য আমার নেই।'

'এটা অবশ্য আশা করা যায় যে আপনার বিষয় যেটা সত্যি সেটাই উনি লিখেছেন।'

'বাবার দৃষ্টিতে যেটা সত্যি বলে মনে হয়েছে সেটাই উনি লিখেছেন। সে দৃষ্টির সঙ্গে আর পাঁচজনের দৃষ্টি নাও মিলতে পারে। আমার বলার ইচ্ছে এই, যে বাবা আমাকে চিনলেন কী করে ? তিনি তো সর্বক্ষণ রুগী নিয়েই পড়ে থাকতেন।'

'আপনার বাবার মাসিক রোজগার কত ছিল সে সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে ?'

'সঠিক নেই, তবে উনি যে ভাবে খরচ করতেন তাতে মনে হয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।'

'উনি যে উইল করে গিয়েছিলেন সেটা আপনি জানেন ?'

'না।'

'গত বছর পয়লা ডিসেম্বর। ওঁর সঞ্চয়ের একটা অংশ ব্যবহার হবে মনোবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে।'

'আই সী।'

'আর, আপনার প্রতি উদাসীন হওয়া সত্ত্বেও আপনিও কিন্তু বাদ পড়েননি।'

শঙ্করবাবু আবার বললেন, 'আই সী।'

'এই খুনের ব্যাপারে আপনি কোনো আলোকপাত করতে পারেন ?'

'একেবারেই না। এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।'

'আর ডায়রিটা যে লোপাট হল ?'

'সেটা ওই তিনজনের একজন লোক লাগিয়ে করাতে পারে। বাবার পেশেন্ট হিসাবে এরা এ বাড়িতে এসেছে। বাবা যে ঘরে রুগী দেখেন, তার পাশেই তো আপিস ঘর। সেখানেই থাকত বাবার লেখাটা।'

'আপনাদের সদর দরজা রাত্রে বন্ধ থাকে নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ, তবে বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে জমাদার ওঠার জন্য একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে।'

'ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক ইউ। আপনি এবার যদি সুখময়বাবুকে একটু পাঠিয়ে দিতে পারেন ?''

মিনিট খানেকের মধ্যেই সেক্রেটারি সুখময় চক্রবর্তী এসে হাজির হলেন। ভদ্রলোক আমাদের থেকে একটু দূরে একটা চেয়ারে বসতে ফেলুদা জেরা আরম্ভ করল।

'আমি প্রথমেই জানতে চাই, পাণ্ডুলিপিটা যে চুরি হল, সেটা কি বাইরে পড়ে

থাকত ?'

'না। দেরাজে; তবে দেরাজে চাবি থাকত না। তার কারণ আমি বা ডাঃ মুনসী কেউই ভাবতে পারিনি যে সেটা এই ভাবে চুরি হতে পারে।'

'ওটা যে আর দেরাজে নেই সেটা কখন কীভাবে জানলেন ?'

'আজ থেকে ওটা টাইপ করা শুরু করব ভেবেছিলাম। সকালে গিয়ে দেরাজ খুলে দেখি সেটা নেই।'

'আই সী...আপনি কদ্দিন হল ডাঃ মুনসীর সেক্রেটারির কাজ করছেন ?'

'দশ বছর।'

'কাজটা পেলেন কী করে ?'

'ডাঃ মুনসী কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।'

'কী ধরনের কাজ করতে হত আপনাকে ?'

'ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো নোট করে রাখতাম, আর চিঠিগুলোর জবাব টাইপ করতাম।'

'চিঠি কি অনেক আসত ?'

'তা কম না। বিভিন্ন দেশের মনোবিজ্ঞান সংস্থা থেকে নিয়মিত চিঠি আসত। বাইরের কনফারেন্সে যোগ দিতে উনি দুবছরে অন্তত একবার বিদেশ যেতেন।'

'আপনি বিয়ে করেননি ?'

'না।'

'আত্মীয়স্বজন আর কে আছে ?'

ভাইবোন নেই। বাবা মারা গেছেন। আছেন শুধু আমার বিধবা মা আর আমার এক বিধবা খুড়িমা।'

'ওঁরা এক সঙ্গেই থাকেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি ওঁদের সঙ্গে থাকেন না ?'

'আমি তো এ বাড়িতেই থাকি। ডাঃ মুনসী আমাকে একটা ঘর দেন একতলায়। প্রথম থেকেই এখানে আছি। মাঝে মাঝে গিয়ে বাড়ির খবর নিয়ে আসি।'

'বাড়ি কোথায় ?'

'বেলতলা রোড ল্যান্সডাউনের মোড়ে।'

'আপনি এই খুন সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করতে পারেন ?'

'একেবারেই না। ডায়রি বেহাত হতে পারে হুমকি চিঠি থেকেই বোঝা যায়; কিন্তু খুনটা আমার কাছে একেবারে অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে।'

'ডাঃ মুনসী বস্ হিসাবে কেমন লোক ছিলেন ?'

'খুব ভালো। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আমার কাজে সন্তুষ্ট

ছিলেন, এবং ভালো মাইনে দিতেন।'

'আপনি কি জানেন ডাঃ মুনসীর বই বেরোলে তাঁর অবর্তমানে বইয়ের স্বত্বাধিকারী হতেন আপনি?'

'জানি। ডাঃ মুনসী আমাকে বলেছিলেন।'

'বই ছেপে বেরোলে তার কাটতি কেমন হবে বলে আপনার মনে হয়?'

'প্রকাশকদের ধারণা খুব ভালো হবে।'

'তার মানে মোটা রয়েলটি, তাই নয় কি?'

'আপনি কি ইঙ্গিত করছেন এই রয়েলটির লোভে আমি ডাঃ মুনসীকে খুন করেছি?'

'এখানে যে একটা জোরালো মোটিভের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে সেটা কি আপনি অস্বীকার করবেন?'

'আমার যেখানে টাকার অভাব নেই সেখানে শুধু রয়েলটির লোভে আমি খুন করব, এটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য?'

'এর সঠিক উত্তর দিতে যতটা চিন্তার প্রয়োজন, তার সময় এখনো পাইনি। যাই হোক এখন আপনার ছুটি।'

'কাউকে পাঠিয়ে দেবো কি?'

'আমি ডাঃ মুনসীর শালার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

সুখময়বাবু চলে যাবার পর জটায়ু বললেন, 'আপনার কি মনে হচ্ছে বলুন তো, ডায়রি লোপাট আর খুনটা সেপারেট ইস্যু, না পরস্পরের সঙ্গে জড়িত?'

'আগে গাছে কাঁঠাল দেখি, তারপর তো গোঁফে তেল দেব।'

'বোঝো!'

॥ ৬ ॥

শালা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হলেন। কপালের ঘাম মুছতে দেখে মনে হল ভদ্রলোক একটু নার্ভাস বোধ করছেন।

'আপনার নাম তো চন্দ্রনাথ; পদবী কী?' ভদ্রলোক বসার পর ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'বোস।'

'আপনি এখানে রয়েছেন পনেরো বছর, তাই তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কী করে...?'

'আমি ডাঃ মুনসীর ডায়রিটা পড়েছি। আপনার বিষয় অনেক কিছু জানি, তবু আপনার মুখ থেকে কনফার্মেশনের জন্য কতকগুলো প্রশ্ন করছি।'

চন্দ্রনাথ বোস আবার ঘাম মুছলেন।
'ডাঃ মুনসী আপনাকে এ বাড়িতে থাকতে বলেন ?'
'না। আমার বোন ডাঃ মুনসীকে অনুরোধ করেন।'
'উনি এক কথায় রাজি হয়ে যান ?'
'না।'
'তাহলে ?'
'আমার বোন...পীড়াপীড়ি করলে পর...রাজি হন।'
'আপনিতো কোনো চাকরি-টাকরি করেন না।'
'না।'
'হাত খরচা পান মাসে মাসে ?'
'হ্যাঁ।'
'কত ?'
'পাঁচশো।'
'তাতে চলে যায় ?'
চন্দ্রনাথবাবু উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করলেন। বুঝলাম হাতখরচটা যথেষ্ট নয়।
'আপনিতো ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছেন ?'
'হ্যাঁ।'
'ছাত্র হিসেবে কীরকম ছিলেন ?'
'সাধারণ।'
'নাকি তার চেয়েও নিচে ?'
চন্দ্রনাথবাবু চুপ।
'প্রথমবার আই. এ-তে ফেল করেননি ? সেই কারণেই তো আপনার কোনো চাকরি জোটেনি, তাই নয় কি ?'
দৃষ্টি নত করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন চন্দ্রনাথবাবু।
'এ বাড়ির কোনো কাজ আপনি করেন কি ?'
'হ্যাঁ।'
'কী।'
'বাজার করি। ওষুধপত্র আনি...'
'বুঝেছি।...আপনার শোবার ঘর দোতালায় ?'
'হ্যাঁ।'
'কোনখানে ? ডাঃ মুনসীর ঘর থেকে কতদূরে ?'
'পাশে।'

'একেবারে পাশে? লাগালাগি?'

'ই-ইয়েস।'

'রাত্রে ঘুমোন কখন?'

'দশটা সাড়ে দশটা।'

'আর ওঠেন?'

'ছ-টা।'

'এই খুন সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে।'

'নো-নো স্যার। নাথিং।'

'ঠিক আছে। আপনি এবার অনুগ্রহ করে রাধাকান্ত মল্লিককে একটু পাঠিয়ে দিন।'

রাধাকান্ত মল্লিক এসে সোফায় বসেই এক সঙ্গে হাত আর মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি খুন সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিছু না...'

'আমি কি বলেছি আপনি জানেন?'

'বলেননি, কিন্তু বলবেন। আই নো ইউ ডিটেকটিভস। এসব জেরা-টেরা আমার ভালো লাগে না। যা বলার আমি বলে যাচ্ছি। আপনি শুনুন। আমি যে ব্যারাম নিয়ে এখানে আসি তার নাম আমি জানতাম না। মুনসী বলেন। পার্সিকিউশন ম্যানিয়া। তার লক্ষণ হল, চারপাশের সব লোককে হঠাৎ শত্রু বলে মনে হওয়া। বাবা, দাদা, পড়শী, আপিসের কোলীগ কেউ বাদ নেই। সবাই যেন ওৎ পেতে বসে আছে। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আগে এটা ছিল না; ঠিক কখন যে শুরু হল তাও বলতে পারি না। শুধু এটা বলতে পারি যে শেষ দিকে এমন হয়েছিল যে রাত্তিরে ঘুমোতে পারতাম না, পাছে ঘুমোলে কেউ এসে বুকে ছুরি মারে!'

'ডাঃ মুনসীর ওষুধে কাজ দেয়?'

'দিচ্ছিল, তবে সময় লাগছিল। কথা ছিল আর দু'হপ্তা পরে ছুটি পাব। কিন্তু তার আগেই...ছুটি হয়ে গেল...'

'আপনি কি এখন বাড়ি ফিরে যাবেন?'

'পুলিশ যেতে দিলেই যাব!'

'আপনার চাকরি তো একটা আছে নিশ্চয়ই।'

'পপুলার ইনশিওরেন্স।'

'ঠিক আছে। আপনি এবার আসতে পারেন।'

রাধাকান্ত মল্লিক চলে যাবার পর ফেলুদা একবার খুনের জায়গা আর লাশটা দেখে এল। যে জিনিসটা দিয়ে বাড়ি মেরে খুন করা হয়েছে সেটা এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে পুলিশের ডাক্তার এসে দেখে বলে গেছে খুনটা হয়েছে

ভোর চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। পাণ্ডুলিপিটা এখনো পাওয়া যায়নি। ইনস্পেক্টর সোম বলেছেন সেটা বেরোলেই ফেলুদাকে জানিয়ে দেবেন।

'মিসেস মুনসীর সঙ্গে কি এখন কথা বলা যাবে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল সোমকে।

'তা যাবে। উনি দেখলাম মোটামুটি শক্তই আছেন।'

আমরা তিনজন মিসেস মুনসীর ঘরে গেলাম। ভদ্রমহিলা জানালার দিকে মুখ করে খাটে বসে আছেন। ফেলুদা দরজায় টোকা মারতে আমাদের দিকে ফিরলেন।

আমি চমকে উঠলাম। ইনি হুবহু এঁর ভাইয়ের মতো দেখতে! যমজ নাকি?

নমস্কারের পর ফেলুদা বলল, 'আমার নাম প্রদোষ মিত্র। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আপনার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি।'

'আপনি কিছু জিগ্যেস করবেন কি?'

দেখে অবাক হলাম যে ভদ্রমহিলার কথায় বিন্দুমাত্র কান্নার রেশ নেই।

ফেলুদা বলল, 'সামান্য দু-একটা প্রশ্ন।'

ভদ্রমহিলা আবার জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, 'করুন।'

'এই হত্যা সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে কি?'

'ওঁর ডায়রিই হল ওঁর কাল। আমি ওঁকে কতবার বলেছি, তুমি লিখছ লেখ, কিন্তু এ জিনিস ছাপিও না। আমাদের দেশের লোকেরা এত সত্যি কথা গ্রহণ করতে পারবে না। অনেকে ব্যথা পাবে, অনেকে অসন্তুষ্ট হবে, আর আজ...'

'আমি কিন্তু ডায়রিটা পড়েছি। আমার মনে হয় না এটা পড়লে মনে কেউ ব্যথা পেতো।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'আপনি আর চন্দ্রনাথবাবু যমজ ভাইবোন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি যখন ডাঃ মুনসীকে প্রস্তাব করেন আপনার ভাইকে এ বাড়িতে এনে রাখা হোক, তখন উনি কী বলেন?'

'অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দেন।'

'অনিচ্ছা কেন?'

'আমার ভাই কোনো চাকরি করে না সেটা উনি মেনে নিতে পারছিলেন না। উনি নিজে ছিলেন কাজ-পাগলা মানুষ। কাজ ছাড়া আর কিছুই জানতেন না।'

'অনেক ধন্যবাদ, মিসেস মুনসী। আমার আর কিছু জানার নেই।'

॥ ৭ ॥

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বারোটা হয়ে গেল। লালমোহনবাবু সকালে স্নান সেরে বেরোন, কাজেই সে সমস্যাটা নেই। তাঁকে বললাম দুপুরের খাওয়াটা আজ এখানেই সারতে। ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন।

'মহীয়সী মহিলা!' পাখাটা খুলে ফুল স্পীড করে তাঁর প্রিয় কাউচটায় বসে বললেন লালমোহনবাবু, 'এত বড় একটা ট্র্যাজিডিতে এতটুকু টসকালেন না! অথচ ভাইটা একেবারে গোবর গণেশ।'

'সেই জন্যেই মহিলার ভাইয়ের উপর এত টান', বলল ফেলুদা, 'এ বড় জটিল মনোভাব, লালমোহনবাবু। স্নেহ, অনুকম্পা, এসব তো আছেই; তার মধ্যে কোথায় যেন একটা মাতৃত্বের রেশ রয়েছে। ভদ্রমহিলার নিজের কোনো ছেলেপিলে নেই, এবং ডাঃ মুনসীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছেলের প্রতিও টান নেই, এসব কথা ভুলবেন

না।'

'তার উপরে যমজ।'

'তা তো বটেই।'

'আপনার কি মনে হয় ভদ্রমহিলার ডাঃ মুনসীর সঙ্গে বনিবনা ছিল না?'

'সেটা মুনসী পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা না থাকলে বলা মুশকিল। গোয়েন্দাকে যা বোঝার বুঝতে হয় দুটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, কান আর চোখ।'

'এক্ষেত্রে কান কী বলছে?'

'মনে একটা খটকা লাগাচ্ছে।'

'কী সেটা?'

'সেটা আপনারা কেন বোঝেননি তা জানি না।'

এবারে আমি একটা কথা না বলে পারলাম না।

'তুমি বলতে চাও ওঁর কথা শুনে মনে হল উনি ডায়রিটা পড়েছেন?'

'সাবাস, তোপ্‌সে, সাবাস।'

'কেন মশাই, ডায়রিতে কী ধরনের জিনিস আছে সেটা তো মুনসী মুখেও বলতে পারেন।'

'একই হল, লালমোহনবাবু একই হল।'

মুনসীর কথায় মনে হয়েছিল ওই তিন ব্যক্তির ঘটনা ছাড়া ডায়রিতে কী আছে তা কেউ জানে না। এখন মনে হচ্ছে কথাটা হয়ত ঠিক না।'

'তবে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে ডাঃ মুনসীর স্ত্রীর প্রতি মোটেই বিরূপভাব পোষণ করতেন না। ডায়রির প্রথম পাতা খুললেই সেটা প্রমাণ হয়। যে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা নেই, তাকে কেউ বই উৎসর্গ করে না।'

'আপনি দেখছি ফর্মে আছেন। ভেরি গুড।'

'আরেকটা ব্যাপারে আমি কানকে কাজে লাগিয়েছি মশাই; আপনি নিশ্চয়ই অ্যাপ্রিশিয়েট করবেন। ডাঃ মুনসীর নিজের ছেলের প্রতি যে মনোভাব দেখিয়েছেন তাতে তাকে শুষ্কং কাষ্ঠং বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু সেইখেনে দেখুন, তাঁর সেক্রেটারির প্রতি তাঁর কত দরদ!'

'গুড। গুড।' ফেলুদা যে অন্যমনস্ক ভাবে তারিফটা করে সোফা ছেড়ে উঠে পায়চারি আরম্ভ করে দিল।

'কী ভাবছেন মশাই?' প্রায় এক মিনিট চুপ থেকে প্রশ্ন করলেন জটায়ু।

'ভাবছি যে তিন উহ্য নামের মধ্যে একজনই রয়ে গেল যার আসল পরিচয়টা পাওয়া গেল না। ফলে মামলাটার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেল যেটা আর পূরণ হবে না।'

'আপনার কি মনে হয় ডাঃ মুনসী কোনো তথ্য—'

ক্রিং-ং-ং !

আমাদের এই নতুন নীপ টেলিফোনটার আওয়াজ আগেরটার চেয়ে অনেক বেশি জোর। ফেলুদা রিসিভারটা তুলে 'হ্যালো' বলল।

অবিশ্বাস্য টেলিফোন। যাকে ফেলুদা টেলিপ্যাথি বলে এ হল খোদ তার ভাই। কার সঙ্গে কী কথাবার্তা হল সেটা ফেলুদা ফোন নামিয়ে রেখেই বলেছিল: আমি যখন ঘটনাটা লিখতে যাব, তখন ও বলল, 'যদিও তুই ফোনটার সময় শুধু আমার কথাগুলোই শুনেছিলি, লেখার সময় এমন ভাবে লেখ যেন দুই তরফের কথাই শুনতে পাচ্ছিস। তাহলে পাঠক মজা পাবে।'

আমি ওর কথামতোই লিখছি।

'হ্যালো।'

'মিঃ মিত্তির ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি "আর" কথা বলছি।'

'"আর" ?'

'মুনসীর ডায়রির "আর"।'

'ও। তা হঠাৎ আমাকে ফোন কেন ? মুনসীর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা আপনি জানলেন কী করে ?'

'আপনি আজ সকালে মুনসীর বাড়ি যাননি ?'

'তা তো যাবই। মুনসী আজ ভোর রাত্রে খুন হয়েছেন। সেই কারণেই যেতে হয়েছিল।'

'আপনার চেহারা অনেকের কাছেই পরিচিত। সেটা আপনি জানেন বোধহয়। মুনসীর বাড়ির সামনে ভিড় এবং পুলিশ দেখে প্রতিবেশীদের অনেকেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদেরই একজন আপনাকে চিনে ফেলে আমার এক পেশেন্ট। আমিও ডাক্তার সেটা জানেন কি ? এই পেশেন্টের বাড়ি গেস্লাম ঘণ্টাখানেক আগে। তারই কাছে শুনি মুনসীর মৃত্যু ও আপনার উপস্থিতির খবর। দুইয়ে দুইয়ে চার করে বুঝি মুনসী আপনাকে এমপ্লয় করেছিল।'

'আপনার আসল নামটা জানতে পারি কি ?'

'না, পারেন না। ওটা উহ্যই থাকবে। আমি জানতে চাই মুন্সী আপনাকে আমার সম্বন্ধে কী বলে।'

'উনি বলেন, আপনাকে উনি যথেষ্ট চেনেন এবং আপনাকে নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। ডায়রিটা বেরুচ্ছে এবং তাতে আপনার অতীতের ঘটনা থাকছে জেনেও নাকি আপনি কোনো আপত্তি করেননি।'

'ননসেন্স! সম্পূর্ণ মিথ্যা। ও আমাকে জানাবে কী করে? আমি তো পনেরো দিন

বাইরে থেকে কলকাতায় ফিরেছি সবে পরশু রাত্রে। বাড়িতে এসে পুরানো স্টেটসম্যান ঘাঁটতে ঘাঁটতে মুনসীর ডায়রি পেঙ্গুইন ছাপছে এ খবরটা দেখি। খবরটা পড়ে আমার অস্বস্তি লাগে। মুনসী সাইকায়াট্রিস্ট হওয়াতে অনেক মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির হাঁড়ির খবর সে জানে ; আমারতো বটেই। সে সব কথা কি সে ডায়রিতে লিখেছে ?

'আমি মুনসীকে ফোন করি। সে স্বীকার করে যে আমার ঘটনা তার ডায়রিতে স্থান পেয়েছে, তবে আমার নাকি চিন্তার কোনো কারণ নেই এই জন্যে যে আমার নামের শুধু প্রথম অক্ষরটা ব্যবহার করা হয়েছে। ...কিন্তু তাতে আমি আশ্বস্ত হব কেন ? আমি চব্বিশ বছর আগেও ডাক্তার ছিলাম, এখনও আছি। তখনকার অনেক পেশেন্ট এখনও আমার পেশেন্ট। ডায়রি থেকে তারা আমায় চিনে ফেলবে না তার কী গ্যারান্টি ?'

'আমি কিন্তু ডায়রিটা পড়েছি। আমার মনে হয় আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই।'

'আপনি যখন পড়েছেন তখন আমিও পড়ব। সে কথাটা আমি মুনসীকে বলি। আমি বলি যে তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি নিজে তোমার লেখা পড়ে বিচার করব সেটা ছাপলে আমার কোনো ক্ষতি হবে কিনা। তুমি আমাকে লেখাটা দাও। যদি না দাও তাহলে তোমার অতীতের ঘটনা আমি ফাঁস করে দেব।'

'এ আবার কী বলছেন আপনি ?'

'মিস্টার মিত্তির, আমি আর মুনসী একই বছর লণ্ডনে যাই ডাক্তারি পড়তে। আমার বিষয় যদিও মনোবিজ্ঞান ছিল না, কিন্তু আমাদের দুজনের যথেষ্ট পরিচয় ছিল। আমি মুনসীর যে চেহারা দেখেছি সে চেহারা কলকাতার কেউ দেখেনি। সে সেখানে উচ্ছন্নে যেতে চলেছিল, আমি তাকে সামলাই, তাকে সোজা পথে নিয়ে আসি। কলকাতায় ফিরে এসে প্র্যাকটিস শুরু করার পর সে ক্রমে ক্রমে নিজেকে সংশোধন করে।'

'আপনি মুনসীর বাড়ি গিয়ে তাঁর কাছ থেকে লেখাটা চেয়ে আনেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গতকাল রাত এগারোটায়। বলেছিলাম দুদিন পরে লেখাটা ফেরত দেব। এখন অবিশ্যি তার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'নেই মানে ? আপনি পাণ্ডুলিপি ফেরত দিলেই সেটা ছাপা হবে। লেখকের মৃত্যুর পর তার বই ছাপা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। একে ইংরিজিতে পসথ্যুমাস পাবলিকেশন বলে সেটা আপনি জানেন না ?'

'জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হবে না। লেখাটা আমি পড়েছি। সেটা আমার কাছেই থাকবে। বই হয়ে বেরোবে না। আসি।'

ফেলুদা রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দিল, তার মুখ গম্ভীর।

'লোকটা এমন করে আমার উপর টেক্কা দিল?' ধপ্ করে সোফায় বসে বলল ফেলুদা। 'এ সহ্য করা যায় না, সহ্য করা যায় না!...আর এমন একটা চমৎকার লেখা—এইভাবে বেহাত হয়ে গেল!'

'লেখাটা নিয়ে ভাববেন না, ফেলুবাবু।' একটু যেন রাগত ভাবেই বললেন জটায়ু। 'দা খুন ইজ মাচ মোর ইমপর্ট্যান্ট দ্যান দা লেখা।'

'আপনি লেখাটা পড়েও একথা বলছেন?'

'বলছি। যেখানে মার্ডার হ্যাজ বিন কমিটেড, সেখানে আর ওসব কিছু তার কাছে তুচ্ছ।'

শ্রীনাথ এসে খবর দিল ভাত বাড়া হয়েছে। আমরা তিনজনে খাবার ঘরে খেতে বসলাম। লালমোহনবাবু যদিও বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। এমন কি চিংড়ি মাছের মালাই কারিটা খেতে খেতে বললেন, 'আপনাদের জগন্নাথের রান্নার তারের তুলনা নেই;' ফেলুদা শুক্তো থেকে দই পর্যন্ত একবারও মুখ খুলল না।

খাবার পর তিনজনে তিনটে পান মুখে পুরে বসবার ঘরে বসতেই ফোনটা বেজে উঠল। আমিই ধরলাম। ইন্সপেক্টর সোম। আমি ফেলুদার হাতে ফোনটা চালান দিলাম। 'বলুন স্যার'-এর পর ফেলুদা কেবল দুটো কথা বলল। প্রথমে মিনিট খানেক কথা শুনে বলল, 'তাহলে তো খুনটা বাড়ির লোকে করেছে বলেই মনে হচ্ছে' আর ফোনটা রাখবার আগে বলল—'ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'মুনসী প্যালেস', টেবিল থেকে চার মিনারের প্যাকেট আর লাইটারটা তুলে পকেটে পুরে বলল ফেলুদা।

'খুনটা বাড়ির লোকে করেছে কেন বললেন?' জটায়ুর প্রশ্ন।

'কারণ নিস্তারিণী ঝি আবিষ্কার করেছে যে একটা হামানদিস্তা মিসিং। এ পারফেক্ট মার্ডার ওয়েপন।'

'আর ইন্টারেস্টিংটা কী?'

'মুনসীর একটা ডায়রি পাওয়া গেছে যাতে এ বছরের প্রথম দিন থেকে মারা যাবার আগের দিন পর্যন্ত এনট্রি আছে।...চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

॥ ৮ ॥

পেঙ্গুইন যে ডায়রিটা ছাপছিল সেটা ১৯৮৯ ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে। পুলিশ যেটা পাণ্ডুলিপি খুঁজতে খুঁজতে মুনসীর শোবার ঘরে পেয়েছে, সেটাতে দৈনিক

এনট্রি আছে ১৯৯০ পয়লা জানুয়ারি থেকে মুনসী মারা যাবার আগের রাত, অর্থাৎ ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ডায়রিটা সম্ভবত খাটের পাশের টেবিলে রাখা ছিল। সেখান থেকে মাটিতে পড়ে যায়। পুলিশ সেটাকে মাটিতেই পায়।

ডায়রিটা সোমের কাছ থেকে নিয়ে প্রথম পাতা খুলেই ফেলুদার চোখ কিসে আটকে গেল। কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করে পাতাটির দিকে চেয়ে থেকে আবার যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে পাশে দাঁড়ানো শঙ্করবাবুকে জিগ্যেস করল, 'আপনি জানতেন যে আপনার বাবা ডায়রি রাখার অভ্যেসটা শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে গেছেন?'

'একেবারেই না। তবে শুনে যে অবাক হচ্ছি তা নয়, কারণ চল্লিশ বছর একটানা লিখে হঠাৎ বন্ধ করার তো কোনো কারণ নেই।'

'সুখময়বাবু জানতেন এই ডায়রির কথা?'

'সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করুন।'

আমরা সকলে বসবার ঘরে জমায়েত হয়ে ছিলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই সুখময় চক্রবর্তী এলেন। ফেলুদা প্রশ্ন করাতে সুখময়বাবু বললেন, 'ডাঃ মুনসী ডায়রি লিখবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু উনি কাজটা করতেন দিনের শেষে শুতে যাবার আগে। ডায়রিও শোবার ঘরেই থাকত নিশ্চয়ই, এই লাল বই আমি কোনোদিনই দেখিনি।'

'বসুন।'

সুখময়বাবু দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, ফেলুদা বলতে যেন একটু অবাক হয়েই বসলেন। আমি বুঝলাম ফেলুদা আরো কিছু জিগ্যেস করতে চায়।

'সুখময়বাবু', বলল ফেলুদা, 'আপনি নিশ্চয়ই চান যে ডাঃ মুনসীর আততায়ীর উপযুক্ত শাস্তি হোক। তাই নয় কি?'

'আমার দায়িত্ব', বলে চলল ফেলুদা, 'হল সেই আততায়ীকে খুঁজে বার করা। একটা কারণে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে আততায়ী এই বাড়িতেই রয়েছেন। সেদিন আমি এই বাড়িতে যাঁরা থাকেন তাদের প্রত্যেককে জেরা করেছি। তার ফলে আমি এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। হয়ত আমার তরফ থেকেই যথেষ্ট প্রশ্ন করা হয়নি, এবং যাদের প্রশ্ন করেছি তারা আমার সব প্রশ্নের জবাব দেননি। একটা প্রশ্ন আমি সেদিন করিনি, আজ করতে চাই।'

'বলুন।'

'একটা ব্যাপারে আমাদের মনে খট্‌কা জেগেছে।'

'কী?'

'শঙ্করবাবুর মতে ডাঃ মুনসী তাঁর লেখা এবং পেশেন্ট ছাড়া আর সবকিছু সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু আপনি তো তাঁর পেশেন্টও নন, তাহলে আপনার

প্রতি তিনি এতটা স্নেহবর্ষণ করবেন কেন ? ডায়রিতে পড়েছি পাঁচ বছর আগে আপনার অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হয় ; তাঁর সমস্ত খরচ মুন্সী বহন করেন। অপারেশনের পর আপনি দশ দিনের জন্য পুরী যান ; সে খরচও তিনি বহন করেন। কেন ? এর কোনো কারণ আপনি দেখাতে পারেন ? এই পক্ষপাতিত্ব কিসের জন্য ?'

'জানি না।'

উত্তরটা আসতে যে যৎসামান্য দেরি হল সেটা নিশ্চয়ই ফেলুদা লক্ষ করেছে। সেটা তার পরের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম।

'আমি আবার বলছি সুখময়বাবু, আপনি সত্যি কথা বললে, বা গোপন না করলে, আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।'

এবারে উত্তরে দেরি হল না।

'আমি সত্যি বলছি।'

লালমোহনবাবু আমাদের নামিয়ে দিয়ে 'টুমরো মর্নিং' বলে গড়পার ফিরে গেলেন। ফেলুদা সোজা তার শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। বুঝলাম সে ডায়রিতে মনোনিবেশ করবে। ঘড়িতে এখন তিনটে পঁচিশ।

পাখাটা ফুল স্পীড করে দিয়ে সোফায় গা ছড়িয়ে শুয়ে আমি একটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন খুলে অ্যানটার্কটিকার বিষয় চমৎকার সব ছবি সমেত একটা লেখা পড়তে লাগলাম।

সাড়ে চারটায় শ্রীনাথ চা আনল। আমারটা টেবিলের উপর রেখে ফেলুদার ঘরের দরজায় টোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা বেরিয়ে এসে বলল, 'এ ঘরেই চা দাও।'

বুঝতেই পারছি ডায়রিটা পড়া হয়ে গেছে, তাই জিগ্যেস করলাম, 'কিছু পেলে ?'

ফেলুদা কাউচে বসে পকেট থেকে ডায়রি আর চারমিনারের প্যাকেটটা বার করে টেবিলের উপর রেখে গরম চায়ে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল, 'তোকে কয়েকটা আইটেম পড়ে শোনাচ্ছি। আমার মনে হয় চিন্তার খোরাক পাবি।'

আমি আগেই লক্ষ করেছিলাম। ডায়রির মাথার দিকটা দিয়ে কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ উঁকি মারছে। ফেলুদা কোনোরকম তাড়াহুড়ো না করে একটা চারমিনার ধরিয়ে প্রথম টুকরো মার্কে ডায়রিটা খুলল।

'শোন, এটা তিন সপ্তাহ আগের এনট্রি। আমি ইংরিজি থেকে বাংলা করছি। 'আজ একটি নতুন পেশেন্ট। রাধানাথ মল্লিক। আমার ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে প্রথমেই পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে হাতের তেলোয় রেখে সেটার দিকে আর আমার দিকে বারকয়েক দেখে কাগজটা দলা পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার

বাস্কেটে ফেলে দিল। ওটা কী ফেললেন জিগ্যেস করাতে ভদ্রলোক বললেন, টেলিগ্রাফের খবর আপনার ছবি সমেত। আমি বললাম, আপনি কি যাচাই করে নিলেন ঠিক লোকের কাছে এসেছেন কিনা? এবারে একটা ছোটখাট বিস্ফোরণ হল। "আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, কাউকে না! যাচাই করে নিতে হবে বৈকি।" ...পার্সিকিউশন মেনিয়া।'

চার পাতা পরে দ্বিতীয় এনট্রি।

'শোন—আর. এম-কে. নিয়ে সমস্যা। সে নিজের বাড়িতে একদণ্ড টিকতে পারে না। তার দাদা, তার পড়শী সকলেই তার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করছে। ডিফিকাল্ট কেস। আমি বলেছি কাল থেকে যেন সে আমার এখানে চলে আসে। দুটো ঘর তো খালি পড়ে আছে দোতলায়; তার একটাতেই থাকবে।'

তৃতীয় এনট্রি, এটাও দিন চারেক পরে।

'আর. এম-কে নিয়ে সমস্যা মিটছে না। আজ ওকে কাউচে শোয়ানোর আগে ও আমার আপিসে এসে বসেছিল। আমি তখন বিলেত থেকে সদ্য আসা একটা জরুরী চিঠি পড়ছি। পড়া শেষ করে ওর দিকে চেয়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। আমার ভারী কাঁচের পেপার ওয়েটটা হাতে নিয়ে ও কেমন যেন অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে। ও যদি আমাকেও ওর শত্রুপক্ষ মনে করে তাহলে তো মুশকিল।'

চার নম্বর এনট্রি।

'আমার ওষুধের শিশিটা ভুল করে আপিস ঘরে ফেলে এসেছিলাম, রাতে শোবার আগে সেটা আনতে গিয়ে প্যাসেজ থেকেই বুঝলাম ঘরে বাতি জ্বলছে! ভেবেছিলাম হয়ত সুখময় কোনো কাজ করছে, কিন্তু গিয়ে দেখি শঙ্কর। সে আমার দিকে পিঠ করে ঝুঁকে পড়ে টেবিলের নীচের দেরাজটা বন্ধ করছে। আমায় দেখে ভারী অপ্রস্তুত হয়ে বলল ওর এয়ার মেল খাম ফুরিয়ে গেছে তাই এখানে আছে কিনা দেখতে এসেছিল। আমি ওকে দুটো খাম দিয়েছিলাম।...ওই দেরাজেই থাকে আমার পাণ্ডুলিপি।'

এরপরে একেবারে শেষ পাতায় শেষ এনট্রি। এর সঙ্গে রাধাকান্ত মল্লিকের কোনো যোগ নেই, আর এটা সত্যিই রহস্যজনক।

'কী ভুলই করেছিলাম!...যাক্, তবু যে ভুলটা ভেঙেছে! কিন্তু "আর"-এর জের কি তাহলে অনির্দিষ্টকাল ধরে চলবে? নাকি ওটা নিয়ে অযথা চিন্তা করছি?'

ফেলুদা ডায়রিটা বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "অদ্ভুত কেস!'

'তার মানে রহস্যের জট এখনো ছাড়াতে পারনি?'

'না, তবে কীভাবে প্রোসীড করতে হবে তার একটা ইঙ্গিত পেয়েছি। এবার

কিছু দৈহিক পরিশ্রম আছে। রুটিন এনকোয়ারি। তুই জটায়ুকে ফোন করে বলে দে কাল যেন সকালে না এসে বিকেলে আসেন। সকালে আমি থাকছি না।'

॥ ৯ ॥

ফেলুদা পরদিন সকাল আটটায় বেরিয়ে আড়াইটেয় ফিরল। ও নাকি বাইরেই লাঞ্চ সেরে নিয়েছে। কাজ হল কিনা জিজ্ঞেস করতে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলাম না। কারণ ওর মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ করছিলাম; তার মানে সাক্সেস না ফেইলিওর সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

ফেলুদা সোফায় বসার আগে দুটো ফোন করল, একটা শঙ্কর মুনসীকে, অন্যটা ইনস্পেক্টর সোমকে। দুজনকেই একই ইনস্ট্রাকশন, আগামীকাল সকাল দশটায় সুইনহো স্ট্রীট বৈঠকে সবাই যেন উপস্থিত থাকে।

এবার একটা চারমিনার ধরিয়ে ফেলুদা সোফায় বসে সামনের টেবিলের উপর পাটা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমারও মুনসীর মতো বলতে ইচ্ছা করছে, কী ভুলই করেছিলাম!...রহস্য উদ্‌ঘাটনের চাবি সবকটা চোখের সামনে পড়ে আছে, অথচ দেখতে পাচ্ছিলাম না।'

আমি একটা কথা না জিগ্যেস করে পারলাম না।

'অপরাধীকে আমরা চিনি তো?'

'নিশ্চয়ই', বলল ফেলুদা। 'তোর যখন এত কৌতূহল, তখন আমি তোকে কয়েকটা প্রশ্ন করছি যেগুলোর উত্তর ঠিকমতো দিতে পারলে হয়ত তুই নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবি।'

আমি চুপ, বুক ঢিপ ঢিপ।

'এক, নতুন ডায়রিটায় লক্ষ করার মতো বিশেষ কিছু দেখলি?'

'একটা ব্যাপারে খটকা লাগল।'

'কী?'

'খুনের আগের রাত পর্যন্ত ডায়রি লিখে গেছেন ভদ্রলোক, কিন্তু "আর" আসার কোনো উল্লেখ নেই।'

'এক্সেলেন্ট! দুই, বিসর্জন কথাটা বলতে প্রথমেই কী মনে হয়?'

'নাটক। রবীন্দ্রনাথ।'

'হল না।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও! জল...জলে কিছু ফেলে দেওয়া।'

'গুড। তিন, নেমেসিস কাকে বলে জানিস?'

'নেমেসিস?'

'হ্যাঁ।'

'ইংরিজি কথা?'

'উঁহু। গ্রীক।'

'ওরে বাবা, সে কী করে জানব?'

'তাহলে শিখে নে। অপরাধ করে যে শাস্তি সাময়িকভাবে এড়িয়ে গেলেও একদিন-না-একদিন ভোগ করতেই হয়, তাকে বলে নেমেসিস। এই নেমেসিস-এরই ভয় পাচ্ছিল "এ", "জি" আর "আর"।'

আমার ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছিল, তাই ফেলুদা চুপ করে আছে দেখে বললাম, 'আরো আছে?'

'আর একটা বলব। বেশি বললে কালকের নাটকটা জমবে না।'

'ঠিক আছে।'

'ফিজিশিয়ান হীল দাইসেল্ফ, মানে জানিস?'

'এ তো ইংরিজি প্রবাদ, ডাক্তার, আগে নিজের ব্যারাম সারাও।'

'আরেকটা শেষ কথা বলে দিচ্ছি তোকে, "সাজা" কথাটার অনেকগুলো মানে পাবি অভিধানে, তার মধ্যে দুটো মানে নিয়ে আমাদের কারবার।'

'বুঝেছি।'

চা দেবার মিনিট দশেক আগে জটায়ু এসে হাজির। কাউচে বসেই প্রথম প্রশ্ন হল, 'আমরা কোন স্টেজে আছি?'

উত্তরে ফেলুদা 'মিনার্ভা' বলে লালমোহনবাবুকে অসম্ভব ভ্রূকুটি করতে দেখে বলল, 'পেনালটিমেট।'

'পেনালটি, কী বললেন?'

'আপনার ইংরিজিটা আর রপ্ত হল না কিছুতেই। পেনালটিমেট মানে লাস্ট বাট ওয়ান।'

'লাস্ট স্টেজে পৌঁছচ্ছি কবে?'

'কাল সকাল দশটায় মুনসী প্যালেসে সর্বসমক্ষে যবনিকা উত্তোলন।'

'আর পতন?'

'ধরুন, তার আধ ঘণ্টা বাদে।'

'চারজনের উপর তো সন্দেহ—'

'হ্যাঁ, ইনি, মিনি, মাইনি, মো।'

'উঃ, কথায় কথায় আপনার এই প্রগল্‌ভতা অসহ্য। এইটে অন্তত বলুন যে শঙ্কর, সুখময়, রাধাকান্ত—'

ফেলুদা হাত তুলে বাধা দিয়ে বলল, 'আর স্পিক-টি-নট। এইখানেই দাঁড়ি।'

'আপনি দিন দাঁড়ি। আমার বলা শেষ হয়নি। নাটকের ক্লাইম্যাক্স আমার

হাতে, আপনার হাতে নয়। এটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিলুম।'

'আপনি যে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন।'

'ভয়ের কিস্যু নেই। আপনার সিংহাসন কেউ টলাতে পারবে না। আর তারিফের সিংহভাগ আপনিই পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সিংহাসনের পাশে একটি ছোট্ট স্পেশাল আসন, আর তারিফের পাশে একটি মিনি-তারিফ, এ দুটো আমার বরাদ্দ থাকবেই।'

পরদিন ভোরে এক পশলা বৃষ্টি হওয়াতে আমাদের পাড়াতে কিছুটা জল জমেছিল, তাও ঠিক সাড়ে নটার সময় বগলে ছাতা, কাঁধে ঝোলা আর মুখে হাসি নিয়ে লালমোহনবাবু এসে হাজির। 'তপেশ ভাই', কাউচে বসে বললেন ভদ্রলোক, 'জগন্নাথকে বোলো যেন আজ খিচুড়ি করে। নাটকের পর মধ্যাহ্নে ভোজনটা এখানেই সারব।'

চা খেয়ে দশটার পাঁচ মিনিট আগেই আমরা সুইনহো স্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম। আমাদের আগেই পুলিশ হাজির; ইনস্পেক্টর সোম ফেলুদাকে গুড মর্নিং করে বললেন, 'আমি আপনার মেথডতো জানি। তাই সকলকেই বৈঠকখানায় জমায়েত হতে বলে দিয়েছি, বেয়ারা বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কেবল মিসেস মুনসীরও থাকার দরকার কিনা সেটা জানার ছিল।'

ফেলুদা মাথা নেড়ে বলল, 'উনি না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়।'

সবাই যে যার জায়গা নিয়ে বসতে না বসতে এক তলায় বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে একবার চারদিকে দেখে নিয়ে ঘড়ির শেষ ঢং-এর রেশটা মিলিয়ে যেতেই কথা আরম্ভ করে দিল।

'আমি প্রথমেই শঙ্করবাবুকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

শঙ্করবাবু ঘরের উল্টোদিকে বসেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ফেলুদার দিকে ঘুরল। ফেলুদা বলল, 'আমি সেদিন যখন বললাম যে ডাঃ মুনসী তাঁর ডায়রিতে অনেকবার আপনার উল্লেখ করেছেন, তা শুনে আপনি বিস্মিত হন। এবং আমি যখন বললাম যে তিনি আপনার সম্বন্ধে নিশ্চয় সত্যি কথাই বলেছেন। তখন আপনি বেশ বিরক্ত হয়েই বললেন, 'বাবা আমাকে চিনলেন কবে, কীভাবে তিনিতো তাঁর রুগী নিয়েই পড়ে থাকতেন।' শঙ্করবাবু আপনি কেন ধরে নিলেন যে বাবা আপনার সম্বন্ধে অপ্রিয় কথাই বলেছেন? আমিতো কিছুই বলিনি।'

'কারণ বাবা সামনা-সামনি আমার কখনো প্রশংসা করেননি।'

'নিন্দে করেছেন কি?'

'না, তাও করেননি।'

'তাহলে আপনিই বা আপনার সম্বন্ধে ডাঃ মুনসীর প্রকৃত মনোভাব কী করে

জানলেন ?'

'ছেলে তার বাবার মন জানবে না কেন ? সে তো অনুমান করতে পারে।'

'বেশ, এবার আরেকটা কথায় আসি। আমি গতকাল দুপুরে একবার আপনাদের এখানে এসেছিলাম। এ বাড়িতে ভৃত্যস্থানীয় যারা আছে তাদের ডেকে ডেকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করি। একটা প্রশ্ন আপনাকে নিয়ে ; সেটার উত্তর দেয় আপনাদের মালি গিরিধারী। প্রশ্নটা ছিল, আপনার বাবার খুনের দিন সে আপনাকে ভোরে বেরোতে দেখেছিল কিনা। মালি বলে, হ্যাঁ দেখেছিল। তখন আমি জিগ্যেস করি আপনি খালি হাতে বেরোন কিনা। উত্তরে মালি বলে, না। আপনার হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ ছিল। বর্ণনায় বুঝি সেটা ব্রীফকেস বা পোর্টফোলিও জাতীয় ব্যাগ। এই ব্যাগে কী ছিল সেটা বলবেন কি ?'

শঙ্করবাবু চুপ। তাঁর নিশ্বাস জোরে জোরে পড়তে শুরু করেছে।

'আমি বলব কী ছিল ?' বলল ফেলুদা। শঙ্করবাবু নিরুত্তর। ফেলুদা বলল, 'ব্যাগে ছিল আপনার বাবার ডায়রির পাণ্ডুলিপি। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে, বা করার আগে, আপনি সেটা লেকের জলে বিসর্জন দেন তবে তার কারণ', ফেলুদার গলা চড়ে ওঠে, 'আপনি ডায়রিটা পড়ে দেখেছেন যে আপনার বাবা আপনার সম্বন্ধে একটিও প্রশংসাসূচক কথা বলেননি। তিনি—'

ফেলুদার গলা ছাপিয়ে শঙ্করবাবু বলে উঠলেন, 'ইয়েস, ইয়েস ! এই বই ছাপা হলে আমার রোজগারের রাস্তা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। অলস, উদ্যমহীন, ইরেসপনসিব্‌ল, অস্থিরমতি, কী না বলেননি উনি আমাকে !'

'রাইট', বলল ফেলুদা। 'তাহলে এটাও স্বীকার করুন যে সেদিন গলার স্বর পালটিয়ে "অর"-এর ভূমিকা নিয়ে আপনিই আমাকে ফোনটা করে আপনার বাবা সম্বন্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলেছিলেন, সন্দেহ যাতে আপনার উপর না পড়ে ?'

শঙ্করবাবু দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, এবার ধপ্ করে বসে পড়লেন।

'"অর"-এর কথাই যখন উঠল', বলল ফেলুদা, 'তখন ব্যাপারটা আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক।'

ফেলুদার দৃষ্টি এবার বাঁয়ে বসা সুখময়বাবুর দিকে ঘুরল।

'আমি এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'করুন।'

'ইংরিজিতে যাকে হাঞ্চ বলা হয়, সেই হাঞ্চের উপর নির্ভর করে আমি গতকাল সকালে একবার সাঁইত্রিশ নম্বর বেলতলা রোডে যাই। সকলের অবগতির জন্য বলছি। এটা হল সুখময়বাবুর বাড়ির নম্বর। আমার মনে হচ্ছিল উনি কিছু তথ্য গোপন করে যাচ্ছেন, এবং হয়ত ওঁর বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা

বললে কিছুটা আলোর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।'

ফেলুদার দৃষ্টি ঘুরে গিয়েছিল, এখন আবার ফিরে এল সুখময়বাবুর দিকে।

'আপনার মা-র সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি আপনার বাবার মৃত্যু হয় চব্বিশ বছর আগে, গাড়ি চাপা পড়ে।...এই তথ্যটি কি ডাঃ মুনসী জানতেন?'

দৃষ্টি মেঝে থেকে না তুলেই উত্তর দিলেন সুখময়বাবু।

'জানতেন। ইন্টারভিউ-এর সময়, আমার বাবা সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মারা যান জেনে ডঃ মুনসী জিগ্যেস করেন কিসে তাঁর মৃত্যু হয়।'

'খুব সতর্ক লোকেরও কেমন ভুল হয় তার একটা উদাহরণ দিই। শঙ্কর মুনসী যখন আমার বাড়িতে আসেন তখন তিনি নিজের পরিচয় দিতে বলেন যে তিনি ডাঃ রাজেন মুনসীর ছেলে। এই রাজেন নামটা আমার মাথা থেকে বেমালুম লোপ পেয়ে যায়; যেটা থেকে যায় সেটা হল "ডঃ মুনসী"। কাল ওঁর লাল ডায়রি খুলে প্রথম পাতাতেই "আর মুনসী" দেখে আমি চমকে উঠি। তাহলে কি ডাঃ মুনসী নিজেই তাঁর ডায়রির "আর", এবং তিনিই গাড়ি চাপা দিয়ে লোক মেরে চতুর্দিকে ঘুষ দিয়ে আইনের কবল থেকে নিজেকে বাঁচান, আর সেই মৃত ব্যক্তিরই ছেলে তাঁরই কাছে আসে চব্বিশ বছর পরে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে?'

'ভুল, ভুল, ভুল!' চেঁচিয়ে উঠলেন সুখময়বাবু। 'আমার বাবাকে যিনি চাপা দেন তাঁর উপযুক্ত শাস্তি হয়।'

'সে কথা কি ডাঃ মুনসী জানতেন?'

'না। তাঁর ধারণা ছিল তিনিই আমার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী। আসল ঘটনা তিনি জানতে পারেন মৃত্যুর আগের দিন।'

'কীভাবে?'

'উনি আমাকে ডেকে বলেন যে ওঁর একটা স্বীকারোক্তি করার আছে যেটা না করলে উনি শান্তি পাবেন না। স্বীকারোক্তিটা কী জানতে পেরে আমি বলি, ডাঃ মুনসী, আপনি ভুল করছেন; আমার বাবাকে যিনি চাপা দেন তাঁর শাস্তি হয়েছিল। কথাটা শুনে উনি স্তম্ভিত হয়ে যান। আর আমিও বুঝতে পারি কেন তিনি আমার উপর এত সদয় ছিলেন।'

ঘরের উল্টোদিক থেকে একটা ছোট্ট, শুকনো হাসি শোনা গেল। শঙ্করবাবু।

'কিছু বলবেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'না বললে আপনি আরো বেশি ভুল পথে গিয়ে পড়বেন।'

'মানে?'

'আমার বাবা জীবনে কখনো গাড়ি চালাননি।'

'সে তথ্য আমার অজানা নয়, শঙ্করবাবু। মালির সঙ্গে কথা বলার পর আপনার ড্রাইভারের সঙ্গে আমার কথা হল।'

'সে কী বলে ?'

'ত্রিশ বছর সে আপনাদের ড্রাইভারি করছে, তার মধ্যে সে মাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। তাতে আপনার বাবার তাড়া ছিল বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনবহুল রাস্তায় তাকে জোরে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। তাই যখন দুর্ঘটনাটা ঘটে তখন ডাঃ মুনসী খানিকটা নিজেকেই দায়ী করেন। ড্রাইভারের যাতে দণ্ড না হয় তার জন্য তিনি যা করবার সবই করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ড্রাইভারের অনুতাপ আর আতঙ্ক কিছুতেই যাচ্ছিল না। তখন ডাঃ মুনসী তার চিকিৎসা করে তাকে ভালো করে তোলেন। অর্থাৎ আপনার বাবা ডায়রিতে একটুও মিথ্যে লেখেননি। এবং "আর" হচ্ছে নট রাজেন মুনসী, বাট ড্রাইভার রঘুনন্দন তেওয়ারি।'

'বাট হু কিল্‌ড মাই ফাদার ?' অসহিষ্ণুভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন শঙ্কর মুনসী।

'এসব ব্যাপারে একটু ধৈর্য ধরতে হয়, মিঃ মুনসী,' গম্ভীর স্বরে বলল ফেলুদা। তারপর মুনসীর দিক থেকে তার দৃষ্টি ঘুরে একটি অন্য ব্যক্তির উপর গিয়ে পড়ল। 'এ ঘরে একজন ব্যক্তি আছেন যাঁকে আমরা অসুস্থ বলে জানি,' বলল ফেলুদা। 'এর আগে তিনি দুবার আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, এবং দুবারই নানান অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে নিজেকে অসুস্থ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। আজ তাঁকে দেখছি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের চেহারা নিয়ে আমার ভাষণ শুনছেন। মিঃ মল্লিক—আপনি কি আপনা থেকেই সেরে গেলেন ?'

রাধাকান্ত মল্লিক হঠাৎ যেন শক খাওয়া মানুষের মতো চমকে উঠলেন।—'কী—কী বলছেন বলুন।'

'বলছি যে আমার জেরায় সকলেই অল্পবিস্তর মিথ্যা বলেছেন বা সত্য গোপন করে গেছেন, কিন্তু আপনি সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন।'

মল্লিক এখনো এক দৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে, তার মনের ভাব বোঝার কোনো উপায় নেই। ফেলুদা বলল, 'আপনি বলেছিলেন পপুলার ইনশিওরেন্সে কাজ করেন। আমি সেটা ভেরিফাই করতে সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম আপনি আর সেখানে নেই, চার মাস হল ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি কি তাহলে বেকার ? না অন্য কোথাও কাজ করছেন ? ইনশিওরেন্স অফিসে এ প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারল না বলে আপিস থেকেই আপনার বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। সতীশ মুখার্জী রোড, তাই না ?'

মল্লিক এখনো চুপ, তার দৃষ্টি সামনের দিকে।

'সত্য, এ মামলায় বিস্ময়ের শেষ নেই,' বলে চলল ফেলুদা। 'আপনি ডাঃ মুনসীকে বলেছিলেন আপনার বাবা, আপনার দাদা, সকলেই আপনার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে। অথচ আপনার বাড়ি গিয়ে দেখি আপনার বাবা দাদা, কেউই নেই। বাবা মারা গেছেন প্রায় পঁচিশ বছর হল, আর দাদা বলে কেউ

কোনোদিন ছিলই না। আপনার বিধবা মার কাছ থেকে জানি যে আপনি একটা যাত্রা কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন এবং বর্তমানে টুরে আছেন।'

এবারে রাধাকান্ত মল্লিক মুখ খুললেন।

'আমি যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির এটা আমি কোনোদিনই ক্লেম করিনি। কিন্তু আপনি কী বলতে চান? আমি খুন করেছি?'

'আমি ধাপে ধাপে এগোই, মল্লিক মশাই, লাফে লাফে নয়। আপনি খুনী কিনা সে ব্যাপারে পরে আসছি; প্রথমে দেখছি আপনি প্রবঞ্চক। মনোবিকারের অভিনয় করে আপনি মুনসীর কাছে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য। আপনি—'

'কেন এসেছিলাম সেটা জানেন আপনি?' ফেলুদাকে বাধা দিয়ে জোরালো গলায় বললেন মল্লিক।

'এটা আপনার মা-র কাছ থেকে জানি যে আপনার বাবা গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান, যিনি চাপা দেন তাঁর কোনো শাস্তি হয়নি, এবং গাড়ির মালিক এসে আপনার মা-র হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে।'

'ইয়েস!' চেঁচিয়ে উঠলেন রাধাকান্ত মল্লিক। 'তখনই দেখি আমি ভদ্রলোককে, আর তারপরে ছবি দেখি কাগজে এই সেদিন। সেই একই চেহারা, আর দেখেই স্থির করি যে একে বাঁচতে দেওয়া চলে না। কল্পনা করতে পারেন? একটি বারো বছরের ছেলে, বাবার পিছনে পিছনে ট্রাম থেকে নামছে। চোখের সামনে বাবা মোটরের তলায় তলিয়ে গেল! ওঃ, কী ভয়ংকর দৃশ্য! আজও মনে পড়লে শরীর শিউরে ওঠে। মাসের পর মাস ধরে মা-কে জিগ্যেস করেছি, যে লোকটা বাবাকে চাপা দিল তার শাস্তি হবে না? 'বড় লোকদের শাস্তি হয় না! বাবু, বড় লোকেরা পার পেয়ে যায়।'...আর তারপর হঠাৎ খবরের কাগজে ছবি! এক মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলি। এর শাস্তি হবে। আর সে শাস্তি দেব আমি!'

'তারপরেই মনোবিকারের অভিনয় করার সিদ্ধান্ত?'

'হ্যাঁ, কিন্তু খুন করা যে এত কঠিন কে জানত? বুঝতে পারছিলাম এ জিনিস চট করে হবার নয়; সময় লাগবে আমার মনকে শক্ত করতে। শেষকালে মন শক্ত হল, অস্ত্র জোগাড় হল...মুনসীরই আপিস ঘরের একটা পেপার নাইফ। বাবার দেহ থেকে যে রক্ত বেরোতে দেখেছি। তাঁর হত্যাকারীর দেহ থেকেও রক্তপাত না হলে উপযুক্ত শাস্তি হবে না। তারপর—'

'তারপর কী, মল্লিকমশাই?'

'অদ্ভুত ব্যাপার, অদ্ভুত ব্যাপার! ছোরা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেছি। পশ্চিমের জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে মুনসীর উপর পড়েছে। মুখ হাঁ, আধ খোলা চোখে নিষ্প্রাণ চাউনি। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ নেই! আমি খুন করব কি? সে

লোক তো অলরেডি, ডেড, ডেড, ডেড !'

তৃতীয় 'ডেড' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে একটা ধুপ করে শব্দ হল।

সেটার কারণ হচ্ছে ডাঃ মুনসীর শালা চন্দ্রনাথবাবু। তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে চেয়ার থেকে উল্টে মেঝেতে পড়েছেন।

সোম তাঁর দিকে দৌড়ে গেলেন। আর সেই সঙ্গে ফেলুদা বলে উঠল, 'দেখে নিন, মিঃ মুনসী। আপনার মামা, আপনার মা-র যমজ ভাই। হি কিল্‌ড ইওর ফাদার।'

'মানে?' হঠাৎ থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন জটায়ু 'মোটিভ?'

ফেলুদার দৃষ্টি আবার শঙ্করবাবুর দিকে গেল। 'আপনি বলতে পারেন না, শঙ্করবাবু? আপনি তো ডায়রিটা পড়েছেন?'

শঙ্করবাবু ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'মানুষকে চেনা অত সহজ নয়, শঙ্করবাবু', বলল ফেলুদা। 'জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের আসল তফাত, জানোয়ার ভান করতে জানে না, অভিনয় জানে না, মনের ভাব লুকোতে জানে না। ...ডাঃ মুনসী আপনার মা সম্বন্ধে মোটেই উদাসীন ছিলেন না। থাকলে ডায়রিটা তাঁকে কখনই পড়তে দিতেন না। কখনই সে ডায়রি তাঁকে উৎসর্গ করতেন না। ব্যাপারটা আসলে উল্টো। ঔদাসীন্য যদি কারুর তরফ থেকে হয়ে থাকে তিনি হলেন আপনার বিমাতা, যিনি তাঁর সমস্ত স্নেহ, ভালোবাসা, চিন্তা, ভাবনা, ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর অকর্মণ্য ভাইয়ের উপর।'

...এবার খুনের মোটিভটা কী? সেটা কি একবার সমবেত সকলকে বলবেন?' প্রায় যান্ত্রিক মানুষের মতো কথা বেরোল শঙ্করবাবুর মুখ থেকে।

'বাবার উইলে চার ভাগ পাবে মনস্তাত্ত্বিক সংস্থা, চার ভাগ আমি, আর আট ভাগ আমার মা।'

ইতিমধ্যে মিঃ সোমের পরিচর্যায় চন্দ্রনাথবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। ফেলুদা তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করল, 'খুন করার সিদ্ধান্ত কি আপনার?'

চন্দ্রনাথবাবু মাথা নাড়লেন, তাঁর দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাসের পর কথা বেরোল, এত ক্ষীণ, যে বেশ কষ্ট করে বুঝতে হয়।

'না। সিদ্ধান্ত...ডলির। ডলিই আমার হাতে...হামানদিস্তা তুলে দেয়!'

'হুঁ, বুঝেছি।' ফেলুদা যেন বেশ ক্লান্তভাবেই চেয়ারে বসে পড়ল। 'শুধু একটা আপসোস, গভীর আপসোস...ডায়রিটা বেরোলে নিঃসন্দেহে সাহিত্যিক হিসাবে ডাঃ মুনসীর সুনাম হত। সেই ডায়রি এখন সলিলগর্ভে।'

'অ্যাটেনশন! স্পটলাইট!'

ঘর কাঁপিয়ে সবাইকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন জটায়ু। সবাই তাঁর দিকে

দেখছে দেখে একটা অদ্ভুত হাসি হেসে কাঁধের ঝোলা থেকে একটানে একটা ফাইল বার করে সেটাকে মাথার উপর তুলে পাখার মতো নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'জলে যায়নি ! জলে যায়নি ! হিয়ার ইট ইজ !'

'ডাঃ মুনসীর পাণ্ডুলিপি ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ফেলুদা। 'সেটা কী করে হয় ?'

'ইয়েস স্যার ! থ্যাঙ্কস টু বিজ্ঞানের অগ্রগতি। একদিনে পড়া হবে না বলে এটা জিরক্স করিয়ে রেখেছিলাম, জিরক্স ! এক্স ই আর ও এক্স !...নিন সুখময়বাবু, টাইপিং শুরু করে দিন, শেষ হলে পর সোজা নর্থ পোল।'

এখানে অবিশ্যি একটা জটায়ু মার্কা ভুল হল, পেঙ্গুইন নর্থ পোলে থাকে না, থাকে সাউথ পোলে।

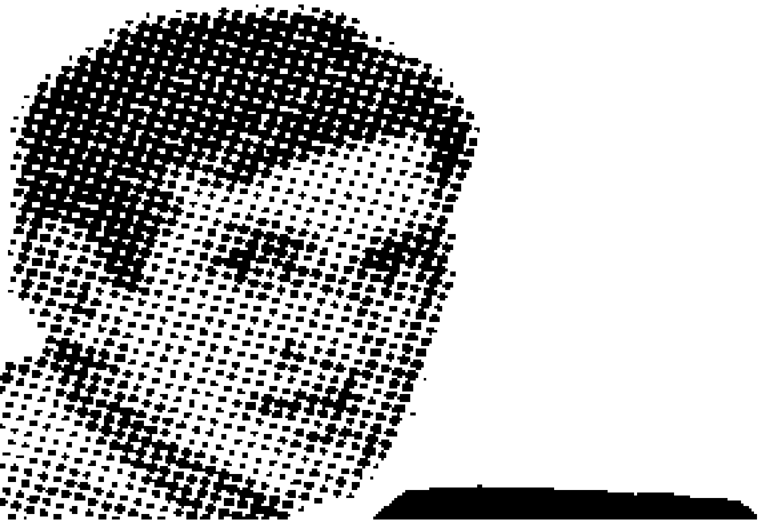

গোলাপী মুক্তা রহস্য

Pradosh C. Mitter

Private Investigator

গোলাপী মুক্তা রহস্য

॥ ১ ॥

'সোনাহাটিতে দেখবার কী আছে মশাই ?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

"বাংলায় ভ্রমণ"-এ যা বলছে, তাতে একটা পুরনো শিবমন্দির থাকা উচিত, আর একটা বড় দিঘি থাকা উচিত। নাম বোধহয় মঙ্গলদিঘি। ওখানকার এককালের জমিদার চৌধুরীদের কীর্তি। সোনাহাটি বিশ বছর আগে অবধি ছিল একটা গাঁ। এখন ইস্কুল, হাসপাতাল, হোটেল সবই হয়েছে।'

লালমোহনবাবু ঘড়ি দেখলেন। এটা সম্প্রতি কেনা একটা কোয়ার্টজ্ ঘড়ি। বললেন, 'সাংঘাতিক অ্যাকিউরেট টাইম রাখে।'

'আর দশ মিনিট,' ঘড়ি দেখে বললেন ভদ্রলোক।

আমরা তিনজন এবং আরেকটি ভদ্রলোক—নাম নবজীবন হালদার—সোনাহাটি যাচ্ছি ওখানকার রিক্রিয়েশন ক্লাব থেকে নেমন্তন্ন পেয়ে। ওরা ফেলুদা আর নবজীবনবাবুকে সংবর্ধনা দেবে ওদের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে। নবজীবনবাবু ইতিহাসের নামকরা অধ্যাপক, বই-টইও আছে দু-তিনটে। আমরা থাকব দু'দিন, ওখানকার সবচেয়ে নামকরা বড়লোক পঞ্চানন মল্লিকের গেস্ট হয়ে। মল্লিক হলেন রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। তাঁর নাকি নানারকম পুরনো জিনিসের সংগ্রহ আছে।

'আপনি যে এই নেমন্তন্ন অ্যাক্সেপ্ট করবেন সেটা কিন্তু আমি ভাবিনি,' ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন জটায়ু।

ফেলুদা বলল, 'আর কিছু না—দু'দিনের জন্য যদি কলকাতার বিষাক্ত বায়ু থেকে রেহাই পাওয়া যায় তো মন্দ কী ? তা ছাড়া ওখানে আমার এক কলেজের সহপাঠী আছে, নাম সোমেশ্বর

সাহা। ওকালতি করে।'

আমাদের ট্রেন মোটামুটি ঠিক সময়ই সোনাহাটি পৌঁছে গেল। আমরা নামতেই একটা দল আমাদের দিকে এগিয়ে এল—তাদের মধ্যে দু'জনের হাতে ফুলের মালা। একজন ফেলুদার গলায় মালা পরিয়ে নমস্কার করে বলল, 'আমি ক্লাবের সেক্রেটারি—নরেশ সেন। আমিই আপনাকে চিঠিটা লিখেছিলাম।'

নবজীবনবাবুকেও মালা পরানো হয়েছিল। এবার একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক—সিল্কের পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম—এগিয়ে এলেন। নরেশ সেন বলল, 'ইনিই হচ্ছেন আমাদের ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পঞ্চানন মল্লিক।'

মল্লিকমশাইয়ের মুখে স্বাগতম্ হাসি। বললেন, 'আপনারা যে আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন সেটা আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়। আমার বাড়িতে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আশাকরি কোনও অসুবিধা হবে না। বড় শহরের সব ফ্যাসিলিটিজ তো এখানে পাবেন না।'

'ও নিয়ে আপনি কোনও চিন্তা করবেন না,' বলল ফেলুদা।

'আপনিও তো শুনিচি খ্যাতিমান ব্যক্তি,' লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বললেন ভদ্রলোক।

'আমি লিখি-টিখি আর কী,' বিনয়ী হাসি হেসে বললেন জটায়ু।

মল্লিকমশাইয়ের নীল অ্যাম্বাসাডর স্টেশনের বাইরেই অপেক্ষা করছিল, আমরা পাঁচজন তাতে উঠে পড়লাম—আমি আর জটায়ু সামনে।

'আপনার সংগ্রহের কথা শুনেছি,' গাড়ি রওনা হবার পর বলল ফেলুদা। 'বোধহয় কাগজেও দেখেছি।'

'হ্যাঁ—ওটা আমার অনেকদিনের শখ। অনেক রকম জিনিস আছে আমার কাছে। হালদারমশাইও ইন্টারেস্ট পাবেন, কারণ বেশ কিছু জিনিসের সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে আছে। আমার লেটেস্ট সংগ্রহ হল মহর্ষির জুতো।'

'মহর্ষির জুতো? সেটা কী ব্যাপার?' ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

'সে ঘটনা জানেন না ? হালদারমশাই নিশ্চয়ই জানেন।'

'কী ব্যাপার ?'

'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তখন যুবা বয়স, খুব শৌখিন লোক। ঐশ্বর্যে ডুবে আছেন। একবার এক জায়গা থেকে নেমন্তন্ন এল, সেখানে কলকাতার সব রইস আদ্‌মিরা যাবেন। মহর্ষি গেলেন। কলকাতার বিখ্যাত বাবুমশাইরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত মহামূল্য পোশাক আর অলঙ্কারে ঢেকে এসেছেন। কাশ্মিরি দোরোখা আর জামিয়ার শালে চতুর্দিক ঝলমল করছে। তারই মধ্যে দেখা গেল দেবেন্দ্রনাথ এলেন, পরনে সাদা চোগা, সাদা চাপকান, তার উপরে নকশাহীন সাদা শাল জড়ানো। সকলে তো অবাক। এ কী ব্যাপার ? মহর্ষির এই দৈন্যদশা কেন ? তারপর সকলের চোখ গেল মহর্ষির পায়ের দিকে। এক জোড়া সাদা নাগরা, তাতে দুটি বিশাল বিশাল হিরে ঝলমল করছে।'

'সেই জুতো আপনি পেয়েছেন ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন লালমোহনবাবু।

'একটি। একটি পেয়েছি হিরে সমেত। দেখাব আপনাদের।'

পঞ্চাননবাবুর বাগানে ঘেরা বিশাল দোতলা বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় তিনি বড়লোক। গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে গাড়ি থামল। আমরা সবাই নামলাম। সদর দরজায় দু'জন বেয়ারা আর একজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, মল্লিকমশাই একজন বেয়ারাকে বললেন, 'বৈকুণ্ঠ, যাও এঁদের ঘর দেখিয়ে দাও। আর এখন তো সোয়া বারোটা ; একটার মধ্যে যাতে খাবার ব্যবস্থা হয় সেটা দেখো।'

আমরা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগলাম। মল্লিকমশাই বললেন, 'আপনাদের ঘটনা তো সেই সন্ধ্যায়। ও সময়টা কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা ; আশাকরি গরম কাপড় আছে সঙ্গে।'

'পৌষ মাসে গ্রামাঞ্চলে ঠাণ্ডা হবে সেটা আমরা জানতাম,' বলল ফেলুদা।

একটা প্যাসেজের দু'দিকে তিনটে ঘর আমাদের জন্য রাখা

হয়েছে। হালদারমশাই তাঁর ঘরে চলে গেলেন, আমরা তিনজন গিয়ে ঢুকলাম ফেলুদার আর আমার ঘরে। চীনেমাটির টুকরো দিয়ে ঢাকা মেঝে, যাকে ইংরাজিতে বলে Crazy China। এককালে টানা-পাখার ব্যবস্থা ছিল সেটা দেয়ালের উপর দিকে ফুটো দেখলেই বোঝা যায়।

'এঁর টাকা হচ্ছে তামার খনির টাকা,' বলল ফেলুদা। 'আমার এক মক্কেল এঁকে ভাল করেই চেনেন।'

'আবহাওয়াটা যে কলকাতার তুলনায় নির্মল সেটা এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে,' বললেন লালমোহনবাবু।

আমিও সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। তা ছাড়া কানটাও আরাম পাচ্ছে। ট্র্যাফিক বলে কোনও ব্যাপার নেই; এখনও পর্যন্ত একটাও হর্ন শুনিনি।

একজন বেয়ারা একটা থালায় তিন গেলাস সরবত দিয়ে গেল। সেই সরবত খেতে না খেতেই খবর এল যে নীচে খাবার ঘরে পাত পড়েছে।

॥ ২ ॥

আতিথেয়তায় মল্লিকমশাই যে একেবারে পয়লা নম্বর সেটা খাবার বহর দেখেই বোঝা গেল। মাছের যে এতরকম জিনিস রান্না হতে পারে সেটা আমার ধারণাই ছিল না। ফেলুদা অল্প খায়, কিন্তু লালমোহনবাবু ভোজনরসিক—খুব তৃপ্তি করে খেলেন। ওঁর খুশির আরেকটা কারণ হচ্ছে যে পঞ্চাননবাবু ওঁর লেখা সম্বন্ধে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করছিলেন তাই ভদ্রলোক নিজের ঢাক পেটাবার একটা সুযোগ পেলেন।

খাবার পর মল্লিকমশাই বললেন, 'এবার আপনাদের একটু এনটারটেন করব। চলুন আমার সংগ্রহের কিছু জিনিস দেখাই।'

আমরা আবার দোতলায় ফিরে এলাম। এবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে না ঘুরে বাঁদিকে ঘুরলাম। এদিকেই পঞ্চাননবাবুর ঘর আর তাঁর সংগ্রহশালা।

জিনিসপত্র অনেকরকম জোগাড় করেছেন ভদ্রলোক তাতে সন্দেহ নেই। তার প্রত্যেকটারই আবার একটা করে পরিচয় আছে। মহর্ষির নাগরাটা প্রথমেই দেখা হল, তারপর ক্রমে টিপুর নস্যির কৌটো, ক্লাইভের ট্যাঁকঘড়ি, সিরাজদ্দৌলার রুমাল, রানি রাসমণির পানবাটা—এ সবই দেখলাম। আমরা সকলেই অবিশ্যি খুবই তারিফ করলাম, কিন্তু আমার যেন কেমন-কেমন লাগছিল। কোন জিনিসটা কার ছিল সেটা জানা গেল কী করে? ক্লাইভের ঘড়িতে তো আর ক্লাইভের নাম লেখা নেই। বা সিরাজদ্দৌলার রুমালেও নেই।

সব দেখেটেখে চারজনে ঘরে ফেরার পথে নবজীবনবাবু ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন মনে হল?'

ফেলুদা বলল, 'খুব কনভিনসিং লাগল না।'

'কনভিনসিং? ওর মধ্যে একটা জিনিসও জেনুইন নেই। লোকটা বোগাস, হামবাগ। মহর্ষির নাগরা থেকে তো রীতিমতো নতুন চামড়ার গন্ধ বেরোচ্ছিল।'

ঘণ্টা তিনেক বিশ্রামের সময় ছিল, তারপর অনুষ্ঠানে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। ফেলুদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরল বোধহয় আজ দশ

বছর পর। ওকে পোশাকটা যে দারুণ মানায় সেটা স্বীকার করতেই হয়। লালমোহনবাবু একটা নকশাদার কাশ্মিরি শাল চাপিয়েছিলেন, বললেন সেটা ওঁর ঠাকুরদাদার ছিল।

ঠিক পৌনে ছ'টায় বেয়ারা পাঠিয়ে আমাদের ডেকে নিলেন পঞ্চাননবাবু। শীতকাল, তাই এর মধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনুষ্ঠানের জায়গায় পৌঁছে দেখি আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে। স্পটলাইট, ফ্লুয়োরেসেন্ট লাইট, রঙিন বাল্ব—কিছুরই অভাব নেই।

আমরা মঞ্চে গিয়ে বসলাম। সংবর্ধনার ব্যাপারটা একেবারে শেষে—অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্স। তার আগে নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটকের অংশের দৃশ্য—সবই হল। সকলেই আজ জান দিয়ে দিচ্ছে ফেলুদাকে ইমপ্রেস করার জন্য, ফেলুদাও হাততালিতে কার্পণ্য করছে না।

সংবর্ধনার ব্যাপারটা কুড়ি মিনিটে সারা হয়ে গেল। সময় একটু লাগল মানপত্রটা পড়তে। এটা বলতেই হবে যে মানপত্র দুটো দেখতে বেশ ভাল হয়েছে, আর যে লিখেছে তার হাতের লেখা খুব ভাল। সব শেষে কয়েকজন সাংবাদিক ফেলুদাকে ঘিরে ধরল, আর তাদের কিছু প্রশ্নের জবাবও দিতে হল ফেলুদাকে। সে বলল এখন তার অবসর—হাতে কোনও কেস নেই।

নবজীবনবাবু অনুষ্ঠানের শেষে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে গেলেন, আমরা রয়ে গেলাম কারণ আমাদের নেমন্তন্ন আছে ফেলুদার সহপাঠী সোমেশ্বর সাহার বাড়িতে। ভিড় কমবার পরেই ভদ্রলোক হাসিমুখে ফেলুদার দিকে এগিয়ে এলেন।

'চিনতে পারছিস ?'

'অনায়াসে,' বলল ফেলুদা। 'গোঁফটা ছাড়া আর প্রায় কিছুই বদলায়নি।'

'তুইও মোটামুটি একই রকম আছিস, তবে চোখে একটা দীপ্তি দেখছি যেটা বুদ্ধি পাকবার ফলে হয়েছে। ক'টা কেস হ্যান্ডল করলি এ পর্যন্ত ?'

'হিসেব নেই,' বলল ফেলুদা। 'গোড়ার দিকে হিসেব রাখতাম,

আজকাল ছেড়ে দিয়েছি।'

'তোর সঙ্গে একজন আলাপ করতে ভীষণ আগ্রহী'—সোমেশ্বর সাহা তাঁর পিছনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে পিঠে হাত দিয়ে সামনে আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন।—'এঁর নাম জয়চাঁদ বড়াল। এখানকারই বাসিন্দা। ইনিই মানপত্রটা ডিজাইন করেছেন।'

'তাই বুঝি?' বলল ফেলুদা। 'খুব ভাল হয়েছে। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলাম।'

জয়চাঁদবাবু লজ্জায় ঘাড় নিচু করে বললেন, 'আপনার কাছ থেকে প্রশংসা পাব এ কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি আপনার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত।'

'আজ ইনিও আমাদের বাড়িতেই খাচ্ছেন,' বললেন সোমেশ্বরবাবু। 'চ—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে গোঁজিয়ে কোনও লাভ নেই। আমার বাড়ি বেশি দূর নয়। মিনিট দশেক পা চালাতে পারবি তো?'

'জরুর।'

সোমেশ্বরবাবুর বাড়ি বড় না হলেও, বেশ গুছোনো। সেটা বোধহয় ওঁর স্ত্রীর জন্য। স্ত্রী ছাড়া একটি দশ বছরের ছেলেও আছে ভদ্রলোকের। জয়চাঁদবাবু সমেত আমরা চারজনে বৈঠকখানায় বসার দশ মিনিটের মধ্যেই সরবত এসে গেল। স্ত্রী উমাদেবী বললেন, 'আগে সরবতটা খান—সাড়ে ন'টার মধ্যে আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করে দেব।'

মিনিট পাঁচেক এটা-সেটা নিয়ে কথা হবার পর সোমেশ্বরবাবু জয়চাঁদ বড়ালকে দেখিয়ে বললেন, 'এঁর একটা বিশেষ কিছু বলার আছে তোকে। আমার মনে হয় তুই ইন্টারেস্ট পাবি।'

'বটে?' বলল ফেলুদা। 'কী ব্যাপার শুনি।'

'কিছুই না,' সলজ্জ হাসি হেসে বললেন জয়চাঁদবাবু, 'আমাদের ফ্যামিলি সংক্রান্ত একটা ব্যাপার।'

লালমোহনবাবু আগ্রহের সঙ্গে একটু এগিয়ে বসলেন। 'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?'—গল্পের গন্ধ পেলেই ভদ্রলোক চনমনিয়ে ওঠেন।

জয়চাঁদবাবু হাত থেকে সরবতের গেলাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'আমি নিজে এখন ইস্কুল মাস্টারি করি, কিন্তু আমার পৈতৃক ব্যবসা ছিল হিরে-জহরতের। কলকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে আমাদের একটা গয়নার দোকান এখনও আছে ; সেটা দেখেন আমার এক কাকা। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি ছিলেন আমার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদা—নাম ছিল অভয়চরণ বড়াল। তিনিই এই ব্যবসা আরম্ভ করেন। জাহাজে করে ভারতবর্ষের উপকূলে সব শহরে গিয়ে হিরে পান্না কেনাবেচা করতেন। মাদ্রাজের কাছাকাছি কোনও একটা শহরে তিনি একবার একটা রত্ন পান। সেটা তিনি যত্ন করে জমিয়ে রেখেছিলেন। সে রত্ন এখনও আমার কাছে রয়েছে। সেটা আমি আপনাদের দেখাতে চাই।'

'সঙ্গে এনেছেন ?' জটায়ু প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা খয়েরি রঙের রুমাল বার করলেন, তাতে গেরো দিয়ে বাঁধা একটা ছোট্ট লাল ভেলভেটের বাক্স। বাক্স খুলে তার থেকে একটা মুক্তো বার করে ভদ্রলোক আমাদের সামনে ধরলেন।

ফেলুদা উত্তেজনায় ভরা চাপা স্বরে বলে উঠল—

'একী—এ যে পিংক পার্ল !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' বললেন জয়চাঁদ বড়াল। 'অবিশ্যি গোলাপী হওয়ায় এর কোনও বিশেষত্ব আছে কি না জানি না।'

'কী বলছেন আপনি !' বলল ফেলুদা। 'ভারতবর্ষে যতরকম মুক্তো পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য আর সবচেয়ে মূল্যবান হল গোলাপী মুক্তো।'

'মুক্তো সাদা ছাড়া হয় তাই তো জানতাম না,' বললেন লালমোহনবাবু।

'সাদা লাল কালো হলদে নীল—সবরকম হয়,' বলল ফেলুদা। তারপর জয়চাঁদবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'শুনুন—আপনি ও জিনিস ওভাবে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না। বাড়িতে সিন্দুক থাকলে

তাতে রেখে দেবেন।'

'আজ্ঞে এটা আমি বার করি না বললেই চলে। আজ আপনাকে দেখাব বলে নিয়ে এলাম।'

'আর কাকে দেখিয়েছেন ওটা?'

'মাত্র একজন। গত সপ্তাহে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বণিকদের নিয়ে একটা বই লিখছেন—তাঁকে দেখিয়েছিলাম।'

'এ ছাড়া আর কেউ জানে না তো?'

'কী আর বলব বলুন—এই ভদ্রলোক, যিনি বই লিখছেন—তিনি আবার ঘটনাটা এক সাংবাদিককে বলেন। ফলে পরদিনই সেটা কাগজে বেরিয়ে যায়।'

'কলকাতার কাগজে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনটে বাংলা কাগজে বেরিয়েছে। আপনি ফিরে গিয়ে সেটা দেখতে পারেন।'

'গোলাপী মুক্তো বলে বলা আছে তাতে?'

'তাই তো বলেছে। একটা কাগজে তো এ-ও বলে দিয়েছে যে মুক্তোর মধ্যে গোলাপী মুক্তোই সবচেয়ে ভ্যালুয়েব্‌ল।'

'সর্বনাশ!' কপালে হাত ঠুকে বললে ফেলুদা। 'আমি আপনাকে জোর দিয়ে বলছি এ জিনিস আপনি কাউকে কখনও দেখাবেন না। এই একটা মুক্তোর দাম কত তা আপনি কল্পনা করতে পারেন? বিক্রি করলে আপনি যা দাম পাবেন তাতে আপনার পরের দুই পুরুষ পর্যন্ত খাওয়া-পরার কোনও ভাবনা থাকবে না।'

'এটা আপনি আমাকে বলে খুব উপকার করলেন।'

আমরা তিনজনেই একবার করে মুক্তোটা হাতে নিয়ে দেখলাম। নিটোল চেহারা। ফেলুদা বলল যে, শেপের দিক দিয়েও মুক্তোটা অসাধারণ।

জয়চাঁদবাবু তাঁর সম্পত্তি আবার পকেটে পুরে নিলেন। ফেলুদা 'ছিক্‌' করে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করে বলল, 'খবরটা কাগজে বেরোন খুবই আনফরচুনেট ব্যাপার। আশা করি কোনও গোলমাল হবে না।'

'যদি হয় তা হলে কি আমি আপনাকে জানাব?'

'নিশ্চয়ই। আমার ঠিকানা, ফোন নম্বর সবই সোমেশ্বর জানে। আপনি বিনা দ্বিধায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এমন কী দরকার হলে ওটাকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে পারেন।'

॥ ৩ ॥

আমরা পরদিন সকালে হাওড়া এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে বিকেলে কলকাতা পৌঁছে গেলাম। আমাদের সঙ্গে হালদারমশাইও ফিরলেন। দেখলাম ফেলুদা ওঁর সামনে একবারও গোলাপী মুক্তোর উল্লেখ করল না।

বাড়িতে এসে ফেলুদা শুধু একটা কথাই বলল।

'মুক্তোর খবরটা কাগজে বেরোনটা মারাত্মক ভুল হয়েছে।'

আসবার তিন দিন পরে সকালে বসবার ঘরে বসে কথাসরিৎসাগর পড়ছি, ফেলুদা ক্লিপ দিয়ে নখ কাটছে, এমন সময়

টেলিফোনটা বেজে উঠল। ফেলুদা উঠে ধরল। কথা শেষ হয়ে যাবার পর ফেলুদা বলল, 'বড়াল।'

'কলকাতায় এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে বিশেষ দরকার। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় আসছে। কথা শুনেই বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক খুবই উত্তেজিত।'

আমরা ফোন করে লালমোহনবাবুকে ডাকিয়ে নিলাম। কোনও মামলার কোনও জরুরি অংশ থেকে বাদ পড়লে উনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন। বলেন, 'কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারি না। ফলে চিন্তা করে যে আপনাকে হেল্‌প করব তারও উপায় থাকে না।'

ভদ্রলোক ঠিক পাঁচটায় এসে পড়লেন, আর তার আধঘণ্টা পরে, শ্রীনাথ চা দেবার সঙ্গে সঙ্গে, এসে পড়লেন জয়চাঁদ বড়াল।

এ চেহারাই আলাদা। এই তিন দিনে ভদ্রলোকের উপর দিয়ে যে বেশ ধকল গেছে সেটা বোঝাই যায়। ইতিমধ্যে দুটো ইংরিজি কাগজেও পিংক পার্লের খবরটা বেরিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

জয়চাঁদবাবু এক গেলাস জল খেয়ে আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথাটা নাড়িয়ে বললেন, 'একটা খবরের কাগজের খবর থেকে যে এত কিছু ঘটতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না। তিনটে ঘটনা আপনাকে বলার আছে। এক হচ্ছে আমার এক খুড়তুতো ভাই—নাম হচ্ছে মতিলাল বড়াল—তার একটা চিঠি। সে বহুকাল থেকে বেনারসে আছে। একটা সিনেমা হাউস চালায়। সে লিখেছে যে যদি আমি মুক্তোটা বিক্রি করি তা হলে যা পাব তার একটা অংশ তাকে দিতে হবে। মুক্তোটা পরিবারের সম্পত্তি, শুধু আমার একার নয়। চিঠিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে মুক্তোর ব্যাপারটা আমি তার কাছ থেকে গোপন করে গেছি।'

'আর দুই নম্বর?'

'সেটাও একটা চিঠি, এসেছে ধরমপুর বলে উত্তরপ্রদেশের একটা শহর থেকে। আমি ইস্কুলের লাইব্রেরির বই ঘেঁটে জেনেছি যে ধরমপুর একটা করদ রাজ্য ছিল। যিনি চিঠিটা লিখেছেন তিনিই যে ধরমপুরের সর্বেসর্বা তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ ঠিকানা হচ্ছে

ধরমপুর প্যালেস। লেখকের নাম সুরয সিং। এঁর নাকি মুক্তোর বিরাট কালেকশন আছে, কিন্তু গোলাপী মুক্তো নেই! মুক্তোটা উনি কিনতে চান। আমি কত দাম চাই সেটা অবিলম্বে তাঁকে জানাতে হবে।'

'আর তিন নম্বর?'

'সেটাই সবচেয়ে মারাত্মক। এক ভদ্রলোক—পশ্চিমা কিংবা মাড়োয়ারি হবে—পরশু আমার বাড়িতে গিয়ে হাজির। তিনি অনেক কিছু কালেক্ট করেন। কথায় বুঝলাম সে সব জিনিস তিনি ভাল দামে বিদেশে পাচার করেন। জামাকাপড়, হাতের আংটি, কানের হিরে ইত্যাদি দেখে মনে হল খুব মালদার লোক।'

'এঁরও কি মুক্তোটা চাই?'

'হ্যাঁ। তার জন্য তিনি চল্লিশ হাজার টাকা দিতে রাজি আছেন। আমি অবিশ্যি হ্যাঁ না কিছুই বলিনি। তিন দিন সময় চেয়েছি। ভদ্রলোক এখন কলকাতায়। তাঁর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে গিয়েছেন। আমাকে কাল সকাল দশটায় তাঁর কাছে গিয়ে একটা কিছু বলতে হবে। মনে হল ভদ্রলোক মুক্তোটা পেতে বদ্ধপরিকর। হয়তো দাম একটু বাড়াতে পারেন, কিন্তু মুক্তোটা ওঁর চাই।'

'এঁর নাম জানেন নিশ্চয়ই।'

'জানি।'

'কী?'

'মগনলাল! মগনলাল মেঘরাজ।'

আমরা তিনজনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থ মেরে গেলাম। আর কতবার এই লোকটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে? প্রতিপক্ষ হিসেবে এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কাউকে কল্পনা করা যায় না। আর ইনিই গিয়ে হাজির হয়েছেন বড়ালমশাইয়ের কাছে? এঁরও দরকার হয়ে পড়েছে গোলাপী মুক্তো?

মুখে ফেলুদা বলল, 'আপনি সোজা না করে দেবেন। ওই মুক্তোর দাম ওর চেয়ে পাঁচগুণ বেশি। ভদ্রলোক এই পাথর মোটা দামে বিদেশে পাচার করবেন। দালালি করাই হচ্ছে ওঁর ব্যবসা।

ওঁকে আমরা পাঁচ বছর ধরে চিনি।'

'কিন্তু উনি যদি আমার কথা না শোনেন ?'

ফেলুদা একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'বেশ কড়া মেজাজে কথা বলছিলেন কি ভদ্রলোক ?'

'তা বলছিলেন বটে,' বললেন জয়চাঁদবাবু 'এমন কী এ-ও বলেছিলেন যে ওঁর মুক্তোটা পাবার রাস্তা কেউ বন্ধ করতে পারবে না।'

'আপনি একটা কাজ করুন—মুক্তোটা আমাকে দিয়ে যান। আপনি সঙ্গে নিয়ে গেলে ওটা ও আদায় করে ছাড়বে। তার জন্য যদি খুনও করতে হয় তাতেও পেছপা হবে না। লোকটা সাংঘাতিক।'

'কিন্তু ওকে আমি কী বলব ?'

'বলবেন আপনি মুক্তোটা বেচবেন না। তাই ওটা আর সঙ্গে করে আনেননি। ওরকম একটা প্রেশাস জিনিস তো কলকাতায় পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায় না।'

'বেশ, তা হলে আপনিই রাখুন।'

ভদ্রলোক আবার রুমালের গেরো খুলে বাক্স থেকে মুক্তোটা বার করে ফেলুদাকে দিলেন। ফেলুদা তৎক্ষণাৎ মুক্তোটা নিজের ঘরের গোদরেজের আলমারিতে রেখে দিল। তারপর ফিরে এসে সোফায় বসে বলল, 'আর সেই সুরয সিংকে কী বলবেন ? তিনিও বেশ নাছোড়বান্দা বলে মনে হচ্ছে।'

'তাঁকেও না করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। দেড়শো বছরের ওপর জিনিসটা আমাদের কাছে রয়েছে, আর এখন হাতছাড়া হয়ে যাবে ? আমার তো টাকার অভাব নেই, টাকার লোভও নেই। আমার তো চাকরি আছেই, তা ছাড়া বাড়ি আছে। ধান জমি আছে, চাষ করে মোটামুটি ভালই আয় হয়। তিনটি প্রাণী তো সংসারে—আমার দিব্যি চলে যায়।'

'দেখুন কাল সকালে কী হয়। যাই হোক না কেন, আমাকে জানিয়ে যাবেন। আমাকে জানিয়ে আসারও কোনও দরকার নেই।'

ভদ্রলোক চা খেয়ে উঠে পড়লেন। উনি বেরিয়ে যাবার পর লালমোহনবাবু বললেন, 'এই রাহু থেকে আমাদের মুক্তি নেই। এবারে আর কী খেল দেখাবে কে জানে!'

ফেলুদা বলল, 'তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিবারই আমরা ওকে জব্দ করেছি।'

'সেটি ঠিক। ভাল কথা, আমার এক পড়শী আছে জহুরি, নাম রামময় মল্লিক। বৌবাজারে দোকান আছে—মল্লিক ব্রাদার্স। ওঁকে গিয়ে পিংক পার্লের কথাটা বলতে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল। উনিও কনফার্ম করলেন যে এত ভ্যালুয়েব্‌ল মুক্তো আর হয় না।'

ফেলুদা বলল, 'কাল সকালে কী হয় তার উপর সব নির্ভর করছে। মগনলাল যদি জেনে ফেলে জয়চাঁদবাবু আমার এখানে এসেছিলেন, তা হলেই মুশকিল।'

'আপনি মুক্তোটা নিজের কাছে রেখে একটা বড় রিস্ক নিয়েছেন।'

'ও ছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না। ওটা না করলে মুক্তো কাল মগনলালের হাতে চলে যেত।'

॥ ৪ ॥

জয়চাঁদ বড়ালের কথা

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে মগনলালের বাড়ি বার করতে বেশি সময় লাগল না। বাড়ির বাইরেটা দেখে ভিতরে ঢুকতেই ইচ্ছা করে না, কিন্তু একবার ঢুকে পড়লে দেখা যায় বেশ তক্‌তকে পরিচ্ছন্ন।

একজন চাকর এসে জয়চাঁদবাবুকে তিন তলায় নিয়ে গেল। তারপর একটা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে ঘোষণা করল যে বড়ালবাবু এসেছেন।

'ভিতরে আসুন,' মগনলালের গম্ভীর গলায় শোনা গেল।

জয়চাঁদ বড়াল ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

মগনলাল এক পাশে গদিতে বসে আছে। অন্য পাশে সোফা রয়েছে, তারই একটাতে বড়াল বসলেন।

'কী ডিসাইড করলেন ?' মগনলাল প্রশ্ন করল।

'ওটা বেচব না।'

মগনলাল কিছুক্ষণের জন্য চুপ। তারপর বলল, 'আপনি ভুল করছেন, জয়চাঁদবাবু। আমাকে রিফিউজ করে কোনও লোক রেহাই পায়নি। আপনি কি দাম বাড়াতে চাচ্ছেন ?'

'না। আমি ওটা ফ্যামিলিতেই রাখতে চাই। চার পুরুষ ধরে রয়েছে, এখনও থাকুক।'

'আপনার বাড়ি যা দেখলাম সোনাহাটিতে, তাতে আপনার মান্থলি ইনকাম দেড়-দু হাজারের বেশি বলে মনে হয় না। আর এতে আপনি একসঙ্গে ক্যাশ অনেক টাকা পেয়ে যাবেন। হোয়াই আর ইউ বিইং সো ফুলিশ ?'

'এটা বংশমর্যাদার ব্যাপার। এটা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না।'

'ওই মূর্তি কোথায় আছে ?'

'আমার কাছে নেই।'

'ওটা আপনি আনেননি ?'

'বেচবই না যখন ঠিক করলাম তখন আর আনব কেন ?'

মগনলাল তার সামনেই রাখা একটা ঘণ্টার উপর চাপড় মারল। টুং শব্দের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকর এসে ঘরে দাঁড়াল।

'গঙ্গা—এই বাবুকে সার্চ করো।'

গঙ্গা বেশ ষণ্ডা লোক ; সে একটানে জয়চাঁদবাবুকে বসা অবস্থা থেকে দাঁড় করাল। তারপর সর্বাঙ্গ সার্চ করে একটা মানিব্যাগ, একটা রুমাল আর একটা মশলার কৌটো বার করে মগনলালের সামনে রাখল।

'ঠিক হ্যায়,' বলল মগনলাল। 'ওয়াপিস দে দেনা।'

চাকর জয়চাঁদবাবুকে তার জিনিসগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

'বসুন আপনি।'

জয়চাঁদবাবু আবার সোফায় বসলেন। মগনলাল বলল,

'সোনাহাটিতে জানলাম কি আপনাদের ক্লাব প্রদোষ মিটারকে রিসেপশন দিয়েছে।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল ?'

'আপনার সব কথার জবাব দিতে তো আমি বাধ্য নই।'

'আপনার জবাবের দরকার নেই, বিকজ আই অলরেডি নো। আপনি যখন হাওড়াতে ট্রেন থেকে নামলেন, তখন থেকে আমার লোক আপনাকে নজরে রেখেছে। আপনি শিয়ালদায় যোগমায়া

হোটেলে উঠেছেন—রাইট ?'

'ঠিক।'

'বিকেল পাঁচটার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে আপনি ট্যাক্সি করে সাউথে যান। আপনার ডেস্টিনেশন ছিল ফেলু মিটারের বাড়ি—রাইট ?'

'আপনি তো সবই জানেন।'

'আপনার মোতি এখন ফেলু মিটারের জিম্মায় আছে।'

জয়চাঁদবাবু চুপ করে রইলেন। মগনলাল বলল, 'ইউ হ্যাভ ডান সামথিং ভেরি স্টুপিড, মিস্টার বড়াল। আপনি পার্লটা আমাকে দিলে চালিস হাজার টাকা পেতেন। এখন আমি সে পার্ল আদায় করে নেব, আর আপনি আমার কাছ থেকে একটা পইসাও পাবেন না।'

জয়চাঁদবাবু উঠে পড়লেন।

'আমি তা হলে এখন আসতে পারি ?'

'পারেন। আমাদের বিজনেস খতম। তবে আপনার জন্য আমার আপসোস হচ্ছে।'

॥ ৫ ॥

ফোন না করে দুপুর বারোটা নাগাত জয়চাঁদবাবু নিজেই এসে হাজির। মগনলালের সঙ্গে তাঁর কী ঘটল না ঘটল বর্ণনা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি মুক্তোর ব্যাপারটা কী করবেন ?'

ফেলুদা বলল, 'যদ্দুর বুঝতে পারছি, মগনলাল আন্দাজ করছে যে মুক্তোটা আমার কাছে রয়েছে। লোকটা অত্যন্ত তুখোড়। সোজাসুজি যদি আমার কাছে এসে পড়ে তা হলেও আশ্চর্য হব না। যে জিনিসটা এতকাল আপনাদের ফ্যামিলিতে ছিল, সেটা এখন হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে আপনার মন খারাপ লাগবে সেটাও আমি বুঝি। কিন্তু তাও আমি বলব যে মুক্তোটা আমার কাছেই থাক। আপনার কাছে থাকলে ও যেন-তেন-প্রকারেণ ওটা আদায় করে নেবে। সেটা ভাল হবে না।'

জয়চাঁদ রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি বিক্রি না করলে তো ও মুক্তোটা এমনিতেই পাবে না। আপদ বিদেয় হোক, তারপর ওটা আমার কাছে ফিরে যেতে পারে।'

'ঠিক কথা,' বলল ফেলুদা। 'আপনি আজই ফিরছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্ধের গাড়িতে।'

'কোনও খবর থাকলে জানাতে ভুলবেন না।'

পরদিন সকালে সাড়ে সাতটার সময় ফোন এল। সোনাহাটি থেকে। সোমেশ্বর সাহা। ফেলুদা কথা বলা শেষ করে ফোনটা রেখে গম্ভীর মুখ করে বলল, 'কাল রাত্তিরে ট্রেনে জয়চাঁদ বড়ালের মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে কে বা কারা যেন তার বাক্স সার্চ করে। জিনিসপত্র সব ছত্রাকার হয়ে পড়ে ছিল। অবিশ্যি সোনাহাটি আসবার আগেই ভদ্রলোক জ্ঞান ফিরে পান।'

আমি বললাম, 'এ-ও তো মগনলালেরই ব্যাপার।'

'নিশ্চয়ই,' বলল ফেলুদা। 'লোকটা কোনওরকম সুযোগ ছাড়ে না। ভাগ্যিস মুক্তোটা আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম।'

একটা নতুন কেসের গন্ধ পেলে জটায়ু মাঝে মাঝে বিকেলেও এসে হাজির হন। আজও তাই হল। বললেন, 'মনটা পড়ে রয়েছে এখানে তাই বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।'

ফেলুদা লেটেস্ট খবরগুলো লালমোহনবাবুকে দিয়ে দিল।

'তা হলে তো মনে হচ্ছে ওঁর পায়ের ধুলো এবার এখানে পড়বে। ও তো নির্ঘাত বুঝে গেছে যে মুক্তোটা আপনার কাছে রয়েছে।'

লালমোহনবাবু কথাটা বলার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাইরে একটা গাড়ি এসে থাবার শব্দ পেলাম। তারপর দরজার বেল বেজে উঠল। খুলে দেখি আসল লোক এসে হাজির।

'মে আই কাম ইন, মিস্টার মিটার?' বললেন মগনলাল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

ভদ্রলোক ঢুকে এলেন। সেই কালো শেরওয়ানি আর ধুতি, পায়ে মোজা আর পাম্প শু।

'অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল কি আপনার বাড়িতে একবার আসি।

আমাদের এতদিনের দোস্তি—হে হে হে ! আঙ্কল কেমন আছেন ?'

লালমোহনবাবুকে মগনলাল যা নাস্তানাবুদ করেছে, ভদ্রলোক আর কোনওদিন মগনলালের সামনে স্বাভাবিক হতে পারবেন বলে মনে হয় না। শুক্‌নো গলায় জটায়ু উত্তর দিলেন, 'ভাল আছি।'

'চা খাবেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না স্যার। নো টী। আমি আপনার বেশি সময় নেব না। আমি কেন এসেছি তা বোধহয় আপনি বুঝতে পারছেন।'

'তা বোধহয় পারছি।'

'তা হলে আর টাইম ওয়েইস্ট করার দরকার নেই। হোয়ার ইজ দ্যাট পার্ল ?'

'মিস্টার বড়ালের কাছে যে নেই তা তো আপনি জানেন। আপনার লোক তো ট্রেনে তাঁকে ঘায়েল করে তাঁর বাক্স সার্চ করে মোতি খুঁজে পায়নি।'

'আমার লোক ?'

'তা ছাড়া আর কার লোক হবে বলুন।'

'আপনি এভাবে বলবেন না, মিস্টার মিটার। আপনার কোনও প্রমাণ নেই যে আমার লোক কাজটা করেছে।'

'আপনার ক্ষেত্রে প্রমাণের দরকার হয় না, মগনলালজী। আপনার কাজ মার্কামারা কাজ। সে কাজ আমি দেখলেই বুঝতে পারি।'

'আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি—সে পার্ল কোথায় আছে ?'

'আমার কাছে।'

'ওটা আমার দরকার।'

'যা দরকার তা কি সব সময়ে পাওয়া যায় ?'

'মগনলাল মেঘরাজ ক্যান অলওয়েজ গেট ইট। কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, মিস্টার মিটার। আমার ওই পিংক পার্ল চাই। না হলে, আপনি তো জানেন, আমি যেমন করে হোক ওটা আদায় করে নেব।'

'তা হলে সেটাই করুন, কারণ মুক্তো আমি আপনাকে দিচ্ছি না।'

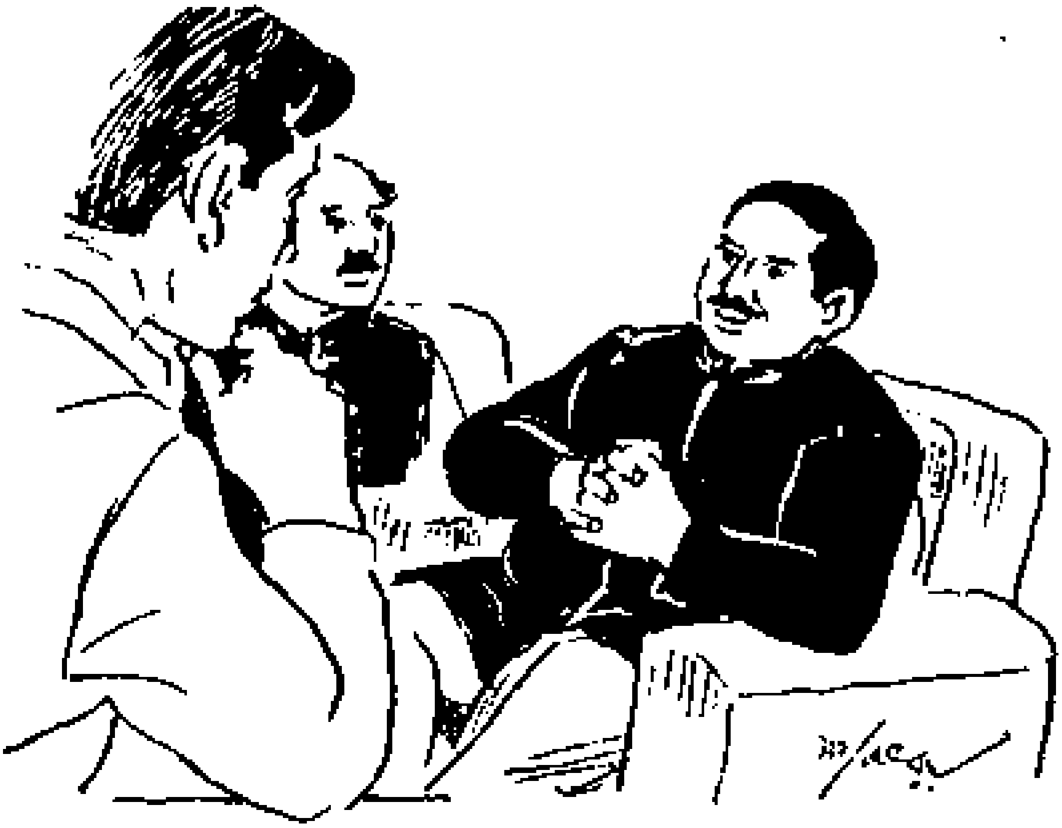

'দেবেন না ?'

'ভদ্রলোকের এক কথা।'

'তা হলে আমি আসি।' মগনলাল উঠে পড়লেন। 'গুড বাই, আঙ্কল।'

'গুড বাই,' ক্ষীণস্বরে বললেন জটায়ু।

দরজার কাছে গিয়ে মগনলাল থেমে ফেলুদার দিকে ঘুরলেন। তারপর বললেন, 'আমি তিন দিন সময় দিচ্ছি আপনাকে। আজ সোমবার। সোম, মঙ্গল, বুধ। বুঝেছেন ?'

'বুঝেছি।'

মগনলাল বেরিয়ে গেলেন।

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না মোটেই। দিয়ে দিন মশাই, দিয়ে দিন। আর আপনি কাছেই বা আর কত দিন রাখতে পারবেন। বড়ালকে তো তাঁর জিনিস ফেরত দিতে হবে—তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এত সাধের জিনিস।'

'যদ্দিন মুক্তো বেহাত হবার আশঙ্কা আছে ততদিন এটা বড়ালকে

ফেরত দেওয়া যাবে না। সব সংশয় কাটিয়ে উঠলে পর যেখানের মুক্তো সেখানে যাবে।'

'কিন্তু বড়াল যে এক মহারাজার কথা বলছিল তার সম্বন্ধেও তো একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।'

'সে খোঁজ দিতে পারেন সিধু জ্যাঠা। বহুদিন জ্যাঠার সঙ্গে দেখা হয়নি। চলুন একবার ঘুরে আসি।'

'জায়গার নামটা মনে আছে?'

'ধরমপুর।'

'আর মহারাজার নাম?'

'সূরয সিং।'

আমরা লালমোহনবাবুর গাড়িতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিধু জ্যাঠার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। জ্যাঠা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে একটা পুরনো পুঁথি পরীক্ষা করছিলেন, আমাদের দেখে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তোমরা কে? তোমাদের তো আমি চিনি না।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'অপরাধ নেবেন না জ্যাঠা। পসারটা একটু বেড়েছে বলে আর লোকজনের বাড়িতে বিশেষ যাওয়া হয় না। আমি যে কাজে উন্নতি করছি তাতে আপনি নিশ্চয়ই খুশি।'

এবার সিধু জ্যাঠার মুখে হাসি ফুটল।

'ফেলু মিত্তির—তোমাকে কি আমি আজ থেকে চিনি? আট বছর বয়সে এয়ার গান দিয়ে শালিক মেরে এনে আমায় দেখিয়েছিলে। আমি বলেছিলাম নিরীহ জীবকে আর কক্ষনও মারবে না—কথা দাও। তুমি সেদিন থেকে পাখি মারা বন্ধ করেছিলে। গোয়েন্দাগিরিতে পসার হচ্ছে বলে আমার কাছে বড়াই কোরো না। গোয়েন্দা আমিও হতে পারতাম। তার সব গুণই আমার ছিল। এখনও আছে। তবে কোনওরকম কাজে বাঁধা পড়া আমার ধাতে সয় না। আমার সময় যদি আমি নিজে ইচ্ছামতো ব্যয় না করতে পারি তা হলে লাভটা কী? শার্লক হোম্‌সের এক দাদা ছিল জানতে? মাইক্রফ্‌ট হোম্‌স। জাত কুঁড়ে, কিন্তু বুদ্ধিতে সত্যিই শার্লকের দাদা। সেই দাদার কাছে শার্লক মাঝে মাঝে যেত পরামর্শ

নিতে। আমি হচ্ছি সেই মাইক্রফট। যাক গে, এখন বলো কী জন্যে আগমন?'

'একজন লোক সম্বন্ধে আপনার কাছে কোনও ইনফরমেশন আছে কি না জানতে এসেছিলাম।'

'কে সেই ব্যক্তি?'

'আপনি ধরমপুরের নাম শুনেছেন?'

'শুনব না কেন? উত্তরপ্রদেশের একটা করদ রাজ্য ছিল। আলিগড় থেকে সাতাত্তর মাইল দক্ষিণে। ট্রেন নেই, গাড়িতে যেতে হয়।'

'তা হলে সূরয সিং-এর সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই জানেন?'

'ওরে বাবা!—সে কি এখনও বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে যে একটি আস্ত বাঘ। মালটি মিলিওনেয়ার। হোটেলের ব্যবসার টাকা। হিরে জহরতের অত ভাল কালেকশন ভারতবর্ষে আর কারুর নেই।'

'লোক কেমন জানেন?'

'তা কী করে জানব? সে কি আমার এই কুটিরে পদার্পণ করেছে, না আমি তার বাড়ি গেছি? এ সব লোককে ভাল-খারাপ বলে বর্ণনা করা যায় না। তুমি হয়তো গিয়ে দেখলে তার মতো অতিথিবৎসল লোক আর হয় না—তোমাকে রাজার হালে রেখে দিল। আবার পরদিন হয়তো সেই লোকই তার কালেকশনের জন্য পাথর আদায় করতে একজনকে খুনই করে ফেলল। অবশ্য নিজে হাতে নয়; এরা সব সময় আইন বাঁচিয়ে চলে, যদিও তার জন্য ট্যাঁক খরচা হয় অনেক।'

এই খবরই যথেষ্ট বলে আমরা সিধু জ্যাঠাকে আর বিরক্ত করলাম না, যদিও সূরয সিং-এর সঙ্গে আমাদের কারবার হচ্ছে কীভাবে সেটা এখনও বুঝতে পারলাম না। ফেলুদাকে বলতে ও বলল, 'তাও এ খবরগুলো জেনে রাখা ভাল। সে লোক যখন বড়ালকে চিঠি লিখেছে তখনই বোঝা যাচ্ছে তার মুক্তোটার বিশেষ দরকার। সেটা পাবার জন্য সে কতদূর যেতে পারে সেইটে দেখার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে।'

॥ ৬ ॥

মগনলাল বিষ্যুদবার পর্যন্ত টাইম দিয়েছিল ফেলুদা তার মধ্যে ওর সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করল না। আর বিস্ফোরণটা হল শুক্রবার সকালে।

আমিও ফেলুদার দেখাদেখি রোজ সকালে যোগব্যায়াম করি। সাড়ে ছ'টায় সে ব্যাপার শেষ হয়েছে। ফেলুদার কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না দেখে আমি তার ঘরের দিকে গেলাম। দরজাটা ভেজানো ছিল। ঠেলে খুলতেই একটা দৃশ্য দেখে থ মেরে গেলাম।

ফেলুদা এখনও ঘুমোচ্ছে। এ যে অভাবনীয় ব্যাপার। এই সময়ের মধ্যে ফেলুদার স্নান ব্যায়াম দাড়ি কামানো সব শেষ হয়ে যায়। সে বসবার ঘরে খবরের কাগজ পড়ে। আজ কী হল?

আমি ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলাম। বার দু-এক ঠেলা দিয়ে আর নাম ধরে ডেকে বুঝতে পারলাম ওর হুঁশ নেই।

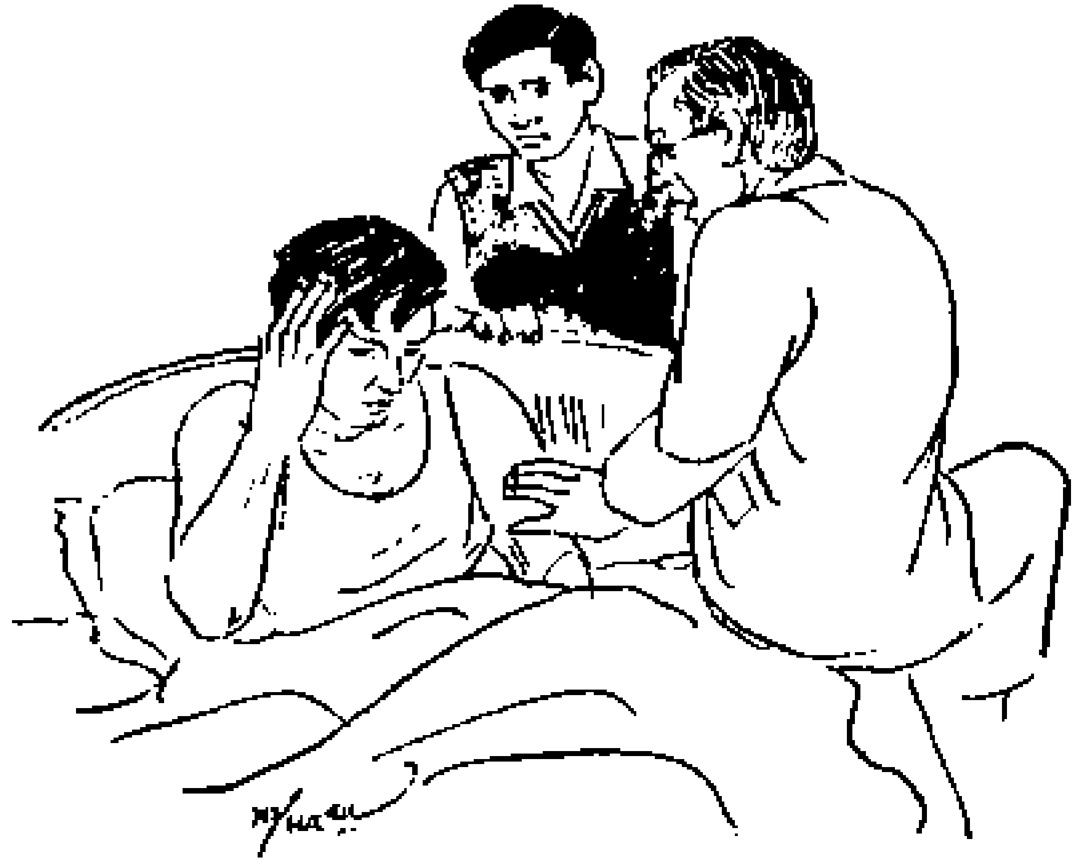

আমার দৃষ্টি গোদরেজের আলমারির দিকে চলে গেল। দরজা হাট হয়ে আছে। সামনে মেঝেতে জিনিসপত্র ছড়ানো।

ফেলুদার পাল্‌স দেখলাম। দিব্যি চলছে। দৌড়ে বসবার ঘরে গিয়ে আমাদের ডাক্তার ভৌমিককে টেলিফোন করে ব্যাপারটা বললাম। ভদ্রলোক দশ মিনিটের মধ্যে চলে এলেন। ফেলুদাকে যখন পরীক্ষা করছেন তখনই ও নড়াচড়া আরম্ভ করেছে। ভৌমিক বললেন, 'ক্লোরোফর্ম জাতীয় কিছু ব্যবহার করা হয়েছে অজ্ঞান করার জন্য। কিন্তু লোক ঘরে ঢুকল কী করে?'

সেটা আমি দু' মিনিটের মধ্যে বার করে দিলাম। বাথরুমের উত্তর দিকে জমাদার ঢোকার দরজাটা খোলা।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফেলুদার জ্ঞান হল। ডাক্তার ভৌমিক ভরসা দিয়ে বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবেন। তবে এরা কী ক্ষতি করেছে সেটা একবার দেখে নিন। আলমারি তো দেখছি খোলা।'

'তোপ্‌সে দেরাজটা একবার খুলে দেখ তো!'

দেখলাম, কিন্তু সেই লাল ভেলভেটের কৌটো কোথাও পেলাম না। অর্থাৎ পিংক পার্ল উধাও।

ফেলুদা মাথা নেড়ে আক্ষেপের সুরে বলল, 'বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে আমার কোনওদিন ভুল হয় না। কালও হয়নি। আসলে ছিটকিনিটা ভাল কাজ করছিল না। কেন যে সারিয়ে নিইনি—কেন যে সারিয়ে নিইনি!'

ডাক্তার ভৌমিক চলে গেলেন।

আমি ফেলুদার অবস্থা দেখেই লালমোহনবাবুকে ফোন করে দিয়েছিলাম। উনি এবার এসে পড়লেন।

'পিংক পার্ল নেই?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। আমি বললাম, 'না।' ভদ্রলোক ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমাকে হেলাফেলা করার রেজাল্টটা দেখলেন তো? আমি প্রথমেই বলেছিলাম—কাজটা ভাল হচ্ছে না। আপনার যে এই দশা করতে পারে সে লোক কী সাংঘাতিক ভেবে দেখুন। এখন কী করা?'

ফেলুদা উঠে বসে চা খাচ্ছিল। বলল সে এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট। 'বড়ালকে দুঃসংবাদটা এখনও দেব না। আগে দেখি মুক্তোটা উদ্ধার করতে পারি কি না।'

টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি তুলে কথা বলে সেটা ফেলুদার হাতে চালান করে দিলাম। 'তোমার ফোন।'

ফেলুদা মিনিট তিনেক কথা বলে ফোনটা রেখে বলল, 'সোনাহাটি থেকে সোমেশ্বর। বড়ালের খবর আছে। সূরয সিং আবার চিঠি লিখেছে। মুক্তো তার চাই। সে সাত দিনের জন্য দিল্লি যাচ্ছে, সেখান থেকে ফিরে সোনাহাটি গিয়ে বড়ালের সঙ্গে দেখা করবে। সে এক লাখ টাকা অফার করছে। এত টাকা পাবে বড়াল ভাবেনি। সে এখন মুক্তোটা বেচে দেবার কথা ভাবছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে মুক্তোটা এখন ওর একটা অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বলছে আপদ বিদেয় করাই ভাল। আমি আর বললাম না যে মুক্তোটা মগনলালের হাতে চলে গেছে।'

'কিন্তু সেটা তো উদ্ধার করতে হবে,' বললেন লালমোহনবাবু।

'তা তো হবেই। সেটাই এখন আমাদের কাজ। তোপ্‌সে টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে মগনলালের ঠিকানাটা বার কর তো।'

'সাতষট্টি নম্বর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ,' বই খুলে নম্বর দেখে বললাম।

'চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব,' বলল ফেলুদা।

'এখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ করছেন তো?' জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'ইয়েস স্যার।'

'পুলিশে খবর দেবেন না?'

'কী লাভ? তারা তো অনুসন্ধান করে নতুন কিছু বলতে পারবে না। সবই তো আমার জানা।'

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে মগনলালের বাড়ি যখন পৌঁছলাম, তখন বেজেছে ন'টা দশ। আমরা ভিতরে ঢুকছি আর লালমোহনবাবু বিড়বিড় করছেন—'আজ আবার কী খেল দেখাবে কে জানে!'

কিন্তু তিনতলায় মগনলালের গদিতে পৌঁছে তাকে পাওয়া গেল না। তারই একজন কর্মচারী বলল, মগনলাল সকালে দিল্লি চলে গেছেন।

'প্লেনে গেছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'না, ট্রেন।'

আমরা আবার নীচে নেমে এলাম। লালমোহনবাবু বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার ইনিও দিল্লি গেছেন আর ওদিকে সুরয সিংও দিল্লি গেছেন।'

'ব্যাপারটা ভেরিফাই করতে হবে,' বলল ফেলুদা।

চতুর্দিকে ফেলুদার চেনা—রেলওয়ে আপিসেও বাদ নেই। অপরেশবাবু বলে বুকিং-এর এক ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'আজ সকালে দিল্লির কী কী ট্রেন আছে?'

'সোয়া ন'টায় আছে—এইট্টি ওয়ান। পরদিন সকালে দশটা চল্লিশে দিল্লি পৌঁছায়।'

'এ ছাড়া আর কিছু নেই?'

'না।'

'এবার রিজার্ভেশন চার্টটা দেখে বলুন তো মিস্টার মেঘরাজ বলে এক ভদ্রলোক এই ট্রেনে দিল্লি গেছেন কি না।'

ভদ্রলোক চার্টের নামের উপর চোখ বুলিয়ে এক জায়গায় থেমে বললেন, 'মিস্টার এম. মেঘরাজ। ফার্স্ট ক্লাস এ. সি.। কিন্তু ইনি তো দিল্লি যাননি।'

'তা হলে?'

'বেনারস। বেনারস গেছেন। আজ রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছবেন।'

'বেনারস?'

কথাটা শুনে আমারও আশ্চর্য লাগছিল, তবে এটা তো জানি যে মগনলালের বেনারসেও একটা বাড়ি রয়েছে। সেখানেই তো আমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপ।

'কাল সকালের দিকে বেনারস পৌঁছায় এমন কী কী ট্রেন আছে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আপনি দুটো সুবিধের ট্রেন পাবেন একটা অমৃতসর মেল, আর একটা ডুন এক্সপ্রেস। প্রথমটা ছাড়ে সন্ধ্যা সাতটা কুড়ি আর বেনারস পৌঁছায় পরদিন সকাল দশটা পাঁচ, আর অন্যটা ছাড়ে রাত আটটা পাঁচ আর পৌঁছায় সকাল এগারোটা পনেরো।'

ফেলুদা না হলে অবিশ্যি আমাদের রিজার্ভেশন পাবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সঙ্গে টাকা ছিল না। তাই বাড়ি ফিরতে হল। আবার রেল আপিসে ফিরে গিয়ে বারোটার মধ্যে রিজার্ভেশন হয়ে গেল। লালমোহনবাবু চলে গেলেন তাঁর বাড়িতে বাক্স গুছাতে। ফেলুদা বলে দিল, 'ক'দিনের জন্য যাচ্ছি কিছু ঠিক নেই মশাই। আপনি এক হপ্তার মতো জামাকাপড় নিয়ে নিন। ওদিকে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা—সেটা ভুলবেন না।'

ট্রেনে বলবার মতো একটা ঘটনাই হল। পরদিন সকালে সাড়ে সাতটায় বক্সারে খবরের কাগজ কিনে তাতে একটা জরুরি খবর পড়লাম। আমেরিকা থেকে একটা ব্যবসায়ীদের দল এসেছে, তারা যে সব ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে তার মধ্যে সুরয

সিং একজন। ভদ্রলোকের দিল্লি যাবার কারণটা বোঝা গেল।

মিনিট পনেরো লেট করে আমাদের ট্রেন বেনারস পৌঁছে গেল।

॥ ৭ ॥

বেনারসে দ্বিতীয়বার এসেও সেই প্রথমবারের মতোই চমক লাগল। এবারও দশাশ্বমেধ রোডে ক্যালকাটা লজেই উঠলাম। ম্যানেজারও একই রয়েছেন—নিরঞ্জনবাবু। ঘর আছে কি না জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'আপনাদের জন্য ঘর সব সময়ই আছে। ক'দিন থাকবেন?'

'সেটা আগে থেকে বলতে পারছি না,' বলল ফেলুদা।

আমরা আগেরবারের মতোই একটা চার বেডের ঘর পেয়ে গেলাম।

ব্রেকফাস্ট বক্সারেই সারা হয়ে গিয়েছিল, তাই খাবার তাড়া নেই। ফেলুদা বলল, 'আগে কর্তব্যটা সেরে নিই, তারপর খাবার কথা ভাবা যাবে।'

'আপনি কি একেবারে বাঘের খাঁচায় গিয়ে ঢোকার কথা ভাবছেন?' লালমোহনবাবু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি যদি হোটেলে থাকতে চান তো থাকতে পারেন।'

'না না, সে কি হয়? থ্রী মাস্কেটিয়ার্স—ভুলে গেলে চলবে কেন?'

মগনলালের বাড়ি বিশ্বনাথের গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। আমরা বারোটা নাগাদ রওনা দিয়ে দিলাম। আবার সেই দৃশ্য, সেই শব্দ, সেই গন্ধ। মনে হল এই ক'বছরে একটুও বদল হয়নি, আর কোনওদিনও হবে না। কয়েকজন দোকানদারের মুখও যেন চিনতে পারলাম।

ক্রমে মন্দির ছাড়িয়ে আমরা গলির একটা মোটামুটি নিরিবিলি অংশে পৌঁছে গেলাম। সব মনে পড়ছে। এর পরে ডাইনে ঘুরতে হবে, তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়েই আমরা পৌঁছে যাব মগনলালের

বাড়ির রাস্তায়।

'আপনি কী বলবেন সেটা ঠিক করে নিয়েছেন ?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'আমি যে সব সময় আগে থেকে ভেবে কাজ করি তা নয়। একেকটা বিশেষ মুহূর্তে একেকটা বিশেষ আইডিয়া এসে যায়। তখন সেইটে প্রয়োগ করি।'

'এর বেলাও তাই করবেন ?'

'সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে।'

মগনলালের বাড়ির সদর দরজার দু'পাশে এখনও তলোয়ারধারী দুই প্রহরীর ছবি, এই ক'বছরে রংটা একটু ফিকে হয়ে গেছে।

আমরা দরজা দিয়ে ঢুকে একতলার উঠোনে পৌঁছলাম। কেউ কোথাও নেই। দু'বার 'কোই হ্যায়' বলেও ফেলুদা জবাব পেল না।

'চলুন উপরে,' বলল ফেলুদা। 'লোকটার সঙ্গে যখন দেখা করতেই হচ্ছে, তখন নীচে দাঁড়িয়ে থেকে তো কোনও লাভ নেই।'

আবার সেই ছেচল্লিশ ধাপ সিঁড়ি, আবার সেই তিন তলায়।

দরজা দিয়ে বারান্দায় ঢুকতে একজন লোক সামনে পড়ল। সে খৈনি ডলছিল, আমাদের দেখে একটু অবাক হয়ে হিন্দিতে প্রশ্ন করল, 'আপনারা কাকে চাইছেন ?'

'মগনলালজী আছেন ?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আছেন, তবে উনি এখন খেতে বসেছেন। আপনারা ওঁর ঘরে অপেক্ষা করুন। চলুন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।'

আমরা আবার অনেকদিন পরে মগনলালের ঘরে এসে ঢুকলাম। এই ঘরেই লালমোহনবাবুকে নাকাল করেছিলেন ভদ্রলোক। সে ঘটনা কোনওদিনও ভুলব না। লালমোহনবাবুকে নিয়ে রগড় করার একটা বাতিক লোকটার মজ্জাগত।

কাঠমাণ্ডুতেও লালমোহনবাবুর চায়ে এল. এস. ডি. মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে অবিশ্যি লালমোহনবাবুর খুব ক্ষতি হয়নি, কিন্তু হবার সম্ভাবনা ছিল পুরোমাত্রায়।

আমরা তিনজন সোফায় বসার পরেই জটায়ু চাপা স্বরে বললেন,

'কী বলবেন ঠিক করে ফেলুন মশাই। এইবেলা ঠিক করে ফেলুন। আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না।'

'আপনার মাথা দিয়ে তো আর এ মামলা চালাচ্ছি না আমি। আপনি চুপচাপ দেখে যান।'

'ইয়েটা সঙ্গে আছে ?'

ইয়ে মানে ফেলুদার রিভলভার সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

'আছে। নার্ভটাকে ঠাণ্ডা করুন। এ সব সিচুয়েশনে সঙ্গে একজন নার্ভাস লোক থাকলে বড় অসুবিধা হয়।'

কোত্থেকে যেন একটা ঢোলকের শব্দ আসছে, ঘরের দেয়াল-ঘড়ি টিক্ টিক্ করছে, নাকে রান্নার গন্ধ এসে ঢুকছে, আমরা চুপচাপ বসেই আছি তো বসেই আছি।

'একটা লোকের খেতে এত সময় লাগে ?' বিড়বিড় করে বললেন লালমোহনবাবু।

কথাটা বলার মিনিট খানেকের মধ্যে একজন লোক এসে ঘরে ঢুকল। সে যে কুস্তির ভাঁজা পালোয়ান তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে ফেলুদার সামনে গিয়ে বলল, 'খাড়া হো জাইয়ে।'

'কিঁউ ?' ফেলুদার প্রশ্ন।

'সার্চ হোগা।'

'কে হুকুম দিয়েছে তোমায় ?'

'মালিক।'

'মগনলালজী ?'

'হাঁ।'

ফেলুদা তবু বসে আছে দেখে লোকটা তার দু'হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে অনায়াসে তাকে দাঁড় করাল। ফেলুদা আর কোনও আপত্তি করল না, কারণ এ লোকটার সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে ওঠা পাঁচটা ফেলুদারও সাধ্যি নেই।

লোকটা চাপড় মেরে প্রথমেই ফেলুদার রিভলভারটা বার করল। তারপর মানি ব্যাগ আর রুমাল।

এবার ফেলুদাকে ছেড়ে লোকটা লালমোহনবাবুকে ধরল। লালমোহনবাবু অবিশ্যি ফেলুদার সার্চ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই

উঠে দাঁড়িয়েছেন হাত মাথার উপর তুলে।

আমাদের তিনজনের সার্চ শেষ হবার পর লোকটা রিভলভার ছাড়া আর সব কিছু ফেরত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপরেই বাইরে থেকে একটা গলা খাঁকরানির আওয়াজ পেলাম। এ আমাদের খুব চেনা গলা।

'এ ভাবে আমার পিছে লাগলেন কেন, মিস্টার মিটার?' গদিতে বসে মগনলাল প্রশ্ন করলেন। 'আপনার এখুনো শিকষা হয়নি? কী লাভ আছে আমার পিছে পিছে ঘুরে? আপনি তো সে মোতি আর ফিরত পাবেন না।'

'আপনি নিজেকে খুব চালাক মনে করেন—তাই না, মগনলালজী?'

'সে তো আপনিও করেন। বুদ্ধি না থাকলে আর এতদিন বেওসা চালাচ্ছি? বুদ্ধি না থাকলে আর আপনার ঘর থেকে মোতি বার করে আনতে পারি?'

'কী মোতি?'

'পিংক পার্ল!' মগনলাল চেঁচিয়ে উঠলেন। 'কী মোতি সেও কি আপনাকে বলে দিতে হবে?'

'কে বলল পিংক পার্ল?' ধীর কণ্ঠে বলল ফেলুদা। 'ইট্‌স এ হোয়াইট পার্ল। তাও খাঁটি মুক্তো নয়, কালচারড পার্ল—যার দাম অনেক কম। আপনাকে ভাঁওতা দেবার জন্য ওতে পিংক রং করা হয়েছে। আসল মুক্তো চলে গেছে যার জিনিস তার কাছে। অত বেশি বুদ্ধিমান ভাববেন না নিজেকে, মগনলালজী।'

আমি অবাক হয়ে ফেলুদার কথা শুনছি। ও কী করে এত সব বানিয়ে বানিয়ে বলছে? কোত্থেকে ওর এত সাহস হচ্ছে? লালমোহনবাবু দেখলাম মাথা হেঁট করে রয়েছেন।

'আপনি সচ বলছেন?'

'আপনি কীভাবে যাচাই করতে চান করে দেখুন।'

মগনলাল তার সামনে রাখা একটা রুপোলি কলিং বেলে চাপড় মারল। পর মুহূর্তেই সেই পালোয়ান লোকটা আবার এসে ঢুকল।

'সুন্দরলালের দোকান থেকে ওকে ডেকে আনো। বলো

মগনলালজী ডাকছেন। তুরন্ত্‌।' ভৃত্য চলে গেল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ। মগনলাল একটা পানের ডিবে থেকে পান নিয়ে মুখে পুরলেন। তারপর ডিবে বন্ধ করার সময় একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন।

'রবীন্দরনাথ টেগোরের গান আপনি জানেন?'

এবার মগনলালের চাউনি থেকে বুঝলাম প্রশ্নটা করা হয়েছে জটায়ুকে।

'কী আঙ্কল? জবাব দিচ্ছেন না কেন? আপনি বাঙালি আর আপনি টেগোর সং জানেন না?'

লালমোহনবাবু মাথা নেড়ে না বোঝালেন।

'সচ্‌ বোলছেন?'

এবারে মাথা নড়ল উপর-নীচে। অর্থাৎ হ্যাঁ। ভদ্রলোক এখনও মাথা তুলতে পারছেন না।

এবার ফেলুদা বলল, 'উনি গান করেন না, মগনলালজী।'

'করেন না তো কী হল? এখুন করবেন। দশ মিনিট লাগবে সুন্দরলালের এখানে আসতে। সেই টাইমে টেগোর সং হবে। আঙ্কল উইল সিং। আসুন আঙ্কল—গদ্দিপর বসুন। সোফায় বসে কি গান হয়? গেট আপ, গেট আপ! না গাইবেন তো বড় মুশকিল হবে।'

'আপনি বার বার ওঁকে নিয়ে এমন তামাসা করেন কেন বলুন তো?' বেশ রেগে গিয়েই বলল ফেলুদা। 'উনি আপনার কী ক্ষতি করেছেন?'

'নাথিং। দ্যাট ইজ হোয়াই আই লাইক হিম। উঠুন আঙ্কল। উঠুন, উঠুন!'

নিরুপায় হয়ে লালমোহনবাবু সোফা ছেড়ে উঠে গদ্দিতে বসলেন।

'ভেরি গুড। নাউ সিং।'

আর কোনওই রাস্তা নেই। তাই ভদ্রলোক সত্যিই গান ধরলেন। 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও।'

মগনলাল তাকিয়ায় শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে পাশে রাখা

ক্যাশ-বাক্সের উপর তাল ঠুকে তারিফ করতে লাগলেন। এই অদ্ভুত গানের তারিফ হতে পারে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

প্রায় পাঁচ মিনিট একটানা গেয়ে লালমোহনবাবু আর পারলেন না। বললেন, 'বাকিটা আমি না…'

'দ্যাট ইজ এনাফ,' বললেন মগনলাল। 'এবার সোফায় গিয়ে বসুন।'

লালমোহনবাবু সোফায় বসতেই ঘরে লোকের প্রবেশ হল—সেই পালোয়ান চাকর, আর একজন পুরু চশমাপরা বুড়ো।

'আইয়ে সুন্দরলালজী,' বললেন মগনলাল। 'আপনি এত বুঢ়া হয়ে গেছেন এই ক'বছরে তা ভাবতে পারিনি। একটা কাজের জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।'

সুন্দরলাল গদিতে বসলেন। মগনলাল তাঁর ক্যাশবাক্স খুলে তার থেকে ভেলভেটের বাক্সটা বার করলেন। তারপর বাক্স থেকে মোতিটা বার করে সুন্দরলালকে প্রশ্ন করলেন, 'গুলাবী মোতি হয় সেটা আপনি জানেন?'

'গুলাবী মোতি?'

'হাঁ।'

'সেরকম তো শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি।'

'আপনি পঞ্চাশ বছর হল দোকান চালাচ্ছেন আর গুলাবী মোতি চোখে দেখেননি ? দেখুন এইটে দেখুন। দেখে বলুন তো এটা সচ্চা না ঝুঠা ?'

সুন্দরলাল মুক্তোটা হাতে নিলেন। দেখলাম তাঁর হাত কাঁপছে। চোখের খুব কাছে এনে মুক্তোটাকে মিনিটখানেক ধরে দেখে সুন্দরলাল বললেন, 'হাঁ, এতো সত্যিই দেখছি গুলাবী মোতি। অ্যায়সা কভী নেহি দেখা।'

'তা হলে এটা খাঁটি ?'

'ওইসাহি তো মালুম হোতা।'

'এবার মোতিটা দিয়ে দিন আমাকে।'

সুন্দরলাল মুক্তোটা ফেরত দিয়ে দিল।

'এবার আপনি যেতে পারেন।'

সুন্দরলাল ঘর থেকে বেরোনর পর মগনলাল ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি ঝুট বাত বলেছেন, মিস্টার মিটার। এই পার্ল জেনুইন।'

'এটা কি আপনি সূরয সিংকে বিক্রি করতে চান ?'

'আমি কী করি না-করি তাতে আপনার কী ?'

'আপনি তো এখান থেকে দিল্লি যাবেন ?'

'হাঁ, যাব।'

'ওখানে তো সূরয সিং রয়েছেন।'

'সে খবর আমি পেপারে পড়েছি।'

'আপনি কি বলতে চান তাঁর সঙ্গে আপনার কোনও কারবার নেই ?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না, মিস্টার মিটার। দ্য পিংক পার্ল চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজড। আমি ওই নিয়ে আপনার সঙ্গে আর কোনও কথা বলব না।'

'ঠিক আছে, আমি উঠছি। আমার যে জিনিসটা আপনার কাছে রয়েছে সেটা দয়া করে ফেরত দিন।'

মগনলাল আবার কলিং বেল টিপলেন। পালোয়ান এসে দাঁড়াল।

'এঁকে এর রিভলভার ওয়াপিস দিয়ে দাও।'

পালোয়ান আজ্ঞা পালন করল, ফেলুদা আর আমরা দু'জন উঠে পড়লাম।

মগনলালের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে লালমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কেমন লাগছে?'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'লোকটা কী করে যে একটা মানুষের উইক পয়েন্ট ধরে ফেলে!—পাঁচ মিনিট ধরে একটানা রবীন্দ্রসংগীত জীবনে এই প্রথম গাইলাম।'

একতলায় এসে ফেলুদা বলল, 'আজকে যে একটা খুব জরুরি কাজ হয়ে গেল সেটা কি বুঝতে পেরেছেন, লালমোহনবাবু?'

'জরুরি কাজ?' ভদ্রলোক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'ইয়েস স্যার,' বলল ফেলুদা। 'জেনে গেলাম ও মুক্তোটা কোথায় রাখে।'

'আপনি কি ওটা আবার আদায় করার তাল করছেন?'

'ন্যাচারেলি।'

॥ ৮ ॥

হোটেলে ফিরে ঘরে ঢোকার আগেই নিরঞ্জনবাবু তাঁর ঘর থেকে ডাক দিয়ে বললেন, 'একটি ভদ্রলোক আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন।'

ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে দেখি একটি মাঝারি হাইটের কালো ভদ্রলোক, বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ, ম্যানেজারের উলটো দিকে একটা চেয়ারে বসে আছেন। আমাদের দেখে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার নাম মতিলাল বড়াল।'

'আপনি কি জয়চাঁদবাবুর ভাই?'

'খুড়তুতো ভাই। এখানে একটা সিনেমা হাউস আছে আমার।'

'চলুন, আমাদের ঘরে চলুন। কথা হবে।'

আমরা চারজন আমাদের ঘরে এলাম। খাটে বসে ভদ্রলোক

প্রশ্ন করলেন, 'মুক্তোটা এখন কোথায় ? জয়চাঁদের কাছে ?'

'না।'

'তবে ?'

'মগনলাল মেঘরাজের নাম শুনেছেন ?'

'বাবা ! তেইশ বছর কাশীতে আছি, আর মগনলালের নাম শুনব না ?'

'মুক্তোটা তাঁরই কাছে আছে।'

'কিন্তু তিনি তো মুক্তো জমান না। তিনি তো দালাল ; কম দামে জিনিস কিনে বেশি দামে বেচেন।'

'এবারেও তাই করবেন। ধরমপুরের সূরয সিংকে উনি মুক্তোটা বেচবেন।'

'সূরয সিং এখানে আসছেন ?'

'না। উনি দিল্লিতে। আমার যতদূর ধারণা, মগনলাল দিল্লি যাচ্ছেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।'

'আপনি কী করছেন ?'

'আমরাও দিল্লি যাব—যদি তার আগে মুক্তোটা আদায় করতে পারি।'

'মগনলাল যদি টাকা না পায়, তা হলে আমার ভাই পাবে তো ?'

'সূরয সিং যদি তাঁর কথা রাখেন তা হলে নিশ্চয়ই পাবেন।'

'আশ্চর্য ! এমন একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস ফ্যামিলিতে রয়েছে এতকাল ধরে, আর জয় সে কথা একবারও বলেনি। ও একাই জিনিসটাকে আগলে রেখেছে।'

'আপনি জানতেন না এতে আমার খুব অবাক লাগছে।'

'আমি পনেরো বছর বয়স থেকে ঘর ছাড়া। তারপর আর সোনাহাটি যাইনি। কাগজে মুক্তোর কথাটা পড়ে জয়কে চিঠি লিখেছিলাম, যে বিক্রি যদি হয় তা হলে আমি যেন একটা শেয়ার পাই। ও লিখল আমি বিক্রি করব না। তারপর কাল একটা চিঠি পেয়েছি তাতে লিখেছে ও মাইন্ড চেঞ্জ করেছে, বিক্রি করবে। এই যে সেই চিঠি।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে দিলেন। ফেলুদা

সেটা পড়ে ফেরত দিয়ে বলল, 'আপনাকে তো বিশ হাজার অফার করেছে, আপনি তাতে সন্তুষ্ট ?'

'আরেকটু বেশি হলে আরও খুশি হতাম, তবে নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। মুক্তোটা যে মগনলালের কাছে আছে সে বিষয়ে আপনি শিওর ?'

'আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

মতিলালবাবু একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনি যদি মুক্তোটা চান, তা হলে তো আপনিই সেটা সুরয সিংকে বিক্রি করবেন ?'

'তা তো বটেই, এবং তা হলেই আপনি আপনার শেয়ার

পারেন।'

'তা হলে প্রথম কাজ হচ্ছে মগনলালের কাছ থেকে মুক্তোটা আদায় করা।'

'সে ব্যাপারে আপনি আমাকে হেল্প করতে পারেন ?'

'আপনার কী দরকার ?'

'বেপরোয়া কাজ করতে পারে এমন কিছু লোক।'

মতিলালবাবু কয়েক মুহূর্ত মাথা হেঁট করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'একটা কথা আপনাকে বলি, মিস্টার মিত্তির—আজকাল শুধু সিনেমা হাউস চালিয়ে সংসার চলে না। লোকেরা সব বাড়িতে বসে ছবি দেখে। তাই কিছু একস্ট্রা রোজগারের রাস্তা দেখতে হয়।'

'মানে গোলমেলে কাজ ?'

'কিন্তু আইন বাঁচিয়ে।'

'তার মানে আপনার হাতে লোক আছে ?'

'মগনলালের যে রাইট-হ্যান্ড ম্যান—মনোহর—সে আমার দিকে চলে এসেছে। তা ছাড়া আরও দু-একজন লোক আমি দিতে পারি।'

'ভেরি গুড।'

'আপনি বলুন কখন কী করতে হবে।'

'আজ রাত বারোটা। জ্ঞান-বাপীতে চলে আসুন আপনার লোক নিয়ে। আমরা ওখানে থাকব।'

'ঠিক আছে। রাত বারোটা।'

'আপনি আবার গোঁয়ার্তুমি করছেন ?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু। ফেলুদা তাতে কানই দিল না। সে মতিলালবাবুকে বলল, 'মগনলালের কিন্তু একটি পালোয়ান ভৃত্য আছে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করার কথাটা ভুললে চলবে না।'

মতিলালবাবু হেসে বললেন, 'আমার মনোহরও পালোয়ান। তার উপরে মাথায় বুদ্ধি রাখে।'

'তা হলে ওই কথা রইল। রাত বারোটা, জ্ঞান-বাপী।'

মতিলালবাবু উঠে পড়ে বললেন, 'একটা জরুরি কথা জিজ্ঞেস

করা হয়নি। মুক্তোটা ও কোথায় রাখে জানেন?'

'জানি। ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

'অল রাইট।'

ভদ্রলোক চলে গেলে ফেলুদাও বিছানা থেকে উঠে পড়ে বলল, 'আমার নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দু' মিনিট দরকার আছে। সেটা সেরে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সারা যাবে। বেশ খিদে পেয়েছে।'

॥ ৯ ॥

কাশীর মতো থমথমে রাত খুব কম জায়গাতেই দেখেছি। সেটা আরও বেশি মনে হয় এই জন্যে যে দিনের বেলা জায়গাটা লোকে জনে রঙে শব্দে ভরে থাকে। আমরা বারোটার সময় যখন জ্ঞান-বাপী পৌঁছলাম তখন একটা রাস্তার কুকুরের ডাক ছাড়া কোনও শব্দ নেই।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর ফেলুদা একটা শেষ-করা চারমিনার পায়ের তলায় ফেলে চাপ দিতেই চাপা গলায় শোনা গেল, 'মিস্টার মিত্তির!' বুঝলাম মতিলাল বড়াল হাজির।

কতগুলো অন্ধকার মূর্তি আমাদের দিকে এগিয়ে এল। 'আমার সঙ্গে তিনজন লোক আছে। আপনি রওনা দেবার জন্য তৈরি?'

চাপা স্বরে প্রায় ফিস্‌ফিসিয়ে কথা হচ্ছে। ফেলুদাও সেইভাবেই বলল, 'নিশ্চয়ই। আর, আমাদের গাইড করতে হবে না, আমরা রাস্তা জানি।'

'তা হলে চলুন।'

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। ফেলুদা আর মতিলালবাবু দু'জনেই দেখলাম রাস্তা খুব ভাল করে জানে, আর এই ঘুটঘুটে অন্ধকারেও বেশ দ্রুতই এগিয়ে চলেছে। এক জায়গায় একটা রাস্তার আলো টিমটিম করে জ্বলছিল। সেই আলোতে দেখে নিয়েছি মতিলালবাবুর তিনজন লোকের মধ্যে একজন ভীষণ ষণ্ডা। বুঝলাম এই হচ্ছে মনোহর।

মগনলালের রাস্তার মুখে এসে সকলে থামল। ফেলুদা

লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। আমাদের হয়তো মিনিট কুড়ি লাগবে।'

কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই মতিলালবাবু আর ওই তিনজন লোকের সঙ্গে ফেলুদা মগনলালের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট দু'জনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। নিজেদের নিশ্বাস ফেলার শব্দ পাচ্ছি। অবশেষে লালমোহনবাবু হয়তো আর থাকতে না পেরে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'ওই গুণ্ডাদের সঙ্গে তোমার দাদার যাবার কী দরকার ছিল বুঝতে পারলাম না।'

'সেটা যথাসময়ে বুঝবেন।'

'আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।'

'ঠিক আছে। আমার মনে হয় কথা না বলাই ভাল।'

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। খুব মন দিয়ে শুনলে দূর থেকে হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের শব্দ পাওয়া যায়। আকাশের দিকে চাইলাম। এত তারা কলকাতার আকাশে কোনওদিন দেখিনি। এই তারার আলোতেই চার পাশ আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। যতদূর মনে হয়, আজ অমাবস্যা।

বেশি সময় যায়নি, কিন্তু এখনই মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কতক্ষণ হল? দশ মিনিট? পনেরো মিনিট? আশ্চর্য! মগনলালের বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে, এখান থেকে ত্রিশ হাত দূরে, কিন্তু তার কোনও শব্দ নেই।

আরও মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকার পর পায়ের শব্দ পেলাম। একজনের বেশি লোক। এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

ফেলুদারাই ফিরছে। কাছে এসে বলল, 'চ।'

'কাজ হল?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন জটায়ু।

'খতম্,' বলল ফেলুদা। তারপর মতিলালবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আপনার শেয়ারের ব্যবস্থা আমি করে দেব।'

আমরা আমাদের হোটেলের দিকে হাঁটা দিলাম।

কথা হল একেবারে ঘরে ঢুকে।

'কিছু বলুন, মশাই!' আর থাকতে না পেরে বললেন লালমোহনবাবু।

'আগে এইটে দেখুন।'

ফেলুদা পকেট থেকে লাল ভেলভেটের বাক্সটা বার করে খাটের উপর রাখল।

'সাবাস!' বললেন লালমোহনবাবু। 'কিন্তু কীভাবে হল ব্যাপারটা একটু বলুন। খুন-খারাপি হয়নি তো?'

'সেই পালোয়ানটা মাথায় একটু চোট পেয়েছে, সেটা মনোহরের কীর্তি।'

'কিন্তু ক্যাশবাক্স খুললেন কী করে?'

'যে ভাবে লোকে খোলে। চাবি দিয়ে।'

'একি ম্যাজিক নাকি?'

'নো স্যার। মেডিসিন।'

'মানে?'

'সাপ্লাইটা দিলেন নিরঞ্জনবাবুর বন্ধু ডাক্তার চৌধুরী।'

'কী সব বলছেন আবোল তাবোল? কীসের সাপ্লাই?'

'ক্লোরোফর্ম,' বলল ফেলুদা। 'শঠে শাঠ্যম্। এবার বুঝেছেন?'

পরদিন রাত সোয়া এগারোটায় দিল্লি এক্সপ্রেস ধরে তারপর দিন ভোর ছ'টায় দিল্লি পৌঁছলাম। এর আগের বার আমরা জনপথ হোটেলে ছিলাম, এবারও তাই রইলাম। ফেলুদা ঘরে এসে আর কিছু করার আগে বিভিন্ন হোটেলে ফোন করে খোঁজ নিতে আরম্ভ করল সুরয সিং কোথায় আছে। দশ মিনিট চেষ্টা করার পর তাজ হোটেলে বলল, 'হ্যাঁ, সুরয সিং এখানেই আছেন। রুম থ্রি ফোর সেভ্‌ন।'

'একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?'

সৌভাগ্যক্রমে সুরয সিং তাঁর ঘরেই ছিলেন। এক মিনিটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেল। সন্ধ্যা ছ'টা। হোটেলে ওঁর ঘরেই যেতে হবে। কী কারণ জিজ্ঞেস করেছিল, বলল ফেলুদা। 'আমি তাকে পিংক পার্ল সংক্রান্ত ব্যাপার বলাতে তৎক্ষণাৎ টাইম দিয়ে

দিল।'

দুপুর বেলাটা কিছু করার নেই। জলপথে একটা চীনে রেস্টোরান্টে খেয়ে দোকানগুলো দেখে তিনটে নাগাত হোটেলে ফিরে এলাম একটু বিশ্রামের জন্য। পৌনে ছ'টায় বেরোতে হবে। লালমোহনবাবু ফেলুদাকে মনে করিয়ে দিলেন, 'আপনার ইয়েটা নিতে ভুলবেন না।'

ছ'টায় তাজে পৌঁছে ফেলুদা প্রথমে নীচ থেকে ফোন করে জানিয়ে দিল যে আমরা এসেছি।

'আমার ঘরে চলে আসুন,' বললেন ভদ্রলোক।

তিনশো সাতচল্লিশে গিয়ে বেল টিপতে যে দরজা খুলল তাকে মনে হল সেক্রেটারি জাতীয় কেউ। বললেন, 'আপনারা বসুন, উনি এক্ষুনি আসছেন।'

ঘর বলতে যা বোঝায় এটা তা নয়; তিনটে ঘর জুড়ে একটা বিশাল সুইট। যেটায় ঢুকেছি সেটা সিটিং রুম। আমরা সোফায় গিয়ে বসলাম।

মিনিট পাঁচেক বসতেই ভদ্রলোক এসে পড়লেন।

ইনি যে অত্যন্ত ধনী সেটা এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়। গায়ে চোস্ত সুট, সোনার টাইপিন, পকেটে সোনার কলম। হাতে পাথর বসানো সোনার আংটি। বয়স পঞ্চান্নর বেশি নয়। কানের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে, বাকি চুল কালো, আর চাড়া দেওয়া গোঁফটাও কালো।

'হু ইজ মিস্টার মিটার?'

ফেলুদা উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় দেওয়ার ব্যাপারটা সেরে নিল। ভদ্রলোক দেখলাম দাঁড়িয়েই রইলেন।

'আপনার সঙ্গে পিংক পার্লের কী কানেকশন?' ফেলুদাকে প্রশ্ন করলেন মিস্টার সিং।

ফেলুদা বলল, 'আমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। জয়চাঁদ বড়াল মুক্তোটা আমার জিম্মায় রেখেছেন যাতে ওটা নিরাপদ থাকে।'

'কথাটা আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য নই, মিস্টার মিটার। আপনি মালিকের কাছ থেকে যে মুক্তোটা চুরি করেননি তার কী প্রমাণ ?'

'কোনও প্রমাণ নেই। আপনাকে আমার কথা মেনে নিতে হবে।'

'আমি তাতে রাজি নই।'

'তা হলে আমার একটা কথাই বলার আছে—আমি মুক্তোটা দেব না। এটা যার জিনিস তাঁর কাছে ফেরত চলে যাবে।'

'মুক্তোটা দিতে আপনি বাধ্য।'

'না মিস্টার সিং, আমি বাধ্য নই। নো ওয়ান ক্যান ফোর্স মি।'

চোখের পলকে সূরয সিং-এর হাতে একটা রিভলভার চলে এল, আর তার পরমুহূর্তেই একটা কান-ফাটানো গর্জন।

কিন্তু সেটা সূরয সিং-এর রিভলভার থেকে নয়, ফেলুদার কোল্ট থেকে। সে সূরয সিং-এর হাত নামানো দেখেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে। আর বিদ্যুদ্বেগে নিজের রিভলভারটা বার করেছে।

গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সূরয সিং-এর হাত থেকে তার রিভলভারটা ছিটকে বেরিয়ে একটা ঠং শব্দ করে ঘরের পিছন দিকের মেঝেতে পড়ল।

সূরয সিং-এর চেহারা পাল্টে গেছে। তার চাউনিতে ঘৃণার বদলে এখন সম্ভ্রম।

'আমি চল্লিশ গজ দূর থেকে বাঘ মেরেছি, কিন্তু তোমার মতো টিপ আমার নেই। ঠিক আছে, আমি তোমার নামেই চেক লিখে দিচ্ছি, তুমি মুক্তোটা আমাকে দাও।'

ফেলুদা পকেট থেকে ভেলভেটের কৌটাটা বার করে সূরয সিংকে দিল। কৌটোটা থেকে মুক্তোটা বার করে ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে ধরে সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন সূরয সিং। তাঁর চোখ জ্বল জ্বল করছে।

'আমি এটাকে যাচাই করে নিলে আশা করি তোমার আপত্তি হবে না। এতগুলো টাকা...'

'ঠিক আছে।'

'শঙ্করপ্রসাদ!' হাঁক দিলেন সূরয সিং। পাশের ঘর থেকে

একজন ফিটফাট ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, বছর চল্লিশেক বয়স, চোখে সোনার চশমা।

'স্যার?'

'একবার দেখো তো এই মুক্তোটা জেনুইন কি না।'

শঙ্করপ্রসাদ মিনিটখানেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেই সেটা সূরয সিংকে ফেরত দিল।

'নো স্যার।'

'মানে?'

'এটা ফল্‌স। সস্তা সাদা কালচারড পার্লের উপর গোলাপী রং করে দেওয়া হয়েছে।'

'আর ইউ শিওর?'

'অ্যাবসোলিউটলি।'

সূরয সিং-এর মুখ লাল। কাঁপতে কাঁপতে ফেলুদার দিকে চাইলেন। তাঁর কথা বলতেও যেন কষ্ট হচ্ছে।

'ইউ-ইউ—মেকি জিনিস আমাকে পাচার করছিলে?'

ফেলুদার মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'তা হলে বড়ালের বাড়িতেই নিশ্চয়ই ফল্‌স মুক্তো ছিল,' বলল ফেলুদা।

'তোমার রিভলভার নামাও।'

ফেলুদা নামাল।

'এই নাও তোমার ঝুঠা মোতি।'

ফেলুদা বাক্সসমেত মুক্তোটা সূরয সিং-এর হাত থেকে নিল।

'নাউ গেট আউট।'

আমরা তিনজন সুবোধ বালকের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলাম। যখন লিফ্‌টে উঠছি তখন দেখলাম ফেলুদার কপালে গভীর খাঁজ।

কলকাতা ফেরার পথে ট্রেনে ফেলুদা একটা কথাও বলল না। এমন অবস্থায় যে সে কোনওদিন পড়েনি সেটা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

আমরা ফিরলাম রাত্রে। পরদিন সকালে আমার ঘর থেকে শুনতে পেলাম ফেলুদা গুন গুন করে গান গাইছে।

আমি বসবার ঘরে এসে দেখি ও পায়চারি করছে আর 'আলোকের এই ঝর্ণাধারায়'-এর সুরটা ভাঁজছে। আমাকে দেখেও সে পায়চারি, গান কোনওটাই থামল না। আমি অবশ্য খুশি। ফেলুদাকে মনমরা দেখতে আমার মোটেও ভাল লাগে না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই লালমোহনবাবুর গাড়ির হর্ন শোনা গেল। আমি দরজাটা খুলে দিলাম, ভদ্রলোক ঢুকলেন।

'প্রাতঃ প্রণাম!' ঘাড় হেঁট করে হাতজোড় করে বলল ফেলুদা। 'আসতে আজ্ঞা হোক!'

লালমোহনবাবু কেমন যেন থতমত খেয়ে একটা বোকা হাসি হেসে বললেন, 'আপনি কি তা হলে... ?'

'আমি অন্ধকার পছন্দ করি না, লালমোহনবাবু, তাই সেখানে আমাকে বেশিক্ষণ ফেলে রাখা চলে না। ফল্স মুক্তোটা যে আপনার গড়পারের সেকরা বন্ধুর কীর্তি সেটা আমি বুঝেছি; আর এটা যে আপনার এবং আমার স্যাঙাতের যৌথ প্রয়াস সেটা বুঝেছি, কিন্তু কবে কখন—'

'বলছি, স্যার, বলছি,' বললেন লালমোহনবাবু। 'অপরাধ নেবেন না কাইন্ডলি। আর আপনার ভাইটিকেও মাপ করে দেবেন। আপনি মগনলালের হুমকি যেরকম বেপরোয়া ভাবে নিলেন, তাতে আমি অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছিলুম। ও মুক্তোটা পেয়ে যাবে এই চিন্তাটাই আমি বরদাস্ত করতে পারছিলুম না। ও তিন দিন সময় দিয়েছিল সোম, মঙ্গল, বুধ। মঙ্গলবার আমি সকালে আসি। আপনি চুল ছাঁটাতে গেলেন, মনে আছে তো? সেই সময় তপেশ আপনার চাবি দিয়ে আলমারি খুলে মুক্তোটা বার করে আমায় দেয়। এক দিনেই ডুপ্লিকেট হয়ে যায়। বুধবার ওটা তপেশকে এনে দিই, ও সুযোগ বুঝে সেটা আলমারিতে রেখে দেয়। যা করেছি তা শুধু আপনার মঙ্গলের জন্য, বিশ্বাস করুন।'

'আপনাদের ফন্দি অবিশ্যি তারিফ করার মতোই।'

'আপনি সেদিন যখন মগনলালকে বললেন মুক্তোটা ফল্স,

তখন আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাদের কারসাজি ধরে ফেলেছেন।'

'না ধরিনি। আপনাদের পক্ষে এতটা মাথা খাটানো সম্ভব সেটা ভাবতে পারিনি। আসলে আপনারা যে ফেলু মিত্তিরের এত কাছে থাকেন সেটা ভুলে গিয়েছিলাম।'

'জয়চাঁদবাবু নিশ্চয়ই আরও ভাল অফার পাবেন।'

'অলরেডি পেয়েছেন। কাল এসে সোমেশ্বরের একটা চিঠিতে জানলাম। এক আমেরিকান ভদ্রলোক। এক লাখ পঁচিশ অফার করেছেন।'

'বাঃ, এ তো সত্যিই সুখবর।'

ফেলুদা এবার আমার দিকে ফিরল। আমি একটা গাঁট্টা কি রদ্দা এক্সপেক্ট করছিলাম, তার বদলে ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'তোকে একটা অ্যাডভাইস দিই। এই ঘটনাটার বিষয় যখন লিখবি, তখন তোদের এই কীর্তিটার কথা একেবারে শেষে প্রকাশ করবি। নইলে গপ্প জমবে না।'

আমি অবিশ্যি তাই করেছি। লোকে আশা করি আমার এই কারচুপিটা মাইন্ড করবে না।

'তা হলে এবার আসলটা আপনাকে দিয়ে দিই?' বললেন লালমোহনবাবু।

'ইয়েস, ইফ ইউ প্লিজ, মিস্টার গাঙ্গুলী।'

জটায়ু পকেট থেকে লাল ভেলভেটের কৌটোটা বার করে ফেলুদাকে দিল। ফেলুদা বাক্সটা খুলে জানালার কাছে গিয়ে আলোতে ধরল।

গোলাপী মুক্তা সগৌরবে বিরাজমান।

ইন্দ্রজাল রহস্য

ইন্দ্রজাল রহস্য

॥ ১ ॥

অন্য অনেক জিনিসের মতো ম্যাজিক সম্বন্ধেও ফেলুদার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। এখনও ফাঁক পেলে তাসের প্যাকেট হাতে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাতসাফাই অভ্যাস করতে দেখেছি। সেইজন্যেই কলকাতায় সূর্যকুমারের ম্যাজিক হচ্ছে দেখে, আমরা তিন জনে ঠিক করলাম এক দিন গিয়ে দেখে আসব। তৃতীয় ব্যক্তিটি অবশ্য আমাদের বন্ধু রহস্য-রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু। যারা ম্যাজিকের আয়োজন করেছে তারা ফেলুদার খুব চেনা, তাই চাইতেই তিনখানা প্রথম সারির টিকিট পাওয়া গেল।

গিয়ে দেখি হল প্রায় ছ আনা ফাঁকা। ম্যাজিক যা দেখলাম নেহাৎ খারাপ নয়, কিন্তু ম্যাজিশিয়ানের ব্যক্তিত্বে কোথায় যেন ঘাটতি আছে। ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ির সঙ্গে একটা চুমকি বসানো সিল্কের পাগড়ি, কিন্তু গলার আওয়াজটা পাতলা। গোলমালটা সেখানেই। অথচ ম্যাজিশিয়ানকে অনর্গল কথা বলে যেতে হয়।

সামনের সারিতে বসার ফলে হল কী, হিপ্‌নোটিজ্‌ম দেখাতে ভদ্রলোক লালমোহনবাবুকে স্টেজে ডেকে নিলেন। এ জিনিসটা ভদ্রলোক ভালই জানেন। লালমোহনবাবুর হাতে পেনসিল দিয়ে, সেটাকে কামড়াতে বলে জিগ্যেস করলেন, 'চকোলেট কেমন লাগছে?'

লালমোহনবাবু সম্মোহিত অবস্থায় বললেন, 'খাসা চমৎকার চকোলেট।'

পাঁচ মিনিট স্টেজে ছিলেন, তার মধ্যে জটায়ু একেবারে নাজেহাল

হয়ে গিয়েছিলেন, আর লোকেও উপভোগ করল খুব। লালমোহনবাবু জ্ঞান ফিরে পাবার পরে হাততালি আর থামে না।

পরদিন ছিল রবিবার। লালমোহনবাবু তাঁর সবুজ অ্যাম্বাসাডারে ঠিক ন-টার সময় চলে এসেছিলেন তাঁর গড়পারের বাড়ি থেকে আড্ডা মারতে। তখনও ম্যাজিকের কথা হচ্ছে।

ফেলুদা বলল, 'ঠিক জমাতে পারছে না লোকটা। কালকেও সিট খালি ছিল দেখেছিলি?'

লালমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু যাই বলুন মশাই, আমাকে যেভাবে বোকা বানানো, তাতে বলতেই হবে কৃতিত্ব আছে। পেনসিল চিবিয়ে চকোলেট, পাথর কামড়ে কড়া-পাকের সন্দেশের স্বাদ—এ ভাবা যায় না।'

শ্রীনাথ সবে চা এনেছে, এমন সময় বাইরে গাড়ি থামার শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় টোকা পড়ল। অথচ কারুর আসার কথা নেই। খুলে দেখি, বছর ত্রিশেকের ভদ্রলোক।

'এটাই প্রদোষ মিত্তিরের বাড়ি?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ভেতরে আসুন।'

ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। ফরসা, রোগা, চোখে চশমা। বেশ সপ্রতিভ চেহারা।

সোফার একপাশে বসে বললেন, 'টেলিফোনে অনেক চেষ্টা করেও আপনার লাইনটা পেলাম না। তাই এমনিই চলে এলাম।'

'ঠিক আছে।' বলল ফেলুদা, 'আপনার প্রয়োজনটা যদি বলেন।'

'আমার নাম নিখিল বর্মন। আমার বাবার নাম হয়তো আপনি শুনে থাকবেন—সোমেশ্বর বর্মন।'

'যিনি ভারতীয় জাদু দেখাতেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজকাল তো আর নাম শুনি না। রিটায়ার করেছেন বোধহয়?'

'হ্যাঁ, বছর সাতেক হল আর ম্যাজিক দেখান না।'

'উনি তো স্টেজে ম্যাজিক দেখাতেন না বোধহয়?'

'না। এমনি ফরাসে দেখাতেন। ওঁর চারদিকে লোক ঘিরে বসত।

সাধারণত নেটিভ স্টেটগুলোতে ওঁর খুব নাম ছিল। বহু রাজাদের ম্যাজিক দেখিয়েছেন। তাছাড়া বাবা নানান দেশ ঘুরে ভারতীয় ম্যাজিক সম্বন্ধে নানান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলো একটা বড় খাতায় লেখা আছে। বাবা ইংরিজিতে লিখেছিলেন, নাম দিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়ান ম্যাজিক'। ওটা এক জন কিনতে চেয়েছেন বাবার কাছে। কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত অফার করেছেন। বাবা চাচ্ছিলেন আপনাকে একবার লেখাটি দেখাতে। কারণ বাবা ঠিক মনস্থির করতে পারছেন না।'

'কুড়ি হাজার টাকা দিতে চেয়েছে কে জানতে পারি?'

'জাদুকর সূর্যকুমার নন্দী।'

আশ্চর্য! কালই আমরা সূর্যকুমারের ম্যাজিক দেখে এসেছি! একেই ফেলুদা বলে টেলিপ্যাথি।

ফেলুদা বলল, 'বেশ, আমি লেখাটা নিশ্চয়ই দেখব। তাছাড়া আপনার বাবার সঙ্গে আমার আলাপ করারও যথেষ্ট ইচ্ছে আছে।'

'বাবাও আপনার খুব গুণগ্রাহী। বলেন, অমন শার্প বুদ্ধি বাঙালিদের বড়-একটা দেখা যায় না। আমার মনে হয়, এর মধ্যেই একদিন এসে পড়ুন না। বাবা সন্ধ্যায় রোজই বাড়ি থাকেন।'

'ঠিক আছে। আমরা আজ সন্ধ্যাতেই তাহলে আসি।'

'বেশ তো। এই সাড়ে ছ-টা নাগাত?'

'তাই কথা রইল।'

॥ ২ ॥

রামমোহন রায় সরণিতে সোমেশ্বর বর্মনের পেল্লায় বাড়ি। এঁরা আগে পূর্ববঙ্গের জমিদার ছিলেন, অনেক দিন থেকেই কলকাতায় চলে এসেছেন। এখন বাড়িতে অধিকাংশ ঘরই খালি পড়ে আছে। বাড়িতে চাকর বাদে লোক মাত্র পাঁচজন। সোমেশ্বর বর্মন, তাঁর ছেলে নিখিল, মি. বর্মনের সেক্রেটারি প্রণবেশ রায়, মি. বর্মনের বন্ধু অনিমেষ সেন, আর রণেন তরফদার বলে এক শিল্পী। ইনি নাকি সোমেশ্বরবাবুর একটা পোর্ট্রেট করছেন। এ সব খবর আমরা সোমেশ্বরবাবুর কাছ থেকেই পেলাম। ভদ্রলোকের বয়স ধরা যায় না, কারণ চুল এখনও তেমন

থাকেনি, চোখ দুটো উজ্জ্বল, যেমন জাদুকরের হওয়া উচিত। আমরা একতলায় সোফায় বসেছিলাম। নিখিলবাবু আমাদের জন্য চায়ের অর্ডার দিলেন।

'আমার বাবা ছিলেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার।' বললেন সোমেশ্বরবাবু, 'ভাল পসার ছিল। আমি ল' পড়েছিলাম, কিন্তু সেদিকে আর যাইনি। আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন তান্ত্রিক। হয়তো তাঁরই কিছুটা প্রভাব আমার চরিত্রে পড়েছিল। আমি ছোটবেলা থেকেই ভারতীয় জাদুবিদ্যার দিকে ঝুঁকি। এলাহাবাদে একটা পার্কে এক বুড়োর ম্যাজিক দেখেছিলাম। তার হাত-সাফাইয়ের কোনও তুলনা নেই। মঞ্চের ম্যাজিকের অর্ধেকই আজ যন্ত্রপাতির সাহায্যে হয়, সেই জন্য তাতে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। ভারতীয় ম্যাজিক হল আসল ম্যাজিক, যেখানে মানুষের দক্ষতাই সম্পূর্ণ কাজটা করে। তাই আমি কলেজের পড়া শেষ করে, এই সব ম্যাজিক সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ি। সুবিধে ছিল বাবা এ সব বিষয়ে খুব উদার ছিলেন। আমি একটা নতুন কিছু করছি, এটাতে তিনি খুশিই হয়েছিলেন। আসলে আমাদের পরিবারে নানান লোকে নানান কাজ করে এসেছে চিরকালই। ডাক্তার, উকিল, গাইয়ে, অভিনেতা, সাহিত্যিক—সব রকমই পাওয়া যাবে আমাদের এই বর্মন পরিবারে, আর তাদের মধ্যে অনেকেই রীতিমত সফল হয়েছেন। যেমন আমি হয়েছিলাম জাদুতে। আমার সব রাজা-রাজড়াদের কাছ থেকে ডাক আসত। প্রাসাদের ঘরে ফরাসের উপর বসে ম্যাজিক দেখাতাম—সব লোক হাঁ হয়ে যেত। রোজগারও হয়েছে ভাল। কোনও ধরাবাঁধা ফি ছিল না আমার। কিন্তু যা পেতাম, সেটা প্রত্যাশার অনেক বেশি।'

চা এসে গিয়েছিল। ফেলুদা একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল, 'এবার আপনার পাণ্ডুলিপির কথা বলুন। শুনেছি, ভারতীয় জাদু নিয়ে আপনি একটা বড় কাজ করেছেন।'

'তা করেছি,' বললেন সোমেশ্বর বর্মন, 'আমি যা করেছি, তেমন আর কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই। এ নিয়ে আমি প্রবন্ধ-টবন্ধও লিখেছি, এবং তার ফলেই আমার পাণ্ডুলিপির ব্যাপারটাও জানাজানি হয়ে গেছে। সেই কারণে সূর্যকুমার আমার

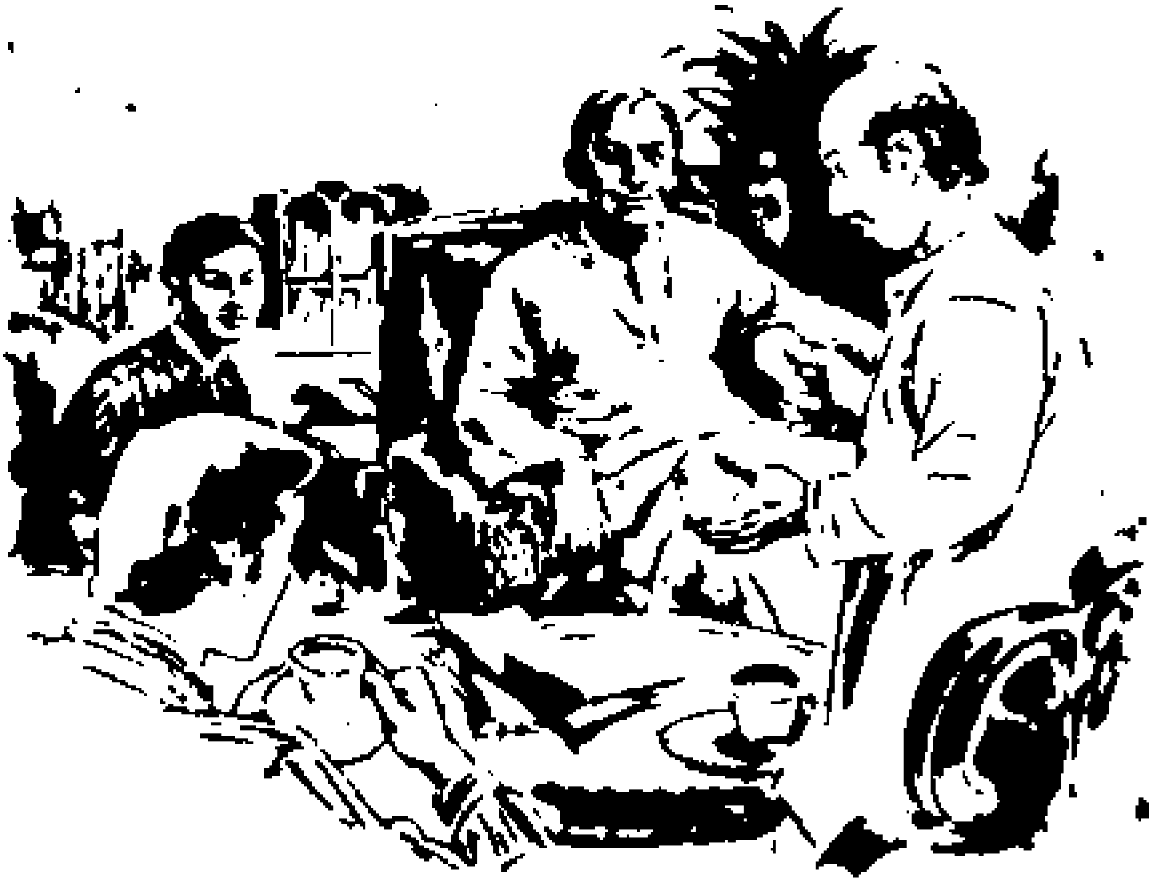

কাছে আসে। নইলে তার তো জানার কথা নয়। অবিশ্যি জাদুকর হিসেবে সে আমার নাম আগেই শুনেছে।'

'সে কি আপনার পাণ্ডুলিপিটা কিনতে চায়?'

'তাই তো বলে। সে সোজা আমার বাড়িতে চলে এসেছিল। আমার বেশ ভাল লাগে ছেলেটিকে, দেখেছি কেমন একটা স্নেহ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর অফারটায় আমি ঠিক রাজি হতে পারছি না। আমার ধারণা আমার কাজটা খুব জরুরি কাজ, এবং তার মূল্য বিশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি। সেই জন্যেই চাচ্ছিলাম পাণ্ডুলিপিটা আপনি একটু পড়ে দেখুন। আপনার তো নানান বিষয় পড়াশোনা আছে। সেটা আপনার কেসগুলো সম্বন্ধে পড়ে দেখলেই বোঝা যায়।'

'বেশ তো। আমি সাগ্রহে পড়ব আপনার লেখা।'

সোমেশ্বরবাবু তাঁর সেক্রেটারির দিকে ফিরে বললেন, 'প্রণবেশ, যাও তো খাতাটা একবার নিয়ে এসো।'

সেক্রেটারি চলে গেলেন আজ্ঞা পালন করতে।

ফেলুদা বলল, 'আমরা কাল সূর্যকুমারের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম।'

'কেমন লাগল?'

'মোটামুটি।' বলল ফেলুদা, 'তবে ভদ্রলোক হিপ্‌নোটিজ্‌মটা বেশ আয়ত্ত করেছেন। আর যা ম্যাজিক, সবই যন্ত্রের কারসাজি।'

সোমেশ্বরবাবু হঠাৎ সামনের প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে নিয়ে, সেটা হাতের মুঠোয় বন্ধ করে, পরমুহূর্তেই হাত খুলে দেখালেন বিস্কুট হাওয়া। তারপর সেটা বেরল লালমোহনবাবুর পকেট থেকে।

ফেলুদা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

'আপনি ম্যাজিক বন্ধ করে দিলেন কেন? আপনার তো অদ্ভুত হাত!'

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি এখন পাণ্ডুলিপিটা নিয়েই কাজ করব। বইটা ছাপাতে পারলে মনে হয় কাজ দেবে। এ নিয়ে তো বই আর লেখা হয়নি।'

'তাহলে আমি খাতাটা নিলাম।' বলল ফেলুদা, 'আমি পরশু ফেরত দেব। এই রকম সন্ধ্যাবেলা।'

'বেশ, তাই কথা রইল।'

ফেলুদা পরদিন সকালেই বলল, তার নাকি পাণ্ডুলিপি পড়া শেষ হয়ে গেছে। সে সারারাত পড়েছে। 'ভদ্রলোকের হাতের লেখা মুক্তোর মতো—অ্যান্ড ইট্‌স এ গোল্ডমাইন। ছেপে বেরোলে, একটা প্রামাণ্য বই হয়ে থাকবে। বিশ কেন, পঞ্চাশ হাজার দিলেও এ পাণ্ডুলিপি হাত-ছাড়া করা উচিত নয়।'

সন্ধ্যাবেলা সোমেশ্বরবাবুকে গিয়ে আমরা সেই কথাটাই বললাম। ভদ্রলোক শুনে যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'আপনি আমার মন থেকে একটা বিরাট চিন্তা দূর করে দিলেন। আমি দোটানার মধ্যে পড়েছিলাম, কিন্তু আপনি যখন পড়ে এত প্রশংসা করলেন, তখন আবার আমি মনে বল পাচ্ছি। প্রণবেশ পাণ্ডুলিপিটাকে টাইপ করছে—ও ও অনেকবার বলেছে যে এতে আশ্চর্য সব তথ্য আছে। আমার বন্ধু অনিমেষও সেই একই কথা বলেছে। এবার নিশ্চিন্তে সূর্যকুমারকে না

বলে দিতে পারব। ভাল কথা, কাল আমার ঘরে চোর এসেছিল।'

'সে কী!'

'আমার ঘুমটা ভেঙে যায়। আমি "কে"? বলতেই পালায়।'

'এর আগে কখনও চুরি হয়েছে কি?'

'কক্ষনো না।'

'আপনার ঘরে কোনও ভ্যালুয়েবল জিনিস আছে কি?'

'আছে। কিন্তু সেটা আমার সিন্দুকে থাকে। সিন্দুকের চাবি আমার বালিশের নীচে থাকে। আর সেটা সম্বন্ধে আমার বাড়ির লোকেরা কেউ জানে না।'

'আমি জানতে পারি কি? আমার অদম্য কৌতূহল হচ্ছে।'

'নিশ্চয়ই পারেন।'

ভদ্রলোক উঠে দোতলায় গেলেন। তারপর মিনিট তিনেক পরে এসে একটা ছ-ইঞ্চি লম্বা জিনিস আমাদের সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। সেটা একটা বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি।

'পঞ্চরত্নের তৈরি।' বললেন সোমেশ্বরবাবু, 'তার মানে হিরে, পান্না, নীলকান্ত, প্রবাল আর মুক্তো। এর কত দাম জানি না।'

'অমূল্য', বলল ফেলুদা। 'এবং অপূর্ব জিনিস। এ জিনিস কবে থেকে আছে?'

'এটা পাই রঘুনাথপুরের রাজা দয়াল সিং-এর কাছে। নাইনটিন ফিফটি সিক্সে। আমার ম্যাজিক দেখে খুশি হয়ে দেন আমাকে জিনিসটা।'

'আপনাদের বাড়িতে দারোয়ান নেই?'

'তা আছে বইকী। তাছাড়া চারজন চাকর আছে। চোরের মনে হয় চাকরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।'

'যদি না চোর বাড়ির লোক হয়।'

'এ যে আপনি সর্বনেশে কথা বলছেন!'

'আমরা গোয়েন্দারা এ রকম কথা বলে থাকি। সেটা সিরিয়াসলি নেবার কোনও দরকার নেই।'

'তাও ভাল।'

'আপনি বোধহয় বিপত্নীক?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার ওই একটিই ছেলে?'

'না। নিখিল আমার ছোট ছেলে। বড়টি—অখিল—উনিশ বছর বয়সে বি. এ. পাস করে বিদেশে চলে যায়।'

'কোথায়?'

'সেটা বলে যায়নি। আমাদের ফ্যামিলিতে ভবঘুরেও রয়েছে কিছু কিছু। অখিল ছিল তাদের মধ্যে একজন। অস্থির চরিত্র। বলল, জার্মানি গিয়ে চাকরি করবে। তারপর বেরিয়ে পড়ল। এ হল নাইনটিন সেভেনটির কথা। তারপর আর কোনও যোগাযোগ করেনি। ইউরোপেই কোথাও আছে হয়তো, কিন্তু জানবার কোনও উপায় নেই।'

'আপনার সেক্রেটারি প্রণবেশ এই কৃষ্ণটার কথা জানেন?'

'হ্যাঁ। সে তো আমার ঘরের ছেলের মতোই। আর তাকে তো আমার সব কাগজপত্র, করেসপন্ডেন্স ঘাঁটতে হয়।'

'যাই হোক, এবার এটা তুলে রেখে দিন। এমন চমৎকার জিনিস আমি কমই দেখেছি।'

'আমি তাহলে সূর্যকুমারকে না বলে দিই।'

'নির্দ্বিধায়।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'আমি একবার বাড়ির আশপাশটা ঘুরে দেখতে চাই। চোর কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে আসতে পারে, সেটা একবার দেখা দরকার।'

'সবচেয়ে সুবিধে বারান্দা দিয়ে। আসলে আমার দারোয়ান একটু কর্তব্যে ঢিলে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

বাড়ির বারান্দা যেদিকে, সেদিকেই একটা বাগান রয়েছে। তবে সেটাকে খুব যত্ন করা হয় বলে মনে হল না। বাড়ির চারিদিকে বেশ উঁচু কম্পাউন্ড ওয়াল, সেটা টপ্‌কে পেরোনো সহজ নয়। দেয়ালের দু ধারে গাছপালাও বিশেষ নেই।

ফেলুদা মিনিট পনেরো ঘোরাঘুরি করে বলল, 'চোর সম্বন্ধে ঠিক শিওর হওয়া গেল না। বাড়ির চোর না বাইরের চোর, সে বিষয়ে সংশয় রয়ে গেল।'

॥ ৩ ॥

পরদিন সোমেশ্বরবাবু টেলিফোনে জানালেন যে সূর্যকুমারের সঙ্গে ওঁর কথা হয়ে গেছে। উনি খাতাটা বিক্রি করবেন না বলে দিয়েছেন।

'ভাল কথা।' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমার জাদুকর নিয়ে একটা ভাল প্লট মাথায় এসেছে। ভাবছিলাম, সূর্যকুমারের সঙ্গে কী করে একটু কথা বলা যায়।'

'ওকে হোটেলে ফোন করুন।' বলল ফেলুদা, 'কোন্ হোটেলে আছে সে তো যারা আমাদের টিকিট দিয়েছিল, তারাই বলে দেবে।'

'তা বটে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে লালমোহনবাবু সূর্যকুমারের সঙ্গে কথা বলে, তার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিলেন আমাদের বাড়িতেই। ভদ্রলোক আগামীকাল সকালে সাড়ে ন-টায় আসবেন।

'আপনি কিন্তু আমাকে দেখলেই চিনবেন।' বললেন লালমোহনবাবু, 'আমি সেদিন আপনার দ্বারা হিপ্নোটাইজ্ড হয়েছিলাম।'

পরদিন একটা মারুতি গাড়িতে ঠিক সাড়ে ন টার সময় সূর্যকুমার এসে হাজির। লালমোহনবাবু অবিশ্যি মিনিট কুড়ি আগেই চলে এসেছিলেন। সূর্যকুমার ফেলুদাকে দেখে কেমন হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনার পরিচয়টা পেতে পারি কি? আপনাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে।'

ফেলুদা বলল, 'আমার নাম প্রদোষ মিত্র। হয়তো খবরের কাগজে ছবি দেখে থাকবেন।'

'প্রদোষ মিত্র মানে গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র?'

আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমার পরম সৌভাগ্য।'

'সৌভাগ্য তো আমারও। আপনার মতো একজন দক্ষ ম্যাজিশিয়ানের পায়ের ধুলো পড়ল আমাদের বাড়িতে, সেও কি কম সৌভাগ্য?'

চায়ের পর লালমোহনবাবু প্রশ্ন আরম্ভ করলেন।

'আপনি কদ্দিন ম্যাজিক দেখাচ্ছেন?'

'তা বারো বছর হল।'

— 'কারুর কাছে শিখেছেন কি?'

'আমি নক্ষত্র সেন ঐন্দ্রজালিকের সহকারী ছিলাম পাঁচ বছর। তাঁর বয়স হয়েছিল—স্টেজেই ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে স্ট্রোক হয়ে মারা যান। তাঁর সব ম্যাজিকের সরঞ্জাম আমার হাতে পড়ে। আমি তাই নিয়েই শুরু করি।'

'আপনাকে কি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে খেলা দেখাতে হয়?'

'হ্যাঁ। শুধু ভারতবর্ষ কেন, আমি জাপান আর হংকংও গিয়েছি।'

'বটে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আগামী বছর সিঙ্গাপুর থেকে নেমন্তন্ন আছে।'

আপনার ফ্যামিলি নেই?'

'না। আমি ব্যাচেলার।'

'এখনও ম্যাজিক অভ্যাস করতে হয় আপনাকে, না আর দরকার হয় না?'

'এখনও সকালে দু ঘন্টা হাত-সাফাই প্র্যাক্‌টিস করি। ওটা থামালে চলে না।'

এবার ফেলুদা একটা প্রশ্ন করল।

আপনার সঙ্গে সোমেশ্বর বর্মনের বোধহয় আলাপ হয়েছে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি তো ভারতীয় জাদুবিদ্যার পাণ্ডুলিপিটা কিনতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমি ভেবেছিলাম আমার বিলিতি ম্যাজিকের মধ্যে কয়েকটি দিশি আইটেম ঢোকাতে পারলে অ্যাট্রাকটিভ হবে। কিন্তু ভদ্রলোক বইটি বিক্রি করলেন না। আমি বিশ হাজার অফার করেছিলাম। তবে বিক্রি না করলেও, ওঁর সঙ্গে আমার খুব ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, কারণ আমি ওঁকে সত্যিই শ্রদ্ধা করি। উনি আমার শো শেষ হলে পর ওঁর বাড়িতে গিয়ে আমাকে কয়েক দিন থাকতে বলেছেন।'

'আপনার শো শেষ হচ্ছে কবে?'

'এই রবিবার।'

'এর পর কোথায় যাওয়া?'

'দিন সাতেক বিশ্রামের পর পাটনা যাব।'

লালমোহনবাবুর আরও দু-একটা প্রশ্ন ছিল, তারপরেই ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। আমারও ভদ্রলোককে খারাপ লাগল না।

ফেলুদা বলল, 'বিদেশি জামাকাপড় জুতো পরেছে। বোধহয় জাপান কি হংকং-এ কেনা। এমনিতে বেশ সৌখিন লোক, যেমন ম্যাজিশিয়ানরা সাধারণত হয়।'

'সোমেশ্বরবাবুদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন বলুন?' বললেন লালমোহনবাবু, 'নইলে আর বাড়িতে এসে থাকতে বলে!'

॥ ৪ ॥

এ সপ্তাহটায় আর কোনও ঘটনা ঘটল না। তারপর যেটা হল, সেটা একেবারে বজ্রপাত! মঙ্গলবার দিন সোমেশ্বরবাবু ফোন করে জানালেন যে তাঁর বাড়িতে খুন হয়েছে তাঁর বহুদিনের বেয়ারা অবিনাশ, আর সেই সঙ্গে সিন্দুক থেকে পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ হাওয়া। একসঙ্গে ডবল ট্র্যাজেডি!

ফেলুদা তৎক্ষণাৎ লালমোহনবাবুকে ফোন করে বলে দিল সোমেশ্বরবাবুর বাড়িতে আসতে, আর আমরা ট্যাক্সি করে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখি, পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছে। ইনস্পেক্টর ঘোষ ফেলুদার চেনা, দেখে বললেন, 'স্রেফ ডাকাতির কেস। খুন করার মতলব ছিল না; সামনে বাধা পেয়ে খুন করেছে। আসল উদ্দেশ্য ছিল সিন্দুক থেকে ওই কৃষ্ণটা নেওয়া। এ বাইরের লোকের কাজ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই সে দিন একটা ডাকাতির কেস হয়ে গেছে।'

'ওই কৃষ্ণের কথা কিন্তু এ বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানত না।'

'তাহলে এ বাড়ির ভেতর থেকেই ব্যাপারটা হয়েছে। সোমেশ্বরবাবুর ছেলে আছেন, সেক্রেটারি আছেন, বন্ধু আছেন, আর্টিস্ট রণেন তরফদার আছেন, সূর্যকুমার বলে সেই ম্যাজিশিয়ান কাল থেকে

এখানে রয়েছেন; এর মধ্যেই কেউ গিল্টি। আর যদি তাই হয়, তাহলে তো আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে।'

'খুনটা কখন হয়েছে?'

'রাত একটা থেকে তিনটের মধ্যে।'

'বেয়ারা কি চোরকে বাধা দিতে গেসল?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। একতলার বৈঠকখানায় সোমেশ্বরবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। ঘরে আর সকলেই রয়েছে, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ চেয়ারে বসে।

ফেলুদা সোমেশ্বরবাবুকে বলল, 'ঘটনাটা একটু বলবেন? এই বেয়ারা কি আপনার অনেক দিনের বেয়ারা?'

'ত্রিশ বছর। অবিনাশের মতো ভাল লোক পাওয়া খুব দুরূহ।'

'খুনটা কোথায় হয়?'

'একতলায়। চোর সিন্দুক থেকে কৃষ্ণটা নিয়ে পালাচ্ছিল, সেই সময় হয়তো অবিনাশের ঘুম ভেঙে যায়। সে চোরের সামনে পড়ে, হয়তো তাকে ধরতে যায়; সেই সময় চোর তাকে ছুরি মেরে খুন করে।'

'আপনারা কে কোথায় শোন্, জানতে পারি?'

'আমার ঘর তো আপনি দেখেইছেন। আমি আর অনিমেষ দোতলায় শুই। বাকি সকলে একতলায় শোয়। কাল সূর্যকুমার এখানে এসেছেন ক-দিনের জন্য, তাকে একতলায় একটা গেস্ট-রুম দিই।'

'কিন্তু আপনার এই কৃষ্ণর কথা তো বাইরের কেউ জানত না?'

'তা তো না-ই। অথচ বাড়ির কেউ এমন কাজ করে থাকতে পারে, সেটা ভাবা অসম্ভব মনে হচ্ছে।'

'আপনার বালিশের নীচ থেকে চাবি নিল, আর আপনি টের পেলেন না?'

'আমি যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোই। সে গভীর ঘুম।'

'সিন্দুকের চাবিটা কি রেখে গেছে?'

'হ্যাঁ। সেটা তালাতেই ঝুলছিল।'

'যে অস্ত্রটা দিয়ে খুন হয়েছিল, সেটা পাওয়া গেছে?'

'না।'

ইনস্পেক্টর ঘোষ এ সময় এসে বললেন, তিনি সকলকে জেরা করতে চান।

ফেলুদা বলল, 'আপনার জেরার পর আমি যদি একটু জেরা করি, তাহলে আপনার আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না। আপনার কীর্তিকলাপের সঙ্গে আমি বিলক্ষণ পরিচিত। নইলে প্রাইভেট ডিটেকটিভকে আমরা বিশেষ পাত্তা দিই না।'

ইনস্পেক্টর ঘোষ সোয়া ঘণ্টা ধরে সকলকে জেরা করলেন। আমরা ততক্ষণ চা-টা খেলাম। সোমেশ্বরবাবু যথেষ্ট আঘাত পেয়েছেন— খুনের ব্যাপারেও, চুরির ব্যাপারেও। কিন্তু তাতে আতিথেয়তার কোনওরকম ত্রুটি হল না।

আমরা চা খেয়ে বাইরে বাগানে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ইনস্পেক্টর ঘোষ এসে বললেন, 'আমার কাজ শেষ। এবার আপনি টেক-ওভার করুন।'

ফেলুদা ভিতরে গিয়ে প্রথমেই সোমেশ্বরবাবুর ছোট ছেলে নিখিলবাবুকে নিয়ে পড়ল। আমরা নিখিলবাবুর ঘরেই বসলাম।

ফেলুদা প্রথমেই জিগ্যেস করল, 'আপনি কী করেন?'

'আমার একটা অকশন হাউস আছে মিরজা গালিব স্ট্রিটে।'

'কী নাম?'

'মডার্ন সেল্‌স ব্যুরো।'

'জানি, দোকানটা দেখেছি।'

'তা দেখে থাকতে পারেন। ওখানে আমি সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত থাকি।'

'ব্যবসা কী রকম চলে?'

'ভালই।'

'আপনি আর্ট সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড?'

'আমার কাজের মধ্যে দিয়ে তো অনেক রকম আর্টের জিনিসপত্র আমাদের ঘাঁটতে হয়। সেই সূত্রে বেশ কিছু জানা হয়ে গেছে।'

'কত বছর হল আপনি এ কাজ করছেন?'

'সাত বছর।'

'আপনার বয়স কত?'

'তেত্রিশ চলছে।'

'আপনার দাদা আপনার চেয়ে কত বড়?'

'তিন বছর।'

'দাদার সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

'দাদা মিশুকে ছিলেন না। কথাও বেশি বলতেন না, বন্ধু-বান্ধবও বেশি ছিল না। সত্যি বলতে কী, দাদার কারুর উপরেই টান ছিল না— এমনকী আমার উপরেও না।'

নিখিলবাবুর কথা শুনে আমার কেন যে একটু অদ্ভুত লাগছিল, সেটা কিছুতেই ভেবে বের করতে পারলাম না।

'বিদেশে গিয়ে দাদা আপনাকে চিঠি লেখেননি?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'না। শুধু আমাকে না, কাউকেই লেখেননি।'

'বাবার ম্যাজিকে আপনার কোনও ইন্টারেস্ট ছিল না?'

'নিশ্চয়ই ছিল। তবে বাবা তো বেশির ভাগ ম্যাজিক বাইরে দেখাতেন; সেগুলো আর আমার দেখা হত না।'

'নিজে ম্যাজিক করার শখ হয়নি?'

'তা হয়নি। শুধু দেখতেই ভাল লাগত।'

'এই যে অঘটনটা ঘটল, এটার জন্য কে দায়ী, সে সম্বন্ধে আপনার কোনও ধারণা আছে?'

'না। একেবারেই নেই। তবে বাবাকে আমি অনেকবার বলেছি কৃষ্ণটা বাড়িতে না রেখে ব্যাঙ্কে রাখা উচিত। বাবা আমার কথায় কান দেননি।'

নিখিলবাবুর সঙ্গে কথা শেষ করে, আমরা সোমেশ্বরবাবুর বন্ধু অনিমেষবাবুর কাছে গেলাম।

খাট আর চেয়ার ভাগ করে আমরা বসলাম ভদ্রলোকের ঘরে।

ফেলুদা জিগ্যেস করল, 'আপনি কী করেন?'

'আমি কিছুই করি না।' বললেন অনিমেষবাবু, 'আমার বাবা ছিলেন উকিল। তিনি অনেক তলার একটা বাড়ি তৈরি করে গেসলেন, সেটার ভাড়া থেকেই আমার চলে যায়।'

সোমেশ্বরবাবুর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব কত দিনের?'

'তা প্রায় বিশ বছর।'

'কী করে সূত্রপাত হয়?'

'আমি এককালে জ্যোতিষ করতাম। সোমেশ্বর আমার কাছে এসেছিল তার ভাগ্য গণনা করাতে। ও তখন সবে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করেছে। আমি ওর ভবিষ্যতের খ্যাতির কথা বলে দিই। এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে ও আমার বাড়িতে আবার আসে, এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। সোমেশ্বরের স্ত্রী মারা যাবার পর ও আমাকে ওর বাড়িতে এসে থাকতে বলে—বোধহয় একাকীত্ব খানিকটা কাটবে বলে। তখনই আমি চলে আসি। সে আজ পনেরো বছর হল।'

'পঙ্করত্নের কৃষ্ণটা আপনি কবে দেখেন?'

'ওটার কথা তো আমি আমার গণনায় বলি। ওটা পাওয়া মাত্র ও আমাকে দেখায়।'

'এই চুরি এবং খুন কে করতে পারে, সে বিষয়ে আপনার কোনও ধারণা আছে?'

'বাড়ির চাকরের সঙ্গে যোগসাজশ আছে, এমন কোনও চোর বলেই আমার বিশ্বাস। আমার ধারণা, ও সিন্দুক খুলে টাকা নিতে গেসল। তারপর সামনে ওই ঝলমলে কৃষ্ণটা দেখে, সেইটে নিয়ে নেয়। বাড়ির কোনও লোক এ ব্যাপারে জড়িত, এ বিশ্বাস করতে আমার মন চায় না।'

॥ ৫ ॥

সোমেশ্বরবাবুর সেক্রেটারি প্রণবেশবাবু বললেন, উনি পাঁচ বছর থেকে সেক্রেটারির কাজ করছেন। ওঁর নিজের বাড়ি একটা ছিল ভবানীপুরে, কিন্তু এ বাড়িতে এত ঘর আছে দেখে, সোমেশ্বরবাবুই প্রস্তাব করেন এই বাড়িতে এসে থাকার জন্য। প্রণবেশবাবুও আপত্তি করেননি।

'মনিব হিসেবে সোমেশ্বরবাবু কেমন লোক?'

'চমৎকার। সেদিক দিয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

'কাজটা কেমন লাগে?'

'সোমেশ্বরবাবু যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেগুলো আশ্চর্য। টাইপ করতে করতে আমি যে কত কী নতুন জিনিস জানতে পারছি, তা বলতে পারি না।'

'আপনি কটা পর্যন্ত করেন?'

'রাত আটটা, ন-টা...'

'আপনি তো একতলায় শোন্।'

'হ্যাঁ।'

'ঘুম কেমন হয়?'

'ভালই।'

'কাল কোনও কারণে—কোনও শব্দে বা ওই জাতীয় কিছুতে আপনার ঘুম ভেঙে যায়নি?'

'না। আমি ঘটনাটা জেনেছি সকালে উঠে।'

'এ বাড়ির কাউকে আপনার সন্দেহ হয়? কৃষ্ণটার বিষয় যখন শুধু এ বাড়ির লোকেরাই জানত, তখন হয়তো অপরাধীও এ-বাড়িতেই রয়েছে।'

'সে হতে পারে। আমিও তো সাসপেক্টদের মধ্যে পড়ছি।'

'তা পড়ছেন বৈকি।'

'পুলিশ অবিশ্যি পুরো বাড়ি সার্চ করবে, কিন্তু অতটুকু জিনিস লুকোনোর জায়গার তো অভাব নেই। তারপর সুযোগ বুঝে বার করে নিলেই হল।'

সোমেশ্বরবাবুর যিনি অয়েল পেন্টিং করছিলেন, তিনিও এই বাড়িতেই থাকেন। অন্তত যতদিন না ছবি শেষ হচ্ছে, ততদিন থাকবেন। এই ভদ্রলোককে আমার কেন জানি একটু অদ্ভুত লাগে। প্রথমত চেহারাটা অদ্ভুত—চাপ-দাড়ি, চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। তারপর ভদ্রলোক কথা অত্যন্ত কম বলেন। কাজ অবিশ্যি ভালই করেন, কারণ সোমেশ্বরবাবুর যেটুকু ছবি আঁকা হয়েছে সেটা আমি দেখেছি, আর সেটা ভালই হয়েছে।

ইনিও একতলায় থাকেন। ফেলুদা তাঁর দরজায় গিয়ে টোকা মারল।

ভদ্রলোক দরজা খুলে ফেলুদার দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল।' বলল ফেলুদা।

'বেশ তো, ভেতরে আসুন।'

অগোছালো ঘর, যেটা হবে বলে আমি আন্দাজ করেছিলাম। আমরা মোড়া চেয়ার বিছানা মিলিয়ে বসলাম।

'আপনার নাম তো রণেন তরফদার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি ক-দিন হল এ বাড়িতে আছেন?'

'যে দিন থেকে ছবিটা আঁকা শুরু করেছি। তার মানে দেড় মাস।'

'আপনার একটা পোর্ট্রেট করতে কত সময় লাগে?'

'ফুল ফিগার হলে, এবং দিনে অন্তত দু ঘণ্টা সিটিং পেলে, মাস দেড়েকে হয়ে যায়।'

'তাহলে এখানে এতদিন লাগছে কেন?'

'এখানে সোমেশ্বরবাবু দিনে এক ঘণ্টার বেশি সিটিং দেন না। তারপর আমাকে ওঁর ভাল লেগেছে বলে, উনি চান আমি এখানেই থাকি। আসলে সোমেশ্বরবাবু বেশ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। ওঁর এক ছেলে বিলেতে। মেয়ের বিয়ে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, উনি ভয়ানক একা হয়ে গেসলেন। এ বাড়িটাকে উনি খানিকটা ভরাট করতে চান, এটা আমার ধারণা।'

'আপনি পেন্টিং কোথায় শিখেছিলেন?'

'আমি ফ্রান্সে শিখি তিন বছর। তা ছাড়া প্রথমে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ্ আর্টে শিখেছি।'

'পোর্ট্রেট করে রোজগার ভাল হয়?'

'এখন আর হয় না। ফোটোগ্রাফির যুগে আসল-পোর্ট্রেটের কদর অনেক কমে গেছে। আমিও তাই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট পেন্টিং-এ চলে যাচ্ছি। সোমেশ্বরবাবুর পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে, আমার অবস্থা খুবই কাহিল হত।'

'আপনি পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতেন?'

'হ্যাঁ। ওটা আমাকে সোমেশ্বরবাবু দেখিয়েছিলেন।' বলেছিলেন, 'তুমি আর্টিস্ট, তুমি এর কদর করতে পারবে।'

'কালকের খুন এবং ডাকাতি সম্বন্ধে আপনার নিজের কোনও থিওরি আছে?'

'বাড়ির লোক এ কাজ করতে পারে না। আমার মনে হয়, চোর সিন্দুক থেকে টাকা নিতে গিয়ে কৃষ্ণটা দেখে সেটা নিয়ে নেয়। তারপর নীচে নেমে বেয়ারার সামনাসামনি পড়ে, ওকে খুন করে। আত্মরক্ষা ছাড়া খুনের আর কোনও মোটিভ আছে বলে আমার মনে হয় না।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

আর দু জন বাকি রইল—সূর্যকুমার আর সোমেশ্বরবাবু। আমরা সূর্যকুমারেরর কাছেই আগে গেলাম। ভদ্রলোক কেমন যেন গুম্ মেরে গেছেন। তিনি এ বাড়িতে আসার দিনই ঘটনাটা ঘটল, এই জন্যই বোধহয়।

ফেলুদা বলল, 'আপনার ভাগ্যটা খুব খারাপ দেখছি।'

'আর বলবেন না!' বললেন ভদ্রলোক, 'সোমেশ্বরবাবু এত আপ্যায়ন করে আমায় থাকতে বললেন, আর প্রথম রাত্রেই কী কাণ্ড! আমি একবারে থ মেরে গেছি!'

'রাত্রে কোনওরকম শব্দ-টব্দ পাননি?'

'একেবারেই না। আমি এমনিতে খুব ভাল ঘুমোই। এক ঘুমে রাত কাবার হয় আমার। কাজেই আমি কিছুই শুনিনি।'

'এ বাড়ির সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'যা হয়েছে, তাকে আলাপ বলা যায় না। একমাত্র সোমেশ্বরবাবু ছাড়া।'

'যে জিনিসটা চুরি হয়েছে, সেটা আপনি দেখেননি?'

'কী করে দেখব? প্রথমত ঠিক করে জানি না জিনিসটা কী। শুধু কৃষ্ণ শুনেছি, এই পর্যন্ত।'

'কৃষ্ণই বটে, তবে পঞ্চরত্নের তৈরি। যেমন সুন্দর, তেমন ভ্যালুয়েব্‌ল। লাখখানেকের উপর দাম হবে। ...আপনি কি এখনও এখানেই থাকবেন?'

'সোমেশ্বরবাবু তো তাই বলছেন। বলছেন, "আপনাকে ডেকে এনে, চলে যেতে বলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবে আপনার থাকাটা

আপনার পক্ষে তেমন সুখকর হতে পারল না, এই যা দুঃখ!" '

'আপনি যখন আছেন, তখন প্রয়োজনে আপনাকে আবার প্রশ্ন করা চলবে তো?'

'নিশ্চয়ই। এ নিয়ে তো কোনও কথাই উঠতে পারে না।'

এরপর আমরা সোমেশ্বরবাবুর কাছে গেলাম। ভদ্রলোক এখনও মুহ্যমান অবস্থায় রয়েছেন।

ফেলুদা বলল, আপনি কতটা ঘা খেয়েছেন, সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি যখন এখানে উপস্থিত রয়েছি, তখন কৌতূহলবশত আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন না করে পারছি না।'

'তা তো করবেনই। আপনার তো পেশাই এটা।'

'আপনি কোনওরকম টের পাননি, না?'

'টের পাইনি, তবে আঘাত পেয়েছি প্রচণ্ড। প্রথমত আমার অবিনাশ বেয়ারার এই দশা। লোকটা যে কী কাজের ছিল, তা বলতে পারি না। আর আমাকে কতটা মান্য করত, সেও বলে বোঝাতে পারব না। দ্বিতীয়ত, আমার পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ। দয়াল সিং নিজে হাতে তুলে দিয়েছিলেন জিনিসটা আমায়। বললেন, "তুমি শিল্পীর সেরা শিল্পী— তোমাকে এর চেয়ে কম পারিশ্রমিক দেওয়া যায় না।" আর সেই পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ চলে গেল! আর তা ছাড়া—' সোমেশ্বরবাবু কী যেন বলতে গিয়ে, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

তারপর কয়েক মুহূর্ত পরে প্রায় আপন মনেই বললেন, 'আমি কি ভুল করলাম? আশা করি ভুল করেছি। কারণ জিনিসটা সত্যি হলে, আমার পক্ষে আরও দ্বিগুণ বেদনাদায়ক হবে।'

'আপনি কিসের কথা বলছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'সে আপনি জানতে চাইবেন না, কারণ আপনাকে বলতে পারব না।'

'আপনি কিছু টের পাননি?'

'টের পেয়েছি, কিন্তু পেয়েও কিছু করতে পারিনি।'

'আপনার কথায় একটা রহস্যের সুর রয়েছে, সেটা আপনি উদঘাটন করবেন কি? করলে, আমাদের অনেক সুবিধে হত।'

'সে অনুরোধ আমায় করবেন না, মি. মিত্তির। আপনি যদি এবার

আমাকে রেহাই দেন, আমি বাধিত হব।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—।'

আমরা তিন জন উঠে পড়লাম।

'তবে আমি নিজের স্বার্থে তদন্ত করতে চাই আপনার বাড়ির এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে। তাতে আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।'

'মোটেই না, অপরাধী যেই হোক্ না, তাকে ধরা কর্তব্য।'

॥ ৬ ॥

বাড়ি এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'সোমেশ্বরবাবুর কথাগুলো ভারি রহস্যজনক মনে হচ্ছিল, তাই না?'

'ঠিকই বলেছেন।' বলল ফেলুদা।

'আমার মনে হয়, ভদ্রলোক বেশ কিছু কথা লুকিয়ে গেলেন।'

'আমারও সেই রকমই মনে হয়েছে।'

'আপনি নিজে কী বুঝেছেন?'

'একেবারে অন্ধকারে আছি, তা নয়। তবে ম্যাজিকের জগৎ নিয়ে একটু অনুসন্ধান চালাতে হবে। তাছাড়া অকশন হাউসও একটা ব্যাপার আছে। আমি বরং একটু ঘুরে আসি। আপনারা দু জনে আড্ডা মারুন।'

আমি একটা কথা এই বেলা ফেলুদাকে না বলে পারলাম না। 'আচ্ছা ফেলুদা, নিখিলবাবুর কথা শুনে কি তোমার কিছু মনে হয়েছিল?'

'সেটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কেন নয়, সেটা অবিশ্যি তোকে ভেবে বার করতে হবে।'

ফেলুদা বেরিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমার কিন্তু এই আর্টিস্ট ভদ্রলোককে মোটেই ভাল লাগছে না। অবিশ্যি চাপ দাড়ির বিরুদ্ধে আমার একটু প্রেজুডিস আছে এমনিতেই।'

'সূর্যকুমার ভদ্রলোকটিকে আপনার ভাল লাগছে?'

'ও-ও কেমন যেন পিকিউলিয়ার। তবে প্রথম দিন এসেই ও সিন্দুক খুলবে বলে মনে হয় না। ওই বাড়ির সঙ্গে তো ওর বিশেষ পরিচয় নেই। কোনটা কার ঘর, কোথায় সিন্দুক আছে, কোথায় সিন্দুকের চাবি

আছে---এ সব জানা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে এ চোর খুনী-চোর। ওকে যখন বেয়ারা দেখে ফেলল, তখন তো ও ওকে ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দিতে পারত। পালানো নিয়ে তো কথা, আর বেয়ারার বয়সও ষাটের কাছাকাছি। বোঝা যাচ্ছে যে চোর ছুরি হাতে নিয়েই কুকীর্তিটা করতে বেরিয়েছিল।'

'এটা আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'সোমেশ্বরবাবুও কী বলতে গিয়ে বললেন না, সেটা জানতে ইচ্ছা করে। আমার মনে হয় ওখানে একটা ইম্পর্ট্যান্ট ক্লু লুকিয়ে আছে।'

ঠিক এই সময় একটা ফোন এল। তুলে 'হ্যালো' বলতে ওদিক থেকে প্রশ্ন এল, 'মি.মিত্তির আছেন?'

ইনস্পেক্টর ঘোষ। বললাম, 'ফেলুদা একটু বেরিয়েছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওঁকে বলে দেবেন যে কালপ্রিট ধরা পড়েছে। গোপচাঁদ বলে এক চোর—রিসেন্টলি জেল থেকে বেরিয়েছে। অবিশ্যি লোকটা স্বীকার করেনি এখনও, কিন্তু সে দিন রাত্রে ও বেরিয়েছিল, সে খবর আমরা পেয়েছি। এটা আপনি জানিয়ে দেবেন। আর স্বীকারোক্তি পেলে, আবার আপনাকে টেলিফোন করব। আপনার দাদাকে নিশ্চিন্ত হতে বলে দেবেন।'

আমি ফোন রেখে দিলাম। মনটা কেমন জানি দমে গেল। এ তো ঠিক জমল না।

ঘণ্টা দেড়েক পরে ফেলুদা আসাতে, আমি প্রথমেই ওকে ইনস্পেক্টরের কথাটা বললাম। ফেলুদা যেন গা-ই করল না। বলল, 'সূর্যকুমারের ম্যাজিক খুব ভাল চলছে না, নিখিলবাবুর দোকানের অবস্থাও ভাল নয়। আর আমাদের আর্টিস্ট রণেন তরফদার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ্ আর্টের ছাত্র ছিলেন না। প্যারিসে আঁকা শিখেছিলেন কিনা, সেটা অবিশ্যি জানতে পারিনি।'

'তাহলে এখন কী করণীয়?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আমার দিক থেকে মোটামুটি কাজ শেষ। এখন রইল শুধু রহস্য উদ্‌ঘাটন। দাঁড়ান, আগে ইনস্পেক্টর ঘোষকে একটা ফোন করি।'

ফেলুদা ফোনে প্রথমেই বলল, 'আপনার সমাধান যে মানতে পারছি না, মি. ঘোষ।'

ঘোষের উত্তরের পর ফেলুদা বলল, 'আমার ধারণা খুনী ওই বাড়িরই লোক। আপনি এক কাজ করুন। আমার সমাধান রেডি। আমি আজ বিকেলে সেটা ঘোষণা করতে চাই সোমেশ্বরবাবুর ওখানে। আপনিও আসুন। আমার কথা শুনে আপনার যদি কিছু বলার থাকে বলবেন। আমার এ অনুরোধটা আপনাকে রাখতেই হবে। তা ছাড়া আপনাকে খুনিকে গ্রেপ্তার করার জন্য তৈরি হয়ে আসতে হবে।... থ্যাঙ্ক ইউ।'

ফেলুদা ফোন রেখে বলল, 'ভদ্রলোক রাজি। গোপচাঁদ—হুঁ! এই জন্যই মাঝে মাঝে পুলিশের উপর থেকে ভক্তি চলে যায়।'

এরপর ফেলুদা সোমেশ্বরবাবুকে একটা ফোন করে, বিকেলে ওঁর ওখানে যাবার কথাটা বলে দিল। সেই সঙ্গে এ-ও বলে দিল যে সবাই যেন উপস্থিত থাকে।

বিকেল পাঁচটায় আমরা সোমেশ্বরবাবুর নীচের বৈঠকখানায় জমায়েত হলাম। ইনস্পেক্টর ঘোষ আর দু জন কনস্টেবল এসে গিয়েছিল আগেই।

সকলে যে-যার জায়গায় বসলে পর, ফেলুদা শুরু করল।

'প্রথমেই আমাদের যে প্রশ্নটার সামনে পড়তে হচ্ছে, সেটা হল চোর বাইরের লোক না ভেতরের লোক। এখানে প্রথম যে দিন চোর আসে, তার পর দিন আমি এসেছিলাম। বাড়ির চারদিকে ঘুরে মনে হয়েছিল—এখানে বাইরে থেকে চোর ঢোকা খুব মুশকিল। বারান্দার থাম বেয়ে উঠলেও, জিনিসপত্তর চুরি করে থাম বেয়ে নামার সুবিধে নেই। কাজেই আমার বাড়ির লোকের কথাই বেশি করে মনে হয়েছিল, এবং চোরের দৃষ্টি যে কিসের দিকে, সে সম্বন্ধেও আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

'এবার চুরি এবং খুনের পর আমি সকলকে জেরা করি। সোমেশ্বরবাবুকে জেরা করতে জানতে পারলাম তিনি এটা টের পেয়েছিলেন, কিন্তু বাধা দেবার কোনওরকম চেষ্টা করেননি। এতে মনে হয় তিনি চোরকে দেখে একেবারে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চুরির পর যে খুন হবে, সেটা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

চুরির মোটিভ অবশ্য একটাই হতে পারে; চোরের হঠাৎ বেশ কিছু টাকার দরকার পড়ে গেছল।

'এ বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের মধ্যে রণেন তরফদার ছবি এঁকে রোজগার করছিলেন, সাময়িকভাবে তাঁর অবস্থা স্বচ্ছলই বলা যেতে পারে। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে চুরি করাটা অস্বাভাবিক। অনিমেষবাবু ভালই আছেন বন্ধুর আতিথেয়তায়, কাজেই তাঁকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

'এবার নিখিলবাবুতে আসা যাক। নিখিলবাবুর একটা অকশন হাউস আছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সে অকশন হাউসের অবস্থা খুব ভাল না। সুতরাং নিখিলবাবুর পক্ষে পঞ্চরত্নের কৃষ্ণটা পাওয়া খুবই লাভজনক হবে। কারণ তিনি নিজের অবস্থা সামলে নিতে পারবেন। আমার ধারণা, প্রথম দিন নিখিলবাবুই চুরির চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন।'

নিখিলবাবু বলে উঠলেন, 'আপনি বিনা প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত করছেন?'

ফেলুদা বলল, 'এখানে শেষ তো হয়নি—আপনি তো চুরি করতে পারেননি। কাজেই আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি বলছি না যে আমার যুক্তি অকাট্য। আমি শুধু অনুমান করছি। আপনি আপত্তি করতে চান তো করতে পারেন, কারণ আসল ঘটনা হল দ্বিতীয় দিনের!'

'প্রথম আর দ্বিতীয় দিনের ঘটনার মধ্যে একটি নতুন লোক এসে এ বাড়িতে উঠেছেন, তিনি হলেন জাদুকর সূর্যকুমার। এটাও আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে সূর্যকুমার তাঁর প্রদর্শনীতে লোকসান দিচ্ছে। আমরা যেদিন তাঁর ম্যাজিক দেখতে যাই, সে দিনও হল-এ অনেক সিট খালি ছিল। এই সূর্যকুমার কি চুরি করে থাকতে পারেন? কারণ তাঁর টাকার দরকার ছিল অবশ্যই।'

সূর্যকুমার বলে উঠলেন, 'ভুলে যাচ্ছেন মি. মিত্তির, আমি সোমেশ্বর বর্মনের সিন্দুক ও তার মধ্যে পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না।'

'সূর্যকুমারবাবু,' ফেলুদা বলল, 'এবারে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন